সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প

জান্নাত আরা সোহেলী
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৯৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮

পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্যে উপস্থাপিত 'সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত। এটি আমার সম্পূর্ণ মৌলিক গবেষণা-কর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনোপ্রকার ডিগ্রি / ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষও উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism বা কুম্ভীলকবৃত্তি নেই।

জান্নাত আরা সোহেলী
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৯৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প

জান্নাত আরা সোহেলী

পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প শীর্ষক পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ

গবেষক : জান্নাত আরা সোহেলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণার সার-সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সৈয়দ শামসুল হকের অবস্থান গৌরবের। সাহিত্যের বিভিন্ন রূপাঙ্গিকের মতো কাব্যনাট্য রচনায়ও তিনি অর্জন করেছেন অবিসংবাদিত খ্যাতি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনাই তাঁর কাব্যনাট্যের বিষয়। এছাড়াও বিশ্বখ্যাত নাট্যকারদের ক্লাসিক নাটক তাঁর কাব্যনাট্যে যুগিয়েছে প্রাণের রসদ। তাঁর কাব্যনাটকের সংখ্যা সর্বমোট দশটি। এগুলোর রচনাকাল বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত। প্রায় চার দশকব্যাপী রচিত কাব্যনাটকে তিনি বিষয় নির্বাচনে যেমন, ঠিক তেমনি শৈলিব্যবহারেও তাঁর ধীশক্তির স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞান। ইতিহাসচেতনা ও শিল্পজ্ঞানের সামবায়িক উপস্থাপনা তাঁর কাব্যনাটককে দিয়েছে কালজয়ী অভিধা। 'সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভে তাঁর সমাজ-রাজনীতি ও কালজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পবোধের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিকে প্রধানত দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এর প্রথম পরিচ্ছেদ "কাব্যনাট্যের সজ্ঞার্থ ও স্বরূপ"। এ পরিচ্ছেদে কাব্যনাট্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ "বাংলা কাব্যনাট্যের পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা'। এ পরিচ্ছেদে বাংলাসাহিত্য তথা বাংলাদেশের সাহিত্যে কোন কোন লেখক কাব্যনাট্য রচনায় প্রাতিস্বিকতা প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের পরিচয় প্রদানসূত্রে সৈয়দ শামসুল হকের অবস্থান শনাক্ত করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত সৈয়দ হকের কাব্যনাটক সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এখানে মূল আলোচনাকে বিভক্ত করা হয়েছে চারটি পরিচ্ছেদে। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে তাঁর ইতিহাস-প্রধান নাটকের আলোচনা। এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে – মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, কৃষকবিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক *নূরলদীনের সারাজীবন* ও পলাশীর রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত কাব্যনাটক *নারীগণ প্রসঙ্গ*। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে সমাজ-প্রধান চারটি কাব্যনাটক। এগুলো হলো – *এখানে এখন*, *ঈর্ষা*, *চম্পাবতী* ও *অপেক্ষমাণ*। সৈয়দ হকের রাজনীতি-নির্ভর কাব্যনাটকগুলি আলোচিত হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। বঙ্গবন্ধুর ছায়া অবলম্বনে রচিত নাটক *গণনায়ক*, রূপকধর্মী রচনা *মরা ময়ূর* এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিয়ে রচিত কাব্যনাটক *উত্তরবংশ*। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দশটি কাব্যনাটকেরই পৃথক পৃথক শিল্পরূপ আলোচিত হয়েছে। আর উপসংহার অংশে রয়েছে পুরো অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ। অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রয়োজনীয় তথ্যনির্দেশ সংযুক্ত করা হয়েছে। এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জি অংশে প্রদর্শিত হয়েছে মূল গ্রন্থ, সহায়কগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা।

গবেষকের নাম : জান্নাত আরা সোহেলী
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৯৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য আমি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত হই এবং আমার কর্মস্থল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাছুটি প্রদান করে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে এ-অভিসন্দর্ভ। গবেষণা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গবেষণার বিভিন্ন পর্বে তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মতামত, নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত আমাকে দুরূহ প্রসঙ্গসমূহের মীমাংসায় প্রভূত সাহায্য করেছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। গবেষণাকালে আমি স্যারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার অবাধে ব্যবহার করেছি। এসময় স্যারের সহধর্মিনী, আমাদের প্রিয় লুৎফুননাহার শেলি ভাবির সস্নেহ আপ্যায়ন শ্রমক্লান্তি দূর করেছে। তাঁর প্রতি জানাই আন্তরিক ভালোবাসা।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শরীফ সিরাজ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মীর হুমায়ূন কবীর বিপ্লব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তানিম জসিম, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহসিনা হোসাইনের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করছি। গবেষণার শুরু থেকেই ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর চঞ্চল কুমার বোস, ডক্টর আরজুমন্দ আরা বানু, ডক্টর পারভীন আক্তার জেমী, সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর শিল্পী খানম। তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। করোনা মহামারীকালে গৃহবন্দী অবস্থায় যখন তথ্যসংগ্রহ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছিল, তখন প্রয়োজনীয় কিছু গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রদান করে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর হোসনে আরা জলী, সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর রাহেল রাজীব, ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত। তাঁদের তিনজনকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ। গবেষণাকালে আমি প্রধানত ব্যক্তিগত সংগ্রহের উপর বেশি নির্ভর করেছি। এছাড়া সহায়তা নিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার; বাংলা বিভাগের মুহম্মদ আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষ; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ইংরেজি বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগ গ্রন্থাগারের। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার দীর্ঘসময়ে সন্তান ও সংসারের দায় থেকে মুক্ত রেখে গবেষণা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দিতে আমার আব্বা ও আম্মার যে অপরিসীম ত্যাগ, তা সমস্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঊর্ধ্বে। অগ্রজ তিন ভাই, বিশেষত বড় ভাই আবুল বাশারের সস্নেহ তাগিদ ও পরামর্শ আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যারপরনাই অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনিঃশেষ ভালোবাসা। নিজের পেশাগত শত ব্যস্ততার পরও থিসিস সম্পাদনের দীর্ঘ যাত্রায় সকল কারিগরি সহায়তা-পরামর্শ প্রদান এবং পাশে থেকে একনিষ্ঠ সমর্থন যুগিয়েছে আমার জীবনসঙ্গী ওবায়েদ শিশির। শ্রমক্লান্ত মুহূর্তে আত্মজা নৈসর্গিক নামিরা ও আত্মজ নির্ভীক জুলকারনাইনের নিষ্পাপ মুখশ্রী আমাকে তৃপ্ত করেছে। এরা সকলেই আমার নিরন্তর প্রেরণার উৎস

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের সাহিত্যশিল্পে সৈয়দ শামসুল হক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তাঁর বিচরণ সদর্প। বিশেষত কাব্যনাট্যরচনায় তাঁর খ্যাতি অবিসংবাদিত। কাব্যনাট্যের বিষয় তিনি প্রধানত আহরণ করেছেন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস অবলম্বনে। এছাড়াও বিশ্বখ্যাত নাট্যকারদের ক্লাসিক নাটক তাঁকে কাব্যনাট্য রচনায় উৎসাহিত ও প্রণোদিত করেছে। তাঁর কাব্যনাটকের সংখ্যা সর্বমোট দশটি। এগুলোর রচনাকাল বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত। স্পষ্টত দীর্ঘসময়ব্যাপী অন্যান্য রচনার সমান্তরালে তিনি কাব্যনাটকের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা ধরে রেখেছিলেন। কাব্যনাটকের বিষয় নির্বাচনে যেমন, ঠিক তেমনি শৈলিব্যবহারেও তিনি তাঁর ধীশক্তির স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞান। ইতিহাসচেতনা ও শিল্পজ্ঞানের সামবায়িক উপস্থাপনা তাঁর কাব্যনাটককে দিয়েছে কালজয়ী অভিধা। 'সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভে তাঁর সমাজ-রাজনীতি ও কালজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পবোধের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিকে প্রধানত দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এর প্রথম পরিচ্ছেদ "কাব্যনাট্যের সজ্ঞার্থ ও স্বরূপ"। এ পরিচ্ছেদে কাব্যনাট্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ "বাংলা কাব্যনাট্যের পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা'। এ পরিচ্ছেদে বাংলাসাহিত্য তথা বাংলাদেশের সাহিত্যে কোন কোন লেখক কাব্যনাট্য রচনায় সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের পরিচয় প্রদানসূত্রে সৈয়দ শামসুল হকের অবস্থান সুনির্ণয় করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়েই মূলত সৈয়দ হকের কাব্যনাটক সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এখানে মূল আলোচনাকে বিভক্ত করা হয়েছে চারটি পরিচ্ছেদে। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে তাঁর ইতিহাস-প্রধান নাটক সংক্রান্ত আলোচনা। এখানে রয়েছে – মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, কৃষকবিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক *নূরলদীনের সারাজীবন* ও পলাশির রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত কাব্যনাটক *নারীগণ*। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে সমাজ-প্রধান চারটি কাব্যনাটক। এগুলো হলো – *এখানে এখন*, *ঈর্ষা*, *চম্পাবতী* এবং *অপেক্ষমাণ*। সৈয়দ হকের রাজনীতি-নির্ভর কাব্যনাটকগুলি আলোচিত হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। বঙ্গবন্ধুর ছায়া অবলম্বনে রচিত নাটক *গণনায়ক*, রূপকধর্মী রচনা *মরা ময়ূর* এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিয়ে রচিত কাব্যনাটক *উত্তরবংশ*। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দশটি কাব্যনাটকেরই পৃথক পৃথক শিল্পরূপ আলোচিত হয়েছে। আর উপসংহার অংশে রয়েছে পুরো অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ। অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রয়োজনীয় তথ্যনির্দেশ সংযুক্ত করা হয়েছে। এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জি অংশে যুক্ত করা হয়েছে আলোচিত মূল গ্রন্থ, সহায়কগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা।

উল্লেখ্য যে, সৈয়দ শামসুল হকের দশটি কাব্যনাটকের মধ্যে সবগুলি পৃথকভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সৈয়দ হক জীবদ্দশাতেই সবগুলি কাব্যনাটকের একটি সংকলন প্রকাশ করে গেছেন। এ গ্রন্থটির শিরোনাম – 'সৈয়দ শামসুল হক : কাব্যনাট্যসমগ্র' । এটি ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে ঢাকাস্থ চারুলিপি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এটি মুদ্রণপ্রমাদে কণ্টকিত, তবু অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমরা নিরুপায় হয়ে এ-গ্রন্থটিকেই মূল আকরগ্রন্থ হিসেবে অনুসরণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : কাব্যনাট্যের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ (৪–২৩ পৃ.)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা (২৪–৪৮ পৃ.)

দ্বিতীয় অধ্যায় : সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : সৈয়দ শামসুল হকের ইতিহাস-নির্ভর কাব্যনাটক (৪৯–১১৯ পৃ.)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সৈয়দ শামসুল হকের সামাজিক কাব্যনাটক (১২০–১৭৮ পৃ.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সৈয়দ শামসুল হকের রাজনীতি-আশ্রিত কাব্যনাটক (১৭৯–২৩২ পৃ.)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শৈলিবিচার (২৩৩–৪৩১ পৃ.)

উপসংহার (৪২৮– ৪৩১)

গ্রন্থপঞ্জি (৪৩২– ৪৩৮ পৃ.)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাব্যনাট্যের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ

যে-রূপকল্পে দৃশ্যাত্মক পরিচর্যায় কাহিনি উপস্থাপিত হয় তা-ই নাটক। এটি 'জীবনের বহুবিচিত্র রূপের এক শক্তিশালী দর্পণ।'[১] সংলাপ ও দৃশ্যকে অবলম্বন করে রঙ্গমঞ্চে গতিশীল মানবজীবনের রূপায়ণ এবং জনচিত্তে তার শিল্পিত সঞ্চারণই নাটকের অন্বিষ্ট। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে নাটক একপ্রকার দৃশ্যকাব্য। অর্থাৎ নাটক হচ্ছে সেই কাব্য যাতে লোকবৃত্তকে দৃশ্যরীতিতে উপস্থাপন করা হয়।[২] আবার পাশ্চাত্যরীতিতে নাটক সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'Drama is creation and representation of life in terms of the theatre.'[৩] অর্থাৎ দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে, অভিনেতাদের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে বহমান মানবজীবনের ছবিকে মূর্ত করে তোলাই নাটকের উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কাব্যময় বলিষ্ঠ উচ্চারণই কাব্যনাটক। আধুনিক কাব্যনাটকে সাধারণত যেসব বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকসম্পাত করা হয় সেগুলো হচ্ছে – নাটকটিকে কবিতারীতিতে রচিত হতে হবে, বহির্বাস্তবতার তুলনায় সেখানে অন্তর্বাস্তবতার উপস্থাপনই মুখ্য হবে, ইতিহাস ও পুরাণের সমান্তরালে আধুনিক মানুষের যাপিত জীবনসংকট ও মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হবে, কাহিনি বা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট পরিণামের তুলনায় চরিত্রের অন্তর্দহন, ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন মুখ্য হয়ে উঠবে। কবিতা ও নাটক – কোনোটিই পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে না। অর্থাৎ এখানে কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের সুষমবিন্যাস থাকতে হবে।

---

[১] দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৭

[২] সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৪৭

[৩] Elizabeth Drew , *Discovering Drama* (উদ্ধৃত : শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭০

বস্তুত, সাহিত্যের ধারায় কাব্যনাটক আধুনিক যুগের সাহিত্যকর্মরূপে বিবেচিত হলেও, কাব্যনাট্যের মাতৃরূপ 'নাটক' সাহিত্যের আদিতম শাখা। বিশ্বের প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধ দুটি ভাষা – গ্রিক ও সংস্কৃতে নাটক রচিত হয়েছে খ্রিস্টের জন্মের বহুবছর আগে। গবেষকদের মতে, খ্রিস্টের আবির্ভাবের তিন থেকে পাঁচ-ছয় শতাব্দী পূর্বেই গ্রিসে নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। কিন্তু সেকালে আধুনিক রঙ্গমঞ্চের মতো সুপরিকল্পিত কোনো মঞ্চব্যবস্থা ছিল না ; বরং উন্মুক্ত প্রান্তরে বা পর্বতের পাদদেশে অনেকটা যাত্রার আসরের মতো করে নাটক অভিনীত হতো। এথেন্স শহরে প্রাচীন ডাইওনিয়সের মন্দিরে এপিডাউরাস নামক স্থানে যে থিয়েটার অবস্থিত ছিল, সেখানে চারপাশের গ্যালারিতে অবস্থিত হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তব্যাপী একই দিনে তিনটি নাটক অভিনীত হতো। মানবজীবনের গতিময় অবস্থা নিয়ে স্বতন্ত্র অথচ ধারাবাহিক এ নাটকগুলোর থেকেই আধুনিক ট্রিলজি বা ত্রিস্তরী সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে।

মানবসভ্যতার বিবর্তনের একটি মৌল বিষয় হলো, জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার পর, মানুষমাত্রেই তার আত্মিক প্রয়োজন মেটানোর দিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আবার মানুষের অন্য আরেকটি মৌল প্রবণতা হলো যূথবদ্ধতা। একমাত্র নাট্যকর্মের মাধ্যমেই মানুষ তার এ দুটি বৈশিষ্ট্য একইসঙ্গে উপস্থাপন উপভোগ করতে পারে। কেননা, 'নাচ-গান অঙ্গভঙ্গির জটিল সমবেত মিশ্রণ পাওয়া যায় নাট্যাভিনয়ের মধ্যে। কয়েকজন মিলে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একটি কাহিনী যা নিদেনপক্ষে একটি পরিস্থিতির মায়াময় রূপ প্রকাশ করা হয় দর্শক শ্রোতার সামনে। একক আনন্দ মিলেমিশে যায় সামাজিক আনন্দের সঙ্গে। এক হয়ে যায় অনেক, অনেক হয়ে যায় এক, প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে আমরা পাই কল্পজগতের বৈচিত্র্য।'[১] সংস্কৃত, গ্রিক উভয় ভাষার সমালোচনা-সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায় সকল শাস্ত্রকারই নাটককে কাব্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; কেননা সেকালে নাটকের ভাষাই ছিলো কবিতা। তবে প্রাচীনকালে নাটক রচনায় কবিতার গুরুত্ব সর্বাধিক হলেও প্রতীয়মান হয় যে, সেকালে জীবন ও সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা প্রকাশে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কবিতার চর্চা ও প্রয়োগ ছিল। আদিকাল থেকেই মানবসমাজের সঙ্গে কবিতার ছন্দ ও অভ্যন্তরীণ সুরের সম্পর্ক নিবিড়। মানুষ জাদুবিদ্যা থেকে শুরু করে শিকার করা, ধর্মীয় উৎসব, নিজস্ব পরিসরে আনন্দ উদযাপন প্রতিটি পর্যায়ে মন্ত্রোচ্চারণের মতো করে কবিতার সুর, তাল, লয়, ছন্দকে আত্তীকৃত করে নিয়েছে। নাট্যগবেষকগণ গবেষণা করে দেখেছেন যে, আদিপর্যায়ে নাট্যসাহিত্য উদ্ভাবনের পশ্চাতে মানুষের

---

[১] অমলেন্দু বসু, 'ভূমিকা : ইবসেন প্রসঙ্গে', *ইবসেন নাট্যসম্ভার : চতুর্থ খণ্ড* (সম্পাদনা : সুনীলকুমার ঘোষ), প্রকাশক : গৌরাঙ্গচন্দ্র সান্যাল, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৭

ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-পদ্ধতি, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত, 'নাট্য-সাহিত্যের এবং নাট্যপ্রয়োগের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলেও দেখা যাবে নাটক এবং নাটকের প্রয়োগ অর্থাৎ উপস্থাপনা-রীতি, অভিনয়-রীতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ যুগের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে নিগূঢ় যোগে যুক্ত।'[১] যে-কারণে, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছে মানুষের বহুমুখী চিন্তন, সেই সঙ্গে বিচিত্র ভাষাগত বিকাশমাধ্যম। ফলে কবিতার পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুগল্প, প্রবন্ধসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্যের মতো জীবনবাদী গদ্যসাহিত্য। বলা যায়, মানুষের জীবনধারণের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে কবিতার সমান্তরালে একটা বিশাল স্থান করে নিয়েছে আধুনিক এই কথাসাহিত্য। তদুপরি মানব সভ্যতার বিকাশ-বিবর্তনের পথ-পরিক্রমা ধরে আধুনিক এই যান্ত্রিক যুগে এসেও কবিসাহিত্যিকগণ কবিতার সঙ্গে নাটকের নিবিড় সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেননি। যার ফলস্বরূপ গদ্যের আদল এবং কবিতার শিল্পিত সমন্বয়ে রচিত হয়েছে আধুনিক কাব্যনাটক।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যা কিছু রচনা করেছে, তার ভাষামাধ্যম ছিল কবিতা। এর একটি কারণ হলো মানুষ স্বভাবতই সুরপ্রিয় ও ছন্দপ্রিয়। এর আরেকটি সমাজতাত্ত্বিক কারণ হলো লিখন ও মুদ্রণ যন্ত্রের অপ্রতুলতা। মানুষ তার ভাবনা, দর্শন, চিন্তনকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে আশ্রয় নিয়েছে স্মৃতিশক্তি ও মুখস্থবিদ্যার। কেউ কেউ অবশ্য পশুর চামড়া, বৃক্ষবাকল ও শিলাখণ্ডে তাঁদের লেখনীকে অমর করে রেখেছেন। বস্তুত, গদ্যভাষার তুলনায় কবিতার পঙ্‌ক্তি স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ীভাবে থেকে যায়, একারণেই প্রাচীন দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিকগণ তাঁদের অমরগ্রন্থগুলো রচনা করেছেন কবিতার ভাষায়। এমনকি একারণেই সব প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো কবিতার পঙ্‌ক্তিতে রচিত হয়েছে। বস্তুত, 'বিশ্বের প্রাচীন সব সাহিত্যই মৌখিক ঐতিহ্য ও ধারার মধ্যদিয়েই বিকশিত হয়। [...] মৌখিক ঐতিহ্যের ফলে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা নাট্যকলাও স্মৃতি ও শ্রুতির উপর নির্ভর করে বিকশিত হয়। এর ফলে ঐ আঙ্গিক ছন্দ নির্ভর হয়ে ওঠে।'[২]

প্রাচীন গ্রিক নাট্যকলায় মূলত মানবসভ্যতার এই চিরন্তন ছন্দপ্রিয়তার প্রভাব পড়েছে। বস্তুত, বিশ্বের প্রাচীন সব সভ্যতারই সাহিত্য-সমাজ-দর্শন বিকশিত হয়েছে কাব্যরূপে। গ্রিক, জাপানি, স্কান্ডেনেভীয়, রোমান, চীনা,

[১] সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৭

[২] শান্তনু কায়সার, *কাব্যনাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১১

মিশরীয়, অ্যাংলো-স্যাক্সনসহ সব সভ্যতাতেই জীবনচর্চার প্রাথমিক ভাষারূপ হিসেবে কাব্যকে বেছে নিয়েছেন লেখকগণ। কেবল সাহিত্যের প্রধান ভাষা হিসেবেই কাব্য ব্যবহৃত হয়নি, সাহিত্যবহির্ভূত জীবনাচরণ বিষয়ক প্রায় সব রচনাতেই ভাষামাধ্যম হিসেবে ছন্দলালিত্যপূর্ণ কবিতার ভাষাকে চয়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক হেসিয়াদকে (Hesiod, ৭৫০-৬৫০ খ্রিপূ); যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার কিংবা ভূস্বামী, জোতদারদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলিবিষয়ক রচনাতেও ব্যবহার করেছেন কবিতার ভাষা। আবার সোলেন (Solon, ৬৩০-৫৬০ খ্রিপূ) নামক একজন প্রাচীন গ্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী – দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবাদ রচনার ক্ষেত্রে কবিতার ভাষা ব্যবহার করেছেন। এভাবে আর্যজাতির তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা, মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্ব, গণিতচর্চার সূত্র ও নিয়মাবলি, প্রকৃতি, আবহাওয়া, ফসল-বিন্যাসসংক্রান্ত প্রায় সর্বপ্রকার গ্রন্থই কবিতায় রচিত হয়েছে। ভারতবর্ষে খনার বচন (আনু. ৮ম-১২শ শতাব্দী), মেয়েলি ব্রতকথা; পাশ্চাত্যের ওভিদের (Publius Ovidius Naso, ৪৩-১৮ খ্রিপূ) প্রণয়কৌশল, ভার্জিলের (Publius Vergilius Maro, ৭০-১৯ খ্রিপূ) কৃষিবিষয়ক রচনা, প্রভৃতিতেও কবিতার ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ‘এমনকি যে প্লেটো *রিপাবলিকে*র দশম খণ্ডে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কবিদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তিনিও ছিলেন কাব্যানুরাগী। *ঐ গ্রন্থে*ই তিনি হোমারের প্রতি তাঁর আশৈশব অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেছেন। শেলি *এ ডিফেন্স অব পোয়েট্রিতে* প্লেটোকে বলেছেন ছদ্মবেশি কবি।’[১]

আধুনিক যুগে যখন নাট্যকারগণ নাটকের ভাষা হিসেবে কবিতার প্রয়োগ করেছেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। এই সময়ে ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকের বাইরে নাট্যকারগণ যখনই নতুন সৃজনশীল কোনোকিছু চিন্তা করেছেন, তখনই ভেবেছেন নাট্যসংলাপে চমকসৃষ্টি বা আকস্মিকতা সৃষ্টিতে কবিতার বিকল্প হতে পারে না; তাঁরা কাব্যভাষার মাধুর্য ও চমক, উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের সম্মিলিত নান্দনিকতাকে নাট্যসংলাপে যুক্ত করে নাটককে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন অনন্য উচ্চতায়। এসময় থেকে নাটকে উপস্থাপিত চরিত্রের অন্তর্ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে কিংবা চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কবিতা একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহৃত হয়ে আসছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপে :

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Play wright can exercise better control both over speech and movement of his actors and over the responses of his audience by using the more subtle tones and rhythms of good poetry.[১]

বস্তুত, প্রাচীন নাটকের ভাষামাধ্যম ছিল কেবলই কবিতা; আধুনিক কাব্যনাটকের যে আঙ্গিক বিদ্যমান সেটি প্রাচীন কালের নাটকে অনুপস্থিত ছিল। যদিও কবিতায় রচিত বিশ্বের প্রধান প্রধান মহাকাব্য যেমন, পাশ্চাত্যের *ইলিয়ড*, *ওডিসি*; প্রাচ্যের *রামায়ণ*, *মহাভারত*, মধ্যযুগের বাংলা কাব্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *বৈষ্ণব পদাবলি*, মঙ্গলকাব্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে উচ্চাঙ্গ নাট্যগুণ চোখে পড়ে। তবুও এগুলোকে বিশুদ্ধ কাব্যনাট্য বলা যায় না। তবে আধুনিক কাব্যনাট্যের প্রাকসূচনা ধরলে গ্রিকনাট্যকার এস্কিলাস (Aeschylus, ৫২৩-৪২৬ খ্রিপূ), সফোক্লিস (Sophocles, ৪৯৭/৪৯৬-৪০৬/৪০৫ খ্রিপূ), ইউরিপিডিস (Euripides, ৪৮০-৪০৬ খ্রিপূ), এরিস্টোফানিসের (Aristophanes, ৪৪৬-৩৮৬ খ্রিপূ) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের সূচিত নাট্যপ্যাটার্ন পরবর্তীকালে এলিজাবেথীয় যুগে উইলিয়াম শেকসপিয়রের (১৫৫৪-১৬১৬) নাট্যকলার মধ্যদিয়ে আংশিক বিকশিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালে কাব্যনাটকের যে রূপাঙ্গিক আমরা প্রত্যক্ষ করি সেটির জন্ম বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ইয়োরোপীয় কবি টি.এস. এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) হাত ধরে। নাটকে কবিতার ভাষা প্রয়োগের উপযোগিতা নিয়ে আধুনিক কাব্যনাটকের জনক টি. এস. এলিয়ট নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

poetry is essentially dramatic and the greatest poetry always moves towards drama, drama is essentially poetic and the greatest drama always moves towards poetry.[২]

প্রকৃতপ্রস্তাবে, কাব্যনাট্যকারগণ নাটক ও কবিতার ভাষার মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক অনুধাবন করেছেন। আর তাঁদের সেই অভিজ্ঞানের শিল্পসম্মত প্রতিফলন ঘটেছে জগৎবিখ্যাত কাব্যনাটকগুলোতে। সাধারণ পাঠক-দর্শকদের মধ্যে সহজ সরল একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, কবিতার ভাষায় রচিত নাটকই বুঝি কাব্যনাটক। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিশেষ ছন্দে শব্দ গ্রন্থিত হলেই যেমন কবিতা হয় না, তেমনি পদ্যছন্দে রচিত নাট্যবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাহিত্যকর্ম মানেই কাব্যনাটক নয়; বরং কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে কবিতার ভাষা ও নাটকের নাট্যগুণ যখন সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারবে, তখনই রচিত

---

[১] *The New Encyclopaedia Britanica*, Vol-5, 15th Edition, London, p. 952

[২] T.S.Eliot, 'A dialogue on dramatic poetry', *Selected Essays*, Faber and Faber Limited, London, 1963, p.46

হবে সার্থক কাব্যনাটক; ইংরেজি ভাষায় যার নামকরণ করা হয়েছে 'verse play' বা 'poetic drama'। 'কাব্যনাটক' শব্দবন্ধটি এ-ইংরেজি শব্দের পারিভাষিক প্রপঞ্চরূপে বাংলাসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। নাট্যাঙ্গিকে সুললিত কোন কবিতা উপস্থাপিত হলেই তাকে কাব্যনাট্য বলা যায় না। কাব্যনাট্য আরও বেশিকিছুকে ধারণ করে রচিত হয়। সমালোচকের মতে :

> নাটকের আঙ্গিকে কবিতা এ কথা সত্য, কিন্তু কবিতা ও নাটক এখানে পরস্পরে সম্পৃক্ত। নাটক এখানে তীব্র নাটকীয়তাকে দমন করেছে, কবিতাও শুধু আবৃত্তিযোগ্য না হয়ে দৃশ্যরূপে উদ্ভাসিত।[১]

কাব্যনাট্যে কবিতা ও নাটকের সুষমবিন্যাসের কথা প্রায় সকল নাট্যবোদ্ধা ও সমালোচক স্বীকার করে নিলেও স্বয়ং এলিয়টই তাঁর কাব্যনাট্যে এই অন্বয় সবসময় ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এলিয়ট তাঁর একাধিক রচনায় এই সীমাবদ্ধতার কথা সারল্যের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, তাঁর রচিত সার্থক কাব্যনাটকগুলোতে কবিতার তুলনায় নাট্যগুণের প্রাধান্য অনেকটাই বেশি। অন্যদিকে কাব্যনাটকের স্বরূপ উপস্থাপন প্রসঙ্গে সমালোচক মাহবুব সাদিক বলেছেন :

> নাটক ও কাব্য এখানে পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত। সাধারণভাবে কবিতা নিজের প্রাধান্য পরিহার করে নাটকের অন্তর্দেশে সমন্বিত হলেই তাকে কাব্যনাট্য বলা যেতে পারে। [...] কাব্যনাটকে নাটক ও কবিতা একই সৃষ্টিশীল রূপকল্পের দুটি ভিন্ন উপাদান – যারা পরস্পরের সহযোগী। এখানে কবিতা ও নাটকের সামগ্রিক মিলনের মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হয় কাব্যনাটকের সুগঠিত রূপকল্প। আত্মচেতনাময় মানবসত্তা অন্যের মনোচৈতন্যে নিজের জীবনপ্রত্যয় সঞ্চারিত করার জন্যেই আধুনিক কালে কাব্যনাটকের নতুন শিল্পপ্রকরণ গড়ে তুলেছে।'[২]

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যনাট্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সাহিত্যকর্ম; যেটি সময়ের বিবর্তমান ধারায় ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে নিজস্ব পথ করে নিয়েছে। যদিও এর পূর্ণতা ঘটেছে আমেরিকান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কবি টি এস এলিয়টের অনবদ্য প্রতিভাসূত্রে, তবু পাশ্চাত্য সাহিত্যসমাজে উনিশ শতকের অনেক কবি-সাহিত্যিক যেমন, ব্রিটিশ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪),

---

[১] উত্তম দাশ, *বাংলা কাব্যনাট্য*, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, ১৯৮৯, পৃ. ১০,
(উদ্ধৃত : অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪)

[২] মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য : একালের জীবনভাষ্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১০

জন কীটস (১৭৯৫-১৮২১), লর্ড বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), আলফ্রেড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২), রবার্ট ব্রাউনিং (১৮১২-৮৯), ম্যাথিউ আর্নল্ড (১৮২২-১৮৮৮), চার্লস সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯), ইটালির কবি প্রিসি শেলি (১৭৯২-১৮২২), আইরিশ কবি ম্যানলে হপকিন্স (১৮৪৪-৮৯) প্রমুখ কবিতার ভাষায় নাটক রচনার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এরা প্রত্যেকেই এ সাহিত্যকর্ম রচনার ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রিক নাট্যকলার ধ্রুপদী ফর্ম অথবা শেকসপিয়রীয় নাট্যকলার নিজস্ব ফরমেটকে অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তাঁদের কেউই একজন সফল কাব্যনাট্যরচয়িতা হিসেবে সেভাবে সার্থক হয়ে ওঠেননি। অপরদিকে, বিংশ শতাব্দীতে এসেও যুগের চাহিদায় সমাজবিবর্তনের ধারাক্রমে সমকালীন স্বনামখ্যাত কবিগণ কাব্যের ভাষায় নাটক লিখতে সচেষ্ট হন। তবে এগুলোর অধিকাংশই ছিলো পরীক্ষামূলক সৃষ্টিকর্ম। নিতান্তই পরীক্ষামূলকভাবে তাঁরা এসব রচনা ঘরোয়া জীবনে একান্ত বন্ধুবাৎসল পরিবেশে কিংবা লিটল থিয়েটারে নির্বাচিত উচ্চশ্রেণির সুশিক্ষিত দর্শকের সামনেই মঞ্চস্থ করতেন। মূলত, এমন পারিবারিক ঘরোয়া পরিবেশে মঞ্চস্থ করার উদ্দেশ্যেই টি এস এলিয়টও তাঁর আধুনিক কাব্যনাট্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রথম নাটক *সুইনি এগোনিস্টিস (Sweeny Agonistes, ১৯৩২)* রচনা করেন। এলিয়ট এ নাটকটির রচনা শুরু করেছিলেন ১৯২৬ সালে। কিন্তু দুটি দৃশ্য রচনার পর তিনি আর এটিকে সম্পূর্ণ করেননি। ফলে ১৯৩২ সালে ছোট একটি পুস্তিকা আকারে অসমাপ্ত এ নাটকটি খণ্ড নাটক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

টি এস এলিয়ট এরপর লন্ডনের একটি গির্জার পর্যাপ্ত ফান্ড গঠনের প্রয়োজনে *দ্য রক (The Rock,* ১৯৩৪) নামক নাটকের কোরাস লিখে আধুনিক কাব্যনাট্যের শুভসূচনা করেন। নাটকটি ছিল অনেক বিখ্যাত মানুষের একটি সম্মিলিত উদ্যোগ; এবং এটির প্রথম মঞ্চায়ন হয়েছিল লন্ডনের বিখ্যাত *Sadler's Wells Theatre*-এ ২৮ মে ১৯৩৪ সালে। নাটকটিতে সঙ্গীতের আয়োজন করেছিলেন বিখ্যাত সুরকার মার্টিন শ (Martin Edward Fallas Shaw, ১৮৭৫-১৯৫৮)। উল্লেখ্য যে, টি. এস. এলিয়ট কাব্যনাটক রচনার প্রারম্ভ থেকেই কবিতার চমৎকারিত্বের পাশাপাশি নাট্যক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কাব্যনাট্য রচনায় তিনি সর্বদা সতর্ক থেকেছেন এ কারণে যে, যেন কবিতার ভাবাবেগ নাট্যক্রিয়াকে গ্রাস করে না ফেলে। 'The Four Elizabethan Dramatistis', 'A Dialogue On Dramatic Poetry', 'Rhetoric and Poetic Drama', 'Poetry and drama' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিকরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার, তিনি কেবল এই তাত্ত্বিকরূপেই নিবদ্ধ থাকেননি; বাস্তবে কাব্যনাট্য রচনা করে তার প্রমাণ দেখিয়েছেন। *The Rock* লেখার পরে তিনি *Murder in the Cathedral (১৯৩৫), The Family*

Reunion (১৯৩৯), The Confidential Clark (১৯৫৩) ও *The Elder Statesman (১৯৫৮)* নামক চারটি সফল ও সার্থক কাব্যনাটক রচনা করেন।

এলিয়টের মতে গদ্যনাটক মূলত অস্থায়ী ও বহির্বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অন্যদিকে কবিতায় চিত্রিত হয় স্থায়ী ও অন্তর্গত বিষয়। এ-কারণেই তিনি তাঁর কাব্যনাটকগুলোতে নাট্যক্রিয়া স্পষ্ট করেছেন প্রধান প্রধান চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তরীণ সংকটের মাধ্যমে। যেমন *মার্ডার ইন ক্যাথিড্রালের* প্রধান চরিত্র চার্চের সেবক বেকেটের হৃদয়জাত অন্তর্দ্বন্দ্ব, *দ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়নের* প্রধান চরিত্র হ্যারির নিজস্ব অপরাধবোধ ও অনুশোচনাজাত মানসিক দ্বন্দ্ব, *দ্য এলডার স্টেটসম্যানের* প্রধান চরিত্র লর্ড ক্লেভারটনের মানসজাত অভ্যন্তরীণ শূন্যতা ও আতঙ্কের মাধ্যমেই নাট্যিক দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে।

তবে বিশ শতকের প্রারম্ভে কেবল টি এস এলিয়টই নন, সমসাময়িক আরো অনেক সাহিত্যিকই নাটকের আঙ্গিক হিসেবে কাব্যনাটককে নির্বাচন করেছেন। এদের মধ্যে ডব্লিউ বি ইয়েটসের (William Butler Yeats, ১৮৬৫-১৯৩৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আইরিশ এ কবি-নাট্যকার কাব্যনাটকের আঙ্গিককে ভালবেসে কাব্যনাট্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরেক বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার লেডি গ্রেগরির (Isabella Augusta Lady Gregory, ১৮৫২-১৯৩২) সঙ্গে যুক্তপ্রয়াসে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে ২৭ ডিসেম্বর ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'অ্যাবি থিয়েটার' (Abbey Theatre)। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যমঞ্চ বর্তমানে আয়ারল্যান্ডের জাতীয় নাট্যমঞ্চরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে; এবং আইরিশ শিল্প-সংস্কৃতি বিকাশে যুগ যুগ ধরে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। বলা যেতে পারে, নাট্যসৃজনে ইয়েটসের দক্ষ ও সৃজনক্ষম প্রজ্ঞার ফলেই কাব্যনাটকে পুনর্জন্ম ঘটেছে পুরাণ ও কিংবদন্তির। তবে ইয়েটস, লেডি গ্রেগরি ছাড়াও আইরিশ কবি-নাট্যকার সিঙ (Edmund John Millington Synge, ১৮৭১-১৯০৯), সিন ও কেসি (Sean O Case, ১৮৮০-১৯৬৪) প্রমুখ বিশ্বজুড়ে আধুনিক কাব্যনাট্য বিকাশের ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রেখেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই অ্যাবি থিয়েটারে নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তবে এঁদের ছাপিয়ে কাব্যনাটকে টি এস এলিয়টই হয়ে ওঠেন একক ও অনন্য ব্যক্তিত্ব। কাব্যনাটকের রচনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর যে চিন্তনক্রিয়া ও ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে মূলত সেটিকে অনুসরণ করেই বিশ্বের অন্যান্য ভাষা-ভাষী সাহিত্যিকগণ পরবর্তীকালে কাব্যনাটক রচনা করেছেন। তিনি প্রচলিত নাটকের আঙ্গিকে বেশকিছু নাট্যফর্ম সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে আধুনিক কাব্যনাট্যের নিজস্ব একটি কাঠামো দাঁড় করান।

গ্রিক নাট্যকলার যে ‘ত্রয়ী ঐক্য’ (The Three Unites : unity of action, unity of time, unity of place) গ্রিক দার্শনিক ও কাব্যতাত্ত্বিক এরিস্টটল (Aristotle, ৩৮৫-৩২২ খ্রিপূ) প্রদান করেছিলেন, তার সাথে টি এস এলিয়ট যুক্ত করেছেন ‘আবেগের ঐক্য’ (emotional unity)। এর যৌক্তিকতা ব্যাখায় তিনি বলেন :

> The poetic drama must have an emotional unity, let the emotion be whatever you like. It must have a dominant tone, and if this be strong enough, the most heterogeneous emotions maybe made to re- inforce it.[১]

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবিদের কাব্যনাটক রচনার ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কবিতার রূপকল্প ও ভাষা সৃষ্টিতে অনন্য হলেও মঞ্চ বিষয়ে তাঁরা অনভিজ্ঞ ছিল এবং নাটক সম্পর্কেও তাঁদের সম্যক ধারণা ছিল না। আবার যাঁদের মঞ্চ ও নাটক সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান ছিল তাঁরা হয়তো কবিতার রূপমাধুরীকে পরিপূর্ণ মেলে ধরতে পারেননি। একারণে তাঁরাও হয়েছেন ব্যর্থ। মূলত কবিতা ও নাটকের সুসমন্বয় ছাড়া কাব্যনাট্য অসম্ভব।

বস্তুত, ঐতিহ্যবাহী নাটক এবং আধুনিক কাব্যনাট্যের একটি মৌল পার্থক্য হলো – কাব্যনাট্যে নাট্যসংঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্হিঘটনার চেয়ে চরিত্রের অভ্যন্তরীণ সংকট বা দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেয়া হয় বেশি; এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে চরিত্রেরই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বেদনা-বিক্ষোভ। এলিয়টের কাব্যনাটক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি কাব্যনাটকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে বহির্বাস্তবতার তুলনায় অন্তর্বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক। যেহেতু মানব চরিত্রের হৃদায়াবেগ প্রকাশে কবিতার বিকল্প নেই, সেহেতু কাব্যনাটকের চরিত্রগুলোর মানসিক দ্বন্দ্ব, আবেগ, যাতনা দহন প্রভৃতি প্রকাশে নাট্যকার কবিতার ভাষাকেই প্রধান মাধ্যম করে তুলেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে টি এস এলিয়টের বিশ্বখ্যাত নাটক *Murder in the cathedral* কাব্যনাট্যটি আলোচনা করা যেতে পারে। এ নাটকের কাহিনি যদিও আবর্তিত হয়েছে রাজার সঙ্গে প্রধান ধর্মযাজক বেকেটের অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রাজাদেশে যাজক বেকেটকে হত্যা করার ঘটনা অবলম্বনে; তবু দেখা যাবে যে, এ নাটকের নাট্যরসসৃষ্টিকে মূল অনুঘটক হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে ধর্মযাজক টমাস বেকেটের অভ্যন্তরীণ

---

[১] T.S.Eliot, *Selected Essays*, Faber and Faber Limited, London, 1951, p. 214 (উদ্ধৃত : মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)

সংকট, মানসদ্বন্দ্ব। নাটকে এলিয়টের মূল উদ্দেশ্য ছিলো রাজ-কাহিনি বর্ণনা নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে বীজ সংগ্রহ করে প্রধান চরিত্রের মানসলোকে শিল্পের আলোক প্রক্ষেপণ।

এলিয়ট মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, আবেগ প্রকাশে কবিতার ভাষার বিকল্প নেই। এটি কেবল তাঁর নিজের মতামত নয়, তিনি এক প্রবন্ধে বলেন যে, মানুষের আবেগ কিংবা হৃদয়জাত সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকাশে কবিতাময় ভাষাব্যবহার স্নায়ুবিশেষজ্ঞ দ্বারাও স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে এলিয়টের লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক এলাকা উল্লেখ করা যেতে পারে :

> The human soul, in intense emotion, strives to express itself in verse. It is not for me, but for the neurologist to discover why this is so the tendency, at any rate of porse drama is to emphasise the ephemeral and superficial; if we want to get at the permanent and universal we tend to express ourselves in verse. [১]

মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মতে মানুষ মাত্রেই দ্বৈতসত্তার অধিকারী। একই সঙ্গে একই সময়ে সে বিচিত্র ভাবনা লালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যখন অন্যের সাথে বাক্যালাপে নিমগ্ন হয়, তখন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকটিই প্রকাশ করে থাকে। ফলে একই সময়ে তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে চলতে থাকা তার অন্য আর একটি সত্তা আড়ালেই থেকে যায়। অর্থাৎ একই সঙ্গে একই সময়ে একই মানুষ দুটি সংকট মোকাবেলা করে বাঁচে। এক. ব্যক্তির সামাজিক সংকট, দুই. ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সংকট; এ দুটির সমন্বয়ে সর্বদা চলতে থাকে ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির অভ্যন্তরে লুকায়িত এই আত্মদ্বন্দ্ব এবং জনসম্মুখে প্রকাশিত সামাজিক দ্বন্দ্বকে একই সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য থেকেই টি এস এলিয়ট রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যনাটক *Murder in the Cathedral*। সমালোচকের মতে :

> একদিকে এই বাইরের সামাজিক জগৎ ও অন্যদিকে এই অন্তর্জগৎ – এ দুয়ের মেল-বন্ধন রচনা থেকেই এই নূতন নাট্যপ্রকার 'কাব্যনাটক' (Poetic Drama)-কে নিয়ে এলেন টি. এস. এলিয়ট। [...] এলিয়ট চেয়েছিলেন

---

[১] Raymond Williams, *Drama from Ibsen to Eliot*, Chatto and Windus, London, 1952, p. 22 (উদ্ধৃত : দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব- বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০)

নাটক আর কবিতার পুনর্মিলন হোক। [...] এলিয়ট ভাবতেন পদ্যে লেখা নাটক এমন হবে যাতে নাটকের action টাই প্রধান হয়।[১]

বস্তুত, প্রচলিত গদ্যাঙ্গিকের নাটকের ক্লাইমেক্স, টান টান উত্তেজনা, ঘটনার ধারাবাহিকতা, সুস্পষ্ট পরিণতি প্রভৃতি দেখে যেমন সাধারণ দর্শক আনন্দলাভ করেন, কাব্যনাটকে এমনটা আশা করা যায় না। এখানে কাহিনি বর্ণনা কিংবা কবিতার মাধুর্য উপভোগ করানো নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু, তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বোধ প্রকাশ করেন কবিতার লালিত্যকে আশ্রয় করে। এখানে একটি বিশেষ বাণী এবং আনুভূতিক বিশেষ দ্যোতনা প্রকাশই কাব্যনাট্যকারের উদ্দেশ্য। সুতরাং, কবিতার ভাষায় লিখিত নাটকমাত্রেই কাব্যনাটক হয়ে ওঠে না, বরং ‘কাব্যনাটক মূলত নাটক, তবে এখানে প্রচলিত নাটকের ঘটনা প্লট-সংঘাত একটু আলাদা রকমের। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কতগুলো চরিত্র নির্মাণ করা নাটকের উদ্দেশ্য, অন্যদিকে ঘটনা ও সংঘাতকে ম্রিয়মান রেখে ব্যক্তির অন্তর রহস্যকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয় কাব্যনাটকে। জীবনের দ্বন্দ্ব, মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে কবিতার পেলবরসে একটু ঘটনার ছোঁয়া দিয়ে উপস্থাপন করাই কাব্যনাটকের উদ্দেশ্য।’[২]‘কাব্যনাট্য আগেকার কবিতার লেখা নাটক নয় - এ এক নতুন ধারা।[৩]

টি. এস. এলিয়টের মতে মানব চরিত্রের চূড়ান্ত আবেগানুভূতির সঠিক ও সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটে কবিতার ভাষায়। তবে তিনি মনে করতেন চূড়ান্ত আবেগীয় মুহূর্ত এবং মানব চরিত্রের হৃদয়জাত ভাবনা যদি গদ্যভাষাতেও প্রকাশ করা হয় তবে গদ্যভাষায় রচিত হলেও সে সাহিত্যকর্মকে কাব্যনাটক বলা যেতে পারে। তিনি মূলত কাব্যনাটকের ভাষার তুলনায় নাট্যগুণের ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। কেননা, তিনি চেয়েছেন নাটকের ভাষা গদ্য বা পদ্য যাই হোক দর্শক যেন নাটকের ভাষাকে ছাপিয়ে নাট্যগুণের দিকে অধিক মনযোগী হয়। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর কিংবদন্তিতুল্য ইংরেজ নাট্যকার-কবি উইলিয়াম শেকসপিয়রের *হ্যামলেট* (*Hamlet*, প্রথম মঞ্চায়ন: ১৬০৯) নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের ভাষাশৈলীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, দর্শক *হ্যামলেট* নাটকের ভাষাশৈলীর চমক থেকে নাট্যক্রিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী। টি এস এলিয়ট তাঁর রচিত একাধিক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধে কাব্যনাট্যের বিচিত্রদিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২০

[৩] শুদ্ধসত্ব বসু, *বাংলা সাহিত্যের নানারূপ*, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২০

কাব্যনাট্যের ভাষাগত দিক যেমন এসব প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি কাব্যনাট্যের বিষয় নিয়েও তাঁর মূল্যবান মতামতের প্রকাশ ঘটেছে। কাব্যনাট্যের বিষয় আলোচনায় একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> verse plays, it has been generally held. Should eithter take their subject matter from some mythology, or else should be about some remote historical period, far enough away from the present for the characters.[১]

এলিয়টের বিবেচনায় মানবজীবনের অন্তর্বাস্তব ও বহির্বাস্তব দ্বন্দ্ব-সংকটের রূপায়ণই কাব্যনাট্যের মূল উদ্দেশ্য; কী বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্যনাট্য রচিত হবে সেটি মুখ্য নয়। সেকারণে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ক্লাসিক কিংবা আধুনিক জীবনের যেকোনো দ্বন্দ্বাত্মক বিষয়ই কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে; আর সেই সঙ্গে যে কোনো চরিত্রই হয়ে উঠতে পারে কাব্যনাট্যের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে গল্প মূলত একটি খোলস, এই খোলসের আড়ালে কাহিনির নির্যাস উপস্থাপনই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাব্যনাট্যে কাহিনি অধিক গুরুত্ব পেলে কাব্যনাট্যরস বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রিক ও শেকস্‌পিয়রিয়ান – উভয়শ্রেণির নাটক প্রধানত লিখিত হয়েছে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে, যার সঙ্গে অধিকাংশ দর্শক পূর্ব থেকেই পরিচিত থাকতো। কিন্তু এই পরিচিত নাট্যকাহিনির মঞ্চ-উপস্থাপনের মধ্যে এমন কিছু চমক থকতো, যাতে নাটক কখনো তাদের কাছে শিথিলগ্রন্থির মনে হতো না। নাট্যকাররা তাঁদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যে ওই কাহিনির মধ্যে নিয়ে আসতেন নতুন নতুন তাৎপর্য ও বিন্যাস। যার পরিপ্রেক্ষিতে এসব নাটক দর্শকচিত্তে কালজয়ী আবেদনসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

কাব্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে এলিয়ট আঙ্গিককলা নির্মাণ ও ভাষাশৈলীর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কাব্যনাটকের ভাষা যতই কবিত্বপূর্ণ হোক, যতই কবিতা হিসেবে সার্থক হোক, তা যদি কাহিনি ও চরিত্রের উপযোগী না হয়, তবে সে-ভাষা ব্যর্থ ও রসাবেদনে বোঝাস্বরূপ। এলিয়ট মনে করতেন গদ্যেও যদি চরিত্রের অভ্যন্তরীণ সংকট উপস্থাপন করা যায়, তবে সেটি কাব্যনাটক হতে পারে। কিন্তু আধুনিক কাব্যনাট্যে গদ্য-পদ্য মিশ্ররীতিতে নাটক রচনা করলে দেখা যাবে তখন দর্শকগণ পৃথকভাবে কবিতার ভাষা নিয়ে সচেতন হয়ে উঠবে। তাই কবিতার ভাষাকে এমন করে নাটকে প্রয়োগ করা উচিত, যেন ভাষাগত দিক ছাপিয়ে নাটকের দ্বন্দ্ব ও নাট্যক্রিয়ায় লোকের মনোযোগ অধিক আকর্ষিত হয়।

---

[১] T.S. Eliot, *Poetry and drama*, p. 79 (উদ্ধৃত : মাহবুব সাদিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২)

কাব্যনাট্যের ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে এলিয়ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক – যে-কোনো নাট্যকাহিনিতে তিনি চরিত্রের সংলাপে সমকালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন। অথচ এলিজাবেথীয় যুগে নাট্যকারগণ ভাষার ক্ষেত্রে দুটি নিয়ম মানতেন। তাঁরা অভিজাত চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন পদ্য সংলাপ এবং অনভিজাত চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন গদ্যসংলাপ। এলিয়ট তাঁর নাটকে এসব নিয়ম মেনে চলেননি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন :

> আমার লক্ষ্য ছিলো দর্শক-বৃন্দকে অতীতের এক প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া। ভাষায় অতীতের অনুসরণ করে কোনো লাভ হতো না। হয়তো ভুল সময়ের ধারণা দিয়ে ফেলতাম। দ্বিতীয়ত, আমার উদ্দেশ্যই ছিলো সমকালীন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের মূল প্রতিপাদ্যকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা।[১]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাব্যনাটকের ভাষায় সমকালীন সুর ও ছন্দ প্রয়োগে এলিয়ট সচেতন থেকেছেন মূলত অতীতের সার্থক কবিদের ব্যর্থ কাব্যনাট্যরচনার দৃষ্টান্তকে স্মরণে রেখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবিই গ্রিক অথবা শেকস্‌পিয়রীয় নাট্য আদলে কাব্যনাটক রচনা করতে গিয়ে অমিত্রাক্ষর বা পঞ্চপার্বিক আয়াম্বিক ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। অলংকারের প্রাচুর্যে তাঁদের ভাষা হয়ে পড়েছে সাধারণের মুখের ভাষার অনুপযুক্ত ও বাস্তবতাবর্জিত কৃত্রিম ভাষা। একারণেই এলিয়ট কাব্যনাটকে ছন্দ ও অলংকারের পরিমিত প্রয়োগে ভাষাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যরীতি থেকে পৃথক করে তুলতে পেরেছেন। বলা যায়, *মার্ডার ইন ক্যাথিড্রাল* কাব্যনাটক রচনাকালে তিনি ছিলেন কিছুটা নঞর্থক মানসিকতাসম্পন্ন। অর্থাৎ, পূর্বতন কবিদের রচনার কী কী বাহুল্য বর্জন করলে তাঁর নাটক বিংশ শতাব্দীর সময় ও সমাজকে ধারণ করে সার্থক হয়ে উঠবে – সে-বিষয়ে তিনি ছিলেন সদা সচেতন। এ-প্রসঙ্গে নবনাট্যকারগণকে পরামর্শ দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

> যে কবি মঞ্চের জন্যে লিখতে চান তাঁকে দীর্ঘকাল সাধনার দ্বারা কাব্যশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের বশে রাখতে হবে। অর্থাৎ কবিতাকে স্বাস্থ্যকর স্বল্পাহারে রেখে তাকে নাট্যমঞ্চের উপযোগিতা দান করতে হবে। যখন এই কুশলতা সম্পূর্ণ অর্জিত হবে, কবির তা দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হবে, তখন কবিও মঞ্চের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হবেন। কাব্য নির্মাণে নিত্যকার মুখের বুলিকে আরো অসঙ্কোচে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।[২]

---

[১] শান্তনু কায়সার, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

কাব্যনাটকে নাটক ও কবিতার প্রয়োগ ঘটে সম্পূর্ণ পৃথক দ্যোতনায়। সফল কাব্যনাট্যকার তিনিই হবেন, যিনি তাঁর লেখনীতে নাট্যগুণ ও কবিতার প্রয়োগ করবেন পরিমিতিবোধ রক্ষা করে এবং সর্বদা নৈর্বক্তিক ও নিরাসক্ত থেকে। কেননা, কোনো নাটকে নাট্যগুণের তুলনায় কাব্যগুণ অধিক পরিলক্ষিত হলে সেটি কাব্যনাট্য না হয়ে নাট্যকাব্য হয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়। একারণেই টি এস এলিয়ট কবিতার তুলনায় নাট্যগুণকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। কিন্তু নাটকে ভাষা হিসেবে কবিতার প্রয়োগে তিনি নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ভাষায় ছন্দবৈচিত্র্য ও অলঙ্কার নিয়ে প্রচুর নিরীক্ষার পাশাপাশি নাটকে সংগীতের ব্যবহারও তিনি করেছেন উপযুক্ততা বিচার করে; এমনকি ব্যালে ডান্সের মতো নাচের ফরমেটকেও তিনি নাটকের অংশ করেছেন। বাংলাদশের প্রখ্যাত কবি-নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) এ ধারা অনুসরণ করে তাঁর নিরীক্ষামূলক কাব্যনাটক *অপেক্ষমাণ* (২০০৯)-এ কোরাস চরিত্রের মাধ্যমে ব্রেকডান্সের প্রয়োগ করেছেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এলিয়টের বিবেচনায় দর্শকের কাছাকাছি পৌঁছানোই যেহেতু নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য, তাই তিনি তাঁর নাটকের ভাষাকে সরল করে উপস্থাপন করেছেন। নাটকের ভাষাকে তিনি কখনোই অলংকারের প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। যে কারণে এলিয়টের কাব্যনাটকের সংলাপের ভাষা কবিতার ভাষা হলেও তা ছিলো গদ্যের কাছাকাছি। বস্তুত, এলিয়ট আনুষ্ঠানিকভাবে কাব্যনাট্যচর্চার বহুপূর্ব থেকেই আঞ্চলিক ভাষা ও কবিতার সহজ প্রয়োগে বেশ কিছু খণ্ডনাটক লেখার মাধ্যমে হাত পাকিয়ে নিয়েছিলেন । বস্তুত, 'নাটকের একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কাব্য নাটকের ভাষা কতো তীব্র, কতো গভীর হৃদয়-ভাবব্যঞ্জক ও নাটকীয় হয়ে উঠেছে– এ বিচারই যথেষ্ঠ নয়। দেখতে হবে আদ্যন্ত নাটকটির মধ্যে কাব্যের ছন্দ তার অন্তর্নিহিত লাবণ্যের মতো অবস্থান করে মূল নাট্যরসের পরিপোষক হয়েছে কি না।'[১]

প্রকৃতপক্ষে, কাব্যনাট্যের ভাষা হতে হবে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও সহজ-সরল। এর ফলে নাটকের মূলরস দর্শক সহজেই আস্বাদন করতে পারে। এ-কারণে প্রাচীন গ্রিক নাটকের ভাষায় দেখা যায় আঞ্চলিকতার ছাপ। এমনকি আধুনিক কাব্যনাট্যের জনক টি এস এলিয়ট থেকে শুরু করে বাংলাকাব্যনাট্যের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সৈয়দ শামসুল হক প্রত্যেকেই প্রয়োজনানুসারে তাঁদের কাব্যনাট্যে চরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা, শব্দ, অলঙ্কার, লোকজ প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন।

---

[১] দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

সৈয়দ শামসুল হক পেশাগত কারণে ইংল্যান্ডে থাকার সময় প্রচুর মঞ্চনাটক প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন শেকস্‌পিয়রিয়ান, এলিজাবেথিয়ান কিংবা গ্রিক নাটকের ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে কবিতার অনন্য লালিত্যময় আবেগ। এমনকি টি এস এলিয়টের কাব্যভাবনা, ইবসেন (Henrik Johan Ibsen, ১৮২৮-১৯০৬) রচিত নাটকের রচনারীতি সৈয়দ হককে দারুণভাবে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করে। আবার এদেশীয় লোকসমাজ, লোকসংস্কৃতি, লোকগাঁথা, বিশেষত *মৈমনসিংহ গীতিকা*, এমনকি মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্যের মাটিগন্ধী মাধুর্যে সৈয়দ শামসুল হক বরাবরই ছিলেন মুগ্ধ। ফলে তিনি কবিতার ভাষায় কাব্যনাটক রচনার পূর্বে আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগে 'নবী মুনশী' ছদ্মনামে মৌলিক সনেট রচনা করেছেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই অনন্য বিপ্লবী রচনা পরবর্তীকালে ঢাকার 'সব্যসাচী' প্রকাশনী থেকে *পরানের গহীন ভিতর* নামে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। মূলত এই আঞ্চলিক ভাষার সনেটগুলোই আঞ্চলিক ভাষায় কাব্যনাটক রচনায় তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ।

যেহেতু কাব্যনাটকে নাট্যকার চরিত্রসমূহের হৃদয়জাত ভাবনা-চিন্তাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, সেহেতু নাট্যঘটনার বিকাশ ও পরিণামী চিত্রাঙ্কনে বিঘ্ন ঘটতে পারে। অনেকসময় দেখা যায় লেখক নাট্যরসের পরিণামের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বরং কাব্যের মায়াজালে আবেগময় নানান উপকাহিনি তৈরি করেন। একারণেই মূলত অধিকাংশ কাব্যনাট্যকারের লেখনীতে গীতিকবিতার আবেগ-উচ্ছ্বাসজনিত দুর্বলতা থেকে যায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যনাট্যের পরিসমাপ্তি সন্তোষজনক হয়না। কেননা লেখক কাহিনি-কাঠামোকে উপজীব্য করে পরিসমাপ্তির কথা না ভেবে বরং চরিত্রের মনোজগতে অধিক আলো ফেলতে সচেষ্ট থাকেন।

কাব্যনাটকে নাট্যিক উৎকণ্ঠা, ক্লাইমেক্স, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, তীব্রতার নিয়ন্ত্রিত উপস্থাপনই প্রত্যাশিত। আবার, নাট্যিক সংলাপের ক্ষেত্রেও ছন্দের উৎকর্ষের তুলনায় অধিকতর বিবেচনার প্রয়োজন যে, এটি কাব্যগুণসম্পন্ন কিনা। কেননা, সুললিত ছন্দে রচিত হলেই যেমন সব সাহিত্য কবিতা হয়ে ওঠে না, তেমনি পদ্যসংলাপ মানেই পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক নয়; এখানে অবশ্যই বিশেষভাবে বিচার্য এর কাব্যগুণ কতটা নিঁখুত। প্রকৃতপক্ষে, কাব্যনাটক হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি স্বতন্ত্র সাহিত্যগুণের অপূর্ব সম্মিলন। এক্ষেত্রে এলিয়টের মন্তব্য হলো কাব্যময়তা যখন নাট্যকলায় সার্থকভাবে সংস্থাপিত হয়, তখনি কেবল সার্থক কাব্যনাটকের সৃষ্টি হতে পারে; এবং সর্বদা কাব্যগুণের নাট্যগুণের অনুসারী হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন :

It must justify itself dramatically, and not morely be fine poetry shaped into a dramatic form. [১]

আবার কাব্যগুণ যদি নাট্যঘটনায় অনিবার্য না হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে কবিতা যতই মাধুর্যপূর্ণ হোক সেটি নিরর্থক বিবেচিত হবে। প্রচলিত নাট্যরীতিতে কাহিনি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কাব্যনাটকে বাচ্যার্থ থেকে অনুভববেদ্য ব্যঞ্জনাকে বেশি মূল্যায়ন করা হয়। 'কাব্যনাট্যে কবিতা ভাবের শরীরকে জড়িয়ে রাখে, নাটক সেখানে সহায়, দুটি সত্তা সেখানে একদেহে লীন। নাটকে কাহিনি বা চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করে তোলা লেখকের কৃত্য, কবিতা সেখানে শুধু সহায়ক, কাব্যনাট্যে ভাবের শরীরেই কবিতা ব্যক্ত, কাহিনী কেবল তাকে ছুঁয়ে যায়।' [২]

কাব্যনাট্য মূলত একধরনের অন্তর্নাটক, কেননা এখানে বহির্বাস্তবতাকে অতিক্রম করে আলোর সর্বময় প্রক্ষেপণ ঘটে চরিত্রের অন্তর্সত্যে। অন্যদিকে, চরিত্রের মনোকথন, হৃদয়জাত রক্তক্ষরণ, অন্তর্লোকের রূপ-স্বরূপ প্রকাশে কবিতার মায়াজাল, আবেগীয় ভাষাশৈলী ব্যবহারের বিকল্প নেই। তবে নাটকে যখন কাব্যসংলাপের সার্থক প্রয়োগ ঘটে, তখন সেই ভাষা নিছক কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তৃতীয় কোনো মায়ার জগৎ বিনির্মাণ করে। আর তখনি রচিত হয় সার্থক কাব্যনাটক। সুতরাং, কাব্যনাট্য বলতে আমরা কবিতায় লেখা প্রাচীন গ্রিক বা এলিজাবেথীয় নাটককে না বুঝিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের এক বিশেষ নাটককে বুঝি। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে নাট্যজগতে যে বন্ধ্যাত্ব[৩] দানা বেঁধেছিল এবং পরবর্তীকালে যা আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকে যে সচেতন নাট্যআঙ্গিকের উদ্ভব ঘটেছে, তা-ই কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্য মূলত সময়ের সৃষ্টি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য দুটোর উপাদানই নাটক ও কবিতা। কিন্তু, কিছু মৌলিক পার্থক্যের কারণে এদুটো সাহিত্য-আঙ্গিক স্বতন্ত্র। নাট্যকাব্যের প্রধান কারিগর কবিসত্তা; নাট্যসত্তার ভূমিকা এখানে গৌণ। বলা যেতে পারে, কবিতাকে দীর্ঘতর একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি দেবার নিমিত্তে নাট্যকাব্যের জন্ম। নাট্যকাব্যে কবিতাকে কাহিনির কাঠামোতে ফেলে পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন কবি। 'সেখানে

---

১ T.S. Eliot, *On poetry and poets*, Faber and Faber, London, 1961, P.74

২ উত্তম দাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩ সমালোচক শঙ্খ ঘোষ নাট্যধারার এ স্থবিরতার স্বরূপ উন্মোচন প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :
জীবনের নিঃশ্বাস অস্পষ্ট হয়ে আসে। তখন 'নাট্য' কথাটি এক ম্রিয়মান আঙ্গিক হয়ে পড়ে মাত্র, কাব্যই অধিকার করে নেয় প্রধান ভূমিকা। [দ্রষ্টব্য: শঙ্খ ঘোষ, 'কাব্যনাট্য', *সাহিত্যকোষ : নাটক*, অলোক রায় (সম্পা.), কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ২১]

পাত্রপাত্রীর উল্লেখ থাকে, কাহিনি থাকে, তবে নাটকীয় উৎকণ্ঠা কিংবা নাটকের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকে। সাদা অর্থে নাট্যকাব্য কবিতা, শুধু নাটকের কাঠামো সেখানে নাম মাত্র ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সেখানে নাটকের কিছু নেই।'[২৩] যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিক মানসজাত কাব্য *কথা ও কাহিনী* (১৯০০) একটি সার্থক নাট্যকাব্য ; অন্যদিকে *বিসর্জন* (১৮৯০) একটি সার্থক কাব্যনাট্য। মূলত, একজন সংবেদনশীল কবি যদি কাব্যনাট্য লিখতে গিয়ে কবিতার সৌন্দর্য-মাধুর্যের দিকে অধিক মনোযোগী হন, এবং সেখানে যদি নাটকীয় আবেগ-উৎকণ্ঠা, জটিলতা, গ্রন্থিমোচন প্রভৃতি অনুপস্থিত থাকে, তবে তা কাব্যনাট্য না হয়ে নাট্যকাব্য হবে। সমালোচকের মতে :

> কাব্যনাটক জীবনের আবিশ্ব সার্বিকতার সন্ধান, তাই কাব্যনাটক কি নাট্যকাব্য এই তর্ক অর্থহীন। কাব্যনাটক জৈবিক ঐক্য ' অর্গানিক হোল'। এলিয়ট ন্যাচারিলিস্ট নাট্যপদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়েও স্বীকার করেছেন কাব্যনাটকে কবিতা ও নাটক জৈবিক ঐক্যে একটি অনন্য। [১]

কাব্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কবির অন্তরজাত আবেগের শিল্পিত নিয়ন্ত্রণ। আবেগের আতিশয্য ও ভাবের উন্মত্ততা উভয়ই এখানে মারাত্মক ক্ষতিকর। মূলত, 'আবেগী অথবা সামাজিক মানুষের পক্ষে কাব্যনাটক রচনা করা দুরূহতম প্রতিজ্ঞা। [...] কাব্যনাটকে তার অস্তিত্ব চেতনাময়, সামাজিক চেতনার ঊর্ধ্বে হৃদয়ের গাঢ়তম প্রদেশের অনির্বচনীয় অনুভূতির বিচ্যুতি রেখায় জ্যোতির্ময়। [...] রোমান্টিক মন কাব্যনাটক রচনা করতে অক্ষম। দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ উপলব্ধি কাব্যনাটক রচনার প্রাথমিক পটভূমি।'[২]

তবে কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিক দিক সাহিত্যসমাজে যতটা আলোচিত হয়েছে, ততটা ব্যাপকহারে রচিত হয়নি পূর্ণাঙ্গ- মৌলিক, সফল কাব্যনাটক। কাব্যনাট্যের জনক এলিয়ট স্বয়ং কাব্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধবাদী ছিলেন। কাব্যনাটকের তাত্ত্বিক দিকের প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগের কারণে অনেক কবির পক্ষেই সার্থক কাব্যনাট্য রচনা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এজন্য বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে কাব্যনাটকের সংখ্যা সীমিত। *Poetry and Drama (১৯৫১)* গ্রন্থের 'Selected prose' প্রবন্ধে এলিয়টের কাব্যনাট্য বিষয়ক মন্তব্য, *এবং An Essay Towards a Theory of Art (১৯২২)* গ্রন্থে ব্রিটিশ কবি-নাট্যকার ল্যাসেল অ্যাবারক্রম্বির (Lascelles

---

[১] রাম বসু, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৭

[২] অলোক সরকার, *অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক*, কবিপত্র, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ, ৯৭

Abercrombie, ১৮৮১-১৯৩৮) কাব্যনাট্য বিষয়ক মতামতের সারবস্তুর আলোকে সমালোচক-গবেষক ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় কাব্যনাট্যের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ নির্ণয় করেছেন নিম্নরূপে :

১. নাটকে আমরা যে ভাষাই ব্যবহার করি না কেন, তা নাটকের লক্ষ্য বা উপেয় নয়, তা উপায় মাত্র। নাটকের পদ্যসংলাপে তার গৌরব কিছুমাত্রহ্রাস পায় না – এ কথা বলেছেন অ্যাবারক্রম্বি।

২. নাটকে তিন রকম ভাষা ব্যবহৃত হতে পারে। গদ্য, পদ্য ও এ দুয়ের নিকটবর্তী দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষা। এর মধ্যে কাব্যনাট্যে পদ্যসংলাপই ব্যবহৃত হবে – গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ চলবে না। দর্শক সচেতন ভাবেই এ দুয়ের পার্থক্য বুঝতে পারবেন এবং পীড়িত হবেন।

৩. নাটকে পদ্যের প্রয়োগ প্রথাগত ব্যাপার নয় বা কিছু অতিরিক্ত অলংকরণ নয় – পদ্যসংলাপ নাট্যরসকে ঘনীভূত করে। গদ্যেলেখা নাটক জীবন-ঘটনার বাইরের দিকটি অনুকরণ করে। কিন্তু, কাব্যনাটক ঘটনার অন্তর্বস্তুকে অনুসরণের ফলে নাট্যরস আরো ঘনীভূত হয়। এলিয়ট এবং অ্যাবারক্রম্বি দুজনেই মন্তব্য করেছেন কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু অতীত, পুরাণ এবং ইতিহাসের পাশাপাশি সমকালীন বিষয়বস্তু থেকেও হতে পারে। এলিয়ট নিজেই তাঁর *Family Re-union* নাটকে সমকালীন বিষয়বস্তু সংযোজন করে এর প্রাসঙ্গিকতা দেখিয়েছেন।

৪. কাব্যনাটকে মানবজীবনের ঘটনা ও কথাকে এমন শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে নাটকীয় লক্ষণ ও সাংগীতিক সুর যুগপৎ ফুটে ওঠে।

৫. আধুনিক কালের দর্শক জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ এক রূপ নাটকে দেখতে চান। আর তা দেখাতে গেলে কাব্যনাটকে যে জীবন উপস্থাপিত হচ্ছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা চাই।

৬. গদ্যেও খুব সীমিত ক্ষেত্রে কাব্যনাটক রচনা করা চলে বলে এলিয়ট মন্তব্য করেছেন, যদিও সে রচনা আয়াসসাধ্য নয়। এ ক্ষেত্রে গদ্য নাট্যকারের হাতে এমনই কবিত্বমণ্ডিত হবে যে গদ্যই হয়ে উঠবে কাব্য।

৭. এলিয়ট স্নায়ুতত্ত্ববিদ চিকিৎসকের উল্লেখ করে বলেছেন যে মানুষের অন্তরে যখন তীব্রতম ভাবের আলোড়ন তখন তার আত্মা পদ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। গদ্যে রচিত নাটক গুরুত্ব দেয় ভাসা ভাসা ভাবে ক্ষণিকতার ওপরে। এলিয়ট টমাস বেকেট চরিত্রে একই সঙ্গে সামাজিক মানুষের ত্রি-স্তরের আচরণ এবং সেই সূত্রে ধর্মযাজক বেকেটের অন্তর ও বাহিরকে পরিস্ফুট করেছেন।[১]

বস্তুত, আধুনিক কাব্যনাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসে সফল কাব্যনাটক রচনায় সাধারণ নাট্যকারদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও সফল কবিরাই সার্থকতা প্রদর্শন করেছেন। কেননা কাব্যকৌশল সম্পর্কে পরিপক্ব

---

[১] দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

ধারণা না থাকলে নাটকে তার সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়। তবে শুধু কবিদৃষ্টি নয়, নাট্যলক্ষণ ও নাটকীয়তা সম্পর্কে তাঁর বোধ স্পষ্ট ও প্রগাঢ় হওয়া প্রয়োজন। মূলত, একটি সফল শিল্পসার্থক কাব্যনাটক রচনার ক্ষেত্রে 'একদিকে থাকবে কাব্যনাট্যকারের সৃষ্টিশীল কবিকল্পনার ঐশ্বর্য, দর্শক-মাতানোর কলাকৌশল এবং তাদের অন্তরকে নাড়া দেবার শক্তি, এবং অন্যদিকে নাট্যঘটনাকে বিশেষ একটি লক্ষ্যের অভিমুখে যতটা সম্ভব দ্বন্দ্বময় পথে চরিত্রগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গতিশীল ও উৎকণ্ঠাযুক্ত করে রাখা। দুয়ের আত্মিক মিলনে এবং আধুনিক জীবনেরও যথোচিত রূপায়ণে তাঁকে নৈপুণ্য দেখাতে হবে।' [১] কাব্যনাট্য যদিও কবিতা ও নাটকের সমন্বয়ে একটি সাংগীতিক রূপাবহ সৃষ্টি করে, তবু প্রতীকী রচনার সঙ্গে কাব্যনাট্যের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রতীকী রচনায় প্রতীকের ব্যঞ্জনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবকে অনেক সময় লুপ্ত করে ফেলা হয়। কিন্তু টি এস এলিয়টের মতে কাব্যনাট্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব পৃথিবীর বাইরে অন্যকোনো মায়ার জগৎ সৃষ্টি করে না।

বস্তুত, মানবসমাজের বিবর্তিত ইতিহাস নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবন হয়ে পড়েছে ক্রমশ দুর্বোধ্য, জটিল ও যান্ত্রিক। আর এই যুগচেতনা, যুগযন্ত্রণাকে ধারণ করে লিখিত কবিদের কবিতাও কালের বিবর্তনে ক্রমাগত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। ফলে বেড়ে গেছে লেখক-পাঠক দূরত্ব। অথচ একজন সফল লেখকের লেখনীর প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে পাঠক-দর্শকের বোধির জগতে অবাধ যাতায়াত। পাঠক- দর্শকের সঙ্গে লেখক-সাহিত্যিকের প্রত্যাশা ও বোঝাপড়ার সু-সমন্বয় না ঘটলে শিল্পসাহিত্যসাধনা অর্থহীন হয়ে পরে। মূলত, পাঠক-দর্শকদের সঙ্গে এই ছিন্নসম্পর্ক আত্মিকবন্ধনে আবদ্ধ করতেই নাট্যকারগণ সাহিত্যকে দুর্বোধ্য কবিতার মায়াজাল থেকে ছিন্ন করে নাটক ও কবিতার সার্থক অন্বয় ঘটিয়ে রচনা করেছেন কাব্যনাটক। এলিয়টের হাতে কাব্যনাটকের সুসংহত বিকাশ ও পরিণতির প্রারম্ভকালেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের কবি-নাট্যকারগণ কাব্যনাট্যরচনায় প্রভূত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, আধুনিক জড়বাদী দর্শনের প্রভাবে সেকালের মানুষ হয়ে পড়েছিল ক্রমাগত সমাজবিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত। কবি-সাহিত্যিকগণ তখন তাঁদের সমাজসংলগ্ন মানসিকতা দিয়ে উপলব্ধি করলেন – মানবসভ্যতাকে এই স্থূল জড়সত্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে দৃশ্যাত্মক কবিতা; এবং বিচ্ছিন্ন মানুষের ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনার দৃশ্যমান উপস্থাপনায় নবতর আঙ্গিকের প্রকাশ অতীব প্রয়োজন; যেখানে সমাজের বহির্বাস্তবতার তুলনায় অধিক

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

গুরুত্ব পাবে ব্যক্তির অন্তর্বাস্তবতা; তার সমস্যা-সংকট, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, বেদনা-বিপর্যয়-অচরিতার্থতা প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবনা-চেতনা থেকে কবি-নাট্যকাররা নির্মাণ করেছেন কাব্যনাটক।

সমকালীন নাট্যকারগণ যখন কাব্যনাট্য রচনা শুরু করেন, তখন মূলত তাঁরা প্রাচীন কাব্যনির্ভর সাহিত্যকে পরিমার্জনা করে আধুনিকরূপ দানে সচেষ্ট হন; পাশাপাশি কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও ভাষাবিন্যাসের সার্থক পরিণতি প্রদানের প্রয়োজনে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। বলা যায়, এরই ধারাবাহিকতায় জীবনের গূঢ়ার্থ প্রকাশের নিমিত্তে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কাব্যনাটকের উৎপত্তি। এমনিতে মানুষের অন্তস্তলের রূপপ্রকৃতি প্রকাশে কাব্যভাষার বিকল্প নেই। গদ্যভাষায় বহির্বাস্তবতা প্রকাশ করা যেতেই পারে, কিন্তু জীবনের গূঢ়ার্থ প্রকাশে প্রয়োজন কাব্যের সুললিত আবেগময় মাধুর্য। এই বোধ থেকেই সমকালীন ইয়োরোপীয় কবিগণ কাব্যনাট্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। যান্ত্রিকতা আর জড়বাদী দর্শনে ক্লান্ত মানুষের প্রয়োজন ছিলো ব্যক্তিক হৃদয় অবলোকন, এবং নিজের ভেতরটা পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কার করার। কাব্যনাটকে মানুষ যখন নিজের ভেতরকার লুকায়িত আমিত্বের সন্ধান পেয়েছে তখনই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সাহিত্যের এই মননশীল ও মেধাবী ধারা।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা

বিশ্বসাহিত্যে কাব্যনাট্যের অবিস্মরণীয় আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিসের অবিসংবাদিত নাট্যকারদের মধ্যে এস্কিলাস (৫২৫-৪৫৬ খ্রিপূ), সফোক্লিস (৪৯৭-৪০৬ খ্রিপূ), ইউরোপিদিস (৪৮০-৪০৬ খ্রিপূ), এরিস্টোফানিস (৪৪৬-৩৮৮ খ্রিপূ) প্রমুখ কবি কবিতার ভাষায় লিখেছেন কালজয়ী ট্রাজেডি ও কমেডি। প্রাচীন গ্রিসের পর প্রাচীন রোমেও আদি ফর্মের কাব্যনাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে। ইতালির কিংবদন্তিতুল্য কবি ও নাট্যকার ভার্জিল (৭০-২১খ্রি.পূ) এক্ষেত্রে পালন করেছেন মুখ্য ভূমিকা। রোমান এ নাটকগুলোর মূল প্রতিপাদ্য ছিল স্বজাতির মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন প্রচারের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ ও সুশিক্ষার সম্প্রসারণ। গ্রিক ও রোমানদের পর ইংরেজি ভাষামাধ্যমে রচিত হয়েছে কবিতায় লেখা নাটক। ইংরেজ কবিদের হাতেই মূলত আধুনিক কাব্যনাট্যের নানাবিধ রূপান্তর ঘটেছে। কেননা, তাঁরা কাব্যনাট্যের বিষয়কে কেবল ধর্মীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ না রেখে মানবিক বোধে প্রসারিত করেছেন, এবং নাটকের আঙ্গিকগত পরিবর্তন করেছেন অনন্য দক্ষতায়। ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪-১৫৯৩), উহলিয়ম শেকসপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬), বেন জনসন (১৫৭২-১৬৩৭) প্রমুখ কবি প্রাথমিকভাবে কবিতা ও নাটকে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসেন, এবং রচনা করেন অসামান্য কালজয়ী নাটক। বিশেষত উইলিয়াম শেক্সপিয়র কবিতাময় ভাষায় যেসব নাটক রচনা করেছেন, সেগুলো বিষয় ও ভাষাগুণে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও আধুনিক কাব্যনাট্যের প্রয়োজনীয় গুণগুলো রক্ষিত হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪), প্রিসি শেলি (১৭৯২-১৮২২), জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১), জর্জ গর্ডন বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), আলফ্রেড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২), রবার্ট ব্রাউনিং (১৮১২–১৮৮৯) প্রমুখ সাহিত্যিকগণ আধুনিক কাব্যনাট্যের আদলে কবিতার ভাষায় নাটক রচনার প্রয়াস নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা সেভাবে সফল হতে পারেননি। এরপর, বিংশ

শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এসে টি এস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), ডব্লিউ বি ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯), জে এম সিঙ (১৮৭১-১৯০৯), ডব্লিউ এইচ অডেন (১৯০৭-১৯৭৩) প্রমুখ কবি আবারো কবিতার ভাষায় নাটক লেখা শুরু করেন। কাব্যনাট্যকার হিসেবে টি এস এলিয়ট এদের মধ্যে সফল ও পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে যেমন কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তেমনিভাবে এই তত্ত্বের বাস্তবিক প্রয়োগ দেখিয়েছেন মৌলিক কাব্যনাটক রচনা করে। বলাবাহুল্য সমকালে বিশ্বব্যাপী সংঘটিত বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলোনের প্রভাব, বিশেষত ফরাসি প্রতীকবাদ, জাপানি 'নো'[১] নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য এঁদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্যে কাব্যনাট্যের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। যদিও বিশ্বব্যাপী এলিয়ট প্রবর্তিত কাব্যনাট্যের প্রভাব তখনো বিশ্বের এখনো অনেক অঞ্চলেই কার্যকর ছিল। যেমন আফ্রিকা অঞ্চলে কাব্যনাটক এখনো সমান জনপ্রিয়। এমনকি নাইজেরিয়ান নোবেলজয়ী (১৯৮৬) নাট্যকার ওলে সোয়াঙ্কি (জন্ম. ১৯৩৪) তাঁর প্রায় সব নাটকই কবিতার ভাষায় রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে *দ্য লায়ন এন্ড জুয়েল* (১৯৬২), এ *ডান্স অফ দ্য ফরেস্ট* (১৯৬৩) *ডেথ এন্ড দ্য কিংস হর্সম্যান* (১৯৭৫) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২.

ভারতবর্ষে, সংস্কৃত সাহিত্যে কবিতার ভাষায় প্রচুর কবি-নাট্যকার মঞ্চনাটক রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অযোধ্যার নাট্যকার অশ্বঘোষ (৮০-১৫০ খ্রিস্টাব্দ), প্রাচীন কুষাণ সাম্রাজ্যের কবি-নাট্যকার ভাস (২০০-৩০০ খ্রিস্টাব্দ), নাট্যকার শূদ্রক (২০০-২৫১ খ্রিস্টাব্দ), মহাকবি কালিদাস (আনু. খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক), উত্তরভারতের কবি হর্ষবর্ধন (৫৯০-৬৪৭), কবি ভবভূতি (খ্রিস্টীয় ৮ম শতক) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্য পাশ্চাত্য প্রভাবজাত একথা স্বীকার করেও বলা যায়, আধুনিক বাংলা নাটকে সংস্কৃত সাহিত্য, এমনকি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ*, মধ্যযুগের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, মঙ্গলকাব্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। নাট্যব্যক্তিত্ব সেলিম আল দীনের (১৯৪৯–২০০৮) একটি মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে :

---

[১] পেশাদার নাট্যচর্চার প্রাচীনতম ধারাগুলোর মধ্যে অন্যতম জাপানের 'নো' নাটক। সংগীত, নৃত্য, ও অভিনয়ের সমন্বয়ে এ নাট্যধারার প্রচলন হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে, যেখানে বৌদ্ধধর্মের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : ড. মো. নজরুল ইসলাম, 'জাপানি নাটক : নো', "সাহিত্যপাতা", দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৩ আগস্ট, ২০১৯)

সচরাচর দেখা যায় আমরা 'নাটক' কথাটাকে এক পূর্ব নির্ধারিত ইউরোপীয় ধারণার অমোঘ রূপ ও রীতির আলোকে বিচারের পক্ষপাতী। [...] আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো 'ন্যারেটিভ' ও 'রিচুয়াল' থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান, পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট্য, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর, মঙ্গলনাট, গাজীর গান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বাঙলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মিতা।[১]

বস্তুত, প্রাচীন যুগের *চর্যাপদ*, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক রচনা, বাঙালির হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতি – লোকনাট্য, লোকগীত, ঐতিহ্যবাহী নানান অনুষ্ঠানে অভিনীত যাত্রাপালা, পাঁচালী প্রভৃতিকে আধুনিক কাব্যনাটকের শ্রেণিভুক্ত না করা গেলেও এ ধরনের রচনার মধ্যে কাব্যনাটকের একাধিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোককবিদের মননসৃজিত এসব রচনার ঘটনাসংগঠন, চমকপ্রদ নাট্যক্রিয়া, অলঙ্কার-শোভিত গীতময় সংলাপ, উপস্থাপন কৌশল সবকিছুর সঙ্গে আধুনিক কাব্যনাটকের সাজুয্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে আধুনিক নাটকের মতো চরিত্রগুলোর দ্বান্দ্বিক অবস্থান, মানসসংকটের তীব্রতা এগুলোতে অনুপস্থিত। আর এসব কারণেই হয়তো লেখক-সমালোচক আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গে এককভাবে পাশ্চাত্য উৎসকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'আধুনিক নাট্যতত্ত্ব ও নাটক' প্রবন্ধে এ সর্ম্পকে বলেছেন :

সমকালীন পাশ্চাত্য নাটকের মতো সমকালীন বাংলা নাটকও আধুনিক বাংলা নাটকের সর্বশেষ স্তর। আধুনিক বাংলা নাটক যে পাশ্চাত্য ও সাহিত্যের প্রভাবে উৎপত্তি হয়েছে, তাও ঐতিহাসিক সত্য। আরেকটি জোরালো কারণ যা আমার মনে জাগছে তা হলো সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে যে সব নাটক আমি অভিনীত হতে দেখেছি তার বিষয়বস্তু প্রকরণ ও প্রয়োগ কৌশলে এমন একটা অভিনবত্ব আছে, যাকে পুরোপুরি দেশীয় নিরিখে বিচার করা যায় না।[২]

পাশ্চাত্যরীতিতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯) নাটক রচনার মাধ্যমে আধুনিক বাংলা নাটকের যাত্রাপথ উন্মোচন করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একাধিক ভিন্ন ভিন্ন ফর্মের নাটক রচনার মধ্যদিয়ে এ ধারাকে ঋদ্ধ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৌলিক নাটক ছাড়াও রচিত

---

১ সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃ.১৯-২০

২ আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'আধুনিক নাট্যতত্ত্ব ও নাটক', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৩-২৪

একাধিক কাব্য নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১), *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)*, বিশেষত, *বীরাঙ্গনা কাব্যের* (১৮৬২) নাট্যিকগুণ পাঠককে মোহাবিষ্ট করে রাখে। তদুপরি, এগুলোকে পরিপূর্ণ কাব্যনাট্য বলা যায় না, বরং নাট্যগুণসমৃদ্ধ কাব্য বলা যেতে পারে।

আধুনিক কাব্যনাটক বলতে আমরা যা বুঝি – বাংলা সাহিত্যে তার শুভসূচনা করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকাংশ নাটকই কাব্যগুণসমৃদ্ধ। একজন প্রজ্ঞাবান সফল কবির হাতে রচিত নাটক এমন হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, টি এস এলিয়টের কাব্যনাটক রচনার পূর্বেই নিজস্ব মৌলিক ভাবনা ও নিরীক্ষাপ্রবণ মননের তাগিদে নাটকের ভাষা নিয়ে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নাটকে কাব্যভাষার সম্ভাবনা নিয়ে যাচাই করেছেন।[১] বস্তুত 'মধুসূদনের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তারই ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাটকের পথচলা শুরু হয়েছিলো।'[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতময় সত্তার প্রভাবে তাঁর প্রায় সব রচনাতেই কাব্যসুর অনুরণিত হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৩), *গান্ধারীর আবেদন* (১৮৯৭), *সতী (*১৮৯৭), *নরকবাস (*১৮৯৭), *কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (*১৯০০) নামে তিনি একাধিক নাট্যকবিতা রচনা করেছেন। এসব রচনায় কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হলেও এগুলোকে ঠিক আধুনিক কাব্যনাট্যের বিচারে কাব্যনাটক বলা যায় না। এখানে আধুনিক কাব্যনাট্যের বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আভাসিত হয়েছে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *বিসর্জন* (১৮৯০) নাটকটিকে তাঁর প্রথম ও সার্থক কাব্যনাটক বলা যেতে পারে। আচারসর্বস্ব ধর্মের অপরীতি ও আগ্রাসনের বিপরীতে মানবধর্মের প্রতিষ্ঠায় প্রেমের জয়গান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। কোনো ধরনের হত্যা ও রক্তপাতের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরপূজা হতে পারে না; এবং জীবে দয়াই

---

[১] 'কাব্যনাট্যের রূপতাত্ত্বিক ধারণা ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অনবহিত থেকেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হন। তৎকালীন বঙ্গীয় নাট্যবোধ ছিল প্রবলভাবে শেক্সপীয়র রূপরীতির দ্বারা দীক্ষিত এবং পেশাদারি রঙ্গমঞ্চেরর চাহিদানির্ভর ও রুচিসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ দর্শকের নাট্যাদর্শের অভিমুখী হয়ে নাটক রচনায় নিয়োজিত হননি কিংবা মধুসূদনের মত পেশাদারি নাট্যমঞ্চের বহির্গত চাপেরও মুখোমুখি হননি। তাঁর নাট্যরচনায় শিল্পচেতনার আভ্যন্তর প্রণোদনাই সক্রিয় ছিল বলে নাট্যরূপের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীন, অন্তত স্বকীয় রূপাদর্শের নিমার্ণলক্ষ্যে কাব্যনাট্যকে অনুসন্ধেয় করতে পেরেছিলেন।'– বেগম আকতার কামাল, *রবীন্দ্রনাথ : যেথায় যত আলো*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৬০

[২] অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১

মানুষের প্রধান ধর্ম – এটিই *বিসর্জন* নাটকের মূল বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *বিসর্জন* নাটকের এই প্লট নিয়েছেন তাঁর আর একটি বিখ্যাত রচনা *রাজর্ষি* (১৮৮৭) উপন্যাস থেকে। *রাজর্ষি* উপন্যাসের প্লটের উৎস প্রসঙ্গে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটি দ্বারা *বিসর্জন* নাটকের প্লটের প্রেক্ষাপট ধারণা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> [...] স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ‘ বাবা, এ কী! এ যে রক্ত!’ বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভাণ করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।[১]

মূলত শান্তি, কল্যাণ, ক্ষমা, দয়া – আমৃত্যু এগুলোর সাধনা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এই অন্তরলালিত মানবিক বোধ ও বিশ্বাসের নান্দনিক উপস্থাপন ঘটেছে *বিসর্জন* নাটকে। কাব্যনাট্যের মূল যে বৈশিষ্ট্য অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্বপ্রকাশ, তার শতভাগ উপস্থাপন ঘটেছে *বিসর্জন* নাটকে। রবীন্দ্রসাহিত্য- সমালোচক নীহার রঞ্জন রায় এ নাটকের চারিত্রিক দ্বন্দ্বনির্মাণ-রীতি এবং এর মঞ্চসাফল্যের কার্যকারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন :

> কি মনের কি বাহিরের, এতখানি দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নাট্যেই এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, এই হিসেবে ‘বিসর্জন’ অতুলনীয়। জয়সিংহের মনের মধ্যে যে সংশয়ের নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, খুব কম নাট্যেই তাহার তুলনা আছে। আর কি জয়সিংহ, কি রঘুপতি, কি গোবিন্দমাণিক্য, কি অপর্ণা ইহাদের মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাহা মনের মধ্যেই শুধু লীলায়িত হয় নাই, বাহিরের কথার গতিভঙ্গি ও কর্মের মধ্যেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিত্তের ও কর্মের দ্বন্দ্বগতির এমন অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নাটকেই এতটা সম্ভব হয় নাই। ‘বিসর্জন’ যে অভিনয় সাফল্য লাভ করিয়াছে, ইহাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।[২]

বিসর্জন নাটকটি আবর্তিত হয়েছে নাটকের প্রধান দুই চরিত্র রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও মন্দিরের আত্মম্ভরী পুরোহিত রঘুপতির মধ্যে প্রেম ও ক্ষমতার অন্তর্সংঘাতকে কেন্দ্র করে। একদিকে রাজার রাজ্যশাসনের ক্ষমতা,

[১] ‘জীবনস্মৃতি’, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১৭শ খণ্ড, বিভা, কলকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১৩

[২] নীহার রঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৪

অন্যদিকে রাজ পুরোহিতের আধ্যাত্মিক প্রভাবের দ্বন্দ্ব নাটকটিকে যথার্থই আধুনিক কাব্যনাটকের মর্যাদায় মণ্ডিত করেছে। *বিসর্জনের* নাট্যকাহিনি নির্মিত হয়েছে পঞ্চাঙ্ক নাটকের আদলে। এর ভাষাশৈলী অত্যন্ত চমৎকার ও প্রাঞ্জল। নাট্যকার এখানে চরিত্রানুগ ভাষাপ্রয়োগে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের অধিকাংশ সংলাপ কবিতায় রচিত। জয়সিংহ চরিত্রটি যখন প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, সে সময়ের একটি সংলাপ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য :

মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপানলোভে।
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা
মা মনে করিয়া তাকে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে –
তেমনি কি তোর ব্যবসা? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! (*বিসর্জন*)[১]

আবার, আলোচ্য নাটকে সাধারণ প্রজাবৃন্দের কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়েছে গদ্য সংলাপ, এক্ষেত্রে অলংকারবহুল ভাষার পরিবর্তে প্রযুক্ত হয়েছে সাধারণ গ্রামীণ কথ্যভঙ্গি। যেমন :

গণেশ। ইদিকে এ ভালোমানুষটি, কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার জো নেই।

হারু। নিতেই আমার পিসে হয়।

কানু। শোনো একবার কথা শোনো। নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে? (*বিসর্জন*)[২]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব গদ্যসংলাপাত্মক নাটক রচনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই কাব্যনাটকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে। তবে সমালোচকগণ এ ধারার নাটককে বলেছেন কাব্যনাটকের

---

১ বদিউর রহমান, *রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন পাঠের ভূমিকা*, নতুনধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১১৪-১১৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

লক্ষণাক্রান্ত সফল কাব্যময় গদ্যসংলাপাত্মক নাটক। এ ধারার নাটকের মধ্যে *ডাকঘর* (১৯০২), *শারদোৎসব* (১৯০৮), *রাজা* (১৯১০), *মুক্তধারা* (১৯২২), *রক্তকরবী* (১৯২৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশেষত ‘*মুক্তধারা*, *রক্তকরবী* প্রভৃতি নাটক এদের বক্তব্য পরিবেশ, ঘটনা সংস্থান, কাব্যময় সংলাপ ইত্যাদি নিয়ে একেবারে আদ্যন্ত কবিতায় সংস্থাপিত বলা যায়। আর এখানেই এরা আধুনিক কাব্যনাট্যের সগোত্র হয়ে উঠেছে।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যনাট্যের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে কবি-নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) হাতে। বুদ্ধদেব বসু তিরিশের দশকের কবি হলেও কাব্যনাট্য লেখা শুরু করেন ষাটের দশকে। কবি অলোক সরকার (১৯৩১-২০১৬) তাঁর *অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক* (১৯৬১) প্রবন্ধের পাদটীকায় বলেছেন, : ‘[...] বুদ্ধদেব বসু অনেকগুলি নাটক রচনা করেন, যাকে তিনি নিজে কাব্যনাটক বলে মনে করতেন।’[২]

বস্তুত, বিভাগোত্তরকালে আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী বুদ্ধদেব বসু। বাংলা সাহিত্যে এরপর যাঁরাই কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই কমবেশি বুদ্ধদেব বসু রচিত কাব্যনাট্যের প্রভাব বিদ্যমান। বুদ্ধদেব বসু ১৯৬৬- ১৯৭৩ সময়পরিসরে সর্বমোট তেরোটি নাটক রচনা করেছেন যার মধ্যে ছয়টি নাটককে পরিপূর্ণভাবে শিল্পসফল কাব্যনাটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখযোগ্য কাব্যনাটকগুলো হলো – *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০), *প্রথম পার্থ* (১৯৭০), *সংক্রান্তি* (১৯৭৩)। বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুর অবদান নির্ণয় করতে গিয়ে সাহিত্য-গবেষক ড. মাহবুব সাদিক নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> বাংলা কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় পর্যায়টি সমৃদ্ধ করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর একক কৃতিত্বে। আধুনিক কাব্যনাট্য রচনার পথিকৃৎ তিনি। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ বুদ্ধদেব বসু। [...] জীবনের অন্ত্যপর্বে তিনি নিবিষ্ট হয়েছিলেন নাটক রচনায়। [...] বাংলা কাব্যনাট্যের রূপকল্প গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।[৩]

---

[১] ড. কণিকা সাহা, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য : উদ্ভব ও বিকাশ*, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৭

[২] অলোক সরকার, ‘অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক’, *প্রবহমান সাহিত্য*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৭ (উদ্ধৃত : আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.৯৫)

[৩] মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য : একালের জীবনভাষ্য*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২-১৭

মূলত, 'কবি ও কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব আধুনিকতার পতাকা সগৌরবে বরাবর উড্ডীন করে শেষ বয়সে দেশী ও বিদেশী পুরাণের হলেন নিবিষ্ট পাঠক। আর সেখান থেকেই পেলেন কাব্যনাট্য রচনার প্রেরণা।'[১] বলাবাহুল্য বুদ্ধদেব বসুর সব কাব্যনাট্যে পুরাণের নবরূপায়ন ঘটেছে। পুরাণের অপেক্ষাকৃত গৌণ কাহিনিকে তিনি কল্পনার আশ্রয়ে সমকালীন ও অতীব প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। যেমন, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র কাহিনি তিনি *মহাভারতের* 'ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান' থেকে সংগ্রহ করেছেন। পুরাণে উল্লেখিত সামান্য এক অনামী পতিতাকে তিনি আলোচ্য নাটকে তরঙ্গিণী নাম দিয়ে সমগ্র নারীত্বকে শ্রদ্ধার আসনে আসীন করেছেন। রাজগৃহে নানান অনুশাসন আর নিয়মের জালে বন্দি রাজকন্যা শান্তার পাশাপাশি আলোচ্য নাটকে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পতিতা নারীও আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে; যা বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। একদিকে রাজকুমারী শান্তা যেমন তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পিতার অযাচিত হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে বিচিত্রগামিনী পতিতা নারী তরঙ্গিণী তার নতুন সত্তার আবিষ্কারে হয়েছে নিমগ্ন :

ক. শান্তা : আমার বিবাহ! আর আমারই অজ্ঞাতে তার আয়োজন! [...] এ কি ক্ষত্রনারীর স্বাধিকার নয় যে তার পতি হবে স্বনির্বাচিত? (*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, ১ম অঙ্ক)[২]

খ. তরঙ্গিণী : আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য এক মুখ লুকিয়ে আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো? [...] আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিলো – আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি – আমি খুঁজি সেই মুখ। (*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, ৩য় অঙ্ক)[৩]

স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুও এ বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে এ নাটক রচনার মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের ভূমিকায় বলেছেন :

এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত – অর্থাৎ একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও

---

[১] দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩০৫

[২] বুদ্ধদেব বসু, *কাব্যনাট্যসমগ্র*, বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পা.), অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৬, ১৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

দ্বন্দ্ববেদনা। [...] আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হ'য়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন;[১]

যদিও সমকালীন অনেক সমালোচক '*তপস্বী ও তরঙ্গিণী* পুরোপুরি কাব্যনাট্য নয়'[২] বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এটি কাব্য ও নাট্যমাধুর্যের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ কাব্যনাটক। যদিও এখানে লেখক গদ্যভাষা প্রয়োগ করেছেন, তবু এই গদ্যসংলাপে মিশে আছে কবিত্বের সুর। যেমন, প্রথম অঙ্কে প্রজাদের একটি সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

কী দোষ করেছি আমরা – কেন দেয়া নির্দয়? (*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, ১ম অঙ্ক)[৩]

এখানে 'কেন দেয়া নির্দয়?' অংশে স্পষ্টত কবিত্বের সুললিত মাধুর্য ধরা পড়েছে।

আবার, নাটকে ব্যবহৃত বিভিন্ন চরিত্রের মুখের গানগুলিও চমৎকার শিল্পমাধুর্যসম্পন্ন শব্দ-ছন্দে অলঙ্কৃত। যেমন, একদিকে প্রেমিকের প্রেম, অন্যদিকে স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার – উভয় হারিয়ে মেকি জীবনযাপনে সমর্পিত রাজকন্যা শান্তার বিষাদাক্রান্ত মনোবেদনা প্রকাশের নিমিত্তে রচিত একটি গান উল্লেখ্য :

আসে যায় দিন-রজনী
আসে জাগরণ, তন্দ্রা
শুধু নেই হৃৎস্পন্দ,
লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন। (*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, ৪র্থ অঙ্ক) [৪]

এছাড়া তিনি *মহাভারতে*র ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি নিয়ে রচনা করেছেন *প্রথম পার্থ*, *অনাম্নী অঙ্গনা*, *কালসন্ধ্যা* প্রভৃতি কাব্যনাটক। পুরাণ থেকে ঘটনাংশ সংগ্রহ করে সেগুলো নিয়ে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন পুরাণ বর্তমান পৃথিবীতেও কতখানি প্রাসঙ্গিক; এবং *মহাভারতে*র বর্ণনাগুলো কিছু স্থবির কাহিনির সমষ্টি নয়, বরং তার প্রভাব আধুনিক কালপর্যন্ত বিস্তৃত।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

[২] দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩০৬

[৩] বুদ্ধদেব বসু, কাব্যনাট্যসমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

কালসন্ধ্যা নাটকে লেখক কৃষ্ণ চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের কিছু শাশ্বত জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কিংবা নিয়তির অমোঘ বিধানে কৃষ্ণের সম্মুখেই যদুবংশ ধ্বংস হয়, যে-অর্জুনের বীরত্বে পাণ্ডবরা অনায়াসে কৌরবদের পরাজিত করে, সেই গাণ্ডীবধারী অর্জুন যদুবংশের নারীদের রক্ষায় গাণ্ডীব উত্তোলন পর্যন্ত করতে ব্যর্থ হন। এ-যেন পূর্বনির্ধারিত নিয়তির অমোঘ বিধান; যা থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এতদিন পর কেন আবার নতুন করে এই বিপর্যয়, সুভদ্রার এমন প্রশ্নে কৃষ্ণের উত্তরই যেন যাবতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করে দেয় :

প্রতিহিংসা নয় – প্রতিদান।
যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধ অসমাপ্ত।
দু-একটি প্রশ্ন ছিলো শূন্যে ঝুলে,
সর্বদাই থাকে।
আজ কুরুক্ষেত্রের উত্তর এলো –
অনুবৃত্তি, উপসংহার।
সাত্যকি ও কৃতবার্মা
সকলের সব প্রাপ্য শোধ ক'রে নির্ভার হলেন। (কালসন্ধ্যা)[১]

বস্তুত,'*মহাভারত*–এর এক অণু-কাহিনিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে বুদ্ধদেবের *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাটক। *মহাভারত* -এর মৌষল-পর্বে পুত্রশোকে কাতর ক্রুদ্ধ গান্ধারী কৃষ্ণকে যে অভিশাপ দেন, বুদ্ধদেব সে-অভিশাপকে কেন্দ্রে রেখে *কালসন্ধ্যা* কাব্যনাটকে বিশ শতকের অস্থির সময়কে শিল্পিতা দিয়েছেন – পুরাণের ঘটিয়েছেন পুনর্জন্ম।'[২]

প্রথম পার্থ কাব্যনাটকের কাহিনিও *মহাভারত* থেকে সংগ্রহ করেছেন নাট্যকার। কুন্তীর মুনিপ্রদত্ত বর নিয়ে কৌতূহলমূলক পরীক্ষায় সূর্যদেবের সাহচর্যে জন্ম নেয় বীরপুত্র কর্ণ। কিন্তু কুমারী কুন্তী আকস্মিক এই পুত্রকে লোকলজ্জার ভয়ে সমাজে না নিয়ে তাকে জলে ভাসিয়ে দেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুন্তীর সমাজস্বীকৃত পুত্রদের বিপক্ষ শিবিরে যোগ দেয় কর্ণ। যুদ্ধের প্রারম্ভমুহূর্তে কুন্তী ও কর্ণ পরস্পর পরস্পরের পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। কর্ণকে জ্যেষ্ঠপাণ্ডব সম্বোধন করে পুত্র অর্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ না

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[২] বিশ্বজিৎ ঘোষ, ভূমিকা, *বুদ্ধদেব বসু : কাব্যনাট্যসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

করতে অনুরোধ জানায় কুন্তী। কিন্তু এতদিনকার মাতৃস্নেহবঞ্চিত কর্ণ প্রচণ্ড অভিমানে তাকে ফিরিয়ে দেন। একদিকে যে কৌরবরা তাকে অসহায় মুহূর্তে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রতারণা না করার মতো মানসিকতা; অন্যদিকে জন্মদাত্রী কুন্তীর অর্জুনের স্বার্থে কর্ণকে পুত্র স্বীকার করে নেয়ার আগ্রহ – কর্ণকে দারুণভাবে করে তুলেছে ব্যথিত। কর্ণের এই মানসদ্বন্দ্ব, হৃদয়জাত রক্তক্ষরণ নাটকটিকে আধুনিক কাব্যনাট্যের মর্যাদা দান করেছে। সমগ্র কুরুক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন চরিত্র কর্ণের হৃদয়-অভ্যন্তরে প্রোথিত এই দিগন্তবিস্তারী শূন্যতা প্রসঙ্গ চমৎকার কাব্যিক ভাষামাধুর্যে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। কর্ণ উন্মুলিত হবার অসীম যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আর্তকণ্ঠে দ্রৌপদীর উদ্দেশ্যে বলে উঠেছে :

আমার মর্মকথা তুমি প্রকাশ করলে, পাঞ্চালী।
আমিও তা-ই ভাবি মনে-মনে : আমি কে?
পাণ্ডব নই, কৌরব নই –
অনাত্মীয় এক আগুন্তক, কালস্রোতে ভাসমান এক পাত্র,
নির্বন্ধে ভরা, নিরুদ্দেশ, জল আর বাতাসের বেগে চালিত।
এক অনাহূত অতিথি আমি হস্তিনাপুরে,
কুলগোত্রহীন, নিষ্প্রয়োজন,
দৈবক্রমে কুরুবংশের কাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট – (*প্রথম পার্থ*)[১]

বস্তুত, 'মিথের এক চরিত্রের মধ্যে উত্তর-সামরিক আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা বা alienation-এর প্রকাশ ঘটিয়ে বুদ্ধদেব কর্ণকে করে তুলেছেন একালের মানুষ। মিথের এই নবসৃষ্টিতে বুদ্ধদেবের *প্রথম পার্থ* অনন্য এক নির্মাণ।'[২]

মহাভারতের অন্যতম লোকশ্রুত চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্মকাহিনির প্রেক্ষাপটে বুদ্ধদেব বসু রচনা করেছেন *অনাম্নী অঙ্গনা* কাব্যনাটক। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে যেমন পুরাণে স্বল্পোল্লেখিত এক নারীকে ক্রেন্দ্রীয় চরিত্রে এনে মহিমান্বিত করেছিলেন, তেমনি আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অঙ্গনা ছিল রাজবধূ অম্বিকার নামহীন দাসী। প্রেম ভালোবাসা, অপত্য স্নেহ ও আত্মত্যাগে সামান্য এই দাসীই একটা পর্যায়ে হয়ে উঠেছে অসামান্য 'অনাম্নী অঙ্গনা'। দাসী অঙ্গনার চরম আরাধ্য ছিল দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কোনো সুদর্শন যুবা

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

[২] বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

পুরুষের কণ্ঠে বরমাল্য পরিয়ে চিরসুখে স্বাধীন জীবনযাপন। কিন্তু রাজবধূর অনুরোধে দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার বিনিময়ে রাজবংশকে সুস্থ সবল পুত্র উপহার দিতে তাকে ভয়ঙ্করদর্শন মুনি ব্যাসদেবের সজ্জাসঙ্গী হতে হয়েছে। একসময় ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলনের বাধ্যবাধকতাকে সে চরম অপমান বলে গণ্য করলেও মিলনমুহূর্তে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রেমিকা সত্তায়। এরপর পুত্র বিদুরের জন্মলাভে মাতৃত্বকে বরণ করে সে নতুনভাবে জীবনকে ভাবতে শিখেছে। ফলে প্রেমজসত্তা ও মাতৃত্বসত্তায় উত্তীর্ণ অঙ্গনা আবারো চেয়েছে রাজগৃহে দাসীর জীবনযাপন। রাজগৃহে পালিত পুত্র বিদুরের সান্নিধ্যলাভের বাসনা নিয়ে সে বলে উঠেছে :

> আমি দেখতে চাই দূরযাত্রীকে তীরে দাঁড়িয়ে,
> [...] সে :
> নম্র, মৃদুভাষী, ধীর –
> পিতার মতো বিদ্বান, মাতার মতো নেপথ্যচারী, [...]
> আমার স্মরণচিহ্ন, আমার প্রমাণ, আমার অভিজ্ঞান। (*অনামী অঙ্গনা*)[১]

আর এর মধ্যদিয়েই বুদ্ধদেব বসু বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আত্মসচেতন প্রেমময় নারীর প্রতিচ্ছবি চিত্রিত করেছেন শিল্পিত ক্যানভাসে। এখানেও ঘটেছে পুরাণের পুর্নজন্ম।

বুদ্ধদেব বসুর *সংক্রান্তি* কাব্যনাটকটিও পুরাণের নবরূপায়ণ; মহাভারতের চরিত্র ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও গান্ধারীকে নিয়ে লেখা। গান্ধারীর মানবিকতা, ধার্মিকতা তাকে উজ্জ্বলতর চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সে বার বার আত্মসংবরণের অনুরোধ জানিয়েছে, অবাধ্যপুত্র দুর্যোধনকে অধর্মের পথ পরিত্যাগের আদেশ দিয়েছে; কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে আত্মগ্লানিতে ভুগেছে। আলোচ্য নাটকে কবি বুদ্ধদেব বসু চমৎকারভাবে গান্ধারীর এই তীব্র মনোযন্ত্রণার চিত্র উপস্থাপন করেছেন। যেমন, পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত গান্ধারীকে সঞ্জয়ের সামনে যখন ধৃতরাষ্ট্র উন্মাদিনী বলে শনাক্ত করেছে, তখন ধর্মবোধ ও মাতৃসত্তার দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত গান্ধারী বলে উঠেছে :

> উন্মাদ নই – এক ধর্মহীন পুরুষের সহধর্মিণী,
> এক নরাধম পুত্রের আমি মাতা। [...]
> আমি এক নারী, নারীত্ব যার নিস্ফল,
> এক পত্নী, পতি যার মতিচ্ছন্ন,

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

এক রাজ্ঞী, রাজত্ব যার মর্মপীড়া,

এক মাতা, মাতৃত্ব যার অভিশাপ –

ধর্ম ছাড়া কোথাও যার আশ্রয় নেই,

সত্য ছাড়া কোথাও নেই নির্ভর। (*সংক্রান্তি*)[১]

অনিবার্য সত্যকে উল্লঙ্ঘনের উপায়হীনতাই স্পষ্ট হয়েছে আলোচ্য নাটকে, যার মাধ্যমে বুদ্ধদেব সমকালীন বিনষ্ট মানবচেতনা আর ধ্বংসপ্রবণতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

এগুলো ছাড়াও বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাটকের আদলে *প্রায়শ্চিত্ত (১৯৭৩)*, *ইক্ষাকু সেন্নিন (১৯৭৩)*, *অনুরাধা (১৯৯৮)*, *কলকাতার ইলেক্ট্রা (১৯৬৭)* প্রভৃতি নাটক রচনা করেছেন। তবে এগুলোকে কোনো কোনো সমালোচক পরিপূর্ণ মৌলিক কাব্যনাটকের মর্যাদা দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ অনূদিত, রূপান্তরিত, একাঙ্কিকা, গীতিনাট্য প্রভৃতি অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন। আইরিশ কবি ডাব্লিউ বি ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯)-এর বিখ্যাত নাটক *পারগেটারির (১৯৩৮)* অনুলিখন নাটক *প্রায়শ্চিত্ত*। আর *ইক্ষাকু সেন্নিন* নাটকটি রচিত হয়েছে জাপানি 'নো' নাটকের আদলে। বস্তুত, জাপানি লোকগাথা চরিত্র ইক্ষাকুর সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের শুদ্ধাচারী চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গের গভীরতর সাযুজ্য প্রত্যক্ষ করে নাট্যকার আলোচ্য নাটকটি রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। *অনুরাধা* নাটকটি মূলত একাঙ্ক গীতিনাট্য। আলোচ্য নাটকে সাধারণ মানুষের ওপর নিয়তির অমোঘ ও অমোচনীয় প্রভাব বর্ণিত হয়েছে অনুরাধা, মালতী, অনিরুদ্ধ, পুরন্দর প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে গ্রিক মিথ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বুদ্ধদেব রচনা করেছেন *কলকাতার ইলেক্ট্রা* নাটক। গ্রিক পুরাণের প্রত্নপ্রতিমা চরিত্র ইলেক্ট্রাকে অবলম্বন করে তিনি এখানে বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত কলকাতার সমাজজীবনকে চিত্রিত করেছেন শিল্পের নিপুণতায়। মূলত, বিষয়বস্তু ও শিল্প নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষায় বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাট্যমানসকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় তাঁর অবস্থান সুনির্দিষ্ট, অবদান অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্যধারায় প্রাণিত হয়ে বাংলাদেশে অনেক কবিই কাব্যনাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য যে, 'বাংলাদেশে কাব্যনাট্য রচয়িতার সংখ্যা সীমিত। মূল নাট্যধারার কেউ কেউ দু-চারটি কাব্যনাট্য লিখলেও তা তাঁদের সৃজিত সাহিত্যের তুলনায় অধিক মানসম্পন্ন নয়। ব্যতিক্রম সৈয়দ শামসুল হক।'[২] তবে বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ধারায় অনেকের অবদান স্মরণযোগ্য। বিভাগোত্তরকালে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩–৩৪৪

[২] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, আব্দুল মান্নান সৈয়দের নাট্যসাহিত্য (প্রবন্ধ), *কালি ও কলম* (অনলাইন সংস্করণ), ২৩ এপ্রিল, ২০১৮

বাংলাদেশের সাহিত্যে যাঁরা কাব্যনাট্যরচনায় উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে কবি আ ন ম বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) প্রমুখ কবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি ও নাট্যকার আ ন ম বজলুর রশীদের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কাব্যনাট্য সংকলন *ত্রিমাত্রিক* (১৯৬৬) একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকগাঁথাকে অবলম্বন করে তিনি *ধনুয়া গাঙের তীরে*, *মেহের তোমার নাম* ও *কোনো এক দীপক সন্ধ্যায়* নামক তিনটি কাব্যনাট্য রচনা করে *ত্রিমাত্রিক* কাব্যনাট্য সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, *ত্রিমাত্রিক* কাব্যনাট্য সংকলনের নাটকগুলোতে মাত্রারিক্ত সংগীত ও সুরের প্রাধান্য লক্ষ করে এগুলোকে কোনো কোনো সমালোচক গীতিনাট্য বলতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু শিল্পমানের বিচারে কাব্যনাট্যের মর্যাদা না পেলেও এগুলোকে কাব্যনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। এ নাটকগুলো সম্পর্কে লেখক নিজেই নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> দেশের জনপ্রিয় লোকগাথার অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, অনুসৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য এবং এভাবেই আমাদের লোক-কাহিনীগুলি নতুন রূপ ও রূপায়ণে দীর্ঘায়ু লাভ করবে। ফলে আমাদের কাব্য-সাহিত্যের ভাব ও রেখা-দিগন্ত আরো প্রসারিত হয়ে পড়বে। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ‘দিওয়ানা মদীনা’ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ‘উমর-মারুঈ’ লোকগাথা দু'টিকে কাব্যনাটিকায় আধুনিক আঙ্গিক ও রসরূপে প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি।[১]

অর্থাৎ নাট্যকার স্বয়ং তাঁর এ রচনাগুলোকে কাব্যনাটক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের অনন্য নিদর্শন *মৈমনসিংহ গীতিকার* ‘দেওয়ানা মদিনা’ *পালা* অবলম্বনে লেখক তাঁর অন্যতম কাব্যনাটক *ধনুয়া গাঙের তীরে* রচনা করেছেন। এটি বাংলাদেশের প্রচলিত ও জনপ্রিয় লোককাহিনির অনুরচনা হলেও বজলুর রশীদ ভাষার শিল্পসৌকর্যে, ছন্দের নিপুণতায় নাট্যকাহিনিটিকে কাব্যনাট্যের উপযোগী করে তুলেছেন।

কোনো এক দীপক সন্ধ্যায় নাটকটির কাহিনি তিনি রচনা করেছেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় লোকগাথা *উমর-মারুঈ* থেকে প্রভাবিত হয়ে। এটি একটি ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি। সিন্ধু নদীর অববাহিকার মালি নামক গ্রামের মারু উপজাতির কন্যা মারুই ও একই গ্রামের রাখাল যুবক খেতসীনের প্রেমকাহিনি

---

[১] ‘ভূমিকাংশ’, *ত্রিমাত্রিক*, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৬

অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছে। কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের সমন্বয়ে এটি উন্নীত হয়েছে শিল্পসফল কাব্যনাট্যের মর্যাদায় ।

অনেকটা ঐতিহাসিক নাটকের ঢঙে রচিত হয়েছে *মেহের তোমার নাম* কাব্যনাটক। মানবহৃদয়ের প্রেমাবেগ, মিলনব্যাকুলতা, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা প্রভৃতি নিয়েই নির্মিত হয়েছে এ-কাব্যনাট্যের মূল আলেখ্য। এর নাট্যঘটনা খুব বেশী দীর্ঘ নয়। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্মিত এ-নাটকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল।

কবিতার পাশাপাশি কাব্যনাট্য রচনায় ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বিরল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর একাধিক দীর্ঘ কবিতা কাব্যনাট্যগুণ-সম্পন্ন। *দরিয়ায় শেষ রাত্রি* (১৯৪৪), *নয়া জিন্দেগী* (১৯৫২) এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যনাটক *নৌফেল ও হাতেম* (১৯৬১)। ফররুখ আহমদের *দরিয়ার শেষ রাত্রি রচনার* নাট্যগুণ প্রসঙ্গে কবি ও সাহিত্য-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন :

> ফররুখের কবিতায় শুধুমাত্র নাট্যগুণের দিকে তাকালে তাঁর কাব্যগুণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যে-ক'টি কবিতায় ফররুখ এই দুই আপাতপ্রতীপ গুণকে মিলিয়েছেন, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।[১]

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতারীতিতে প্রভাবিত হয়ে ফররুখ আহমদ তাঁর পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক *নৌফেল ও হাতেম* রচনা করেন। বাংলাদেশের একজন কবির হাতে এমন একটি শিল্পসফল রসোত্তীর্ণ কাব্যনাট্য সমকালে অনেককেই বিস্মিত করেছিল। কোনো কোনো সমালোচক এটিকে দুঃসাহসিক কবিকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিন অঙ্কে রচিত এ কাব্যনাট্যটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ইয়েমেনের দানশীল শাহজাদা হাতেমতায়ী ও আরব-রাজা নৌফেলকে ঘিরে। হাতেমতায়ীর বিপুল জনপ্রিয়তা এবং দেশ্যাপী ভূয়সী প্রশংসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে হাতেমতায়ীকে ধরে আনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেননৌফেল। মানবতা ও সেবার পথে নিবেদিত হাতেম অর্থকষ্টে পতিত এক দরিদ্র কাঠুরিয়াকে নৌফেলকর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের টাকা পাইয়ে দেবার জন্য নিজেই রাজদরবারে হাজির হন। হাতেমের এই আত্মত্যাগী মহানুভবতায় নৌফেল যারপরানাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। নিজেই তখন স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজমস্তকের রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন হাতেমতায়ীর উন্নত শিরে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চৌদ্দমাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ নতুন করে বিনির্মাণ করে আঠারো মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবি ফররুখ আহমদ তাঁর *নৌফেল ও হাতেম* কাব্যনাটকের ছন্দ প্যাটার্ন রচনা করেছেন; যা

---

[১] আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

ছিল ফররুখ আহমদের স্বাভাবিক কাব্যভাষার তুলনায় স্বতন্ত্র। আবার, নাটকটির অঙ্গসজ্জার বহুক্ষেত্রেই মাইকেলের কাব্যের ভাষাবৈশিষ্ট্য অবলীলায় অনুসরণ করেছেন তিনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন তাঁর রচিত মহাকাব্যগুলোতে দীর্ঘ-উপমা, উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন, ফররুখ আহমদের আলোচ্য কাব্যনাটকটিতেও তেমনটা পরিলক্ষিত হয়। নাটকের শেষ কটি অন্তমিল যুক্ত চরণ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে :

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়, – শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী – পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ, – ঘুমঘোরে যখন বেঁহুশ
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে ;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর। (*নৌফেল ও হাতেম*)[১]

ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ও জাতিসত্তায় ধর্মের ইতিবাচক মহিমা প্রচারের উদ্দেশে তিনি রচনা করেছেন *নৌফেল ও হাতেম*। আর এটি করতে গিয়ে তিনি প্রাক- ইসলামি যুগের কাহিনি বেছে নিয়েছেন। 'বাংলা কাব্যে যেসব মহাকাব্য ও কাব্যনাটক রচিত হয়েছে তার বেশির ভাগেরই কাহিনী ও চরিত্র হিন্দু-পুরাণ, *রামায়ণ, মহাভারত* ইত্যাদি এবং কিংবদন্তি ও লোককাহিনী থেকে আহৃত, কবির কল্পনার রং মিশিয়ে কাহিনী ও ঘটনা বিধৃত করেছেন, চরিত্র চিত্রণ করেছেন, প্রতীক ও রূপক ব্যবহার ও চরিত্র-সৃজনের মাধ্যমে শুভ ও কল্যাণের বাণী এবং মানবতাবাদী আদর্শ তুলে ধরেছেন।'[২] যদিও *নৌফেল ও হাতেমে* ধর্মীয় আবেগ ও ঐতিহ্য উপস্থাপনের কারণে রচনার শিল্পগুণ কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে, তবু স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ইতিহাসে এটি অপেক্ষাকৃত অধিক সার্থক ও জনপ্রিয় কাব্যনাট্য। এখানে চমৎকার ভাবে কাব্যগুণের সঙ্গে নাট্যগুণের অন্বয় সাধিত হয়েছে, যেটি কাব্যনাটকটিকে নান্দনিক ও শিল্পোত্তীর্ণ করতে সহায়তা করেছে। বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন সমালোচক ফররুখ আহমদ এবং অপর কবি-নাট্যকার আলাউদ্দীন আল আজাদের ভূমিকা স্মরণ করে বলেছেন : 'ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ কাব্যনাট্য রচনা করে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এ আঙ্গিকে রচিত বাংলাদেশের

---

[১] ফররুখ আহমদ, *নৌফেল ও হাতেম* , আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ.৯২

[২] মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, 'বাংলা কাব্যনাটকের ধারায় ফররুখ আহমদের নৌফেল ও হাতেম', "সাহিত্যপাতা", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১৪ জুন, ২০০২,

সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্যের পথটি উন্মোচন করে দিয়েছেন। ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ইহুদির মেয়ে' (১৯৬২) কাব্যনাট্য বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের বর্তমান বিকাশের ধারায় বিশেষভাবে স্মরণীয়, কেননা এদের প্রদর্শিত পথেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কাব্যনাট্য রচনায় একটা সজীব উজ্জ্বলতা আমরা লক্ষ করি।[১]

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) একজন দেশবরেণ্য সার্থক কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও গত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি একটি কাব্যনাটক রচনা করেছিলেন। *তিনটি গোলাপ* (১৯৬৫) নামক এই কাব্যনাটকটির প্রেক্ষাপট ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের হুদায়রা নামক একটি গ্রামের অধিবাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত জীবনযাপন এবং মসজিদের ইমামের নির্ভীক সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের পটভূমিতে রচিত হয়েছে আলোচ্য কাব্যনাটক। *তিনটি গোলাপ* নাটকে ব্যবহৃত কাব্যভাষা শিল্পগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একজন প্রথিতযশা কবির কাব্যভাষায় রচিত এ-কাব্যনাট্যের নাট্যগুণ দুর্বল। কবি মূলত কিছু চরিত্রের সন্নিবেশনে একটি সরলরৈখিক কাহিনি এতে বর্ণনা করেছেন। নাট্যদ্বন্দ্ব কিংবা নাট্যিক চমক এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। চরিত্রগুলোও কাব্যনাট্যের বৈশিষ্ট্যানুসারে যথেষ্ট পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশের আর একজন স্বনামখ্যাত কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) ষাটের দশকে *ইহুদীর মেয়ে* (১৯৬২) নামক একটি কাব্যনাটক রচনা করেছিলেন। *ইহুদীর মেয়ে* কাব্যনাট্যের মূল বিষয় নরনারীর প্রেম ও ধর্মীয় প্রথার দ্বন্দ্ব। কবি এ-নাটকের কাহিনি সংগ্রহ করেছেন 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' থেকে। তবে এ নাটকের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন ষাটের দশকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের কোপানলে পড়ে কারাবাসকালে বিশ্বব্যাপী সংঘটিত নানান বৈষম্যমূলক সংবাদের চেতনাগত প্রতিক্রিয়া থেকে। তিনি বলেন :

> 'ইহুদীর মেয়ে' বইটা আকস্মিকভাবে লেখা, এমনকি, কতকটা দৈব যোগাযোগ বলা যেতে পারে, যদিও ওসবে বিশ্বাস নেই। জেলখানায় মনটা থাকে খেয়ালী ও স্পর্শকাতর; এবং খবরের কাগজ উত্তেজনার প্রধান অবলম্বন। খবরের কাগজে আমেরিকার একটি বিদ্যালয়ে বর্ণ-বিদ্বেষের বর্ণনা পড়ে যখন বিষণ্ন, তখন 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র একটি জরাজীর্ণ কপি আমার টেবিলে থাকত; মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে তার পাতা ওল্টাই। একবার

---

[১] বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮-৩২৯

জেনেসিসের একটি আখ্যানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম এ বিষয়ে শিল্পায়নের একমাত্র প্রকরণ কাব্যনাট্য।[১]

এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সালেমী রাজ্যের রাজা হামরের পুত্র সেচেম এবং উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ধনকুবের ইয়াকুব- কন্যা দিনা। তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু তাদের অবিভাবকরা জাত্যভিমান, শ্রেণিবৈষম্য ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে ভালাবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এমনকি তাদের এই ভালোবাসার সূত্রধরে দুই জাতির মধ্যে লেগে যায় তুমুল যুদ্ধ। আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রকৃতপক্ষে সালেম-দিনার প্রেমাবেগ ও তার করুণ পরিণতির মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের, বিশেষত আমেরিকায় সংঘটিত যাবতীয় বর্ণবৈষম্য, শ্রেণিবৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন। নাটকের অভ্যন্তরে নাট্যকারের মূল সে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে দিনার ভাই রুবেন নামক চরিত্রের মুখনিঃসৃত সংলাপের মাধ্যমে :

বর্ণে বর্ণে ইতর–বিশেষ, জাতি-জাতি গোত্রে গোত্রে
আকৃতি অশেষ; তবু মানতেই হবে যদি যুক্তি
মূল্যবান, এ কেবল বাইরের রূপ, তার মানে
আমরা সবাই এক আদমের বীজ, সুনিশ্চিত
একই অস্থির রজ্জুতে আবদ্ধ স্বর্গভ্রষ্ট জীব। (*ইহুদীর মেয়ে*)[২]

আলোচ্য নাটকে কাহিনির প্রবাহ তৈরিতে ও নাট্যগ্রন্থি উন্মোচনে উপযুক্ত দক্ষতা দেখিয়েছেন নাট্যকার। এছাড়াও অত্যন্ত আকর্ষণীয় নাট্যমুহূর্তসৃষ্টি ও নিপুণ সংলাপনির্মাণে *ইহুদীর মেয়ে* নাটকটি বাংলা সাহিত্যে একটি সার্থক কাব্যনাটক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা কাব্যনাট্যের শৈল্পিক রূপায়ণে সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) অনন্যসাধারণ ও অবিকল্প নির্মাণশিল্পী। কবিতা ও কথাসাহিত্যের মতোই অনুবাদ-নাটক, বিশেষত আঞ্চলিক ভাষায় বাস্তবগন্ধী কাব্যনাটক সৃজনে তাঁর আগ্রহ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। তাঁর কাব্যনাটকসমূহের অবয়বে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস, নিজস্ব সমৃদ্ধ লোকঐতিহ্য, সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতি আর জাতিগত অপার সম্ভাবনার প্রতিচিত্র। ফলত তাঁর কাব্যনাট্য হয়ে উঠেছে বাঙালির শক্তি-সাহস, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, সংগ্রাম-সংক্ষোভ আর উজ্জীবনের অসামান্য রূপকল্প।

---

[১] আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ইহুদীর মেয়ে', *শ্রেষ্ঠ নাটক*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

সৈয়দ শামসুল হক কেবল বাংলাদেশের বহুমাত্রিক লেখকদের একজন নন, বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্ধারিত। শব্দ ও বাক্যের সুমিত প্রয়োগে, মিথ-পুরাণের যুগোপযোগী উপস্থাপনায়, ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণে এবং বাঙালি জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক উৎসানুসন্ধানে তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস ও নিরীক্ষাধর্মী। তাঁর রচনায় আবহমান বাঙালির পরিচয় যেমন সমুদ্ভাসিত হয়েছে, ঠিক তেমনি তাদের ব্যর্থতা ও গৌরবিত অর্জনগুলোও অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ভাষারূপ পেয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের এই বিরল প্রতিভা এবং অর্জন নিয়ে নাট্যব্যাক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার মন্তব্য করেছেন নিম্নরূপ :

> গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-চিত্রনাট্য-গান, যেখানেই তিনি বিচরণ করেছেন, সেখানেই তাঁর সৃষ্টিশীল মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। শুরু করেছিলেন গল্প দিয়ে, সর্বাধিক পরিচিতি পেলেন কবি হিসেবে, জনপ্রিয় হলেন নাট্যকার হিসেবে। মাত্র ৩১ বছর বয়সে পেয়েছিলেন প্রথম স্বীকৃতি ছোটগল্পের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আর ২০০০ সালে পেলেন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কার। ১৯৮৪তেই পেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় একুশে পদক। অগণিত পুরস্কার আর সম্মাননার চেয়ে বড়ো পুরস্কার ছিল মানুষের ভালোবাসা – যার প্রমাণ মিলেছে তাঁর শবদেহকে ঘিরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আর কুড়িগ্রামে গুণগ্রাহী মানুষের বিপুল সমাগমে।[১]

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হকের হাত ধরেই বাংলা কাব্যনাট্যের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার তাঁর এক লেখনীতে বলেন :

> ৭১ পরবর্তী সময়ে সৈয়দ শামসুল হক যখন নাটক লিখতে শুরু করেন, তখন তিনি কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিলেতে বসে তিনি রচনা করলেন তাঁর প্রথম নাটক ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাট্য। বিষয় বাদ দিয়েও ফর্মের দিক দিয়ে তিনি আমাদের নাট্যাঙ্গনে পথিকৃৎের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মনে করেন কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের মানুষের সাথে যোগাযোগ খুব সহজ হয়, কারণ কবিতা আমাদের মাটির কাছাকাছি। তার মত নিয়ে মতান্তর হতে পারে, কিন্তু কাব্যনাট্যকে তিনি আমাদের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২]

সৈয়দ শামসুল হক মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৯৫১ সালে ফজলে লোহানী সম্পাদিত *অগত্যা* পত্রিকায় ‘উদয়াস্ত’ নামক গল্পরচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তিনি একাদিক্রমে লিখেছেন উপন্যাস,

---

[১] রামেন্দ্র মজুমদার, ‘জীবন এত ছোট কেনে?’, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৪

[২] রামেন্দু মজুমদার, ‘বাংলাদেশের নাটক : ১৯৭২-৮৬’, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

কবিতা, চলচ্চিত্রের কাহিনি ও সংগীত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি প্রবেশ করেছেন অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে; চল্লিশের কোঠায় পা দিয়ে। তাঁর পরিণত শিল্পমান ও রুচির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে কাব্যনাটকে। হয়তো এজন্যে প্রথম পর্যায়ে রচিত তাঁর অন্যান্য উপন্যাস, ছোটগল্প কিংবা কবিতার শিল্পমান নিয়ে সমালোচকগণ বিরূপ মন্তব্য করলেও[১] কাব্যনাটক নিয়ে প্রায় সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

বস্তুত, বাংলাদেশের সাহিত্যে সাহিত্যাঙ্গিক হিসেবে নাটক বরাবরই ছিল অনেকটাই উপেক্ষিত। এ কারণে উচ্চমানসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকগণ নাটকের প্রতি অনেকটাই অনাগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। উপরন্তু নাট্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মঞ্চের প্রয়োজনে ফরমায়েশি নাটক রচনার দায়িত্ব পালন করায় নাটক হারিয়ে ফেলেছে তার শিল্পগুণ। এসময়ে বাংলাদেশের নাটককে শিল্পগুণমানসমৃদ্ধ সাহিত্যের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সৈয়দ শামসুল হক পালন করেছেন অগ্রগণ্য ভূমিকা। মূলত, সমগ্র কাব্যনাট্যের ইতিহাস বিচারে বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক লেখকই কাব্যনাটক রচনা করেছেন। কিন্তু যাঁরাই লিখেছেন তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, সামাজিক রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক নানান ঘটনা পরম্পরা ; যার মধ্যদিয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে গণচেতনার স্বরূপ। আর সৈয়দ শামসুল হক এ ধারায় প্রধান ব্যক্তিত্ব। নাটক রচনা সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হকের নিজস্ব ভাবনা ছিলো নিম্নরূপ :

> ভাষার মাধ্যমে নাটক আমার সর্বশেষের সংসার; অথচ এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই নাটকের মাধ্যমে আমি তৈরী হয়ে উঠেছিলাম সেই ছোটবেলায় বালকের বিস্ময় নিয়ে লেখা ভোরের শেফালীফুল আর দেয়ালে ঝোলানো বিবর্ণ দুটি পদ্য রচনারও বহু আগে।[২]

তিনি আরও বলেন, ‘অনেকদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে এই বর্তমানে বাংলা ভাষায়, খণ্ড কবিতার সব সম্ভাবনা আপাতত আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি, এখন একে কিছুদিনের জন্য পাশে রেখে অন্যদিকে মুখ ফেরানো প্রয়োজন – হতে পারে মহাকাব্য, কথাকাব্য কিংবা কাব্যনাট্য।’[১]

---

[১] সৈয়দ হকের *খেলারাম খেলে যা* উপন্যাসটিকে ‘অপন্যাস’ বলে মন্তব্য করেছিলেন হুমায়ুন আজাদ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন : ‘সৈয়দ হকের অনেক উপন্যাস মূলত পর্নোগ্রাফি। মুক্তিযুদ্ধের যে-উপন্যাসগুলো তিনি লিখেছেন সেগুলোকেও তিনি ধর্ষণের উপাখ্যানে পরিণত করেছেন। তাঁর লেখা *খেলারাম খেলে যা* নামের যৌন অপন্যাসটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মেয়েকে বার বার ভোগ করা হয়েছে। তিনি একজন ভালো পর্নোঅপন্যাসিক। তাঁর *দূরত্ব* উপন্যাসে কলাভবনের ছাদে ‘রাজা’ পাওয়া যায় বলে উল্লেখ আছে।’ (দ্রষ্টব্য : সরকার আমিন গৃহীত সাক্ষাৎকার, *বিশ্বদর্পণ*, ঢাকা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৯)

[২] সৈয়দ শামসুল হক, ‘ভূমিকা’, *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯১,

কাব্যনাট্য সৃজনের পশ্চাতে উদ্দীপক হিসেবে অনেক সমালোচক-বোদ্ধা *বিবিসি*র চাকুরিসসূত্রে তাঁর দীর্ঘ লন্ডনবাসী জীবন, লন্ডনের নাট্যমঞ্চে সরাসরি বিভিন্ন নিরীক্ষামূলক মঞ্চনাটক প্রত্যক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা, এবং সেইসূত্রে উইলিয়াম শেকস্‌পিয়র, টি এস এলিয়ট প্রমুখ পাশ্চাত্য নাট্যব্যক্তিত্বের রচনার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ শামসুল হককে হয়তো শেকসপিয়রের নাটকের বিষয়াবলি উদ্দীপ্ত করেছে, আবার তাত্ত্বিক দিক দিয়ে হয়তো তিনি এলিয়টের অনুসারী, কিন্তু বিষয় নির্বাচনে তিনি সাগ্রহে বেছে নিয়েছেন এদেশের মাটি-মানুষ, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাবলিকে। কেননা, তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন কাব্যনাট্যের বীজ অনেক পূর্বথেকেই এদেশের সাহিত্যের মজ্জায় গ্রন্থিত ছিলো; তা মধ্যযুগের গীতিকাব্যেই হোক, কিংবা শ্রমজীবী মানুষের মুখের গাঁথা অথবা ছড়ায় হোক। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> আমাদের মাটির নাট্যবুদ্ধিতে কাব্য এবং সংগীতই হচ্ছে নাটকের স্বাভাবিক আশ্রয়; আরো লক্ষ্য করি, আমাদের শ্রমজীবী মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে এক ধরনের কবিতাশ্রয়ী উপমা, চিত্রকল্প, রূপকল্প উচ্চারণ করা [...] ময়মনসিংহ গীতিকা, যা বহুদিন থেকেই আমি নাটকের পাণ্ডুলিপি বলে সনাক্ত করে এসেছি।[২]

সৈয়দ শামসুল হক নিজেই বিভিন্ন রচনায় ও সাক্ষাৎকারে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বেশকিছু কাব্যনাটকের বিষয় নির্বাচনে শেকস্‌পিয়র তাঁকে অলক্ষ্যে প্রভাবিত করেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্যনাটক রচনার ভাবনা কাব্যনাটকের জনক টি এস এলিয়টের প্রভাবজাত। এক লেখনীতে তিনি এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> কাব্যনাট্যই শেষ পর্যন্ত আমার করোটিতে জয়ী হয়; টি. এস. এলিয়টের কাব্যনাট্যভাবনা আমাকে ক্রয় করে; [...] একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পঠিত ধ্রুপদী গ্রীক নাটক আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে; শেকস্‌পীয়র, যাঁর নাটকের কথা বাবা অক্লান্তভাবে বলে যেতেন একদা, আমাকে এক তীব্র আলোকসম্পাতের ভেতর দাঁড় করিয়ে রাখে; এই অবস্থায় আমি, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, বিদেশ থেকে ছুটিতে দেশে ফিরে, ঢাকার প্রবল নাট্যতরঙ্গে ভেসে যাই এবং ফিরে গিয়ে রচনা করি 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' – এক সংকীর্ণ ঘরে,

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

টেবিলের অভাবে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে হাঁটুর ওপর খাতা রেখে, অফিস যাতায়াতের পথে পাতাল রেলে মনে মনে; এই রচনাটি শেষ করে উঠবার পরে মনে হয়, দীর্ঘদিন থেকে এরই জন্যে তো আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম।[১]

বস্তুত আধুনিক বিশ্বকাব্যসাহিত্যে, বিশেষত কাব্যনাট্যসাহিত্যে ইংরেজ কবি টি এস এলিয়টের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমকালে তো বটেই, পরবর্তী শতকগুলোতেও বিশ্বের অনেক দেশের স্বনামখ্যাত কবিদের কবিতায় এলিয়টের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার বিখ্যাত *The Washington* পত্রিকার একটি বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এলিয়টের ব্যাপক-বিস্তৃত এই প্রভাব সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয় :

> Eliot is not only a perfect English poet. He is at the same time poet whose voice had become the voice of Europe in the heart of its past.[২]

'আধুনিক কাব্যচিন্তা ও এর বিকাশে এলিয়টের প্রভাব এতোটা সূক্ষ্ম, সাবলীল; এতোটা ব্যাপক ও গভীর যে তাঁকে বাদ দিয়ে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই অর্থবহ হয় না।'[৩] কাব্যনাট্য রচনায় শামসুল হক এলিয়টের অনুসারী হলেও তাঁর নাটকে নিজস্ব কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বরং এলিয়টের কাব্যনাট্যভাবনার তুলনায় অনেকক্ষেত্রে তিনি স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। দু-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এলিয়ট কবিতার ভাষাকে যখন নাটকের সংলাপে ব্যবহার করবেন বলে ভেবেছেন, তখন থেকেই তিনি নানান আঙ্গিকের রচনায় কবিতার ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এমনকি *দ্য রক* (১৯৩৪) নামক একটি খণ্ডনাটক রচনা করে তিনি এতদ্বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আবার, এলিয়টের অধিকাংশ কাব্যনাট্যের বিষয় পুরাণাশ্রিত কিংবা ধর্মীয় অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ। সৈয়দ শামসুল হক এসবের ধারেকাছেও বিচরণ করেননি। তিনি কোনো স্বল্পাঙ্গিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা না চালিয়ে কবিতার ভাষাকে ব্যবহার করে সরাসরি *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাট্য রচনা করেন্। এর বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন বাঙালির মুক্তির গৌরবময় বাস্তব ইতিহাসকে।

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যে দেশাত্মবোধ, বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে। তিনি অবশ্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কেননা ১৯৭১-৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, 'ভূমিকা', *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১০

[২] 'European literary seene, A report Saturday Saturday Review', *Washington*, March 20, 1965, p.25 (দ্রষ্টব্য : মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩১)

[৩] সিদ্দিকুর রহমান, *স্মৃতি সত্তার আলোকে টি. এস.এলিয়ট*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ২

পর্যন্ত তিনি লন্ডনে বিবিসি বাংলা বিভাগে অনুষ্ঠান প্রযোজক ও সংবাদ-পাঠক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ ছিল তাঁর সহজাত প্রবণতা। ভাষা আন্দোলনসৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তিনি লালন করেছেন তাঁর অন্তর্সত্তায়। তিনি হয়তো রণাঙ্গণের যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু কলমকে হাতিয়ার বানিয়ে নিয়ত যুদ্ধ করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, এবং প্রয়াস পেয়েছেন বাঙালিচিত্তে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্ফুরণের। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ঐতিহাসিক *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনে তাঁর ভাষা আন্দোলনবিষয়ক কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *তাস*-এর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'সম্রাট'; যেটি রচিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাকপর্যায়ে বিশেষত ৬৯ ও ৭০-এর উত্তেজনামুখর সময়খণ্ডে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলা একাডেমির অমর একুশে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের ভয়াল কালরাতের পূর্বেই দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রতিবাদী কবিতা *পহেলা মার্চ* ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বিবিসি বেতারে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সংবাদ পাঠ করে এবং বিদেশের মাটিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমতগঠনে ভূমিকা নিয়েছেন তিনি; এমনকি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বিবিসি রেডিও থেকে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার খবরটি তিনিই পাঠ করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে নবগঠিত বাংলাদেশের শিল্পসংস্কৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের চেতনা ছড়িয়ে দিতে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯২-এ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে রাজাকারদের বিচারের দাবিতে গঠিত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।

বহুমাত্রিক সৃজনশীলতার বিচারে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই ঘটেছে তাঁর স্পর্ধিত বিচরণ। প্রায় একাশি বৎসরের আয়ুষ্কালে কবিতা-উপন্যাস-নাটক-ছোটগল্প-প্রবন্ধ ও জীবনীগ্রন্থ মিলিয়ে প্রায় শ-খানেক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। এগুলোর মধ্যে ৩৫টি উপন্যাস, ২০টি কাব্যগ্রন্থ এবং মৌলিক ও অনুবাদ নাটক মিলিয়ে ১৪টির মতো নাটক রয়েছে। তাঁর কাব্যনাটকের সংখ্যা ১০টি – *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *এখানে এখন* (১৯৮১), *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২), *ঈর্ষা* (১৯৯০), *নারীগণ* (২০০৫), *চম্পাবতী* (২০০৮), *অপেক্ষমাণ* (২০০৯), *উত্তরবংশ* (২০০৮), *মরা ময়ূর (২০১৪)*। এসব কাব্যনাট্যে উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর সৃজনী প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এগুলো তিনি জীবিতাবস্থায় সম্পাদনা করে একই গ্রন্থভুক্ত করে প্রকাশ করেছিলেন।

গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন *সৈয়দ শামসুল হক : কাব্যনাট্যসমগ্র*। প্রকাশক : চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৬।

সৈয়দ শামসুল হকের সমকালে যেসব কবি-নাট্যকার কাব্যনাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), সাজেদুল আউয়াল (জ.১৯৫৮), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১) বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যদিও সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যের সংখ্যার তুলনায় এদেঁর রচনা সংখ্যাগত দিক দিয়ে সীমিত, তদুপরি শিল্পমানবিচারে একেবারে অনুল্লেখ্য নয়।

কবিতা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়েই কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) কাব্যনাটক রচনায় উৎসাহবোধ করেন। বস্তুত ‘আমরা আব্দুল মান্নান সৈয়দকে সৈয়দ হকের প্রতিদ্বন্দ্বী কাব্যনাট্যকার হিসেবে দাঁড় করাতে চাই না। তবে মান্নান সৈয়দকে কাব্যনাট্যকার হিসেবে শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন বোধ করি।’[১] তিনি *বিশ্বাসের তরু* (১৯৬৯), *জ্যোৎস্না-রোদ্রের চিকিৎসা* (১৯৬৯), *ঢাকা* (১৯৮৫), *কবি ও অন্যেরা* (১৯৯৬), *আটতলার ওপরে* (১৯৯৭) প্রভৃতি কাব্যনাটক রচনা করেছেন।

ষাটের দশকের অনন্য কবিপ্রতিভা আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) *ওরা কয়েকজন* (১৯৭৫) নামক একটি কাব্যনাটক রচনা করেছেন। *ওরা কয়েক জন* কাব্যনাট্যের স্থান একটি জনবহুল রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুম। আর এখানে অপেক্ষারত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষই এ নাটকের চরিত্র। মূলত এসব চরিত্রের মনোকথন, অন্তর্গত সত্তার রহস্য উন্মোচন লেখকের মৌল উদ্দেশ্য। সে-বিচারে এটি কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করলেও এতে উল্লেখযোগ্য নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছেন হাসান। তবুও আবুল হাসানের *ওরা কয়েকজন* কাব্যনাটক বাংলাদেশের কাব্যনাটকের ধারায় অনন্য সংযোজন।

অপরদিকে, কবি-নাট্যকর্মী সাজেদুল আউয়াল ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিতাস পারের মালোসম্প্রদ্রায়ের কর্মবৈচিত্র্যময় জীবন, সুখ-দুঃখ-হাসিকান্নার নির্মম বাস্তবতাকে উপজীব্য করে রচনা করেছেন তাঁর কাব্যনাটক *ফণিমনসা* (১৯৮৫)। সাজেদুল আউয়াল নিজে ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের সক্রিয় নাট্যকর্মী। একারণে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এই কাব্যনাটকের ক্যানভাসে বাংলার চিরাচরিত ইতিহাস, ঐতিহ্যকে অনায়াসেই ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

[১] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, প্রাগুক্ত

স্বল্পায়ু তরুণ কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কাব্যনাট্য *বিষ বিরিক্ষের বীজ* (১৯৯২)। এর বিষয়বস্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তরকাল। স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার আক্কেল মোড়লের যাপিত জীবনাচরণের মাধ্যমে রুদ্র সমকালীনবাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার এক নির্মম ছবি এ-নাটকে অঙ্কন করেছেন। গণআদালত পর্ব, বীরাঙ্গনা পর্ব, শুঁড়িখানা পর্ব, অস্ত্রসমর্পণ পর্ব, ক্যাম্প পর্ব, গর্ভপাত পর্ব ও ক্ষমা পর্ব – এই সাতটি পর্বের মাধ্যমে উপস্থাপিত এ-কাব্যনাট্যে কবি ও নাট্যকার হিসেবে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ নিজের আলোকিত একটি অবস্থান তৈরিতে যে সক্ষম হয়েছেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ইতিহাস কালধর্মের বিচারে দীর্ঘ নয়। ‘মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যেমন জন্ম, এদেশের সত্যিকার নাটকের জন্মও স্বাধীন বাংলাদেশে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে মঞ্চ নাটকের নবযুগ সূচিত হলো।’[১] অতঃপর প্রতিভাবান কবি-নাট্যকারদের মিলিত প্রয়াসে রচিত হতে শুরু করল বিচিত্র বিষয়বাহিত কাব্যনাট্য। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের কাব্যনাট্যের ধারায় পথিকৃতের মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব সৈয়দ শামসুল হক।

---

[১] আতাউর রহমান, ‘সাম্প্রতিক নাটকে প্রতিবাদী চেতনা’ *থিয়েটার*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ঢাকা, ১৮ তম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ.১৪০-১৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৈয়দ শামসুল হকের ইতিহাস-আশ্রিত কাব্যনাটক

একজন ইতিহাস-মনস্ক লেখক হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকের প্রতিটি কাব্যনাটকে বাঙালি জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। কোনো কোনো কাব্যনাটকে ইতিহাসকে প্রেক্ষাপটে রেখে তিনি বাংলার সাধারণ জনগণের যাপিত জীবনের চিত্র, আর্থ-সামাজিক সংকট, মানস-দ্বন্দ্ব, শ্রেণি-বৈষম্যের স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। আবার কোনো কোনো কাব্যনাটকে সমাজ ও রাজনীতি প্রধান উপজীব্য হলেও সেখানে ইতিহাসের ঘটনাংশ কার্যকারণসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসকে প্রধান অবলম্বন করে তিনি মূলত তিনটি কাব্যনাটক রচনা করেছেন। এগুলি হলো – *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *নূরলদীনের সারাজীবন* এবং *নারীগণ*। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকটিতে লেখকের অন্বিষ্ট ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে প্রেক্ষাপটে রেখে গ্রাম বাংলার সাধারণ জনগণের মানস-সংকট উপস্থাপন। *নূরলদীনের সারাজীবনে* তিনি অবলম্বন করেছেন কৃষকবিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। অপরদিকে *নারীগণ* নাটকটিতে তিনি পলাশির ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রাজমহলের নারীদের জীবনাচার, রাজনৈতিক সংকট ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। নিম্নে এ নাটকগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

সৈয়দ শামসুল হক রচিত প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (রচনাকাল : ১৯৭৫) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মঞ্চনাট্যের ইতিহাসে সর্বাধিকবার অভিনীত জনপ্রিয় মঞ্চনাটক; এবং ‘আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর

এ যাবৎ রচিত সবচেয়ে সার্থক নাট্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত।'[১] নন্দিত নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুনের (১৯৪২-২০০৮) কুশলী নির্দেশনায়, *থিয়েটার* নাট্যগোষ্ঠীর নান্দনিক উপস্থাপনায় বাংলাদেশের মঞ্চে এ-নাটকটি অভিনীত হয়েছে শতাধিকবার।[২] বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাটক হিসেবে এটিই প্রথম। বলাবাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বাঙালির চিরন্তন যে আবেগ ও ভালোবাসা জড়িত, নাট্যকার সে আবেগকে আঞ্চলিক শব্দ ও ছন্দে উপস্থাপন করে নাটকটিকে দর্শকের মমত্বের আরো গভীরে নিয়ে গেছেন।[৩] অন্যদিকে ঢাকার মঞ্চে ঠিকঠাক অভিনয়যোগ্য নাট্যরচনার আকালের মৌসুমে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া* যায়-এর মতো শিল্পিত ও আতিশয্যবর্জিত সংহত নাট্যপ্রাপ্তি ছিল আশীর্বাদের মতো। এ প্রসঙ্গে *নাটকটির* প্রথম প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান *থিয়েটার* নাট্যগোষ্ঠীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এক. আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিয়ে রচিত একটি সার্থক নাটক প্রযোজনা করার বাসনা আমাদের দীর্ঘদিনের। আমাদের কাছে দর্শকদের এ ধরনের একটা প্রত্যাশা ছিল। দুই. সত্যিকার অর্থে একটি কাব্যনাটক মঞ্চস্থ করার ইচ্ছা আমাদের ছিল। তিন. আমরা চেয়েছি প্রযোজনায় দর্শকদের বৈচিত্র্যের স্বাদ উপহার দিতে।

---

[১] রামেন্দু মজুমদার, 'বাংলাদেশের মঞ্চনাটক', *শৈলী*, ইকবাল আহমেদ (সম্পা.), ঢাকা, ১ম বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১৫

[২] *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর প্রথম মঞ্চায়ন তারিখ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মোট অভিনয় সংখ্যা ১০৫। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৭-এর ১৩ আগস্টের মধ্যে এক বছরকাল অতিবাহিত না হতেই নাটকটি বাংলাদেশে প্রথম সুবর্ণজয়ন্তী অভিনয় সম্পন্ন করা নাটকের গৌরব অর্জন করতে পেরেছিল ; যা দ্বারা নাটকটির তুমুল দর্শকপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রায় বিশ হাজার দর্শক নাটকটি দেখেছেন বলে নাটকটির প্রযোজক রামেন্দু মজুমদার এক লেখনীতে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন : 'বিশ হাজার দর্শক নাটকটি দেখেছেন। এর মধ্যে মহিলা সমিতির ৪৫টি প্রদর্শনীতে গড়ে ৩০০ করে দর্শক হলে, মোট ১৩৫০০ দর্শক নাটকটি দেখেছেন। কারিগরি মিলনায়তনের ১০০০, টাঙ্গাইলে ১৫০০ এবং শিল্পকলা একাডেমিতে ২০০০ দর্শক নাটকটি দেখেছেন। মোট ২০,০০০ দর্শক। একটি নাটকের বিশ হাজার দর্শক – এ নিঃসন্দেহে আমাদের গর্বের ব্যপার।'(দ্রষ্টব্য : *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় সুবর্ণ জয়ন্তী*, *সাপ্তাহিক পূর্বাণী*, শাহাদাৎ হোসেন (সম্পা.), ঢাকা, ১৮ আগস্ট ১৯৭৭, পৃ.১০)

[৩] অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, কোনো কোনো সমালোচক আবার এ নাটকটিকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক হিসেবে স্বীকারই করে নেননি। তাঁদের মতে এ নাটকে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা নয়, বরং যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। নাট্য-গবেষক রাহমান চৌধুরী তাঁর পিএইচডি গবেষণাগ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'কাব্যে রচিত নাটকটির মধ্যে খণ্ডিতভাবে জীবনবোধের নানা চিত্র ধরা পড়লেও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে গভীর অনুভবের দেখা মেলেনি। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে রয়েছে এক নারীর বিদ্রোহ ও আত্মাহুতি দান। কিন্তু নাটকের মূল পটভূমিটিই প্রশ্নের সৃষ্টি করে। পুরো একটি গ্রামের লোক মুক্তিবাহিনীর ভয়ে মাতব্বরের বাড়িতে আশ্রয় নেয়, এটা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের কোনো বাস্তবতার চিত্র নয়। বাংলাদেশের কোথাও, কখনও গ্রামের লোকজন মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে কোনো গ্রামের মানুষ ভীতও ছিলো না। নাট্যকারের এ ধরনের বক্তব্য নির্জলা মিথ্যা, যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণেরই নামান্তর। ফলে যে নাট্যদল নাটকটি মঞ্চায়ন করেছে সে দলের সদস্যদের ইতিহাসজ্ঞান ও সমাজভাবনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।' (দ্রষ্টব্য : রাহমান চৌধুরী, *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৭, পৃ. ৩৪১-৩৪২

> আমাদের অনেক শ্রমের ফসল 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এর প্রযোজনাকে নাট্যামোদীরা যেভাবে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাতে আমরা অভিভূত হয়েছি।[১]

সৈয়দ শামসুল হকের প্রতিটি রচনায় স্বদেশ, সমাজ তথা সাম্প্রতিক কালের প্রচ্ছায়া বিদ্যমান; *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* তার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মূলত 'কাব্যনাট্যে সামাজিক রাষ্ট্রীয় সমস্যা যুক্ত করা সহজ নয়। কারণ, কবিতার কাঠামোতে তা প্রকাশ করা কষ্টকর। সৈয়দ শামসুল হক সেটা করতে পেরেছেন।'[২] জনৈক সমালোচক নাটকটিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন :

> মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে সবচেয়ে সার্থক ও মঞ্চসফল নাটক লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬) শীর্ষক কাব্যনাটক। [...] কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে রচিত এই নাটক আঞ্চলিক শব্দের নিপুণ ব্যবহারে যুদ্ধকালীন উত্তর-বাংলার জীবনকে যেন শব্দবন্দী করে ধরে রেখেছে। ভাষার গীতময়তা, আঞ্চলিক শব্দের কুশলী প্রয়োগ এবং যুদ্ধকালীন জীবনবাস্তবতার কাব্যিক উচ্চারণে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* বাংলাদেশের নাট্য-সাহিত্যে একটি পালাবদলকারী নাটক হিসেবে বিবেচিত।[৩]

বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে প্লট করে যে-কটি নাটক রচিত হয়েছে, সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। মহান মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে এতটা গভীরভাবে আর কোনো নাটক ছুঁয়ে যেতে পারেনি। নাট্যকার এখানে কাহিনির ধারাবর্ণনায় আশ্চর্য সংযম বজায় রেখে, লোকজ ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগে এবং শৈল্পিক কুশলতার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে যেন ভিন্ন ভিন্ন রঙের এক-একটি তুলির আচঁড়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন গ্রামবাংলার চিত্র এঁকেছেন কাব্যনাট্যের ক্যানভাসে। নাট্যকার সৈয়দ হক স্বয়ং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক হিসেবে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে সুনিশ্চিত ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ বিষয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :

---

[১] 'থিয়েটারের কথা-সদস্যবৃন্দ', *থিয়েটার*, রামেন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), ৮ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮০ (দ্রষ্টব্য : মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫২)

[২] মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, পৃ.১৬০

[৩] বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য : মুক্তিযুদ্ধের বর্ণমালা', *প্রসঙ্গ নাট্য এবং*, নিলুফার বানু (সম্পা.), যৌথ প্রকাশনা : *থিয়েটার* ও বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ, ১৪৩

আমি জানি যে, এ নাটক এই বাঙালিদেরকে একশো দুশো বছর পরেও পড়তে হবে। যেখানে একশো একান্নটা নাটক লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর বা তারও বেশি। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করলে তুমি প্রথমেই 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের কথা বলবে।[১]

তবে কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে নির্বাচন করলেও নাটকের প্লট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক কাহিনি বর্ণনা করা তাঁর মৌল উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, এখানে নেই কোনো যুদ্ধের বাস্তবিক চিত্র বা রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা ; বরং যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাজধানী থেকে বহুদূরে শান্ত এক নিরিবিলি গ্রামের সাধারণ কিছু মানুষের একান্ত অনুভূতি, মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে তাদের অন্তর্ভাবনা, বিবেকের তাড়না, ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব, সংকট উপস্থাপিত হয়েছে। সেই সঙ্গে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এদেশের স্বাধীনতাবিরোধীদের ভূমিকা, ধর্মান্ধতা এখানে সুস্পষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তবে মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এখানে নেপথ্যেই রয়ে গেছে। সাধারণ গ্রামবাসীর সংলাপে মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা এবং হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। হতে পারে, কাব্যনাট্যের আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেই নাট্যকার এমনটা করেছেন। কেননা, কাব্যনাট্যের মৌলপ্রবণতাই হলো সেখানে কোনো ধারাবাহিক কাহিনি বর্ণিত হয় না; বরং একটি কাহিনিকে কেন্দ্র করে বিচিত্র চরিত্রের ভাবনাপ্রবাহ চলমান থাকে। সে-বিচারে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*কে সফল কাব্যনাটক বলা যায়।

আলোচ্য নাটকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নেপথ্যে ব্যবহার করার কারণ প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন – 'এদেশের আট কোটি লোক মুক্তিযুদ্ধ নেপথ্যেই দেখেছে।'[২] অর্থাৎ 'মুক্তিযুদ্ধ নয়, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি, অবস্থান ইত্যাদিই নাটকের মুখ্য বিষয়। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের নিজস্ব সত্তার প্রতিচ্ছবি, তবু এর বিপক্ষে যায় একদল মানুষ, তারা এদেশে জন্মায়, তাদের উত্তরাধিকার থেকে যায় এদেশে। নাট্যকার সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে পীর যখন বলে, '*দাগ, একটা দাগ রাইখা যায়*, তখন আমরা বুঝতে পারি নাট্যকার আমাদেরকে তাঁর মূল প্রবণতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন।'[৩] তাই বলা যায়, মুক্তিসংগ্রামের কাহিনি বর্ণনা নয়, ১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, সাক্ষাৎকার : 'সৈয়দ শামসুল হকের মুখোমুখি', *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ*, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৯৭

[২] *সাপ্তাহিক রোববার*, ৩য় বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা, রবিবার, ২২শে মার্চ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২৩

[৩] মোস্তফা তারিকুল আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় গ্রামীণ সাধারণ মানুষের অর্ন্তগত মনোভাব ব্যক্ত করাই এ নাট্যরচনার মৌল উদ্দেশ্য।

বস্তুত, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ১৯৭১ সালের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর পূর্বে ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনতিকাল পরেই কার্যত এদেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির চিরন্তন স্বপ্ন ও দাবি ক্রমশ নিষ্প্রভ হতে থাকে। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখে গেছেন : 'পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল।'[১] এসময় আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের নীতি নির্ধারণে একগুঁয়ে মানসিকতা, ধর্মান্ধতা, অগণতান্ত্রিক আচার-আচরণ, জন-বিচ্ছিন্নতা, সর্বোপরি দমনপীড়নমূলক নীতি সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দেয়, এবং তাদের প্রতিবাদী হতে বাধ্য করে। সাধারণ মানুষের স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনা নাট্যকারকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কারণ, 'সৈয়দ শামসুল হক একজন রাজনীতি সচেতন লেখক। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের নানামুখী অত্যাচার শোষণ ও রাজনৈতিক চক্রান্তের একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে সৈয়দ হককে বিবেচনা করা যায়। কারণ তাঁর সাহিত্যে সে সময়কার সামগ্রিক জীবনাচরণ লক্ষ করা যায়।'[২]

আবার, '১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্টের পর থেকে এদেশে শাসকশ্রেণী ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা অনর্গল বলে এসেছেন। শুধু তাই নয়, তারা দাবী করে এসেছেন যে তারাই ইসলামের সত্যিকার পাবন্দ এবং অন্যেরা পাকিস্তান ও ইসলামের দুষমণ।'[৩] তাদের এই ঘৃণ্য মানসিকতার বাস্তব প্রয়োগ স্পষ্ট হয়েছে তাদের দেশ শাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদেরই আপন করে নিয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে, যারা এই মতবাদ বিশ্বাস করে প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে তাদের যথার্থ দোসর হয়ে উঠতে পেরেছিল। আলোচ্য নাটকের মাতবর চরিত্রটি মূলত শাসকগোষ্ঠীকর্তৃক সুবিধাভোগী জনসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অথচ তাকেও শেষপর্যন্ত হানাদার বাহিনী দ্বারা প্রতারিত ও নির্যাতিত হতে হয়েছে; প্রাণপ্রিয় আত্মজাকে তুলে দিতে হয়েছে লম্পট পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের ভোগের সামগ্রীরূপে। এক্ষেত্রে হয়তো সাময়িক আত্মপ্রশান্তির নিমিত্তে সে সংক্ষিপ্ত বিবাহের নাটক সাজিয়েছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার হৃদয়

[১] শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭৫

[২] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৮৩

[৩] বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৯

অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, কেননা সে নিজেও জানে এটি প্রকৃত অর্থে বিয়ে নয়, বরং ধর্ষক কর্তৃক নারী সম্ভোগের নাটকমাত্র। প্রকৃতপক্ষে শোষকের কোনো আপন পর নেই; সে স্বীয়স্বার্থ বিবেচনায় রেখেই প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলে। আলোচ্য নাটকে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন চরিত্রটি এই সামরিক শোষকগোষ্ঠীর প্রতীক।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশীয় কিছু ভণ্ডপীর, বকধার্মিক মোল্লা-মোড়লদের আশ্রয় করে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমান জনসাধারণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, মুক্তিবাহিনী এদেশের কল্যাণের জন্য, সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য প্রধান প্রতিবন্ধক।[১] সাধারণ মানুষ যেন মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় না দিয়ে দেখামাত্র তাদের প্রতিহত করে। সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে ১৯৭১ সালের এই অপরাজনীতি, শোষণ-শাসনের ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন গ্রামবাসীর সংলাপের মাধ্যমে। এখানে মাতবরকে উদ্দেশ্য করে সাধারণ গ্রামবাসী জানাচ্ছে – নিজেদের মঙ্গলের জন্যে, দেশের উন্নতিকল্পে তারা মাতবরের কথামতো মুক্তিবাহিনীকে প্রতিহত করে গেছে :

আপনার হুকুমমতো এই সারা সতেরো গেরামে
কোনোদিন কোনো ব্যাটা মুক্তিবাহিনীর নামে
আসলেই খেদায়া দিছি যেমন ভিটায়
খা-খা কাক ডাকলে দুপুর বেলায়
লাঠি হাতে বৌ-ঝি খেদায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১)[২]

এই শাসকগোষ্ঠী সাধারণ গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ছলে-বলে-কৌশলে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে। ধর্মপ্রাণ, সরলমনা জনগণ ধর্মের ও কল্যাণের কথা ভেবে তাই করেছে। একদিকে ধর্মীয়

---

[১] মুক্তিযুদ্ধের সময় পিরোজপুর নেছারাবাদ উপজেলার ছারছিনা পীরের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এসময়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মিথ্যা কটূক্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করেন। এমনকি তার দরবার শরিফে একাধারে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প ও নির্যাতন শিবির প্রতিষ্ঠা করে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের নির্যাতনে প্রত্যক্ষ মদদ দেন তিনি। এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় তৎকালীন নেছারাবাদ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার জাহিদ হোসেনের এক বক্তব্যে। তিনি এই পীরের নিন্দনীয় ভূমিকা সম্পর্কে বলেন : 'ছারছিনা পীরের বাড়িতে রাজাকারের ক্যাম্প ছিল। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হতো। একাত্তরের ২২ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা ছারছিনা পীরের বাড়ি আক্রমণ করেন। ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে রাজাকারদের যুদ্ধ হয়। ২৬ নভেম্বর রাজাকারদের গুলিতে বরিশালের বানরীপাড়া উপজেলার গাজী মতিউর রহমান এবং ইপিআর সদস্য কাউখালী উপজেলার আনসার আলী শহীদ হন। [...] মুক্তিযুদ্ধের সময় ছারছিনার তৎকালীন পীর শাহ আবু জাফর মো. সালেহ পাকিস্তান সরকারের পক্ষ নেন। স্বাধীনতার পর তিনি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে কারাবরণ করেন।' (দ্রষ্টব্য : 'ছারছিনার পীর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন', *দৈনিক প্রথম আলো*, (অনলাইন সংস্করণ), ২৭ মার্চ, ২০১৭)

[২] আলোচ্য নাটকের সকল সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছে- *কাব্যনাট্যসমগ্র*, সৈয়দ শামসুল হক, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, গ্রন্থ থেকে।

অনুশাসন, অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর ভয়ে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সরলপ্রাণ মানুষের সমর্থনের সুযোগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মম অত্যাচার করে হত্যা করেছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কারবালার মরু-প্রান্তরে অত্যাচারী এজিদ বাহিনীর হাতে ইমাম হোসেন ও তারঁ অসহায় পরিবারের নির্মম মৃত্যুর সঙ্গে মুক্তিকামী বাঙালির মৃত্যুকে তুলনীয় করে নাটকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর বাহিনীর নির্মম অত্যাচার, মুক্তিযোদ্ধাদের আর্তচিৎকার[১] প্রসঙ্গ আলোচ্য নাটকে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক :

আপনের হুকুম মতো খোলা রাখছি – চাইরদিকে চোখ
গেরামের মধ্যে কোনো সন্দেহজনক ঘোরাফেরা দেখলেই পাছ নিছি সাপের মতন
হুজুরে হাজিরও করছি দুই চারজন।
তার মধ্যে কারো কারো রক্ত কাল্ করা চিৎকার
শোনা গ্যাছে ।আচনক য্যান কারবালার
সিয়া-কালা বিরাট চাদর
জাপটায়ে ধরছে বাড়িঘর। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১)

কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর ধর্মছড়ি আর শাসনদণ্ডের ভয়ে ভীত সাধারণ মানুষ নিজেদের প্রবোধ দিয়েছে এই ভেবে যে, নির্যাতিত মুক্তিযোদ্ধারা হয়তো ইসলাম ধর্মের শত্রু, দেশের শত্রু। ফলত, তাদের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তারা কোনো অন্যায় করছে না। কেননা, যা হচ্ছে আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে। নাট্যকার এ প্রসঙ্গে গ্রামবাসীর মনোভাব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে :

---

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে'র অষ্টম খণ্ডে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের বেশ কিছু বিবরণ নথিবদ্ধ করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানিতে। নির্যাতিত ব্যাক্তিদের জবানবন্দীতে নির্যাতনের ভয়ঙ্করর সব বিবরণ রয়েছে। নির্যাতনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি পাকিস্তানি সামরিক কর্মকতা ও সাধারণ সৈন্যরা গ্রহণ করত তা হচ্ছে : অশ্লীল ভাষায় গালাগালি, তৎসঙ্গে চামড়া ফেটে রক্ত না বেরুনো পর্যন্ত শারীরিক প্রহার। পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, তৎসঙ্গে বেয়নেট দিয়ে খোঁচনো ও রাইফেলের বাট দিয়ে প্রহার। উলঙ্গ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা। সিগারেটের আগুন দিয়ে সারা শরীরে ছ্যাঁকা দেয়া। হাত ও পায়ের নখ ও মাথার ভেতর মোটা সুঁচ ঢুকিয়ে দেয়া। মলদ্বারের ভেতর সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া এবং বরফ খণ্ড ঢুকিয়ে দেয়া। শরীরের স্পর্শকাতর অংশে বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ প্রভৃতি।এছাড়া যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে পাকিস্তানিরা। (দ্রষ্টব্য : শাহরিয়ার কবির, ভূমিকা, *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১১)

তবু কিছু কই নাই আপনের হুকুম
আল্লাহর রশির গোড়া শক্ত কইরা
ধইরা গেছি ঘুম
পইরা থাকছি মড়ার লাহান।
তফাৎ যখন নাই জীয়ন্তে ও মড়ার সমান
জাগনা আর ঘুম একই কথা (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১)

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের নির্মম আক্রমণে পুরো বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিলো মৃত্যুকূপে। একদিকে লাশের সারি দীর্ঘ হতে থাকে, অন্যদিকে সমগ্র দেশজুড়ে দেখা দেয় তীব্র খাদ্য ও চিকিৎসা সংকট। দলে দলে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ নানাপথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশিষ্ট যারা এদেশে থেকে গেছে তাদের যুদ্ধে অবরুদ্ধ দেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকতে হয়েছে মৃত্যু আতঙ্ক কাঁধে নিয়ে; কখন আবার অত্যাচারী মিলিটারি বাহিনী রাজাকার সঙ্গে করে দরজায় কড়া নাড়ে, নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে সেই দুর্ভাবনায়। গ্রামবাসীর একটি সংলাপে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের এমনই একটি বিভীষিকাময় অবস্থার ইতিহাসের কথা সুস্পষ্ট হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ মানুষের সহজাত অস্তিত্ববাদী দর্শন, সুস্থ স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রবল আকুতি :

মাতবর সাব, বেহুদা কথায় আমাদের কাম নাই,
সহজ কথায় এই দুনিয়ায় জীবিত থাকতে চাই
পানি দিয়া চাইল দিলেও
চুলায় ভাত ফুটতে না চায়
আগরবাতির মতো মউতের ঘেরাণে গেরাম ছারা
চারিদিকে য্যান ধপধপ পড়ে শত কোদালের কোপ
কবর খোঁড়ার আওয়াজ উঠতাছে য্যান কামানের তোপ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৪)

মাতবর চরিত্রটি তবু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে সাফাই গেয়ে গেছে। কেননা তার স্বার্থবাদী মন বিশ্বাস করে 'বুদ্ধিমান নাড়ায় না ডাল যে ডালে নিজেই বসা' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪)। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বার্থরক্ষা আর নিজের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সে জনগণকে শুনিয়েছে মিথ্যে আশার বুলি :

সাধ্য নাই মুক্তিবাহিনীর

এতটুকু কানা ভাঙ্গে রূপার কলসীর। [...]

দেশের যেখানে যত গাঁও গঞ্জ বাজার বন্দর,

বন্দুক কামানে ভরা। আর মেলেটারির বহর

চোরাগোপ্তা যত জাগা জঙ্গল বডার

সবখানে আছে হুঁশিয়ার।

আরো শোনো, উড়া জাহাজের ঝাঁক ১০/২০/২৫ হাজার

চক্কর দিতাছে তারা, যদি বোমা মারে একবার

পিপড়ার মতো মারা যাবে মুক্তিবাহিনী তোমার।

আরো আছে বিনা তারে খবর দিবার

জবর ব্যবস্থা, যদি হয় দরকার

জরুরী তলব যাবে সারা দুনিয়ায় [...]

এ দেশ একা না জাইনো সাথী আছে সকল বিদাশে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯)

মাতবরের 'এ দেশ একা না জাইনো সাথী আছে সকল বিদাশে।' সংলাপটি বাস্তব ইতিহাসের নিরিখে রচিত। কেননা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে বিশ্বের সব রাষ্ট্রই যে বাংলাদেশের পাশে ছিল এমনটা নয়। বরং বিশ্বের অধিকাংশ ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের সমর্থন ছিল পাকিস্তানি সামরিক জান্তার প্রতি। বিশেষত, যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ান রাজনীতিতে রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট ভারতের উত্থান রহিত করার প্রয়োজনে প্রথম থেকেই পাকিস্তানকে সর্বতো সমর্থন দিয়ে আসছিল।[১] এমনকি ৭১ সালের শেষদিকে ভারতের মিত্রবাহিনী যখন সরাসরি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে বসে তখন পাকিস্তানিদের সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এদেশের সমুদ্রসীমায় সপ্তম নৌবহর পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়। ফলে পাকিস্তানি সরকার ও তাদের মদদপুষ্ট এদেশীয় মাতবর-মোল্লাশ্রেণি এই আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাবে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে অপকর্মে লিপ্ত হয়; নিরীহ জনগণকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

[১] ব্রিটিশ লেখক রবার্ট পেইন বোম্বাই থেকে প্রকাশিত তাঁর *The Tortured and The Damned* গ্রন্থে লিখেছেন : 'মার্চ মাসে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি সৈন্যদের সশস্ত্র অভিযান শুরু হবার পর ওখানে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হল। দশ হাজার লোককে ঘর ছাড়া করে ভারত পলায়নে বাধ্য করা হল। অথচ ভেবে অবাক হতে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র বর্বর গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করেনি। পাকিস্তান বাহিনীর নিপীড়ন নির্যাতনের খবরে দুঃখজনকভাবে নীরব দর্শক থাকলেন হোয়াইট হাউসের কর্তারা।(দ্রষ্টব্য : *পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু*, মূল লেখক রবার্ট পেইন এর গ্রন্থ থেকে ভাবানুবাদ করেন – ওবায়দুল কাদের, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১১৮)

বস্তুত, যুগে যুগে দুবর্লের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাকাঠামো কব্জা করে রাখতে চায়। তারা অবলা নারীকে অত্যাচারেও লজ্জিত কিংবা কুণ্ঠিত বোধ করে না। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত নৃশংসতম নারী নির্যাতন কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির নাৎসি বাহিনী, ইটালির ফ্যাসিস্ট বাহিনী কিংবা জাপানি সৈন্যদের নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বহু ঘটনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু একাত্তরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তার দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। আড়াই লাখেরও বেশি নারী এই সময় পাকিস্তানিদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বহু নারী আত্মহত্যা করেছেন। পাকিস্তানিরাও তাদের ধর্ষকামী প্রবৃত্তির কারণে বহু নারীকে ভয়ঙ্কর সব নির্যাতনের পর হত্যা করেছে।'[১] দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু যদিও এসব অসহায় নারীদের উপযুক্ত সম্মান দিয়ে বীরাঙ্গনা খেতাবে অভিষিক্ত করেছিলেন, কিন্তু নির্মম ও বাস্তব সত্য হলো – এ সমাজে এসব নারী কখনোই ন্যুনতম সম্মান ও সহানুভূতি অর্জন করেনি। বরং ক্যাম্পফেরত অসংখ্য মা-বোন তাদের পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেলেও তাদের কাছে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি কিংবা আশ্রয় না পেয়ে চরম হতাশায় দিনাতিপাত করেছে, কেউ কেউ বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। অনেকে আবার, আপনজনকর্তৃক অসম্মানিত হবার চেয়ে যুদ্ধফেরত পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গী হয়ে পাকিস্তান চলে গেছে; আত্মবলিদানের চেয়ে যেটি তাদের কাছে অনেকবেশি ঔচিত্যের বলে মনে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানিদের লালসার শিকার বীরাঙ্গনা নারী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী এক লেখায় এমন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন :

> শুধু সমাজ নয়, এই বীরাঙ্গনাদের পরিবারও তাঁদের গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। অস্বীকার করেছে পিতা, অস্বীকার করেছে স্বামী। সমাজ ও পরিবারের লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত থেকে বাঁচার জন্য কয়েকজন বীরাঙ্গনা বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে পাকিস্তানে চলে যাওয়া শ্রেয় মনে করেছেন, যদিও তাঁরা জানতেন সেখানে তাঁদের পরিণতি কী হবে। [২]

সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য কাব্যনাটকে মাতবরের মেয়ে চরিত্রটির মাধ্যমে বস্তুত ১৯৭১ সালের অসহায়, সম্ভ্রম হারানো লাখো বীরাঙ্গনা নারীর গোপন দুঃখ, লজ্জাকর বাস্তব সত্যটি উপস্থাপন করেছে। মাতবরের

---

[১] শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[২] ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, সাক্ষাৎকার : 'অনেক মৃত্যু দেখেছি , নারী নির্যাতনের কথা শুনেছি কিন্তু কখনো ভাবিনি আমি তার শিকার হব', শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

মেয়েটি কোনো অপরাধ না করেও বিরূপ রাষ্ট্রযন্ত্রের ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হয়েছে। তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিলো গ্রামের এক তরুণ স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে। অনাগত দিনের সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল সে। অথচ এক কালরাতে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের লোভী হাতের স্পর্শে তছনছ হয়ে গেছে তার জীবন। যুদ্ধের পুরোটা সময় সে তার রাজাকার পিতার ছত্রছায়ায় নিরাপদে থাকলেও, যুদ্ধের শেষমুহূর্তে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন আসন্ন পরাজয় সুনিশ্চিত জেনে, এতদিনকার অন্যায় কাজের দোসর মাতবরের মেয়েকেই পাশবিক উল্লাসে সম্ভোগ করে স্বীয় ধর্ষকামী চিত্তের স্পৃহা চরিতার্থ করেছে। মাতবর যে পাকিস্তানিদের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, প্রকৃতির কি এক অমোঘ নিয়মে সেই পাকিস্তানি বাহিনী তার সঙ্গেও করেছে নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা। মাতবরের মেয়েটি ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছে যে, এতদিন এই সমাজে তার কদর থাকলেও ধর্ষিত হওয়ার পর সমাজে আর তার গ্রহণযোগ্যতা, সম্মান কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই এক দিকে সম্ভ্রম হারানোর ক্ষোভ-দুঃখ-যন্ত্রণায়, অন্যদিকে অনাগত অন্ধকার জীবনের শঙ্কায় জনসম্মুখে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হারানো নিয়ে তার এই শঙ্কা ও ভীতি যে অমূলক ছিল না, সেটি অচিরেই প্রকাশ পেয়েছে নাটকের পাইক চরিত্রটির একটি সংলাপে। মেয়েটি ধর্ষিত হয়েছে জেনে তার সম্পর্কে সে যে উক্তি করেছে তা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে :

> কে চায় নিজের ঘরে নষ্ট মেয়ে, নিজের গেরামে
> কে চায় কলঙ্ক দিতে, সমস্ত সতীর নামে [...]
> শোনেন এখনো যদি খোলা থাকে কান
> কুল নষ্ট মেয়েছেলে কুত্তাচাটা থালার সমান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬)

বস্তুত, পাইক চরিত্রের এই উক্তি অশোভন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটিই মুক্তিযুদ্ধ কিংবা তার পরবর্তীকালের বাঙালি সমাজের বাস্তবসত্য।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে গ্রামবাসীর সংলাপে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পিছু হটিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের খবরও উঠে এসেছে। বাংলার দামাল ছেলেরা তাদের স্বল্পসংখ্যক অস্ত্র আর অজেয় মনোবলকে পুঁজি করে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিহাসের সত্য এই যে, দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষদিকে মুক্তিবাহিনী গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে একের পর এক গ্রাম জয় করতে থাকে, এবং দীপ্তভঙ্গিমায় ওড়াতে থাকে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা। যুদ্ধজয়ের এই গর্বিত ইতিহাসও উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নোক্ত সংলাপে :

কেউ কেউ আরো কয় জেলার সদর

আর যত বড় বড় বাজার বন্দর

সবি তারা নিয়া নিছে তাদের দখলে

নতুন নিশান আইজ উড়ায় সকলে।

নিজ চক্ষে দেখি নাই, শোনাশোনা কথা

জঙ্গলে আগুন য্যান জ্বলে নিজথিকা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০)

বস্তুত, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নির্যাতন ও নিধনের সমস্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে পরাজয়বরণে বাধ্য হয়, এবং ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। বাঙালি জাতি ফিরে পায় দেশ শাসনের অধিকার। নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকের শেষে বাঙালির এই বিজয়ের তথ্যটি সুস্পষ্ট করেছেন। নাটকে বার বার উচ্চারিত হয়েছে রণজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের ইঙ্গিত, যা 'পায়ের আওয়াজ' প্রতীকের মাধ্যমে ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের এই সংকেত নাট্যকারের মতে একাধারে অবরুদ্ধ দশা থেকে সমগ্র জাতির মুক্তির; যাবতীয় পাপাচারের অবসান এবং নতুন দিনের সূচনা। পীরের সংলাপে নাট্যকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

হানিফার ঘোড়ার লাহান;

শোনা যায় দুই পাড় ভাইঙ্গা আসে যমুনার বান ; আসলে কিছু না –

আসলে পাপের শেষ, এ তারি সূচনা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪)

তবে মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যে এদেশ থেকে রাজাকার-আলবদর-আল শামস প্রভৃতি ঘাতকশ্রেণির সমূল উৎখাত ঘটেছে তা নয়। নাট্যকার সেই ঐতিহাসিক সত্যটিও বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করেছেন মাতবরের প্রধান সহযোগী পাইক চরিত্রটির উত্থান এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের ভোল পাল্টানোর ঘটনা তুলে ধরে। যে কারণে পীরের উক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে : 'দাগ একটা দাগ রাইখা যায়'। বস্তুত, এই সামান্য 'একটা দাগ'ই পরবর্তীকালে তুমুল রাষ্ট্রবিনাশক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে নিয়ে এসেছে নেতিবাচক আবহ; তৈরি করেছে দুষ্ট ও দগদগে ক্ষত। ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে জাতির পিতাকে সপরিবারে শহিদ হতে হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বার

বার কালো দাগ ফেলেছে এই পরিবর্তিত সুবিধাবাদী শ্রেণিই। জনগণের হাতে মৃত্যু অত্যাসন্ন জেনে রাজাকার মাতবর চরিত্রটিও বাংলায় বারবার এই কালোশক্তির উত্থানের ইঙ্গিত করে গেছে। মাতবরের সংলাপ নিম্নরূপ :

> আমারে মারলেই হবে গেরামের বিপদ উদ্ধার? [...]
> না হয় জালেম আমি, কও দেখি, একবার
> বুকে হাত দিয়া কও, জালেম কি জন্মাবে না আর ?
> কোনো দেশে? কোনো বংশে ? আবার ? আবার ?
> আমার জীবন নিয়া তবে কও কি হবে তোমার ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮)

অন্যদিকে নাটকের শেষে পীরের সরব উপস্থিতি, সাধারণ জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের একই কাতারভুক্ত করে জানাজার জামাত পরিচলনা করার ঘটনায় নাট্যকার এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন – বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ সরল জনগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মধ্বজী পীরশ্রেণি আবহমানকালধরেই প্রতিনিধিত্ব করে যাবে। নাটকের শেষে পীর চরিত্রের উচ্চারিত সংলাপে এ-সত্যই যেন ভাষারূপ পেয়েছে :

> পীর। সকলে শরিক হও তার জানাজায়।
> আনো আনো লাশ আনো, আরো লাশ আছে
> তোমার দক্ষিণে বামে লাশ আছে পাছে।
> আনো লাশ, আরো লাশ, লাশের পাহাড়
> সকলে দাঁড়াও ভাই কাতারে কাতার
> অন্তত জীবিত আছো এইটুকু শোকর গোজার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০)

বস্তুত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে অনেক নাট্যকারই নাটক রচনা করেছেন। 'কিন্তু কাব্যনাটক রচনায় সৈয়দ হক প্রায় একক এবং অনন্য। একদিকে স্বাধীনতার জন্য দেশপ্রেমিক মানুষের আত্মবিসর্জন, করুণ জীবনযাপন, সংগ্রাম-যুদ্ধ ; অন্যদিকে পাকিস্তানপন্থি মাতবর নিজ কন্যার ইজ্জতের বিনিময়ে হলেও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়।'[১] এই বেদনাদায়ক ট্রাজিক মুহূর্ত অসাধারণ প্রজ্ঞা ও শিল্পকুশলতায় নাট্যকার রূপায়িত করেছেন আলোচ্য নাটকে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর সদর্থক চিন্তনের প্রকাশ ঘটিয়ে এভাবেই স্বদেশ ও স্বজাতির নিকট একজন শিল্পীর দায় মিটিয়েছেন।

---

[১] মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, 'বাংলাদেশের নাটকের বিষয় : রূপ ও রূপান্তর', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), মুক্তধারা প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ. ২৫১

সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* ইতিহাসের ঘটনাসূত্র অবলম্বন করে রচিত হলেও এর মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে আবহমান বাংলার সমাজচিত্র। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান। আলোচ্য কাব্যনাটকের বিভিন্ন চরিত্রের জীবনাচরণ, ঘটনাংশ বা মুখনিঃসৃত সংলাপের মধ্যদিয়ে সমকালীন বাংলাদেশের গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসহ রাজনৈতিক ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের একটি সুসংহত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কসূত্র নির্ণয় করে দেখিয়েছেন যে – 'যাবতীয় সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ অন্যায় মূলত সংঘটিত হয় অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে প্রভুত্ব অর্জনের লিপ্সা থেকে। এই থেকেই সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী অন্য দেশকে পরাধীন রাখতে চায়, আবার পরাধীন দেশের নিজের মানুষের মধ্যেও শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদী বিত্তশালী জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ী শ্রেণী শোষণ করে নিম্নবিত্ত মানুষকে, নির্যাতন চালায় শ্রমিক-কৃষকের উপর।'[১] এই সূত্রে সেকালে মাতবর শ্রেণির এমনই ক্ষমতার দম্ভ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যাচারের নানান চিত্র *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাট্যের পরতে পরতে চিত্রিত হয়েছে। মাতবর শ্রেণি একদিকে যেমন খাজনা আদায়, সুদিকরণ, মজুতবৃত্তি, দাদনপ্রথা প্রভৃতি দ্বারা সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও পরনির্ভরশীল করে রাখতো, তেমনি ব্যক্তিগত লাঠিয়াল, পাইক বাহিনী লালন করে সাধারণ শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষকে জিম্মি করে রাখতো। এরই একটি বাস্তবচিত্র আলোচ্য নাটকে প্রত্যক্ষযোগ্য; যখন গ্রামীণ যুবকসম্প্রদায় মাতবরের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায্য অধিকার হরণের প্রশ্ন তোলে, তখন যুবকদের প্রতি মাতবরের উচ্চারিত বক্তব্যে :

> মাতবর। বেয়াদপ বেশরম, আমারই উঠানে
> আমারই মুখের পরে? তরে আর জানে
> বাঁচাবো না। দাও দিয়া কোপায়া কাটবো।
> জিহ্বা ছিঁড়া কুত্তারে খাওয়াবো। [...] এই, অরে ধর, অরে বান–
> নিয়া আয় কাছি
> অরে আষ্টেপিষ্টে বান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২)

---

[১] দ্রষ্টব্য : কবীর চৌধুরী,' নাটক : প্রতিবাদ প্রতিরোধের', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

মূলত, বাঙালির সমাজব্যবস্থায় আদিকাল থেকেই বিরাজ করছে এই সামাজিক উঁচুনিচু স্তরভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য। বর্ণভেদ প্রথা তো ছিলই, তদুপরি সামন্তপ্রভুদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা যারা পেতেন, তারাই হয়ে উঠতেন সমাজবিধায়ক ; জমি-জোতের মালিক। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের (১৭৩৮-১৮০৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলার চিরন্তন জমিদারি শাসনপ্রথা বদলে গিয়ে আবির্ভূত হয় মধ্যস্বত্বভোগী এক নব্য ধনিক শ্রেণির ; যারা না ছিল আভিজাত্যের অংশ, না ছিল উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জমিদারের সম্পত্তি ক্রয় করে এরা নব্যধনী হয়ে ওঠে। কৃষিজীবী সমাজ থেকে এদের উত্থান হলেও এরাও সাধারণ জনগণের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। নবগঠিত এই শ্রেণিই তখন হয়ে ওঠে এলিট শ্রেণি। এই শ্রেণির সঙ্গে শ্রমজীবী কৃষকশ্রেণির প্রকট হয়ে ওঠে। ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাস গবেষক জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড এই মধ্যবিত্তশ্রেণি নিয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> In city, town and village there was one group of Bengalis who was chained and were accorded recognition as superior in social status to the mass of their fellows. These were the bhadralok, literally the respectable people, the gentleman. They were distinguished by many aspects of their behavior- their style of housing, their eating habits, their occupations and their association and quite as fundamentally by their cultural values and their sense of social propriety.[১]

এই ভদ্রলোকশ্রেণি কালপরম্পরায় নিজেদের আত্মরক্ষার বর্ম হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে। আলোচ্য নাটকে পীরসাহেব-চরিত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ওপর ধর্মব্যাবসায়ীদের প্রভাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট বাস্তবচিত্র উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। সেকালের শিক্ষার আলো-বঞ্চিত গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ রোগে শোকে ডাক্তারকে নয়, পির ফকিরকেই বিশ্বাস করত অধিক। অর্থাৎ বিজ্ঞাননিষ্ঠতা নয়, অলৌকিক শক্তির ওপর ভক্তি ও আস্থাই ছিলো মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, অস্ত্র ও ধর্মের ব্যবহার – এ দুটিই সমভাবে নিম্নবর্গের মানুষকে শাসন, শোষণ করার চিরন্তন উপায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) ইতঃপূর্বে তাঁর *লালসালু*

[১] J.H. Broomfield, *Elite conflict in a plural society : Twentieth Century Bengal*, University of California press, 1968, P. 5-6

(১৯৪৮) উপন্যাসে গ্রামীণ মুসলিম সমাজে পির ফকিরের প্রভাব ও মোহাবেশ বেশ চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন ভণ্ড মাজার ব্যবসায়ী মজিদ চরিত্রের মধ্যদিয়ে।[১] গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বাস্তবতাবিবর্জিত ধর্মীয় শিক্ষার কারণে সাধারণ মানুষ পির ফকিরদের প্রতি অধিকতর আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। এই বাস্তব সত্যটিই আলোচ্য নাটকে নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন :

বাবা আপনেরে পীর বইলা মানি
বাচ্চা যখন জ্বরে কাতর আপনের কাছে আনি
মউতকালে আমরা চাই আপনের হাতে পানি
বাবা আপনেরে পীর বইলা জানি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৮)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু* উপন্যাসে ধর্মকেন্দ্রিক মাজার ব্যবসা ও যুগোপযোগী স্কুল প্রতিষ্ঠার একটি দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেছিলেন। উপন্যাসের ভণ্ডপির মজিদ চরিত্রটি মাজার ব্যবসার স্বার্থে কখনোই চায়নি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা হোক, সাধারণ মানুষ সত্যিকার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত প্রেতারণা ধরে ফেলুক। ফলে গ্রাম্য শিক্ষিত যুবক আক্কাস যখন গ্রামবাসীকে স্কুলঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়, তখন মজিদ গ্রামবাসীকে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কথা বলে; ফলে আক্কাসকে ভরা মজলিসে অপমানিত হয়ে ফিরে যেতে হয়। আলোচ্য নাটকেও এই দ্বন্দ্বের বাস্তবচিত্র সৈয়দ শামসুল হক উপস্থাপন করেছেন। ক্যাপ্টেন কর্তৃক সদ্যধর্ষিতা মাতবরের মেয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে তাই বলে :

মানুষের অধিকার নাই তারে সোয়াল করার।
[...] আর কিছু নাই, খালি এক নাম,
নিরাকার নিরঞ্জন নাম
নামের কঠিন ক্ষারে লোহাও মোলাম
সেই এক নাম।

---

[১] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হককে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। এ কথা শামসুল হক নানান প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর মনোজগত ও রচনাশৈলীর উপর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রভাব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন : 'যদি সেই অর্থে বলো, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ইজ ডেফিনেটলি ওয়ান অব মাই টিচার। হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াং, হোয়েন আই হ্যাড এমবিশন উইথ মাই পেন, আই লুকড আফটার হিম।' (দ্রষ্টব্য : *সৈয়দ শামসুল হকের সাক্ষাৎকার : আমাদের কবিতা বিশ্বমানসম্পন্ন*, সংবাদ সাময়িকী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, পৃ. ১৮)

নামের তাজ্জব গুণে ধন্য হয় পাপের মোকাম;

চোরের আস্তানা হয় বড় কোনো পীরের মাজার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩)

চিরকালের আজ্ঞাবহ, অনুগত মাতবরের মেয়ের মুখে এমন তীব্র কটাক্ষ শুনে মাজারকেন্দ্রিক ব্যবসার ধ্বজ্জাধারী পীর চরিত্রটি ক্ষেপে যায় ; এবং তার সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ে মেয়েটির ভাবীস্বামী মুক্তিযোদ্ধা স্কুল মাস্টারের ওপর। সে অনুমান করতে পারে, তার প্রদত্ত ধর্মজ্ঞান, নীতিশিক্ষা ছাপিয়ে স্কুলশিক্ষকের বিজ্ঞাননিষ্ঠ আলোকিত মনের প্রভাবেই মেয়েটি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। তখন আলোচ্য নাটকে ধর্মব্যবসার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়ে ওঠে। *লালসালু*র মজিদ চরিত্রটির মতোই এ নাটকের পীর চরিত্রটি তখন পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দিতে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে। মাতবরের মেয়ের সঙ্গে আদর্শিক যুক্তিতে না গিয়ে সে বরং ব্যক্তিগত আক্রমণকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে বেছে নেয়। ফলে, স্কুলমাস্টারের শিক্ষার অসারতা এবং মুক্তিযুদ্ধে গমন প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে মাতবরের মেয়ের উদ্দেশ্যে পীর মন্তব্য করে :

খবরদার বেটি খবরদার,
এ সব শিখায়া দিছে তরে ঐ জুয়ান মাস্টার

যার সাথে কথা তর আছিল বিয়ার। [...]

তর সে মাস্টার কয়, সম্ভব কীভাবে?

পুস্তক ফালায়া তাই হাতে নেয় কামান-বন্দুক

বাপদাদা কাইল্যা যত দালান ভাঙ্গুক

তাতে তার কিছু নাই, পাগলা ঘোড়ার

দাপটে দুনিয়াটারে করা চাই নষ্ট ছারখার

এই কাম তার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩)

অন্যত্র, শৈশবে মক্তবে আরবি শিক্ষার আতঙ্কজনক প্রসঙ্গ এ-নাটকে মাতবরের মেয়ের স্মৃতিচারণাসূত্রে নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। একদিকে ভিনদেশি ভাষাশিক্ষায় শিশুদের সমস্যা ও অনাগ্রহ, অন্যদিকে ধর্মগুরুদের কঠিন শাস্তিপ্রদানের বিষয়টিও এ-প্রসঙ্গে উঠে এসেছে নাটকে :

আল্লাতালার নাম

কলমা কালাম

আপনের কাছেই শেখা, অতি ছোটবেলা

মনে আছে, সকালে বিকালে খ্যাতের ভিতর দিয়া বাবা আপনে

রোজ দুই বেলা

আসতেন, আমার পুতুল খেলা

ফালায়া তখন, ওজু নিয়া

মাথায় কাপড় দিয়া

বসতাম আমপাড়া হাতে। ভুল হইলে পর

হাতের পানখার বাড়ি পড়ত এই পিঠের উপর। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০)

আবার, বাংলার গ্রামীণ সমাজে আবহমান প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারের ছবিও নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক নিপুণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন আলোচ্য নাটকে। যেমন, গ্রামীণ বাঙালি বধূর যাপিত জীবনছবির চিরায়ত চিত্র নিম্নে উপস্থাপিত হয়েছে :

কা- কা কাক ডাকলে দুপুর বেলায়

লাঠি হাতে বৌ-ঝি-খেদায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১)

গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজে নানান আচারস্বর্বস্ব ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার বরাবরই বিদ্যমান ছিল। যেমন – যাত্রারম্ভে দধি ভক্ষণে শুভ, কিন্তু চলতিপথে এক শালিক, কালো বিড়াল কিংবা শৃগাল দর্শন অশুভ। তেমনি সাধারণের মনে গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ভর দুপুরে কাকের কা কা ডাক আসন্ন দুর্যোগ, বিপর্যয় ও ঘোর অমঙ্গলের ইঙ্গতবহ। বিশেষত, গ্রামীণ নারীদের মনে এই সংস্কার প্রবলভাবে বদ্ধমূল ছিল। ফলে তারা তাদের আঙিনা, ঘরকন্নার সীমানা থেকে এসব কুলক্ষণ দূর করতে চাইতো। আবার, ভূত, প্রেত, দেও, দানব প্রভৃতি অপদেবতার প্রতি সাধারণ গ্রামবাসীর অমূলক ভীতিও যে সমাজব্যবস্থায় ছিল, তাও মাতবরের সঙ্গে গ্রামবাসীর একটি সংলাপে সুস্পষ্ট হয়েছে :

মনে আছে, সেই সনে ঘোর এক অমাবইশ্যা রাইতে

হাজীগঞ্জ থিকা আমি রওনা দিয়াছি। সোজা বাড়িত যাইতে

পরে পরথমে পাথার। তারপর শ্মশান একটা, সাথে আছে

কয়েকজন দোকানদার। তারা কয় মিয়া সাব, পাছে পাছে কি য্যান আসতে আছে। [...]

কও একবার সত্য কইরা কও,

যতই দুর্বল হও

দেওপরী তত বেশি জাঁক দিয়া ওঠে

কি না ওঠে? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৪-২৫)

বস্তুত, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাট্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র সমবেত গ্রামবাসীর মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থার অংশ। নিরীহ এই গ্রামবাসীর সঙ্গে কথোপকথনসূত্রে মাতবর তাই কৃষিভিত্তিক জীবনঘনিষ্ঠ নানা অলংকার ব্যবহার করেছে।

গ্রামীণ সমাজে মাতবরকে মানুষ শ্রদ্ধা থেকে ভয় করে বেশি। আলোচ্য নাটকেও মাতবরের কূটকৌশল, পেয়াদা পাইকের ভয় গ্রামবাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে সবসময়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এমনই সাহস জন্মাতে শুরু করে যে, তারা আর মাতবরের চোখরাঙানিকে তোয়াক্কা করছে না ; বরং প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। এরকম একটি বাস্তবচিত্র, নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে :

যুবক। কিছু যে কন না কথা মাতবর সাব?
আপনার মুখেতো আগে দেখি নাই কথার অভাব
কি বাহার কথা য্যান বিয়ার মজলিশে
বুড়া বর গাও ভইরা অলঙ্কার দিছে
বর্ষার কইমাছ কথা ফাল পাড়ে
বাক্য না আমের ঝোপ ডাল ভাইঙ্গা পড়ে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২)

উপর্যুক্ত সংলাপে গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গপি ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ সমাজে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকেই বিবাহিত পুরুষের একাধিক বিয়ে করার রীতি ছিল। লোভী এসব পুরুষের লক্ষ্যই ছিল সম্পত্তি ও গয়নার লোভ দেখিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে অল্পবয়সী মেয়েদের অভিবাবককে প্রভাবিত করা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বস্তুত, মানুষের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বকে পুঁজি করে বিচিত্রগামী পুরুষ তাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করে। অর্থ, সম্পত্তি, অলঙ্কার এ ক্ষেত্রে তাদের হাতিয়াররূপে বিবেচিত হয়। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) তাঁর এক রচনায় সমাজে নারীদের অলঙ্কারপ্রীতি এবং পুরুষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন ‘অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্য দেখান বই ত নয়।’[১] বস্তুত, এভাবেই সৈয়দ শামসুল হক তাঁর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*ের প্রতি পরতে পরতে ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের ডামাডোলে তৎকালীন গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপন করেছেন শিল্পিত অবয়বে।

---

[১] রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ‘স্ত্রী জাতির অবনতি’, ‘মতিচূর : প্রথম খণ্ড’, *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৪

বাংলাদেশের কাব্যনাট্যান্দোলনের ধারায় সৈয়দ শামসুল হকের অনন্য সৃষ্টি *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* গণমুক্তি আন্দোলনের একটি মাইলপোস্ট। রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে বিরাজিত অপরাজনীতি, অন্ধতা, কুসংস্কার আর শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষকে সোচ্চার করে তোলার যে মহতী উদ্যোগ তা এ-নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে অসামান্যভাবে। সৈয়দ শামসুল হক স্বয়ং এ-প্রসঙ্গে বলেছেন : 'যদিও 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মুক্তিযুদ্ধের নাটক, কিন্তু আরও একটি বড় মুক্তিযুদ্ধের কথা আমি বলতে চেষ্টা করেছি। সেটা সংস্কার থেকে মুক্তি, ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি, মানবিকতার দিকে উত্তরণ।[১] নাট্যকারের এই সদিচ্ছা *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে শিল্পরূপ পেয়েছে নিঃসন্দেহে।

নূরলদীনের সারাজীবন

প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আশির দশকে[২] সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেন নূরলদীনের *সারাজীবন*। এটি তাঁর আরেকটি মঞ্চসফল কাব্যনাটক। দীর্ঘ প্রবাস-জীবন যাপনকালে বাংলার স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ আন্দোলন নিয়ে নাট্যকারের অসীম কৌতূহল ও নিবিড় পঠন-পাঠনের ফল এই নাটক।

নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের সনিষ্ঠ প্রযোজনায় নাট্যশিল্পী আলী যাকেরের নির্দেশনায় ঢাকার মঞ্চে অভিনীত হয় এ-নাটকটি। আশির দশকের অবরুদ্ধ রাজনৈতিক বাস্তবতায় সাধারণ মানুষের জীবন যখন সমরশাসকের চোখরাঙানিতে ভীত-ত্রস্ত ও শৃঙ্খলিত, ঠিক তখনই অতীত-ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে-আসা এক বীর-কৃষকের সংগ্রাম ও আত্মদানের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এ-নাটকটি সমকালীন দর্শকচিত্তে যুগান্তসৃষ্টিকারী প্রভাব ফেলে। ইতঃপূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) হাতে যে-সব কাব্যনাট্য রচিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষাপট কখনও ব্যক্তির হৃদয়জাত দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ, আবার কখনওবা পুরাণ-আশ্রিত ঘটনার নবরূপায়ণ। কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব ইতিহাসকে পুঁজি করে গণমানুষের সংগ্রামী জীবন নিয়েও

---

[১] কথোপকথন : সৈয়দ শামসুল হক ও ফেরদৌসী মজুমদার, *ফেরদৌসী মজুমদার : জীবন ও অভিনয়* ডকুমেন্টরি থেকে গৃহীত, (উদ্ধৃত : ড. সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১)

[২] এ-নাটকের রচনাকাল নাট্যকার গ্রন্থ সমাপ্তিতে উল্লেখ করেছেন ৯ই জানুয়ারি থেকে ১২ই মে ১৯৮২ পর্যন্ত। কিন্তু গ্রন্থাকারে এটি আরও অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটির ভূমিকা অংশে লেখকের 'সবিনয় নিবেদন'-এ তারিখ উল্লেখিত আছে ৫ই নভেম্বর ১৯৮২।

যে কাব্যনাট্য রচনা করা সম্ভব, বাংলা সাহিত্যে সেটিই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক। নবধারায় নির্মিত সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম দুটি নাটকের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন :

> 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এবং 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটক দু'টিতে অত্যন্ত গভীরভাবে মিশে আছে বাঙালি জাতির চৈতনিক উপাদান। সৈয়দ শামসুল হকের কৃতিত্ব, তিনি নাটকের পাত্রমিত্রদের মুখে প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দমালা, কথনভঙ্গি, উপমা-উৎপ্রেক্ষার মধ্যদিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রোথিত করে দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী চেতনার উপাদানসমূহ।[১]

নূরলদীনের সারাজীবন বাংলাদেশে প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে। উত্তরবঙ্গের জনজীবন থেকে তুলে আনা এক কৃষক নেতার অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা ও আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করে তখন ঢাকার দর্শক বিস্মিত ও বিমোহিত হয়ে যায়। নূরলদীনের 'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়' রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা-পরিসর অতিক্রম করে হয়ে ওঠে সর্বযুগের সংগ্রামশীল মানুষের দিগন্তপ্রসারী আহবান। আশির দশক থেকে অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে পরিচালিত মিছিলে-জনসভায় এই সংলাপটিই হয়ে ওঠে মুক্তিকামী মানুষের উজ্জীবনের সুধামন্ত্র। ফলে নাটকটি, বিশেষত নূরলদীনের নাম এদেশের সারস্বত পরিমণ্ডল ছাপিয়ে আপামর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আর এভাবেই নাটকটি পৌঁছে যায় জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে, বিশেষত কাব্যনাট্যের ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। বস্তুত, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের খণ্ড পরিসর থেকে বিস্মৃতপ্রায় এক কৃষক নেতাকে দৃশ্যকাব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করে বৃহত্তর জনচিত্তে তাকে প্রতিষ্ঠা করার এক যুগান্তসৃষ্টিকারী ভূমিকা সম্পাদন করেছেন সৈয়দ হক।

প্রায় দুশো বছর পূর্বের এক মাটিচাপা সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের মর্মান্তিক ইতিহাসের পুনর্জন্ম ঘটেছে সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকে। এটি ছিল বাঙালি জাতির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়, ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগোষ্ঠীর, বিশেষত কৃষকশ্রেণির প্রতিবাদ। লেখক সেই ঐতিহাসিক আন্দোলন-সংগ্রামকে উপজীব্য করে আলোচ্য নাটকের ঘটনাংশ নির্মাণ করলেও এটিকে শিল্পগুণমানে উন্নীত করার প্রয়োজনে তিনি স্থান-কাল

---

[১] অলোক বসু, 'জাতীয়তাবাদী চেতনায় উৎসারিত সৈয়দ হকের দু'টি নাটক', *থিয়েটার : সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা*, (সম্পা. : রামেন্দু মজুমদার) , ৪৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা : এপ্রিল ২০১৭, ঢাকা, পৃ. ১৩৭

উপযোগী কাল্পনিক ঘটনা, চরিত্রপাত্রের বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের সঙ্গে কল্পলোক-আশ্রিত ঘটনা ও চরিত্রের মিথস্ক্রিয়ায় এটি হয়ে উঠেছে একটি শিল্পোত্তীর্ণ কাব্যনাটক।

যদিও সৈয়দ শামসুল হক উত্তরাধুনিকতা, উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বে আস্থাবান নন,[১] তবু তাঁর সৃষ্টিকর্মে নিবিড় দৃষ্টি স্থাপন করলে দেখা যাবে, ঔপনিবেশিক শক্তির মুখোশ উন্মোচনে তিনি তুলনারহিত শিল্পী। মূলত, মানুষ ঔপনিবেশিক শক্তির বিশাল ও ব্যাপক বিস্তৃত আগ্রাসন থেকে রেহাই পেতে খুঁজে ফেরে নিজস্ব ঐতিহ্য, ইতিহাস সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও মিথকাহিনি ; যাকে আশ্রয় করে মানুষ নিজস্ব শেকড় সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আর এভাবেই ঘটে ইতিহাস ও মিথের পুনর্জন্ম। সৈয়দ শামসুল হক স্বাধীনতা-উত্তর অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপটে এই জাতিসত্তার ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন প্রান্তিক বীর নূরলদীনকে। কেন্দ্রীয় শাসনের অপরতাবোধের (otherness) দৌরাত্ম্যে যে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল কালের গর্ভে। সৈয়দ শামসুল হক নিবিড় মমতায় এই প্রান্তিক বীরকে ইতিহাসের পাতা থেকে সাধারণ মানুষের অন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ ও নির্মম আগ্রাসনের স্বরূপ। বস্তুত এটি কেন্দ্র নয়, প্রান্তের কাহিনি। যেখানে শিল্পের বিশালতর ক্যানভাসে উপস্থাপিত হয়েছে উপনিবেশিত সমাজের সামূহিক মুক্তির বাসনায় উদ্বেল একদল সাধারণ কৃষকের মর্মযাতনার প্রতিচ্ছবি।

রংপুর জেলার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের একাধিক রচনায় রংপুরে ব্রিটিশ আমলে সংঘটিত নবাব নুরউদ্দীন নামক এক কৃষক নেতার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান রচিত *রংপুর জেলার ইতিহাস* (প্রথম পর্ব) গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে কৃষক নুরউদ্দীন এবং তার নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহপ্রসঙ্গ :

> ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে জানুয়ারীতে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ‘নুরউদ্দীন’ নামক এক ব্যক্তি তাদের নবাব ও ‘দয়াশীল’ তাঁর দেওয়ান নির্বাচিত হন। তৎকালীন টেপার জমিদারের নায়েব বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে কাকিনা, ফতেপুর, কাজির হাট এবং টেপা পরগণার প্রজাসকল দলবদ্ধভাবে নায়েব ও গোমস্তা প্রভৃতিকে হত্যা করে। [...] রংপুরের বিদ্রোহীদল কোচবিহার ও দিনাজপুরের প্রজাগণ তাদের অধীনে সমবেত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল। তারা ইংরেজদের রাজস্ব কর প্রদানের নিষেধাজ্ঞা

[১] এক সাক্ষাৎকারে সৈয়দ হক বলেন : ‘উত্তরাধুনিকতা সম্পর্কে আমাকে বলবেন না। আমি এই ধরনের লেভেলিংয়ে বিশ্বাস করি না। আমার কাজ হচ্ছে লেখা। যারা বটানি করেন তারা বটানি করুন। আমি গাছ, আমার গাছে ফুল ধরবে, ফল ধরবে। এটিই হচ্ছে আমার প্রতিক্রিয়া। আমি একাডেমিশিয়ান নই। আমি ক্রিয়েটিভ মানুষ। আমি সৃজনশীল মানুষ। আমি পণ্ডিত নই।’ (দ্রষ্টব্য : ‘অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার : রাঢ় বাঙলার মুগ্ধ চিত্রকর’, *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা*, মাসিক *বলাকা*, সম্পাদক : শরীফা বুলবুল, ঢাকা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩৭, নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ১০

জারী করে বিদ্রোহীদের চাঁদা (টিং খরচা) স্থাপন করে। ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে কর সংগ্রহে দেবী সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[১]

Gazetteer of Rangpur District, ১৯১১-এ উল্লেখিত আছে :

> The exactions of a notorious farmer Raja Deboi Singh of Dinajpur, caused an insurrection of the cultivators in 1783. The revenue officers were driven out. A petition of grievances was submitted to the collector, who offered various concessions, which did not serve to quell the disturbance. The insurgents committed several murders, and issued a proclamation that they would pay no more revenue. They forced the cultivators of Cooch Behar to join them, and sent parties into Dinajpur to raise the people there. One of the leaders assumed the title of Nawab; and a tax called dingkharacha, or sedition tax, was levied for the expenses of the insurrection.[২]

সৈয়দ শামসুল হক অবশ্য আলোচ্য কাব্যনাট্যের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র কোম্পানির ফৌজি অফিসার ম্যাকডোনাল্ডকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করেননি, কিন্তু এই চরিত্রটিও যে বাস্তবে ছিল সে-প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে সে-সময়কার ইতিহাস নিয়ে রচিত একাধিক গ্রন্থ ও দলিলপত্রে। যেমন, *Bangladesh Distric Gazetter's Rangpur* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> A party of sepoys under lieutenant Macdonald marched to the North against the principal body of the insurgents and decisive engagement was sought near patgram in February 1783. [৩]

Hunter's Statistical Accounts of Bengal (১৮৭৭) গ্রন্থের লেখক Sir William Wilson Hunter (১৮৪০-১৯০০) এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

---

[১] মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, *রংপুর জেলার ইতিহাস* (প্রথম পর্ব), আশ্বিন, ১৩৮২, রংপুর, পৃ.৩১

[২] *Gazetteer of Rangpur District*, 1911, (দ্রষ্টব্যঃ ফরিদ আহমেদ, 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়,' blog.mukto-mona.com , ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫)

[৩] *Bangladesh District Gazetteer's Rangpur*, Edited by Nurul Islam Khan, Dhaka : Bangladesh Government press, 1977, p. 45

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে রংপুরের কৃষকগণ হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং রাজস্ব আদায়কারীদের বিতাড়িত করেন। তারা তাদের নেতা নবাব নুরুদ্দীনকে নবাব বলে ঘোষণা করেন এবং খাজনা প্রদান বন্ধ করেন। তাদের দাবি দাওয়া স্থানীয় কালেক্টরের নিকট পেশ করেন। বিষয়টি অমীমাংসিত হলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ড এর নেতৃত্বে সিপাহী দল স্বয়ংসম্পূর্ণ নবাব নুরুদ্দীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে মোঘলহাট যুদ্ধে নবাব আহত এবং তাঁর সেনাপতি দয়াল নিহত হন। এ সময় অবশিষ্টাংশ বিদ্রোহীদল পাটগ্রাম অঞ্চলে অবস্থান করেন। পরদিন অন্য সিপাহীদল সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে হঠাৎ ২২ ফেব্রয়ারি ১৭৮৩ সালে পাটগ্রাম আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিদ্রোহী দলকে বিধ্বস্ত করে। যুদ্ধে ৬০ জন বিদ্রোহী নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হয়ে বন্দী হন। [১]

নুরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাট্যে বস্তুত হান্টার কর্তৃক রচিত এ ইতিহাসের অনুসরণ রয়েছে। কিন্তু নাট্যকার সৈয়দ হক নাট্যকাহিনিতে দয়াশীলকে মৃত না দেখিয়ে নুরলদীনকে মৃত দেখিয়েছেন। হতে পারে এর পেছনে লেখকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল। হতে পারে এই মৃত্যুকে তিনি প্রতীকী করে তুলতে চেয়েছেন ; যেখানে একজন নেতার মৃত্যুশোকে লাখো জনতার জেগে ওঠার প্রেরণা মিলেছে। আর এ কারণেই হয়তো কাব্যনাটকের প্রারম্ভে মৃত নুরলদীনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবকের আহবানে উচ্চগ্রাম সঙ্গীতের তালে আলোকের ঝর্ণাধারায় অতিদ্রুত তিনি জেগে উঠেছেন, এবং তাঁর মাধ্যমেই চিত্রিত হয়েছে পুরো নাট্যঘটনা। বস্তুত, ‘নূরলদীন শারীরিকভাবে বেঁচে নেই। বেঁচে আছে – নূরলদীনের বিপ্লবী আদর্শ। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সে আদর্শ মরেনি এবং কখনো মরবেও না। নূরলদীনের মৃত্যুর পর তার আদর্শ হাজার কৃষকের বুকে প্রতিবাদের সাহস জুগিয়েছে ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে। প্রাণপ্রিয় নেতা নূরলদীনের বুকে একদিন যে আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিল বাংলার কৃষকের বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠার সেই আগুন জ্বলেছে দীর্ঘকাল।’[২] নাট্যকার নিজে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মঞ্চে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতায় এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন সমাজে প্রচলিত মিথ নির্মূলের প্রেরণা হিসেবে। সমালোচক শান্তনু কায়সার এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে লিখেছেন :

---

[১] Sir William Wilson Hunter, *Hunter’s Statistical Accounts of Bengal,* Vol.7, Trubner & Co., London, London, 1877, p.159, (দ্রষ্টব্য: মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭ , পৃ.৫৬)

[২] অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয়ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৭৩

নূরলদীনের স্বেচ্ছামৃত্যু'কে নাট্যকার মিথ নির্মূলের উপায় হিসেবে নির্দেশ ও গণ্য করেন। কিন্তু নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন দেখে নাট্যকারের ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ করে আমি লিখেছিলাম [...] স্বেচ্ছায় আত্মাহুতির রোমান্টিকতা একজন গণনায়কের থাকার কথা নয়। নয়, কারণ নূরলদীন ও নাট্যকার উভয়েরই জানার কথা, মৃত্যু মিথ তৈরিতেই বরং অধিকতর সাহায্য করে, নির্মূল করতে একেবারেই নয়।[১]

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকের নূরলদীন, গুডল্যাড, দয়াশীল ঐতিহাসিক চরিত্র ; একথা নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন। এছাড়াও ভবানী, গরীবুল্লাহ, হরেরাম প্রমুখ চরিত্রও ইতিহাসস্বীকৃত বাস্তব চরিত্র। লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় দোসর দেবী সিংয়ের নির্মমতার কথাও ইতিহাস-সমর্থিত। এছাড়াও নাটকে উল্লেখিত বিভিন্ন স্থান, যেমন পাটগ্রাম, কাজীর হাট, পাংশা, ডিমলা, মোঘল হাট প্রভৃতিও বাস্তবসম্মত। নাটকটিতে লেখক প্রয়োজনানুসারে যেমন ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যবহার করেছেন, ঠিক তেমনি কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্রও জুড়ে দিয়েছেন। ইতিহাস এবং কল্পনার সুষম বিন্যাসে কাব্যনাটকটি যথার্থই শিল্পসার্থক হয়ে উঠেছে। এ-প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার নাটকের *সবিনয় নিবেদন* অংশে লিখেছেন :

ইতিহাস থেকে আমি পেয়েছি নূরলদীন, দয়াশীল ও গুডল্যাডকে ; কল্পনায় আমি নির্মাণ করে নিয়েছি আব্বাস, আম্বিয়া, লিসবেথ, টমসন ও মরিসকে। নূরলদীনের আত্মা ও প্রেরণা আমি ইতিহাসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি, তাঁর ব্যাক্তিগত জীবন ও মানসিক সংকট আমি সম্ভবপরতার ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছি। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় নামটি লিখেছেন – নূরলউদ্দিন, আমরা বলব ওটা হবে নূরুদ্দিন, কিন্তু আমি ব্যবহার করেছি – নূরলদীন, রংপুরের সাধারণ মানুষেরা যেমনটি উচ্চারণ করবে।'[২]

বস্তুত, স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বৃহৎ জায়গা জুড়ে বিরাজ করেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে বিপথগামী জনসাধারণকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার তাগিদে, বিপর্যস্ত রাজনীতি ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকগণ বারবার ইতিহাসের বীরদের স্মরণ করেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে সৈয়দ শামসুল হক ইংল্যান্ডে ছিলেন চাকুরিসূত্রে। সেখান থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাধ্যমতো কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে লন্ডনে বসেই তিনি মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত নাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*। এসময় তিনি বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুসন্ধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই

[১] শান্তনু কায়সার, *বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৮০

[২] সৈয়দ শামসুল হক, 'সবিনয় নিবেদন : নূরলদীনের সারাজীবন', *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

অনুসন্ধানের সূত্রে তিনি রংপুর অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের নেতা নূরলউদ্দীনকে আবিষ্কার করেন। এরপর এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানার প্রয়োজনে লন্ডনস্থ ইন্ডিয়ান অফিসে যোগাযোগ করে পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে তিনি সে-সময়ে রংপুর অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের স্বরূপ, এদেশীয় সামন্তপ্রভুদের অত্যাচারের কাহিনি এবং এসবের বিরুদ্ধে জনৈক কৃষক-নেতার আহবানে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হন। ১৭৮৩ সালে সংঘটিত আপাতব্যর্থ সেই কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে নাট্যকার ১৯৭১ সালের সফল মুক্তিযুদ্ধের বীজমন্ত্র খুঁজে পান। এমন কি স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থরক্ষায় কৃষকনেতা নুরলউদ্দীনের স্বপ্ন ও সংযমী আন্দোলনের সঙ্গে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর বিস্ময়কর সাযুজ্য প্রত্যক্ষ করেন। ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের পূর্বে নুরলউদ্দীন চেয়েছিলেন আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর কাছে শান্তিপূর্ণ সমাধানের নিমিত্তে একাধিকবার লিখিত আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রচণ্ড দম্ভভরে সে আবেদন আমলে না নিয়ে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়টি তিনি নিজেই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন :

> নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এ দেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাঙলাদেশের ইতিহাস করুণ ইতিহাস, [...] ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। [...] আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু – আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।[১]

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকটি রচনার সময় নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হককে এই সাযুজ্য দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। এই বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

[১] রফিকুল ইসলাম, 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা', *বাঙলাদেশ*, মনসুর মুসা (সম্পা.), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩২৫

> সত্তরের দশকে লন্ডনে প্রবাসকালে আমার ইচ্ছে হয় ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস একটু বিস্তারিত পড়ে দেখব, সেই পড়াশোনা করতে গিয়েই আবার একদিন দেখা পেয়ে যাই এই অসামান্য কৃষকটির। [...] আমি আমার একটি পূর্ব ধারণার সমর্থন পেয়ে যাই যে, বাংলার সাধারণ মানুষ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র উনিশশ একাত্তরেই যে গেরিলা হয়েছে তা নয়, এই গেরিলা হয়ে যাবার একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, এটা উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কেবল লঘুই করে যেতে থাকব।[১]

বস্তুত নাটকটি নাট্যকার এমন একটি অস্থির সময়ে রচনা করেছেন যখন এদেশে একাত্তরের ঘাতক দালালশ্রেণি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'নূরলদীনের সারাজীবন নাটকের টেক্সটের যে বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য তার অন্যতর উদ্ভাসন আমরা দেখি এর মঞ্চায়নে যখন বিস্মৃতি থেকে উঠে এসে কৃষকনেতা নূরলদীন আবার দাঁড়ান জনসম্মুখে ; আলোড়িত দর্শকমণ্ডলীর, আশির দশকের প্রথম মঞ্চায়ন-পর্বে, নিশ্চিতভাবে মনে পড়ে যেত বঙ্গবন্ধুর কথা, তাঁকে তখন ঠেলে দেয়া হয়েছে বিস্মৃতিতে, ইতিহাসের পুনর্লিখন ও পুনর্পাঠ শাসকগোষ্ঠীর বড় এজেন্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নপুংসক নতজানু রাজনীতি এর বিরুদ্ধে কোনো শক্ত প্রতিরোধ দাঁড় করাতে পারছে না। বিকৃতির দাপটে পীড়িত সেই সময়ে, সৈয়দ হকের ভাষায়, নষ্ট সময়ে নষ্টবঙ্গে নূরলদীনের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবীভাবেই বঙ্গবন্ধুর পুনর্জাগরণের প্রশ্ন দর্শকমনে দোলায়িত করে দেয়। এমন এক সম্ভাবনার কথা নাটক রচনাকালেও বুঝি নাট্যকার অনুভব করেছিলেন, আর তাই নাটকের একবারে সূচনায় সূত্রধারের কথায় পাই সেই অনুপম বর্ণনা, যখন অতীত হঠাৎ হানা দেয় মানুষের বদ্ধ দরোজায় এবং তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না ঢেলে দেয় চাঁদ, তখন নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়, স্মৃতির জাগরণের নানা সূত্র উল্লেখিত হয় ফিরে ফিরে, নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় যখন 'শকুন নেমে আসে এই বাংলায়/ যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়/ যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়/ যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়/ যখন আমারই এ-দেশে আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়, ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।'[২] উল্লেখ্য, সত্তরের দশকের আরও একজন তরুণ জনপ্রিয় কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১) তাঁর কবিতায় আশির দশকের বিপন্ন সমাজ এবং দেশের রাজনীতির প্রতিচ্ছবি চিত্রণে এই শকুনের উপমা ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর 'বাতাশে লাশের গন্ধ' নামক কবিতায় 'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, 'নাট্যকারের কথা', (দ্রষ্টব্য : হোসনে আরা জলী, *নাট্য বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১৯)

[২] মফিদুল হক, 'সৈয়দ শামসুল হকের নাট্যত্রয়ী : তৃতীয় মাত্রার সন্ধানে', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

সেই পুরনো শকুন'[১] পঙ্‌ক্তিটির অনুরণন যেন সৈয়দ শামসুল হকের 'শকুন নেমে আসে এই বাংলায়/ যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়' পঙ্‌ক্তি।

নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটকটিতে বঙ্গবন্ধুর ছায়া থাকার বিষয়টি নাট্যকার নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল – আলোচ্য কাব্যনাটক রচনার সময় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর হৃদয়ে কোনো প্রতীকী ভাবনা ছিল কি না, এর উত্তরে তিনি বলেন :

> হ্যাঁ। ওটা তো লেখা হয়ে যাবার পর অনেকেই অনেক রকম এর ভেতরে মাত্রা দেখতে পান। ছায়া দেখতে পান। এটা ঠিকই আছে। আমার মনে পড়ে নূরলদীনের সারাজীবন যখন শেখ হাসিনা দেখতে আসেন সে বহু বছর আগের কথা। আজ থেকে অন্তত বিশ বছর আগে হবে। তিনি যখন দেখতে আসেন 'নাগরিক' আমাকে বলেছিল, যে প্রেক্ষাগৃহে শেখ হাসিনার পাশে যদি আপনি বসেন তাহলে তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি এর উত্তর দিতে পারবেন। আমি ওঁর পাশে এসে নাটকটি দেখেছিলাম – উনিও দেখছিলেন, নাটকটির কতগুলো জায়গায় এসে দেখি উনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারছেন না। এবং আমাকে দুয়েকবার বললেনও যে তাঁর পিতার কথা তাঁর মনে পড়ে। এখন চিন্তা করুন শেখ হাসিনারই মনে হচ্ছে যে, এটা বঙ্গবন্ধুর একটা ছায়া ছিল। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে – এই যে মানুষের মুক্তি চায় প্রকৃত অর্থে। এমন একটি মানুষ কিন্তু আমাদের এই ভূখণ্ডে, আমাদের ইতিহাসে আরো অনেক এসেছেন – বঙ্গবন্ধু এদের সর্বোচ্চ প্রকাশ। তিনি যতো বড়ো একটি ভূখণ্ডে যতো মানুষকে নিয়ে একটা মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সফল মুক্তির [...] এরকম হয়তো হয়নি। যেমন নূরলদীনের হয়নি। কিন্তু নূরলদীনের সংগঠন শক্তি নূরলদীনের যে দেশপ্রেম নূরলদীনের যে আত্মত্যাগ সেটা কিন্তু খুব অ্যাবস্ট্রাক্টভাবে বঙ্গবন্ধুর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। সেইজন্য মনে হয় যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। আমি চেয়েছিও তাই। আমি তুলে ধরতে চেয়েছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধটা হঠাৎ একাত্তরে হয়েছে এমন কিছু নয়। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে এবং ইতিহাসের এই যে ধারাবাহিকতা এটাও কিন্তু আবিষ্কার করার আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। নূরলদীনের সারাজীবন লেখার সময় এবং সেই সময় এবং সেইসময় বই যখন বেরোয় এর ভূমিকাতে আমি বলেছিলাম যে

---

[১] রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯)* কাব্যগ্রন্থে 'বাতাসে লাশের গন্ধ' নামক কবিতায় প্রথম স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে 'শকুন' উপমায় উপমায়িত করেন। ১৯৭৭ সালে রচিত এ কবিতার এতৎসংক্রান্ত পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

> 'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন। [...] রক্তের কাফনে মোড়া – কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে,/ সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা।'(দ্রষ্টব্য : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, *উপদ্রুত উপকূল*, বুকস্ ফেয়ার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪)

একাত্তর হঠাৎ করে আসেনি – এই যেমন ধরুন নূরলদীনের সময়কার ইংরেজদের যে রিপোর্ট ইত্যাদি আছে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের। তাতে মি. গুডল্যাড ছিলেন রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর। তিনি নূরলদীন সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিচ্ছেন তাতে লিখছেন – এই লোক পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের একটি বাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং এর সঙ্গে দেশের কৃষক-শ্রমিক-মাঝি-তাঁতি-জেলে, স্কুলের ছাত্র, মক্তবের ছাত্র, মাদ্রাসার ছাত্র অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও যুক্ত আছে। আপনি দেখুন, [...] তখন সমগ্র বাংলাদেশের লোক ছিল মাত্র পৌনে তিন কোটি। মানে যেটা আজকের বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা মিলিয়ে যে বৃহৎ বাংলাদেশ। [...] সেই পৌনে তিনকোটি লোকের ভেতর পয়ঁত্রিশ হাজার লোকের একটি বাহিনী গড়ে তুলেছে আর আজকে যখন আমরা একাত্তর সালে সাড়ে সাত কোটির ভেতরে যখন দেড়লক্ষ দু'লক্ষ লোকের একটা বাহিনী, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা দেখি, তখন দেখা যায় যে এটা নূরলদীনের সময়। এবং তখন যেমন জেলে কামার কুমোর কৃষক ছাত্র জড়িত হয়েছে এবং তারা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল। একাত্তরেও তাই করেছে। তো এই ধারাবাহিকতা এটা আমাদের ভেতরে আছে। নূরলদীনের ভেতরে এই একটা জিনিস আজও করবার চেষ্টা করেছি। আরেকটা জিনিশ আছে, সেটা [...] ক্ষমতা মানুষকে নষ্ট হবার প্রলোভন দেখায়। নূরলদীনকে যখন সবাই ম্যালাদ (?) বলে ডাকতে শুরু করে তখন নূরলদীনকে সচেতন করে দেয় বন্ধু আব্বাস। যে নবাবের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ করছো। তোমার সংগ্রাম। তুমিও কি সেই নবাব হয়ে যাবে? এইরকম একটা দিকও এ নাটকে আছে। [...] শিল্প সাহিত্য তো অন্য আবেগ। এতে অনেকগুলো মাত্রা থাকে। যাকে ইংরেজিতে বলে ডাইমেনশন, অর্থাৎ লেয়ার কাজ করে।[১]

১৯৭১ সালে জাতির ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যেমন নানা শ্রেণি-পেশার লাখো মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে তেমনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত কৃষক-বিদ্রোহে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ একই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কৃষক নেতা নুরলউদ্দীনের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত দক্ষতায় লাল কোরাসের সংলাপের মাধ্যমে *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন নিম্নরূপে :

> সাজ সাজ সাজ বলিয়া ওঠে চাষায় নাঙল ফেলি,/সাজ সাজ সাজ বলিয়া ওঠে জালুয়া, যোগী, তেলী,/সাজ সাজ সাজ বলিয়া ওঠে সুতার, কামার, কুমার।/ নাঙল ফেলি, বাইশা ফেলি, জাল ফেলিয়া দিয়া,/ কেতাব ফেলি, সড়কি লাঠি গুলতি ধরিয়া,/ যার যা আছে হাতের কাছে তাই না ধরিয়া, গাছের কাঁচা বেল পাড়িয়া ধনুক ধরিয়া,/সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৭৭)

---

[১] 'অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার : রাঢ় বাঙলার মুগ্ধ চিত্রকর', মাসিক *বলাকা*, সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকে উচ্চারিত এই আহবানের সঙ্গে ১৯৭১ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু-প্রদত্ত ভাষণের বিষয়গত ও ভাষাগত চমৎকার সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। আর এভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে কৃষকদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত কাব্যনাট্যে পরোক্ষভাবে ঘুরে ফিরে আসেন মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান :

> এরপর যদি এগুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় – তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের, মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।[১]

নূরলদীনের সারাজীবন রচনাকালে সৈয়দ শামসুল হকের অবচেতন মানসলোকে বিরাজ করছিলেন বঙ্গবন্ধু; তাঁর বিশাল অবদান এবং নির্মম ও হৃদয়বিদারক মৃত্যুপ্রসঙ্গ। এমন কি নাটকের শেষদিকে বিদ্রোহী নেতা নূরলদীন বাঙালি জাতিকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটি বঙ্গবন্ধুর দেশ ও জাতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অনুরণন। নূরলদীন দেশ ও জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অসীম সাহস নিয়ে প্রশিক্ষিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে, জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন সেই একই কর্তব্যচেতনায় প্রভাবিত ও উদ্দীপিত হয়ে সেই যুদ্ধের সফল ইতি টেনেছেন তারই উত্তরপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে অধিকারপ্রতিষ্ঠা ও মুক্তির স্বপ্নগুলো সঞ্চারিত হয়েছে। নূরলদীনের স্বপ্ন প্রকৃতার্থে আবহমান বাঙালির যূথবদ্ধ স্বপ্ন। একারণে নূরলদীন অতীত হয়েও বর্তমান ; মৃত থেকেও বেঁচে আছেন কোটি বাঙালির অন্তর্সত্তায় :

> দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ / আবার বাংলার বুকে জোয়ারের পলি পড়িতেছে। / দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ / আবার নাঙল ঠেলি মাঠে চাষী বীজ বুনিতেছে। / দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ / নবান্নের পিঠার সুঘ্রাণে দ্যাশ ভরি উঠিতেছে। / [...] দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ / [...] সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৪৬)

---

[১] রফিকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা', *বাঙলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

এই সোনাঝরা বাংলায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এসে এদেশের সাধারণ নিরীহ জনগোষ্ঠীকে শাসন-শোষণ করেছে এবং এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। ব্রিটিশরা নানান প্রক্রিয়ায় লাখ লাখ টাকার সম্পদ ও মূল্যবান বস্তু পাচার করেছে ইংল্যান্ডে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা যখন এদেশে প্রথম আসে তখন তারা ছিল কপর্দকশূন্য, কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে তারা নিয়ে গেছে বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ। ইংল্যান্ডে 'চতুর্থ পার্লামেন্টারি রিপোর্ট – ১৭৭৩'-এ প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী জানা যায়, ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট দ্বারা নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাতে দেখা গেছে ১৭৫৭ হতে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার থেকে মোট ৬০ লাখ পাউন্ড, অর্থাৎ নয় কোটি টাকা শুধুমাত্র উৎকোচ হিসেবেই গ্রহণ করেছিল।[১] একইভাবে পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ অন্যায়ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেছে। এর ফলে এদেশের বুকে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা। আর তার অনিবার্য ফলস্বরূপ এদেশে নেমে এসেছে ভয়াল দুর্ভিক্ষ। এ কারণে মুক্তিকামী নেতাদের দেশ ও জাতিকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম স্বপ্ন 'দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ/ সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশেই আছে।'

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে দেয়া বাঙালির প্রাণের ছয় দফার মধ্যেও এ দাবিটি সন্নিবেশিত ছিল। ছয় দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি দফাই ছিল অর্থনৈতিক সমবন্টনের। ঐতিহাসিক ছয় দফার তিন, চার এবং পাঁচ নম্বর দফায় বলা হয়েছে :

> ৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। মুদ্রাব্যবস্থা আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা স্টেট ব্যাংক থাকবে। অথবা সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।
>
> ৪. সব রকম কর ও শুল্ক ধার্য করা ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সাথে সাথেই সে অংশটুকু ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এ টাকাতেই ফেডারেল সরকার চলবে।

---

[১] 'মাটির নবাব নূরলউদ্দীন', অন্যআলো : ফিচার, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে।[১]

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হকের চেতনায় এবং মননে বাংলাদেশের লোকপ্রিয় একজন গণনায়ক হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরঞ্জীব হয়ে বেঁচে ছিলেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যখন এদেশে সামরিক শাসকের কালাকানুনের কারণে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তথা সাধারণ জনগণের বাকস্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল, তখন সৈয়দ শামসুল হক রংপুর অঞ্চলের ঐতিহাসিকঘটনা ও 'চরিত্রকে মঞ্চের কেন্দ্রে স্থাপন করে *নূরলদীনের সারাজীবন* লিখলেন, তার মধ্যে দূর অতীতের অপরিহার্য উপাদান থাকলেও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে ভাষ্য রচনা করেছেন, তাতে নিকট অতীতের বঙ্গবন্ধুকে প্রতীকী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করার সংকেত শনাক্ত করা দুরূহ নয়।'[২] কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক আবার আলোচ্য নাটকে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির কথা স্বীকার করে নেননি। যেমন, সৈয়দ শামসুল হকের বন্ধু ও নাট্যজন আতাউর রহমান বলেছেন :

> আমি মনে করি নূরলদীনের সারাজীবন নাটকে হক ভাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি এনেছেন পরোক্ষভাবে ; বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি নয়। কোনো দর্শক যদি মনে করেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা প্রধান, তাহলে সেই দর্শক হয়তো নূরলদীনের সারাজীবন-এ বঙ্গবন্ধুর ছায়া খুঁজে পাবেন।[৩]

বস্তুত, কৃষিই আমাদের সমাজের আদি শিল্প এবং কৃষির ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে মানবসভ্যতা। বিশ্বের প্রাচীন ও বৃহত্তর তিনটি সভ্যতা মিশর, চীন এবং ভারতের অগ্রগতির মূল কারণ ছিল কৃষিশিল্পের বিপ্লবাত্মক উন্নয়ন। কিন্তু ইয়োরোপীয় বেনিয়ারা বারবার এই কৃষিব্যবস্থার ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করে, কৃষিজাত সম্পদ লুণ্ঠন করে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছে। এর ফলে এদেশের কৃষিনির্ভর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। রংপুর অঞ্চলে কৃষকদের ওপর অযাচিত কর আরোপ করেন তৎকালীন গভর্নর

---

[১] প্রীতিকুমার মিত্র, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস : ১৯৫৮-১৯৬৬', প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস : ১৯৪৭-১৯৭১* , আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৩৪

[২] ২৬. শফি আহমেদ, 'শেক্সপিয়রের অনুবাদক সৈয়দ শামসুল হক ', মাসুম রহমান (সম্পা.), পাক্ষিক *অন্যদিন*, ঢাকা, বর্ষ ২১, সংখ্যা ১৪, ১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৮

[৩] আতাউর রহমান, সাক্ষাৎকার, 'হ্যামলেট প্রসঙ্গে আলাপচারিতা', পাক্ষিক *অন্যদিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তা সুদে আসলে আদায় করেন দেওয়ান দেবী সিং। মূলত দেবী সিংয়ের অত্যাচার ও নির্মমতায় অতিষ্ঠ হয়েই রংপুরের কৃষকগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ-বিদ্রোহ ১৭৮৩ সালের 'রংপুর বিদ্রোহ' নামে উল্লেখিত হয়েছে। দেবী সিং ছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ইজারাদার। তিনি ছিলেন কুটিল, নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ। দেবী সিংয়ের অবর্ণনীয় নৃশংসতায় রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়াসহ আশপাশের এলাকা পরিণত হয়েছিলো জনহীন শ্মশানক্ষেত্রে। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের মতে : 'কোম্পানির বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভের পর সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে যে অবর্ণনীয় অরাজকতা দেখা দিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ ছিল দেবী সিংহের লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন।'[১]

যখন ধীরে ধীরে এ অঞ্চল পরিণত হচ্ছিল মৃত্যুকূপে, নগন্য সম্পদটুকু, সামান্য বসতবাড়িটুকু এমন কি সন্তানের মুখের সামান্য আহারটুকুও দেবীসিং ও তার দলবল কেড়ে নিয়েছিল, নির্যাতিত ও নিঃস্ব এসব মানুষের যখন আর কিছুই হারাবার ছিল না তখনই তারা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে শিরদাঁড়া ঋজু করে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করতে হয়েছে ইংরেজদের এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তারা পিছু হটেনি। কৃষকদের এই আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যুগপুরুষ নূরলদীন। 'খনির ঘন অন্ধকার থেকে যেমন করে উঠে আসে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড, তেমনি সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকে উঠে আসেন এক অসামান্য মানুষ, একজন অমিতবিক্রমশালী সিংহহৃদয় পুরুষ। নিপীড়িত জনগণকে সংবদ্ধ করে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে প্রবল তেজে রুখে দাঁড়ান তিনি।'[২]

লক্ষণীয় যে, ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের জীবন ও জনপদ বিষয়ক গ্রন্থরচনায় এদেশীয় ইতিহাসবেত্তাগণ বিস্ময়কর নিস্পৃহতা প্রদর্শন করেছেন। ইতিহাসের পরিবর্তে তারা বরং প্রাচীন মুনি-ঋষিদের কাহিনি বর্ণনায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন; পুরাণকাহিনি বর্ণনায় উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। প্রাক-ব্রিটিশপর্বে, অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলেও যাঁরা ইতিহাস রচনা করেছেন তাদের লেখনীর বিষয়বস্তু রাজরাজড়ার তোয়াজ-তোষামোদের মধ্যেই সীমায়িত থেকেছে; সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখময় বাস্তব জীবনকে তারা গুরুত্ব দেননি। অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদের পূজারী ইতিহাসবেত্তাগণ ব্রিটিশ শাসনের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে প্রকৃত সত্য বিকৃত করে ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই অনেকটা বিকৃত করে ফেলেছেন। ব্রিটিশদের শোষণের কথা নয়,

---

[১]সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১০৬

[২] ফরিদ আহমেদ, 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়', blog.mukto-mona.com, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, ঢাকা

বরং সুশাসনের কথাই তারা সাড়ম্বরে বলেছেন। ফলে এদেশের মানুষের যুগযুগব্যাপী বঞ্চনা ও সংগ্রামের ইতিহাস অনেকটাই অপ্রকাশিত থেকে গেছে। হয়তো এ কারণেই রংপুরের কৃষকবিদ্রোহের নেতা নূরলউদ্দীনের বিশদ পরিচয় ইতিহাসের পাতায় তেমনটা নেই। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* গ্রন্থের 'রংপুর বিদ্রোহ' পরিচ্ছেদে এই বীরের সামান্য কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর অসামান্য ধীশক্তি ও কল্পনাসহযোগে এই সামান্যসূত্রের আশ্রয়ে রচনা করেছেন অসামান্য কাব্যনাটক *নূরলদীনের সারাজীবন*। বলাবাহুল্য এদেশের মানুষের কাছে ইতিহাসের এই মহানবীরকে তিনিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এদেশের আপামর জনসাধারণ সুপ্রকাশ রায়ের নূরলউদ্দীনকে না চিনলেও সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনকে চেনেন; জানেন তার অসামান্য উদাত্ত আহবান – 'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়'।

বলা যায়, *নূরলদীনের সরাজীবন* নাটকটি আদ্যন্তই একটি রাজনৈতিক নাটক। 'রাজনীতি এ-নাটকে অন্তঃসলিলা অথচ বহতা স্রোতস্বিনী।'[১] কিন্তু এ নাটকের প্রতিবাদ-সংগ্রামের ভাষা কখনোই শ্লোগানধর্মী হয়ে ওঠেনি। এ নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৭৮৩ সাল। কিন্তু বাংলাদেশে নীলচাষের ব্যপক বিস্তার ঘটেছে ১৭৮৮ সালের পরবর্তীকালে। যদিও এদেশে নীলচাষের সূত্রপাত ঘটেছে মঁশিয়ে লুই বোর্নাদ নামক এক ফরাসি বণিকের মাধ্যমে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে।[২] হতে পারে নাট্যকার বাংলার কৃষক বিদ্রোহের একটি যৌক্তিক কার্যকারণ তুলে ধরার নিমিত্তে আলোচ্য কাব্যনাটকের পরিসর একটু বাড়িয়ে নিয়েছেন। এতে করে নাট্যঘটনায় যেমন ক্লাইমেক্স তৈরি হয়েছে, তেমনি নাট্যঘটনার প্রতি এবং নাটকের নির্যাতিত চরিত্রের প্রতি দর্শকের আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবার, ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় তাঁর গ্রন্থে দেবী সিং সম্পর্কে যেসমস্ত তথ্য উল্লেখ করেছেন তিনি সেগুলি পেয়েছেন আরেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী* নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের তথ্যানুসারে অত্যাচারী দেবী সিং ছিলেন পশ্চিম-ভারতের পানিপথের নিকটবর্তী এক গ্রামের বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি ভাগ্যান্বেষণে প্রথম মুর্শিদাবাদে আসেন। মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নায়েব দেওয়ান মহম্মদ

---

[১] ১৪. কিশোর সেনগুপ্ত, 'নূরলদীনের সারাজীবন : আমাদের অন্বেষণ', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো..*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ ৭৮৮

[২] '১৭৭২ সালে এদেশে প্রথম নীল চাষ আরম্ভ করেন মঁশিয়ে লুই বোর্নাদ নামে একজন ফরাসি বণিক। [...] যতদূর জানা যায় ১৭৮৮ সালের আগে বাংলাদেশে নীল চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি।' (দ্রষ্টব্য : শাহরিয়ার ইকবাল, *নীল বিদ্রোহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩)

রেজা খাঁকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করে দেবার লোভ দেখিয়ে পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ইজারাদার হন তিনি। এ অঞ্চলে পূর্বে যেখানে বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হতো, দেবী সিং সেখানে রেজা খাঁর সঙ্গে বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকা খাজনা আদায়ের চুক্তি করেন। রেজা খাঁ ইতঃপূর্বে যেখানে নয় লক্ষ টাকার স্থানে ছয় লক্ষ টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হতেন, দেবী সিং ইজারাদার হয়েই বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকাসহ ব্যাক্তিগত খাতে আরও বাড়তি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ প্রজাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। তাঁর এই অমানুষিক অত্যাচারে টিকতে না পেরে প্রজারা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়, এবং অচিরেই ব্রিটিশ বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে, এবং তৎকালীন গভর্নর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদেশে দেবী সিংকে ১৭৭২ সালে ইজারাদারের পদ থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সুচতুর দেবী সিং অর্থলোভী ওয়ারেন হেস্টিংসকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ দিয়ে সে যাত্রায় বেঁচে যায়, এবং পূর্বের মতোই প্রজাদের ওপর তীব্র অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় উক্ত অঞ্চলে পুনর্বার তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার পরিবর্তে হেস্টিংস আবারও মোটা অঙ্কের উৎকোচ নিয়ে দেবী সিংকে মুর্শিদাবাদ-পূর্ণিয়ার ইজারাদারের পদ থেকে সরিয়ে মাসিক একহাজার টাকা বেতনে দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত করে রংপুর অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই পর্যায়ে ধূর্ত দেবী সিং অতিদ্রুত দেওয়ানি পদের পাশাপাশি দিনাজপুর, রংপুর ও এদ্রাকপুর পরগণার ইজারা বন্দোবস্ত করে নেন এবং পুরানো রূপে ফিরে গিয়ে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে পৈশাচিক অত্যাচার শুরু করেন। সাধারণ জনগণের উপর এসব অত্যাচারের ক্ষেত্রে দেবী সিংহের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলো হররাম নামক নিষ্ঠুর, পাষাণ প্রকৃতির এক ব্যাক্তি। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় তাঁর *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী* নামক গ্রন্থে দেবী সিংহের সহকারী হররামের নির্যাতন প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> দেবীসিংহ ইজারা লইয়া জমিদার ও প্রজা উভয়ের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। হররাম নামে এক পিশাচ প্রকৃতির মনুষ্য তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া, দেশমধ্যে ভয়াবহ কাণ্ডের ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। কি জমিদার, কি প্রজা, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও বিন্দুমাত্র নিষ্কৃতি ছিল না। এরূপ লোমহর্ষক অত্যাচার কেহ কখনও দেখে নাই, বা কেহ কখনও শুনে নাই।[১]

[১] নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩২১

উল্লেখ্য, সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কাব্যনাট্যে হরেরাম নামক এক ব্যাক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেও তাকে ইতিহাসের সত্যানুসারে দেবী সিংহের লোক না দেখিয়ে বরং নূরলদীনের অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা প্রকাশে নূরলদীনের লোক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

শুধু সাধারণ কৃষকই নন, অনেক ভূস্বামী, সম্ভ্রান্ত জমিদারও দেবী সিংয়ের অতিরিক্ত খাজনা আর নানাপ্রকার নিয়মবহির্ভূত নীতির শিকার হয়ে তাদের জমিদারি হারাতে থাকে। এসব জমিদারি নামমাত্র মূল্যে কিনে নেন ধূর্ত দেবী সিং এবং কৃষকদের ওপর বাড়িয়ে দেন অত্যাচারের মাত্রা । ফলে কৃষকদের দুরবস্থা চরমে ওঠে। রংপুর অঞ্চলের নিরীহ ভুক্তভোগী চাষিদের করুণ অবস্থার চিত্র স্বয়ং দেবী সিং একটি পত্রে উল্লেখ করেন এভাবে :

> ইহা অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় যে, বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা রঙ্গপুর প্রদেশের কৃষকদিগের মধ্যেই ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। শস্য কাটার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় তাহাদের ঘরে কোনরূপ সম্পত্তি পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাদিগকে অন্য সময়ে অতি কষ্টে আহারের উপায় করিতে হয়, এইজন্য দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক লোক কাল-কবলে পতিত হইতেছে। দুটি একটি মৃৎপাত্র ও একখানি পর্ণকুটীর মাত্র তাহাদের সম্বল ; ইহাদের সহস্রখানি বিক্রয় করিলেও দশটি টাকা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।[১]

দেবী সিংয়ের পাশাপাশি এসময় সুযোগসন্ধানী মহাজন শ্রেণিও তৎপর হয়ে ওঠে। সাধারণ চাষিরা যখন দেবী সিংয়ের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতির জন্য মহাজনদের দ্বারস্থ হয়েছে তখন তারা কড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে কৃষকদের ওপর নতুন করে আর্থিক চাপ তৈরি করতে শুরু করেছে। ফলে একদিকে অনাদায়ী খাজনার কারণে কৃষকশ্রেণি দলে দলে কারাগারে বন্দিদশা ও নির্মম অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে মহাজন শ্রেণি এই সুযোগে অবৈধ উপায়ে গড়ে তুলছে সম্পদের পাহাড়। ঐতিহাসিক নিখিল রায়ের ভাষ্যে এই নির্মম ঘটনার চিত্র নিম্নরূপ :

> এই সময়ে রঙ্গপুর অঞ্চলে কতকগুলি রাক্ষস প্রকৃতির কুসীদজীবী বাস করিতেছিল। মহাকবি সেক্সপীয়রের বর্ণিত শাইলকও তাহাদের সমকক্ষ ছিল না। [...] শুনিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় যে, সেই সমস্ত কুসীদজীবি বিপন্ন কৃষকদিগের নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা সুদ আদায় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল!!! একদিকে দেবী সিংহের, অন্যদিকে কুসীদজীবিগণের ভীষণ অত্যাচারে সেই নিরীহ প্রজাগণ প্রতিনিয়ত উর্ধ্বমুখে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

ভগবানকে আহ্বান করিত ; [...] তাহাদের কঠোর-পরিশ্রমোৎপাদিত শস্যরাশি বলপূর্বক বাজারে লইয়া এক-চতুর্থাংশেরও কম মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। হতভাগ্যগণের সংবৎসরের আহার্য সম্পত্তি অপহৃত হইল, অথচ তাহাদের ঋণপরিশোধের বিশেষ কোন সুবিধাও হইল না!! অবশেষে তাহাদের লাঙ্গল, বলদ, মই, বিদা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হয়। এইরূপে তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ শস্যোৎপাদনের পথও একেবারে নিরুদ্ধ হইল। তাহার পর, তাহাদিগের জীর্ণ পর্ণকুটীর লুণ্ঠন করিয়া, দেবীসিংহের অনুচরগণ সেই সকল কুটীর অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। [...] এতদিন যাহারা শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আপনাদের আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ করে নাই, এক্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়া বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল ! [...] অনাহারে রঙ্গপুরবাসী প্রজাগণের মধ্যে ঘোর কষ্ট দেখা দিল ; পিতা পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল, স্বামী স্ত্রীকে চিরবিসর্জন দিল। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থসংসার হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। [...] এককথায় সমস্ত উত্তরবঙ্গ জনমানবহীন হইয়া শ্মশান অপেক্ষাও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।[১]

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকটিতেও নূরলদীনের জবানিতে এই নির্মম অত্যাচারের বিপরীতে নিরীহ ও নিঃসহায় কৃষকের করুণ অবস্থা অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। কৃষক নেতা নূরলদীন কোম্পানির প্রতিনিধি মরিসকে উদ্দেশ্য করে বলেছে :

আর একদিন, আল্লার সেই একদিন, দেখিলোম তোমার বন্ধু / দেবী সিং, খাড়া হয়া আছে হামার বাড়ির বগলে। / জন্মে যা শোনো নাই, চৌগুণা খাজনা চায়,/ আব্যড় ড্যাবড় নগদে চায়, বাটা চায় টাকায় আট আনা, / দিবার না পারিলে সব লুটি নিয়া যায়। / অগ্নি দিয়া যায়, হাহাকার করি উঠিলোম সকলে। [...] একদিন টাকায় টাকা সুদ স্বীকার করি মহাজনের ঘরেতে গেইলোম, / কর্জ শোধ করিবার না পাই বলিয়া জমি লিখিয়া দিলোম,/ ঘটি বাটি লাঙল বলদ মই বিক্রি করিলোম, / বাপ হয়া বিক্রি করিলোম ব্যাটা, স্বামী হয়া ইস্তিরি, / যুবতী কন্যা নিলো কাড়ি, / জংগলে পলেয়া গেইলোম, গোরস্তান শ্মশান হয়া গেইল/ হামার বাপোদাদার বাড়ি, / হামার নিজের ভিটা, নিজের মাটি চলি গেইল শয়তানের দখলে। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ১০২)

আবার, দেবী সিংয়ের সঙ্গে কোম্পানির প্রতিনিধিদের যে সম্পর্ক, বিশেষত গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করার ঐতিহাসিক সত্যটিকে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক নিপুণ বাস্তবতায়

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৭

তুলে ধরেছেন আলোচ্য কাব্যনাটকে। রংপুরে সদ্য আগত রেভিনিউ সুপারভাইজার মরিসের সঙ্গে দেবী সিং প্রসঙ্গে কোম্পানির কালেক্টর গুডল্যাডের কথোপকথন প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য। মরিসের উক্তি –

> মহামান্য কালেকটর, আপনার অভিজ্ঞতা আমার নির্ভর। / মাত্র তিনদিন আগে, দেবী সিং এসেছিল আমার কুঠিতে, / কিঞ্চিৎ ব্যাপারে, গুরুতর কিছু নয়, / মোটামুটি আমার কুশল আর সাফল্য কামনা। / সেই সঙ্গে একপ্রস্থ মসলিন, আর কিছু সোনা। [...] আমার তো মনে হয়, দেবী সিংও ব্যাতিক্রম নয়। / বড় জোর স্বার্থেই সে আছে সঙ্গে, তার বেশি নয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৮৯)

গুডল্যাডের উক্তি :

> ওতে দোষ নেই।/ কোম্পানির ক্ষতি নেই। [...] ডিয়ার মরিস, কোম্পানীর রেভেনিউ সুপারভাইজার,/ স্বার্থ আছে আমাদেরও। – নির্ধারিত রাজস্ব আদায়। / কোম্পানীর কুঠির ফ্যাকটর,/ [...] স্বার্থটা উভয় পক্ষে এক হলে, মিত্র হয়ে যায় পরম শত্রুও। / স্বার্থেই সে আমাদের লোক। / তাছাড়া, নিশ্চয় তুমি জানো, অন'বল ওয়ারেন হেস্টিংস, তার বড় প্রিয়পাত্র এই দেবী সিং – এবং আমারও। ক্রমে ক্রমে তোমারও সে হবে। নেটিভের চোখ ও জিহ্বার চেয়ে আমাদের কাছে / বরং আকর্ষণীয়, হাত, তার হাত। / বরং এ লক্ষ্যণীয়, সেই হাত দেয় কি না দেয়, / দেয় যদি কতখানি দেয়, তোমাকে বা দেয় কতখানি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৮৯)

বস্তুত দেবী সিং এবং কোম্পানির প্রতিনিধিবর্গ পরস্পরের স্বার্থরক্ষায় একযোগে অত্যাচার চালিয়েছে এদেশের সাধারণ জনগণের ওপর। দেবী সিং নিজে যখন নির্মম অত্যাচার চালিয়েও প্রজাদের কাছ থেকে আশানুযায়ী খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে, তখন একের পর এক কর্মচারী বদল করে অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুর কর্মচারী নিয়োগ করেছে। দেবী সিংয়ের আপন ভ্রাতা বাহাদুর সিং এবং আরেক স্বদেশীয় পাষণ্ড হরেরাম যুগপৎ অত্যাচার চালিয়ে মূল খাজনার অতিরিক্ত কর ও বাটার জন্য কৃষকদের নিকট থেকে প্রতি টাকায় আট আনা পর্যন্ত সুদ আদায় করেছে পৈশাচিক উল্লাসে। মূলত ইংরেজ বেনিয়াদের অত্যাচারের চেয়েও ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক ছিল স্বদেশীয় জমিদার-জোতদারদের অত্যাচার ও আচরণ। প্রতিযুগে ভিন্ন নামে ও পরিচয়ে এ-স্বদেশদ্রোহী মনুষ্যনামধারী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে এবং বিদেশিদের স্বার্থ-সংরক্ষণে চরম সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বদেশ-স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মীরজাফর-জগৎশেঠ, ১৭৮৩ সালে দেবী সিং, ১৯৭১ সালে রাজাকার-আলবদর-আলশামস নামের দেশদ্রোহী নানান সংগঠন। অনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থলোভ এদের মনুষ্যত্বহীন পাষণ্ডে পরিণত করেছে। সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যের নায়ক নূরলদীনও এই স্বজাতিদ্রোহীদের প্রসঙ্গে তীব্র বিষোদগার করেছেন :

> গোরা নয়, / কারণ গোরার কামান বন্দুক আছে, / তাঁই কিছু নয়, / তারো চেয়ে বড় অস্ত্র আছে, / আছে তার হাতিয়ার – / মহাজন জমিদার। / গোরার কি শক্তি আছে / যদি তার সঙ্গে নাই থাকে এই দেশীয় শুয়ার? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৮৭)

রংপুর, দিনাজপুর এবং এদ্রাকপুরের ইজারাদার দেবী সিং ও দলবল কর্তৃক অবর্ণনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে এ অঞ্চলের সকল কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজেদের আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসেবে কৃষক নেতা নূরলদীনের নেতৃত্বে ১৭৮৩ সালব্যাপী উত্তরবঙ্গের বিভিন্নস্থানে গোপন সভা সমাবেশে মিলিত হয়ে আসন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে। প্রথম দিকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাসীন ব্রিটিশদের সঙ্গে সরাসরি সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে দেবী সিং এর শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিকার করা। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন :

> রংপুরের কালেক্টরের নিকট তাহাদের দাবী সম্বন্ধে একখানি আবেদন-পত্র পেশ করিয়া এই দাবি পূরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কালেক্টর দাবী পূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না। ইহার পর কৃষকগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহারা কালেক্টরকে জানাইয়া দিল, তাহারা আর খাজনা দিবে না এবং এই শাসন মানিয়া চলিতেও প্রস্তুত নহে।[১]

ইতিহাসের এই সত্য ঘটনাটিকে সৈয়দ শামসুল হকও তাঁর আলোচ্য কাব্যনাটকে উপস্থাপন করেছেন। কাব্যনাটকটির ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায় কৃষকনেতা নূরলদীন, তার বন্ধু ও সহচর আব্বাস এবং এলাকার শোষিত কৃষককুল মিলিত হয়ে টমসনের কুঠির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রংপুরের কালেক্টরের নিকট আর্জি জানাতে এসেছে। এখানেই নূরলদীনের বক্তব্যে জানা যায় ইতঃপূর্বে আরও কয়েকবার তারা দেবী সিংয়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি প্রজাদের স্বার্থরক্ষা না করে বরং তাদের নিয়োজিত ইজারাদার দেবী সিংয়ের পক্ষাবলম্বন করেছে এবং এতদ্বিষয়ে নিস্পৃহতা প্রদর্শন করেছে। নূরলদীন ও তাবৎ সাধারণ কৃষক ইংরেজ বেনিয়াকে তাই শেষবারের মতো সাবধান করে বলেছে :

---

[১] *Gazetteer of Rangpur District, 1911*, p-30, (দ্রষ্টব্য : সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯)

> একদিন অনেক যুক্তি করি ভাবি চিন্তি সকলের তরফে মুঁই / এক দরখাস্ত করিলোম ভদ্রমতে / কোম্পানীর ঘরে, কোম্পানীর কালেকটর তোমার মারফতে। / উয়াতে কইলোম, সহ্যের অতীত হয়া গেইছে হামার হাল, / আর সহ্য না হয় কোনোমতে। / লিখিলোম, ইয়ার প্রতিকার তোমরা নিশ্চয় করিবেন, / জরুরী জানিয়া এই এলাকা হতে দেবী সিংকে তুলিয়া নিবেন, আর জমিদারের চাবুক কাড়ি নিবেন, / আর কাড়িয়া নিবেন মহাজনের ঘরে হামার সুদের উপর সুদ লিখিবার খাতা। / [...] তোমরা এই করিবেন নিশ্চয় আর / যা করিবেন করিবেন এই মাসের ভিতরে, / যদি এই মাস পার হয়া যায়, তবে হামরা কোনো দোষী নই, / হামার এই দুই হাত যা করে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১০৩)

কিন্তু তাদের এই আর্জি যখন কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমলে নেননি তখন এলাকার অত্যাচারিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে নূরলদীন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে :

> আর কোন বিচার কি প্রতিকার / না চাই তোমার। / [...] হামার দ্যাশে হামার অধিকার।/ মজুর কিষাণ জালুয়া যোগী আছে হামার সাথে। / এবার হতে বিচার আচার আইন হামার হাতে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১০৪)

নূরলদীনের এই উদাত্ত আহবানে উদ্দীপ্ত হয়ে কৃষকশ্রেণি সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে :

> কুঠিয়াল, হেই সাবোধান। / দেবী সিং, হেই সাবোধান। / জমিদার, হেই সাবোধান। / মহাজন হেই সাবোধান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১০৫)

এই পর্যায়ে সাধারণ কৃষক নূরলদীনকে ‘নবাব’রূপে স্বীকৃতি দেয়। নূরলদীনও অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে অনতিবিলম্বে দয়াশীল নামক এক প্রবীণ বিচক্ষণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এছাড়াও এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে তিনি এতদঞ্চলের সমুদয় কৃষককে অত্যাচারী দেবী সিংকে খাজনা না দিয়ে বরং বিদ্রোহের ব্যয় মিটানোর জন্য চাঁদা দিতে বলেন। সাধারণ কৃষক-প্রদত্ত এই ‘চাঁদা’ ইতিহাসে ‘ডিং খরচা’ নামে পরিচিত ছিল। এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ছিল এটি। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে শাসককুল এ-পর্যায়েও প্রজাসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এসকলের ঊর্ধ্বে ওঠে নূরলদীন সকল নির্যাতিত কৃষককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছে :

> আব্বাস–ভবানী–গরীবুল্লা–হরেরাম / কাঁই সঙ্গে শুনিবে হামার? / কাঁই সঙ্গে জাগিবে হামার? / মজিবর–নেয়ামত–নূরল ইসলাম– / বিপিন– অযোধ্যা–শম্ভূ– হায়দার– / এ নিশীথে কাঁই সঙ্গে জাগিবে হামার? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১২১)

ধর্মের বিভেদ ভুলে সাধারণের জন্য লড়াই করেছেন নূরলদীন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আরোপ করেননি। আর এ কারণেই তিনি হতে পেরেছেন গণমানুষের প্রাণের নেতা। ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বঙ্গবন্ধুকে নূরলদীনেরই উত্তরসুরি মনে হবে। কেননা যেখানে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মের ধুয়ো তুলে এদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, সেখানে বঙ্গবন্ধু শিখিয়েছেন বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলিম, বাংলার খ্রিস্টান, সবাই বাঙালি। নূরলদীনের এই অসম্প্রদায়িক চেতনায় রেভেনিউ সুপারভাইজার মরিস বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন :

> আমি এই লোকটিকে বুঝতে পারি না। / নিজে সে মুসলমান, অথচ মুসলমান তার হাতে নিহত হয়েছে / ঠিক হিন্দুর মতোই, একই হারে, কখনো বা একই হামলায়। / হিন্দু নয়, মুসলমান সে, / যে মুসলমান মন্দির প্রতিমা ধ্বংস পুণ্য বলে মনে করে জানি, / অথচ হিন্দুরা এই লোকটিকে, একজন মুসলমানকে / দেবতার মতো পূজা করে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১২৮)

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে সমগ্র রংপুর অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ তুমুল আকার ধারণ করে। ফলে একদিকে যেমন রংপুর অঞ্চলে দেবী সিংয়ের সকল কর্মচারী এলাকা ত্যাগে বাধ্য হয়, তেমনি পার্শ্ববর্তী কোচবিহার, দিনাজপুরের কৃষকগণও নূরলদীনের বাহিনীতে যোগ দিয়ে একযোগে নিজ নিজ অঞ্চলের নায়েব গোমস্তাদের বিতাড়িত করে ; এবং এ-বিদ্রোহে যে বাধা দিয়েছে, কৃষকগণ তাকেই হত্যা করেছে। এভাবে দেবী সিংয়ের বহু কর্মচারীর সঙ্গে এলাকার অনেক মহাজন-জমিদার কৃষকদের হাতে নিহত হয়েছে। ঐতিহাসিক খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আমেদ তাঁর *কোচবিহারের ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন :

> ইহার পর কাকিনা, ফতেপুর, ডিমলা, কাজিরহাট এবং টেপা পরগণায় বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হইয়া কর সংগ্রাহক নায়েব এবং গোমস্তা প্রভৃতিকে যত্রতত্র বধ করিতে আরম্ভ করে। ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরী বিদ্রোহীগণকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে তাঁহারও জীবনান্ত ঘটে।[১]

---

[১] খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আমেদ, *কোচবিহারের ইতিহাস*, পৃ.২১৯, (দ্রষ্টব্য : সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০)

সৈয়দ শামসুল হক ইতিহাসের এই সত্য ঘটনাটিকে তাঁর কাব্যনাটকেও উল্লেখ করেছেন কিছুটা পরোক্ষভাবে। এখানে ডিমলার জমিদারের সঙ্গে সরাসরি কৃষকদের যুদ্ধদৃশ্য না দেখিয়ে নূরলদীনের স্ত্রী আম্বিয়া এবং সহচর আব্বাসের পারস্পরিক কথোপকথনে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। আম্বিয়া যখন উদ্বিগ্ন হয়ে আব্বাসকে জানায় নূরলদীন ছয়দিন ধরে ঘরছাড়া। তখন আব্বাস তাকে জানায় :

> ডিমলার দিকে কিছু গণ্ডোগোল। ডিমলার জমিদার / মোহন চৌধুরী নিজে সেনাপতি সাজিয়া এবার / তার এলাকার / বেদখল গ্রাম গঞ্জ করিবে উদ্ধার। / অনেক মানুষ ধরি আগায় চৌধুরী। / জয় যদি হয় তার, তবে আছে আর যত চৌধুরী, / মনোতে সাহস ফিরি পাইবে আবার। / সুতরাং পয়লায় চৌধুরীকে ঝাড়ে বংশে নাশ করিবার / দরকার, দরকার /বুঝি সর্বশক্তি ধরিয়া নূরলদীন ডিমলার দিকে যায়, ছয়দিন আগে। /বৃক্ষ যদি বড় হয়, শিকড় তুলিতে তার সময় তো লাগে? / বোঝেন নিশ্চয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৩০)

অন্যত্র আম্বিয়ার কণ্ঠে গীত লোকায়ত গানে উঠে এসেছে ডিমলার জমিদারের সঙ্গে সাধারণ কৃষকদের সম্মুখযুদ্ধ প্রসঙ্গ :

> মোর পতিধন জংগতে যায় ডিমলা শহরে, / [...] ডিমলাতে হে আছে রাজা গৌরমোহন চৌধুরী, / কিষান কারিগরের গলায় মারিল তাঁই ছুরি, / বাড়ি নিল নারী নিল গস্ত করিয়া। / উয়ার গলা কাটিম এলা ঘচাং করিয়া – / ওকি ঘেচ্চাং কি ঘচ্চাং করিয়া। / রাজার বাড়ি শক্ত বাড়ি রাজায় গড়িছে। / কিষাণ সেনা আশেপাশে গত্তো করিছে। / গত্তো করি আগুন দিল বারুদ ঠাসিয়া, / ধ্বসিয়া পড়ে রাজার বাড়ি হিড়িম করিয়া – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৩৩)

আবার নূরলদীনকে 'নবাব' ঘোষণা করে আশপাশের নির্যাতিত কৃষকদের নূরলদীনের দলে সমবেত হওয়ার ঐতিহাসিক সত্যঘটনাও আলোচ্য নাটকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। বাস্তবে নূরলদীনের দেওয়ান ছিল প্রবীণ কৃষক দয়াশীল। নাট্যকার আলোচ্য নাটকেও তাকে নূরলদীনের দেওয়ানরূপেই উপস্থাপন করেছেন। অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া অন্য এলাকার কৃষকরা যখন শুনেছে ডিমলার যুদ্ধে নূরলদীন ও তার কৃষকবাহিনী জয়ী হয়েছে, তখন অবশিষ্ট কৃষকদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে প্রভূত সাহস; এবং তারা নূরলদীনের শক্তি বাড়াতে দলে দলে রংপুরে সমবেত হয়েছে। দ্বাদশ দৃশ্যের একটি মঞ্চনির্দেশনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট

হয়েছে। আবার, নূরলদীনের দেওয়ান দয়াশীলের সঙ্গে অন্য এলাকা থেকে যুদ্ধে যোগ দেবার নিমিত্তে আগত কৃষকদের কথোপকথনে এই বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে :

> ইংরাজ হতে মুক্তি চাই / দেবী সিং হতে রক্ষা চাই / [...] দিনাজপুর হতে – দিনাজপুর। / আসিলোম এই দ্যাশে / নবাব নূরলদীনের সাথে যোগ দিবার উদ্দেশে। [...] / ক্ষুধার প্যাটে অন্ন চাই / উদাম দেহে বস্ত্র চাই / অন্ন চাই বস্ত্র চাই / [...] কুচবিহার হতে – কুচবিহার। আসিলোম এই দ্যাশে / নবাব নূরলদীনের সাথে যোগ দিবার উদ্দেশে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৪১)

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন কৃষকদের এই সম্মিলিত আক্রমণে দেবী সিং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর গুডল্যাডের শরণাপন্ন হন। যেহেতু দেবী সিংয়ের অবৈধ উপার্জনের একটা বড়ো অংশ উৎকোচ হিসেবে গুডল্যাড ভোগ করত, তাই দেবী সিংকে কৃষক-আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য রংপুর অঞ্চলে অবিলম্বে কয়েকটি দলে সিপাহিদের প্রেরণ করেন; এবং এই বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব দেন লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড। নিষ্ঠুর ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী যাত্রাপথে এসময়ে সম্মুখে যাকে পেয়েছে তাকেই নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করে তারা নূরলদীন ও তার বাহিনীর সন্ধানে অগ্রসর হতে থাকে। এদিকে মোগলহাট নামক স্থানে ক্ষুব্ধ কৃষকরা নূরলদীনের নেতৃত্বে দেবী সিং এবং ম্যাকডোনাল্ডের বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর নিকট সাদামাটা লাঠিয়াল কৃষক বাহিনী টিকতে না পেরে অসহায়ভাবে যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে নূরলদীন বীর বিক্রমে লড়াই করে, এবং আহত হয়ে শত্রুসেনাদের হাতে বন্দী হয়। অন্যদিকে তার দেওয়ান দয়াশীল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ হারান। নূরলদীনও শত্রুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শত্রুশিবিরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরপর ১৭৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাটগ্রামে আর একটি বিশাল বিদ্রোহী কৃষকবাহিনীকে ম্যাকডোনাল্ড ও তার বাহিনী সম্মুখ সমরে পরাজিত করে। এবং এই যুদ্ধের পর কৃষক বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাটগ্রামের যুদ্ধে কৃষকবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের পরপরই শুরু হয় কৃষকদের ওপর ইংরেজ বাহিনীর পৈশাচিক অত্যাচার, নৃশংস তাণ্ডব। মোগল হাটের যুদ্ধ ও নূরলদীনের এই পরাজয় নিয়ে গুডল্যাড তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন :

> In an attempt to burn Mughalhat, the self-styled Nawab's forces were defeated, and the Nawab himself wounded and taken prisoner. A party of sepoys under Lieutenant Macdonald marched to the north against the principal body of insurgents and a

decisive engagement was fought near Patgram on the 22nd February 1783. The sepoys disguised themselves by wearing white clothes over their uniform and by that means got close to the rebels, who were utterly defeated; sixty were left dead on the field, and many others were wounded and taken prisoners.[১]

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর নাটকের কাহিনিতে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে এই যুদ্ধের বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত শিল্পকুশলতায় :

দস্যু নূরলদীনে দ্যাখো আশেপাশেই আছে – / [...] সে ঠাঁয় দ্যাখো জনমানুষের শতেক ঘর আছে। / ঘরগুলাতে আগুন দিলোম সটকি পড়ে পাছে / আংগরা করি দিলোম তবু মানুষ মরে নাই। / [...] জ্যান্ত পারেন মড়ায় পারেন আনেন উয়ার লাশ। / [...] পশ্চিমেতে ফাঁসী দিলোম মানুষ ধরি গাছে। / চৌমাথাতে শতে শতে কিষান ঝুলি আছে। / শ্মশান করি দিলোম তবু আওয়াজ ক্যানে পাই? / [...] কাঁই কইলে কাঁই কইলে দক্ষিণেতে আছে? / ডিং খরচা নূরলদীনে সে ঠাঁয় তুলিয়াছে। / দক্ষিণেতে বন্ধ করি দিলোম খেওয়াঘাট। / ভাত বন্ধ করি দিলোম বন্ধ বাজারহাট। [...] দস্যুরা এখানে আছে, এই পাটগ্রামে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১২৩)

অন্য আর একটি পরিচ্ছেদেও নীলকোরাসের ঘোষণার মাধ্যমে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তার এদেশীয় দোসরদের সাধারণ জনগণের প্রতি সীমাহীন শোষণ-অত্যাচারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সাধারণ কৃষকদের ন্যায্য অধিকারপ্রাপ্তির আন্দোলনকে তারা নাম দিয়েছে দস্যুতা। এবং এদের গ্রেফতারের জন্য তারা জনমনে তৈরি করছে বিভ্রান্তি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও ঠিক এমনটা দেখা গিয়েছিল। শাসক পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে বানিয়েছিল ভারতের দালাল, আর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিকট ছিল দস্যু ও দেশদ্রোহী। জনগণকে বিভ্রান্ত করতে তারাও ধর্মকে ব্যবহার করে নানান ভুলতথ্য প্রচার করেছিল; যার প্রমাণ রয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর কাহিনিতে। *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকেও রয়েছে কৃষকদের সম্পর্কে কোম্পানির বিভ্রান্তিমূলক সম্প্রচার এবং সাধারণের প্রতি অত্যাচারের প্রতিচিত্র :

'এই এলান দ্বারা তামাম সুবা বাঙালার প্রজাবৃন্দকে জানানো যাইতেছে, / কোম্পানী বাহাদুরের অশেষ যত্ন এবং সুচারু ব্যবস্থা সত্ত্বেও / কতিপয় দুর্বিনীত ব্যাক্তি এখন পর্যন্ত সমাজের অভ্যন্তরে রহিয়া গিয়াছে, / ইহারা

[১] দ্রষ্টব্য : ফরিদ আহমেদ, 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়', blog.mukto-mona.com, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, ঢাকা

> অশেষ প্রকার দুস্কৃত সাধনে তৎপর রহিয়াছে, / পরগণায় পরগণায় লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতেছে, / সরলমনা কৃষক ও কারিগরদিগকে আপন আপন কর্ম করিতে বাধা দিতেছে, / নানা মিথ্যা বাক্যে তাহারা প্রজাবৃন্দকে দস্যুদলে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করিতেছে। / [...] এই দস্যুদিগের হাত হইতে প্রজার সম্পদ, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় / কোম্পানী বাহাদুর বদ্ধ পরিকর জানিবেন। [...] হুকুম [...] নিজস্বার্থে দস্যুদিগের গতিবিধির সংবাদ সরবরাহ করুন। / [...] নিজস্বার্থে অবিলম্বে দস্যুদিগকে ধরাইয়া দিউন। / [...] যদি কোনো গ্রামে দস্যুরা আশ্রয় লইয়াছিল – এই সংবাদ পাওয়া যায়, / সেই গ্রামে পাইকারি জরিমানা ধার্য করা হইবে। / যদি কেহ দস্যুদিগের সংবাদ জানিয়াও গোপন করে / সেই ব্যক্তিকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইবে। / দস্যুদিগের পরিবারে প্রতিটি সদস্যকেও ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা যাইবে। / দস্যু কেহ ধরা পড়িলে তাহার ফাঁসী হইবে।/ যাবত না পচিয়া গলিয়া নিশ্চিহ্ন হয়, তাহার লাশ ঝুলিয়া রাখা হইবে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১০৮)

নূরলদীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রংপুর অঞ্চলে সংঘটিত এই বিদ্রোহ আপাতভাবে দমিত হলো ঠিকই, কিন্তু কৃষকের অন্তরে থেকে গেল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্পৃহা। নাটকের শেষ দৃশ্যে আব্বাসের উচ্চারিত সংলাপে এ-সত্যটিই বিজ্ঞাপিত হয়েছে – 'ধৈর্য সবে – ধৈর্য ধরি করো আন্দোলন। / লাগে না লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিংবা কয়েক জীবন।' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫০)

কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৩ সালে দেবী সিং কৃষকদের নিকট থেকে একপয়সাও খাজনা আদায় করতে পারেনি। ফলে রংপুর অঞ্চলেই সে-বছর প্রায় ৩,৯০,২০০ টাকার রাজস্ব অনাদায়ী থেকে যায়। এত বিপুল টাকার রাজস্ব হারানোর পর কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে, এবং তারা প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করার জন্য পিটারসন নামক একজন বিচক্ষণ ও সৎ অফিসারকে কমিশনার পদে নিযুক্ত করে রংপুর অঞ্চলে প্রেরণ করে। পিটারসন এ অঞ্চলে এসেই দেবী সিংয়ের অত্যাচারে সাধারণ কৃষক প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান; এবং অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে কোম্পানির কলকাতা অফিসে পত্রমাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্য জ্ঞাপন করেন :

> আমার প্রথম দুই পত্রে প্রজাদের উপর কঠোর অত্যাচার, এবং তাহারই জন্য যে তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে সে কথা সাধারণ ভাবে বিবৃত করিয়াছি। [...] আমার প্রতিদিনের অনুসন্ধানে তাহা আরও দৃঢ় হইতেছে। তাহারা যদি বিদ্রোহী না হইত, তাহা হইলেই আমি আশ্চর্য জ্ঞান করিতাম। প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা হয় নাই, তাহাদের উপর রীতিমত দস্যুতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা ও সর্বপ্রকার

> অপমানে জর্জরিত করা হইয়াছে। [...] মানুষ চির অধীন অবস্থায় থাকিলেও যেখানে অত্যাচার সীমা অতিক্রম করে, সেখানে প্রতিবিধানের জন্য তাহাদের বিদ্রোহ করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।[১]

পিটারসনের এই রিপোর্টে কোম্পানি দেবী সিংকে উক্ত এলাকা থেকে আপাত বহিষ্কার করে কৈফিয়তের জন্য কলকাতায় ডেকে পাঠায়। এসময় দেবী সিং বিপুল অংকের টাকা নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। ১৭৮৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তৎকালীন সাংসদ এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) যখন ওয়ারেন হেস্টিংসের ইমপিচমেন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখছিলেন তখন ভারতবর্ষে হেস্টিংস এবং তার দোসর কর্তৃক সীমাহীন দুর্নীতি, পৈশাচিক অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।[২] *Burkes Speech at the Impeachment of Warren Hastings* (Banggabashi press, Calcutta, 1909)- গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে রংপুর অঞ্চল থেকে দেবী সিং রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যের থেকেও অতিরিক্ত বিপুলসংখ্যক অর্থ ব্যক্তিগতভাবে আদায় করেছিলেন। এই বিপুল টাকার মধ্য থেকে প্রায় ৭০ লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় করে তিনি কোলকাতায় গিয়ে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হাত করে পিটারসনের সত্য রিপোর্টকে মিথ্যা প্রমাণ করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হন।[৩] কিন্তু ইতোমধ্যে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি হলে তার স্থলে নতুন গর্ভনর লর্ড কর্নওয়ালিশ আসেন। তিনি এ অঞ্চলে ইজারাদার প্রথা বাতিল করে ১৭৯০ সালে জমিদারদের সঙ্গে দশসালা বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করলে দেবী সিং এ অঞ্চল থেকে আয় করা বিপুল টাকায় মুর্শিদাবাদে জমিদারি ক্রয় করে সেখানেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

বলাবাহুল্য কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত প্রথায় এ অঞ্চলের মানুষ সাময়িকভাবে দেবী সিংয়ের অপপ্রভাব থেকে মুক্তি পেলেও নতুন আইনে তারা আবারও জমিদার-ভূস্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হতে থাকে। কিন্তু তারা আর মুখ বুজে সব সহ্য না করে নূরলদীনের প্রদর্শিত পথে প্রতিবাদ-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। নূরলদীনের মৃত্যু তাদের

---

[১] সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

[২] ৩৭. সুপ্রকাশ রায় এ সম্পর্কে লিখেছেন : ইংলন্ডের পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া এডমন্ড বার্ক রংপুর ও দিনাজপুরে যাহার পৈশাচিক তাণ্ডবের কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন যে, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইংরেজ শাসকগণের লুণ্ঠনের সেই অংশীদার এবং গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রিয় সুহৃদ দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ পরিণতি হইল ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের রংপুর বিদ্রোহ। (দ্রষ্টব্য : সুপ্রকাশ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬)

[৩] ফরিদ আহমেদ, 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়', ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, blog.mukto-mona.com, ঢাকা

চোখে জাগিয়ে দিয়েছে সম্ভাবনার স্বপ্ন, বুকে দিয়েছে প্রতিবাদের সাহস। নূরলদীনের চেতনাকে ধারণ করেই তারা আগামীর পথে হেঁটে গেছে। নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক তাই প্রথম দৃশ্যেই মৃত নূরলদীনের পুনরুত্থান দেখিয়েছেন। এ উত্থান শরীরী নয়; এ উত্থান বোধের, এ উত্থান চেতনার। সাধারণ মানুষকে নূরলদীন বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, 'হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই'। এবং মানুষ বিশ্বাস করেছে : 'আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়, / আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায় / দিবে ডাক, 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬৮)

নূরলদীনের সারাজীবন ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়ে নির্মিত শিল্পকর্ম। এই নাটকে ইতিহাস-আশ্রিত জীবননদীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে সমকালীন জীবনস্রোত। যে কারণে নাটকটি গ্রন্থের পাতা থেকে উঠে এসে সহজেই সাধারণ মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। এ নাটকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে দেশের প্রতি, মাটি ও মানুষের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা। সৈয়দ শামসুল হকের মতে বিভিন্নযুগে বিভিন্ন দাবি আদায়ের প্রেক্ষাপটে বাঙালির সমবেত জাগরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ফলে আলোচ্য কাব্যনাটকে ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে যে জৈব-ঐক্য নির্মিত হয়েছে বাংলা নাটকের ধারায় তা অভিনব ঘটনা।

বস্তুত, 'জাতিসত্তার উৎস ও অস্তিত্ব অনুসন্ধানের প্রশ্নে এবং সমকালের বিপন্নতা উত্তরণের বাসনায়, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সৃষ্টিক্ষম প্রতিভা কখনো কখনো বিচরণ করেন ইতিহাস ও ঐতিহ্যলোকে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যলালিত শিল্পকলা ধস-আক্রান্ত অবরুদ্ধ পথহারা একটি জাতিকে দিকনির্দেশ করতে পারে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।'[১] প্রতিভাবান শিল্পী সৈয়দ শামসুল হকও তার ব্যতিক্রম নন। *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকে নূরলদীনের সংগ্রাম ও জীবনোৎসর্গের নাট্যরূপাঙ্কনের মাধ্যমে সৈয়দ শামসুল হক এ-সত্যটি প্রতিপাদন করেছেন যে, কেন্দ্র অথবা প্রান্তিক যে অবস্থানেই হোক না কেন, একটি সমাজ বা জাতিসত্তার নেতৃত্বদানের যোগ্যতা সে-ব্যক্তিরই রয়েছে যিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন। সাধারণকে ভালোবেসেই তিনি হয়ে ওঠেন অসাধারণ। তাঁর এই সংগ্রাম এবং অকুণ্ঠ আত্মদান প্রতিযুগের নিপীড়িত ব্যক্তি বা জাতিসত্তার জন্য অনুপ্রেরণাসঞ্চারী।

---

[১] বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'কাব্যনাট্যের রাজপুত্র ও তাঁর নূরলদীন', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২১

নারীগণ

নারীগণ (২০০৬)[১] কাব্যনাটক সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) রচনা করেছেন ১৭৫৭ সালের পলাশির ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। পলাশির রাজনৈতিক ইতিহাস কিংবা নবাব শিরাজদ্দৌলার (১৭৩৩-১৭৫৭) ট্রাজিক কাহিনি বাঙালির অস্তিত্বলোকে গভীরভাবে প্রোথিত। এই ট্রাজিক চরিত্রকে নিয়ে বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে বহু চলচ্চিত্র ও নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক *নারীগণ* নাটকে তাঁর চিন্তাশক্তির অভিনবত্ব ও অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৭৫৭ সালের ঘটনা নিয়ে অন্যদের মতো ঐতিহাসিক দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনা করেননি; বরং দেখিয়েছেন রাজনৈতিক অভিঘাতের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া; রাজমহলের নারীদের ওপর একটি যুদ্ধের অভিঘাতে কেমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তার স্বরূপ ।

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কিংবা বাংলা সাহিত্যে নবাব শিরাজদ্দৌলার শৌর্য-বীর্য, নবাব আলিবর্দী খাঁর ঔদার্য, মীরজাফর-জগৎশেঠদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি বহুভাবে চর্চিত হলেও তাদের অন্দরমহলের নারীরা বরাবরই থেকে গেছে অনালোচিত। অথচ নবাবের জীবনজুড়ে এসকল নারীর ভূমিকা কম ছিল না। সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তকে নেপথ্যে রেখে রাজমহলের নারীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাদের আকাঙ্ক্ষা-অচরিতার্থতা ও অন্তর্বেদনার প্রসঙ্গ প্রকাশ করেছেন। বস্তুত, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান কিংবা বঞ্চনা নিয়ে সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন বরাবরই সোচ্চার। আলোচ্য নাটকটি তাঁর সেই সোচ্চার চেতনারই শিল্পিত প্রয়াস। *নারীগণ* নাটকের আখ্যানভাগ লক্ষ করলে দেখা যাবে, ‘পুরুষের লোভ যেমন এই নাটকে প্রকাশ পেয়েছে তেমনি নারীতে নারীতে দ্বন্দ্বের জায়গাটিও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। নবাব সিরাজদ্দৌলার জেনানা মহলের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে নারী জগতের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সৈয়দ হক।’[২]

---

[১] *নারীগণ* কাব্যনাটকটির খসড়া তিনি রচনা করেছেন ২০05 সালের অক্টোবরে লন্ডনে বসে। কিন্তু পরিপূর্ণ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন তারও একবছর পর ২০০৬ সালের মে-জুন মাসে। নাটকের খসড়া রচনা ও পূর্ণাঙ্গ রচনার মধ্যবর্তী এ সময়ক্ষেপণ বলে দেয় তিনি বেশ ভাবনা চিন্তা করেই নাটকটি রচনা করেছেন। কেননা তিনি যে ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনা করতে চাইছেন, সেটি নিয়ে ইতোমধ্যে বাংলায় বিস্তর রচনা রয়েছে। ফলে তিনি চেনাপথে চেনারূপে নাটক রচনা করে নাট্যগ্রন্থের সংখ্যামাত্র বাড়াতে চাননি। অর্থাৎ চেনা জিনিসে অচেনা চমক আনতেই বলা যায় তাঁর এ সময়ক্ষেপণ।

[২] স. ম. শামসুল আলম, ‘কাব্যনাট্যের কারিগর সৈয়দ শামসুল হক’, “সাহিত্য পাতা”, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৭

পালাকার নাট্যদলের প্রযোজনায় এ-নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে। এই নাট্যদলের প্রচারপত্রে নাটকটি সম্পর্কে যে মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছিল তা এরকম :

> পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়েছিল ষড়যন্ত্রের শক্তিতে এবং অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতায়। নবাব সিরাজদ্দৌলার হত্যার মধ্য দিয়ে ২০০ বছর ব্রিটিশ গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয় এ উপমহাদেশ। [...] যে কোনো যুদ্ধের বাস্তবতা এই – যুদ্ধ করে পুরুষেরা। বিজয়ী বা পরাজিত কোনো পক্ষে নারীযোদ্ধা নেই। যুদ্ধে নারী লুণ্ঠিত হয়, নারী ধর্ষিত হয়, শত্রুপক্ষ যুদ্ধে নারীধর্ষণের তাণ্ডব চালায়। কারণ, নারীরা হয় অধিকার স্থাপনের চূড়ান্ত উপায়। যুদ্ধের প্রান্তরে নয়, জয়-পরাজয় নারীর শরীরে হয় নির্ধারিত। [...] নবাব হত্যার পর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে নারীমহলে কী ঘটনা ঘটেছিল সেটা ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই। এই সাহসী কাজটাই সম্পন্ন করেছেন বাংলাদেশের সব্যসাচী লেখক-কবি-নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক। [...] *নারীগণ* নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হত্যার পর নবাব মহলের অন্তঃপুরে বন্দী নারীদের নানান উপলব্ধি। নবাব সিরাজের বন্দী নানি, মা, পত্নীর জবানে উঠে আসা তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ, নারীর মর্যাদা ও ইচ্ছার স্বাধীনতাসহ অনেক বিষয়। অবমাননার হাত থেকে বাঁচতে এই বন্দী নারীরা আত্মহত্যাও করতে পারে না। কারণ তাঁদের আত্মহননের পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অঙ্গুরির বিষ কেড়ে নেওয়া হয়, কেড়ে নেওয়া হয় খঞ্জর। প্রহরীর রূঢ় হাত তাদের শরীর স্পর্শ করে। তাঁদের বন্দী করার মধ্য দিয়েই ঘটনার শেষ হয় না। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে এবং বিদ্রোহের পথ রুদ্ধ করতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এইসব নারীকে হত্যা করা হয়।[১]

বস্তুত, ‘পলাশীর যুদ্ধের পিছনে ছিল মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষের ষড়যন্ত্র। সে চক্রান্তের সঙ্গে সুবাহ বাংলার জনজীবনের কোনো যোগ ছিল না। এর পিছনে কোনো গভীর নিহিত সামাজিক শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।’[২] ক্ষমতালুব্ধ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ষড়যন্ত্র, নবাব শিরাজদ্দৌলার আত্মীয়-অনুচরদের গোপন ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার শাসনপ্রক্রিয়ায় নেমে আসে সীমাহীন দুর্যোগ। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব শিরাজদ্দৌলার পতনের পর এ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির শাসন-শোষণ শুরু হয়ে যায়। ইউরোপ থেকে

---

[১] দ্রষ্টব্য : আবু সাঈদ তুলু, ‘মঞ্চনাটক : নারীগণ’, *কালি ও কলম (অনলাইন সংস্করণ)*, সম্পাদক : আবুল হাসনাত, প্রকাশ : ২২ নভেম্বর, ২০১২

[২] রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১২

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এদেশে ব্যবসা করতে আসা একটি অর্থনীতিনির্ভর কোম্পানি বাংলার শাসননীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া সামান্য ব্যাপার নয়। তবে বরাবরের মতোই এ রাজনীতি, এ ষড়যন্ত্র, পালাবদল সবকিছু পরিচালিত হয়েছে সমাজের উঁচুতলার মানুষের স্বার্থ ও প্রলোভনকে কেন্দ্র করে। এর সঙ্গে বাংলার সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে *নারীগণ* নাটকে ইতিহাসের এই সত্যটি সুস্পষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। আমিনা চরিত্রটির জবানিতে এ প্রসঙ্গটি সৈয়দ হক উল্লেখ করেছেন এভাবে :

নাকি এই রাজশক্তি আমাদের আসলে স্বৈরই ?
রাজপক্ষে প্রজা কেন থাকবে, দাঁড়াবে ?
কী আছে প্রজার লাভ – প্রজা মনে ভাবে।
তাই প্রজা সাধারণে এ রাজশক্তির
ভিত্তি তবে কিছুমাত্র ছিলো না কখনো ?
তাই কি মুর্শিদাবাদে যখন ক্লাইভ আসে পলাশীর পরে
মাত্র দু'শ গোরা সৈন্য নিয়ে –
লক্ষ লোক পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দ্যাখে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪০৭)

বাংলা সাহিত্যে একাধিক নাট্যকার ঐতিহাসিক চরিত্র শিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। এদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) সাঈদ আহমেদ (১৯৩১-২০১০) ও সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৮-১৯৭৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের রচিত নাটকে উপনিবেশিত সমাজব্যবস্থায় এদেশের মানুষের পরাধীনতা, দুর্দশাময় জীবনবাস্তবতা, জাতিগত ঐক্য, ঐতিহ্যপ্রীতি ও দেশপ্রেমের প্রকাশই ছিল নাট্যকারের মৌল অন্বিষ্ট। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে অগ্রজ কিংবা সমকালীন নাট্যকারদের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করেননি। তিনি নাট্যকাহিনিতে শিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অনুপুঙ্খ বৃত্তান্ত তুলে না ধরে বরং অন্দরমহলের নারীদের করুণ পরিণতি ও ভয়াবহতাকেই উপজীব্য করেছেন। এজন্য তিনি নাট্যপ্লটে ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কল্পনার অসামান্য যোগ ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের মৌলসত্যের সঙ্গে কল্পনার মিশেলে *নারীগণ* হয়ে উঠেছে অনন্যস্বাদী।

নবাব শিরাজদ্দৌলার পতনের পর তাঁর অন্দরমহলের নারীদের পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাসগ্রন্থ *সিয়ারুল মুতাখখেরিনে*র লেখক গোলাম হোসাইন তাবাতাবাইন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, শিরাজকে হত্যার পর

মীরজাফর ও মীরন, তাঁর পরিবারের নারীদের কয়েকটি নড়বড়ে নৌকায় চড়িয়ে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে জাহাঙ্গীরনগরে গৃহবন্দী হিসেবে পাঠিয়ে দেয়। এর কিছুদিন পর মীরন জাহাঙ্গীরনগরের সে-সময়ের শাষনকর্তা যশরথ খানকে লিখিত নির্দেশ দেয় যে, তিনি যেন ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে হত্যা করেন। কিন্তু এই সদাশয় শাসনকর্তা মুর্শিদাবাদ রাজপরিবারের নিকট তাঁর উন্নতি ও অন্নের জন্য ঋণী ছিলেন। ফলে তিনি মীরনের ঘৃণ্য নির্দেশ পালন করতে অসম্মতি জানান। পরে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে শিরাজের মা আমিনা বেগম ও খালা ঘসেটি বেগম দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর তাঁদের বুড়িগঙ্গার ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। [১]

তবে ইতিহাসবিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর পলাশির ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ *নবাব সিরাজ-উদ- দৌলা*তে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মীরনের হুকুমে নবাব পরিবারের নারীদের বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করার প্রসঙ্গটি নিতান্তই ইংরেজ-মদদপুষ্ট লেখকের কল্পনাপ্রসূত। তিনি বলেন – খুশবাগ কবরস্থানে যেহেতু ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমের সমাধি রয়েছে, সেহেতু বলা যায়, বুড়িগঙ্গায় মৃত্যু হলে লাশ পাবার কথা নয়, কিংবা সেসময়ের প্রেক্ষাপটে পানিতে ডোবা মরদেহ ঢাকা থেকে তুলে এনে দীর্ঘযাত্রার পর মুর্শিদাবাদে দাফন সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। বরং মীরজাফর পুত্র মীরনের বজ্রপাতে মৃত্যুর খবর নিয়তির বিধান হিসেবে লোকপ্রিয় করে তুলতে তার প্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি এই কল্পগল্প সাজিয়েছেন যে, নবাব পরিবারের মৃত্যুপথযাত্রী নারীদের অভিশাপেই মীরনের বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ; ইংরেজদের ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ডে নয়।[২]

আবার, সাংবাদিক-গবেষক রেহান ফজল বিবিসি নিউজের এক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে[৩] নবাব মহলের নারীদের পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক করম আলির *মুজফফরনামা* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন – প্রায় ৭০ জন নিরপরাধ বেগমকে একটি নৌকায় চাপিয়ে মাঝ-গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়, আর সেখানেই নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়া হয়। শিরাজদ্দৌলার বংশের বাকি নারীদের বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়। নৌকাডুবি আর বিষখাইয়ে যাদের হত্যা করা হয়, তাদের সবাইকে একই সঙ্গে নদীর ধারেই খুশবাগ নামের একটি বাগানে দাফন করা হয়। শুধু একজন বাঁচিয়ে রাখা হয়। তিনি হলেন শিরাজদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নিসা। মীরজাফর আর তার ছেলে

---

[১] দ্রষ্টব্য : আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৬৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০-৩৭১

[৩] রেহান ফজল, 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা : যার নির্মম হত্যার পর ভারতে ইংরেজদের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়', বিবিসি হিন্দি (অনলাইন সংস্করণ), দিল্লি, ৩ জুলাই ২০২০

মীরন – দুজনেই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লুৎফুন্নিসা পিতা-পুত্র দুজনের প্রস্তাবই এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রথমে হাতির পিঠে চড়েছি, এখন গাধার পিঠে চাপা সম্ভব নয়।[১] সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য কাব্যনাটকে লুৎফুন্নিসার প্রতি মীরণের আকর্ষণের এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন আমিনা বেগমের সংলাপের মাধ্যমে :

> কেন মীরন!
> তার পিতা সিরাজের সিংহাসন পাবে।
> পুত্র নেবে সিরাজের বিধবাকে –
> চোখ তার বহুদিন থেকে! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮৬)

মীরজাফর ও মীরনের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে কিংবদন্তিতুল্য সংলাপ উচ্চারণ করেছিলেন লুৎফুন্নিসা, তা নাট্যকার আলোচ্য নাটকে উপস্থাপন করেছেন। ঘসেটি যখন তাদের মুক্তির উপায় হিসেবে লুৎফাকে নতুন রাজকুমার মীরনের প্রস্তাবে রাজি হবার জন্য আকুল আকুতি জানিয়েছে, তখন লুৎফা অত্যন্ত ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বলেছে :

> আমি রাজহস্তীর রমণী। হস্তীতে অভ্যাস যার
> গর্ধভের কাছে যাওয়া অসম্ভব তার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৩০)

তবে নবাব পরিবারের এই ট্রাজিক পরিণতির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে; যা বিশ্লেষণের জন্য মুর্শিদাবাদ রাজদরবার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ভারতে মুঘল রাজত্বের ব্যাপ্তি ও স্থিতি বিবেচনায় যদি স্বাধীন বাংলা ভূখণ্ডের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে সেখানে দেখা যাবে বাংলা অঞ্চল ছিল মুঘলদের সুবা বা প্রদেশ। বাংলায় নিয়োজিত সুবাদার বা নবাবরা দিল্লির মুঘল সালতনাতকে নিয়মিত খাজনা দিয়ে এ অঞ্চল শাসনের সুযোগ পেত। সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) যেমন পাঠিয়েছেন সেনাপতি মানসিংহকে (১৫৫০-১৬১৪), সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৫৬৯-১৬২৭) পাঠিয়েছিলেন ইসলাম খানকে (১৫৭০-১৬১৩), তেমনি সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭) এ অঞ্চলের সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পৌত্র আজিম উস শানকে

---

[১] *মোজাফফরনামার* রচয়িতা করম আলী তাঁর গ্রন্থে লুৎফুন্নেসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন – নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নিহত হওয়ার পর পিতা ও পুত্র (মীরজাফর ও মীরন) উভয়েই প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে সিরাজ-উদ্- দৌলার মহিয়সী বেগম লুৎফুন্নেসার হস্তকামনা করলে তিনি তা (ঘৃণাভরে) প্রত্যাখান করে বলেছিলেন, ‘পূর্বে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করার পর আমি এখন গর্দভের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হতে পারি না। (দ্রষ্টব্য : আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*,পৃ. ৮৯)

(১৬৬৪-১৭১২); যাঁর দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ (১৬৬৫-১৭২৭)। এই মুর্শিদকুলি খাঁর হাতেই পত্তন ঘটে নবাব বংশের; এবং তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা পায় মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদকুলি খাঁ যখন এ অঞ্চলে আসেন, তখন বর্তমান ঢাকা বা তৎকালীন জাহাঙ্গীরনগর ছিল বাংলার রাজধানী। এসময়ে ইংরেজসহ অন্য বেনিয়ারা ব্যবসার জন্য হুগলি বন্দর ব্যবহার করতো; তাদের ব্যবসার পসার ছিল ভাগীরথী ও গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে। ফলে মুর্শিদকুলি নিজস্ব দপ্তর ঢাকা থেকে তৎকালীন মনসুরাবাদে স্থানান্তর করেন; এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নিজস্ব কর্মদক্ষতা দ্বারা বিপুল রাজস্ব পাঠান। সম্রাট তাঁর বাংলার ভূমিব্যবস্থাপনা ও কর কাঠামো সংস্কারের দক্ষতা দেখে, তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে বাংলার শাসনব্যবস্থার প্রধান বা নাজিম করে পাঠান। অর্থাৎ প্রশাসন ও রাজস্ব দুটোই তখন মুর্শিদকুলির হস্তগত হয়। তিনি তখন সর্বক্ষমতার অধিকারী হয়ে নবাব পদ অলঙ্করণ করেন এবং তাঁর নিজের নাম অনুসারে রাজধানীর নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদকুলি খাঁ একজন উত্তম শাসক ছিলেন। তিনি বাংলার অর্থব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোকে ঢেলে সাজান। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলায় তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তিনি ছিলেন অপুত্রক। ফলে তিনি তাঁর প্রিয় পৌত্র সরফরাজ খাঁকে (১৭০০-১৭৪০) বাংলার মসনদের উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। কিন্তু সরফরাজের পিতা উড়িষ্যার সুবেদার সুজা উদ্দিন মুহম্মদ খান (১৬৭০-১৭৩৯) পুত্রকে সরিয়ে বাংলার স্বঘোষিত নবাব হন। সরফরাজ তখন স্থানীয় শেঠ ও পদস্থদের পরামর্শে পিতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে না গিয়ে তার শাসন মেনে নেন। উল্লেখ্য যে, সুজাউদ্দৌলার প্রাক্তন প্রশাসনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পারস্য বংশদ্ভূত আলিবর্দি খাঁ (১৬৭১-১৭৫৬) ও তাঁর বড় ভাই হাজী আহমেদ। সুজাউদ্দৌলার নবাবি পদপ্রাপ্তির সাথে সাথে তাঁরাও তখন রাজধানীতে এসে প্রশাসনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর এবার যখন তাঁর ছেলে সরফরাজ সিংহাসনে বসেন, তখন বিহারের সুবাদার পদে কর্মরত আলিবর্দি খাঁ গিরিয়ার যুদ্ধের (১৭৪০) মাধ্যমে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করে মুর্শিদাবাদ ও সিংহাসন দখল করেন। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতাদখলের সংস্কৃতি তখন থেকেই শুরু হয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০) তাঁর *অন্নদামঙ্গল কাব্যে (১৭৫২)*-র গ্রন্থসূচনায় এ বাস্তবিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন নিম্নরূপে :

সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রায়াঁ।
ছিল আলীবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।

আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায় ৷৷

তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।

মহাবদজঙ্গ দিল পাতসা খেতাব। (*অন্নদামঙ্গল*, গ্রন্থসূচনা।)[১]

আলিবর্দি খাঁ রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ও কূটকৌশলের মাধ্যমে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর অধীন কর্মচারী মীরজাফর আলী খাঁ (১৬৯১-১৭৬৫) ছিলেন সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ফলে পরবর্তীকালে নবাব শিরাজদ্দৌলাকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মসনদচ্যুত করতে তার বিবেকে এতটুকু বাধেনি। এ যেন আলিবর্দি কর্তৃক নিরপরাধ নবাব সরফরাজ হত্যার বিপরীতে প্রকৃতির প্রতিশোধ। ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মীরজাফরের উপর আলিবর্দির অবৈধভাবে সিংহাসন দখলের ঘটনার প্রভাব নিয়ে লেখেন :

> আলিবর্দ্দীর এই অসাধু ব্যবহারে মীরজাফর যাহা শিক্ষালাভ করিলেন, তাহা আর ইহজীবনে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, সিংহাসন লাভের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রভুহত্যা করা নিন্দনীয় নহে! ষড়যন্ত্র ও বাহুবলে একবার আত্মকার্য্য সাধন করিতে পারিলেই হইল, তাহার পর সে কথা লইয়া লোকে উচ্চবাচ্য করিবার অবসর পায় না।[২]

তবে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও নবাব আলিবর্দি খাঁ একজন দক্ষ ও মানবিক প্রশাসক ছিলেন। ফলে তাঁর আমলে বাংলার অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু তিনিও নিষ্কণ্টক উপায়ে শাসন পরিচালনা করতে পারেননি। বার বার তাঁকে মারাঠা দস্যু বা বর্গিদের প্রতিহত করতে হয়েছে; আফগান সেনাদের বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছে। তিনি কখনো সন্ধির মাধ্যমে, কখনো যুদ্ধজয় করে এসকল বিদ্রোহ ও অরাজকতা দমন করেন। ঐতিহাসিক সুশীল চৌধুরী এ বিষয়ে তাঁর *পলাশীর অজানা কাহিনী* গ্রন্থে লিখেছেন :

> আলিবর্দির রাজত্বের প্রথম দিকে প্রায় দশ বছর ধরে (১৭৪২-৫১) মারাঠারা প্রায় প্রত্যেক বছর বাংলা আক্রমণ ও লুঠ করতে অভিযান চালিয়েছে। তা ছাড়া এ সময় আফগান বিদ্রোহও হয়। আফগানদের দমন করে ও মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি (১৭৫১) করার পর আলিবর্দি দেশের ও প্রজাদের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান হন ও সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেন।[৩]

---

[১] ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, *অন্নদামঙ্গল* (প্রথম খণ্ড), তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, গ্রন্থসূচনা

[২] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *মীর কাসিম*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৫

[৩] সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৬

সৈয়দ শামসুল হক এই ঐতিহাসিক সত্য *নারীগণ* নাটকে উপস্থাপন করেছেন শরিফা ও আমিনা চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপে। আলিবর্দির স্ত্রী শরিফা বেগম এ রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে মহলের নারীদের দুঃখ সামলে ওঠার জন্য পরামর্শ দিতে গিয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেছে :

বর্গির হামলার কথা মনে নেই ?
মহারাষ্ট্র থেকে বালাজি রগুজি আর
ভাস্কর পণ্ডিত বর্গিদস্যুদল নিয়ে
উড়িষ্যার গিরিনদ বীরভূম বিষ্ণুপুর অতিক্রম করে
কীভাবে বাংলার বুকে নেমে আসে ঘোড়ায় সোয়ার !
[...] দীর্ঘ এ জীবনে
অনেক অনেক যুদ্ধ দেখে দেখে বার্ধ্যক্যে পৌঁছেছি,
বর্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধ
পাটনায় আফগান বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ, [...]
পরাজয় কখনো মানিনি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮৪)

অন্যদিকে, মুর্শিদকুলির মতো আলিবর্দি খানও অপুত্রক ছিলেন। তিনি নিজের তিন কন্যাকে বড়ভাই হাজি আহমেদের তিন ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেন। তাঁর বড়কন্যা ঘসেটি বেগম বা মেহেরুন্নেসাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মতিঝিল প্রাসাদে পাঠান; আর কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন শিরাজের মাতা আমিনাকে। কিন্তু পাটনার সুবেদার থাকাকালে আলিবর্দির ভাই হাজি আহমেদ ও ভ্রাতুষ্পুত্র জৈনুদ্দিন আহমদ অর্থাৎ আমিনার শ্বশুর এবং স্বামী আফগান বিদ্রোহীদের হামলায় অকালে মারা যান। তখন সপুত্রক আমিনা পুরোপুরিই আলিবর্দির আশ্রিতা হয়ে পড়েন। আমিনা চরিত্রটির সংলাপে এ ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। আমিনা তার হত্যভাগ্য অতীত ইতিহাস স্মরণ করে পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে সান্ত্বনার সুরে বলেছেন :

পাথরে তো নয়, রক্ত মাংস দিয়ে গড়া,
রূপ যার আকাশের আদম সুরত –
আমি সেই স্বামী, তোর শ্বশুরকে হারিয়েছি
পাটনায় এক রাষ্ট্রবিদ্রোহের কালে।

আফগান ঘাতকের হাতে তার শিরোচ্ছেদ হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৮)

আবার শরিফা চরিত্রটিও আমিনার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে এ ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন :

আমার ভাশুর, হাজী আহমদ খান তোর শ্বশুর, আমিনা,
তারও মৃত্যু হয়েছিলো ঘাতকের হাতে
সেই একই পাটনা বিদ্রোহে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৮)

শিরাজের বড়ো খালা ঘসেটি বেগম নিজেও ছিলেন সন্তানহীন। শিরাজের মধ্যম ভ্রাতা ইকরামুদ্দৌলাকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। অন্যদিকে আমিনার জ্যেষ্ঠপুত্র শিরাজের জন্মের পরপরই আলিবর্দির ব্যাপক উন্নতি ঘটে। তাই অপুত্রক আলিবর্দী খুশির আতিশয্যে নাতিকে দত্তক নেন এবং পুত্রবৎ আদর ও প্রশ্রয় দিয়ে বড় করেন। করম আলী রচিত ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ *মুজাফফরনামার* সূত্রদিয়ে ঐতিহাসিক সুশীল রায় এ বিষয়ে লিখেছেন :

আলিবর্দী সিরাজের জন্ম থেকেই তাঁর প্রতি এমন স্নেহান্ধ ছিলেন যে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে কাছছাড়া করতেন না। তিনি তাঁকে রাষ্ট্রনীতি, শাসনকার্য ও শাসক-অভিজাত জীবনের নানা গুণাবলি শেখাতেন। সিরাজের প্রতি তাঁর স্নেহ এমনই অন্ধ ছিল যে সিরাজের সমস্ত অপকীর্তিকে তিনি যেন দেখেননি বা শোনেননি এমন ভাব করতেন। [...] সিরাজের চিন্তা ছাড়া তাঁর একটি মুহূর্তও কাটত না। [১]

মাতামহ আলিবর্দি খাঁর অতিরিক্ত প্রশ্রয় ও সমর্থনে কিশোর সিরাজ প্রথম জীবনে কিছুটা উচ্ছৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এসময়ে মন্দস্বভাবের নানান বন্ধু-বান্ধব জুটে যায় তার। এ-অবস্থায়ও আলিবর্দি তাকে ভাবী নবাব কল্পনা করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করেন। এমনকি আলিবর্দি নিজের সঙ্গে শিরাজকে বিভিন্ন যুদ্ধযাত্রায় নিয়ে যান ভাবী নবাব হিসেবে যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। কিশোর-বয়সেই তিনি শিরাজকে ঢাকার নৌবাহিনীর প্রধান করেছেন, আবার রাজ্যশাসনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলের সুবাদার করেও পাঠিয়েছেন। একদিকে কিশোর শিরাজের স্বেচ্ছাচারী আচরণ এবং অন্যদিকে তার প্রতি নানা আলিবর্দির অকুণ্ঠ সমর্থনে আত্মীয়-স্বজন যারপরনাই অসন্তুষ্ট ছিলেন; যা আরও প্রকট হয়ে পড়ে আলিবর্দি কর্তৃক শিরাজকে নবাবরূপে মনোনীত করার পর। আবার, ঘসেটি বেগম চেয়েছিলেন তাঁর পালকপুত্রকে নবাব পদে অভিষিক্ত করতে। অন্যদিকে, সিরাজের মেজো খালা মোমেনা বেগমের ছেলে পুর্ণিয়ার নবাব শওকত জং-ও চেয়েছেন নবাব হতে। আলিবর্দি বেঁচে থাকতেই ভেতরে ভেতরে ক্ষমতা দখলের এই

[১] সুশীল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

উচ্চাভিলাষ ও ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। ঘসেটির জীবনে এসময়ে দুটো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। একদিকে তাঁর পালকপুত্র ইকরামুদ্দৌলা বসন্তরোগে মারা যায়, অন্যদিকে স্বামী নওয়াজিশ মুহম্মদ খানকে অকালে হারিয়ে তিনি বৈধব্য বরণ করেন। ঘসেটির ইচ্ছে ছিল পালকপুত্রকে ক্ষমতায় বসিয়ে রাজমাতা হবেন। কিন্তু ছেলের অকাল মৃত্যুতে সে আশা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। তাঁর স্বামীর দুই ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন হোসেনকুলি খাঁ ও বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ। জনশ্রুতি আছে যে, ঘসেটি বেগমের সঙ্গে এদের নীতিবিরুদ্ধ ঘনিষ্ঠতা ছিল,[১] বিশেষ করে হোসেনকুলি খাঁর বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বে ঘসেটি বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। একথা অবগত হয়ে রাজমহলের সম্মান রক্ষার্থে, নানা আলিবর্দির আদেশে হোসেনকুলি খাঁ-কে শিরাজ প্রকাশ্য দিবালোকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। আলোচ্য কাব্যনাটকে নাট্যকার এ ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন শিরাজের মাতা আমিনার একটি সংলাপের মাধ্যমে :

> ঘসেটির বিবরণ আরো মনে করাবো কি ?
> স্বামী বেঁচে থাকতেই উপপতি!
> খুন হয় হোসেনকুলী যে, কেন হয় ?
> তার সঙ্গে ঘসেটির অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণে –
> এমন কি স্বামী বেঁচে থাকতেই!
> আলিবর্দী বংশের মর্যাদা নষ্ট, লোকনিন্দা, বাজারে গুজব
> শুনে শুনে দেখে দেখে বিচলিত হয়েছে শিরাজ।
> খালাকে সে শাসন করেছে। [...]

---

[১] শিরাজদ্দৌলার জেনানা মহল নিয়ে বিশ্বস্ত তথ্য পাওয়া খুবই দুস্কর। প্রকৃত সত্য তথ্যের অভাবে ইতিহাস প্রণেতারা এসব নিয়ে অনুমানভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছেন। কেউ লিখেছেন শিরাজের দুই ভ্রাতা, কেউ লিখেছে তিন (শিরাজদ্দৌলা, একরামুদ্দৌলা, মীর্জা মেহেদী)। কেউ বলেছেন ঘসেটি শিরাজের ভাইকে নবাব করতে চেয়েছিল, কেউ লিখেছেন শিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে। কেউ লিখেছেন কর্মচারী হোসেন কুলী খাঁ এর প্রতি ঘসেটী এবং আমিনা উভয়ে অনুরক্ত ছিল ; যার কারণে জেনানা মহলে দুই বোনের মধ্যে কলহ বাঁধে। ফলে আলিবর্দীর নির্দেশে শিরাজ হোসেন কুলীকে হত্যা করে। আবার কেউ বলেছে ঘসেটির হোসেন কুলীর সাথে সম্পর্ক শুনে শিরাজ নিজদ্বায়িত্বে হত্যা করে তাকে আলীবর্দী খানের সম্মতি ছাড়াই। আবার, শিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নিসাকে নিয়েও নানান তথ্য রয়েছে। কেউ বলেছেন লুৎফুন্নিসা শিরাজের বিবাহিত প্রথম পত্নী ছিলেন না। শিরাজের প্রথম পত্নী ছিল মুঘল ইরেজ খানের মেয়ে বহু বেগম। ১৭৪৬ সালে আলিবর্দী খাঁ মির্জা ইরেজ খানের কন্যার সঙ্গে খুব ধুমধাম করে সিরাজের বিয়ে দেন। এই অনুষ্ঠানের বিলাসবহুল আড়ম্বর ছিল দেখার মতো। অন্যদিকে, লুৎফুন্নিসা ছিল শিরাজের মাতা আমিনা বেগমের হিন্দু দাসী। সিরাজ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে এবং নাম দেয় লুৎফুন্নিসা। অন্য আরেকটি সূত্র বলছে সিরাজের কাশ্মির থেকে আগত ব্রাক্ষ্মণ সহচর মোহনলালের ভগ্নি ছিল লুৎফুন্নিসা। মোহনলাল তার সুন্দীর ভগ্নিকে বন্ধুত্বের নির্দশন হিসেবে সিরাজের নিকট স্ত্রীরূপে তুলে দেন।

ঘসেটির বসবাস মতিঝিল থেকে তুলে আনে এই হীরাঝিলে। [...]

হোসেনকুলীকে করে খঞ্জরে খতম। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৭)

এই ঘটনার পর ঘসেটি শিরাজের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। তিনি উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে শওকত জঙ্গকে সমর্থন করতে থাকেন। আবার অন্য একটি সূত্র বলছে – শওকত জঙ্গকে নয়, বরং নিজ পোষ্যপুত্রের রেখে যাওয়া শিশু-সন্তান মুরাদুদ্দৌলাকে নিয়ে তিনি ক্ষমতাহরণের স্বপ্ন দেখেন।[১] সৈয়দ হক অবশ্য দ্বিতীয়সূত্রটি অনুসরণ করে শরিফা চরিত্রের সংলাপে নিম্নোক্ত তথ্য জ্ঞাপন করেছেন :

ভুলি নি ঘসেটি তার পোষ্যপুত্রটিকে একদিন
চেয়েছিলো নবাব বানাতে।
অকালে প্রয়াত হলে স্বামী কোনো সন্তান না রেখেই –
[...] হঠাৎ অকালে মৃত্যু হলে পোষ্যপুত্রটির, তারই শিশুটিকে
কেন কাছে টেনে নেয় আবার ঘসেটি ?
শিরাজের বিরুদ্ধে সে বদ প্রচারণা করে –
শিরাজ মদ্যপ, বেয়াদব, ক্ষমতার সীমাহীন দর্প তার,
নারী লোলুপ শিরাজ। কেন বলে ?
অযোগ্য শাসকরূপে শিরাজকে প্রমাণ করতে।
আশা ছিলো শিরাজের পতন ঘটবে,
নাবালক পোষ্যনাতী পাবে সিংহাসন –
পর্দার আড়ালে থেকে নবাবিটা ঘসেটি করবে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৬)

পলাশির ট্রাজিক ঘটনার অন্যতম খলনায়ক মীরজাফর আলী খান ছিলেন আরববংশীয় দাস। এদেশে এসে আলিবর্দির শাসনামলে তার প্রতাপ-প্রতিপত্তি ঘটে। কিন্তু আলিবর্দির আমলেও সে নানান প্রতারণামূলক কাজে অংশ নেয়, যার ফলে সেসময়ে তাকে একাধিকবার পদচ্যুতও হতে হয়। কিন্তু নানা উপায়ে সে আবার আলিবর্দির মন ভুলিয়ে ক্ষমতায় টিকে যায়। শিরাজ ক্ষমতায় বসার পর তার উপর রুষ্ঠ হয়ে তাকে একবার পদচ্যুতও করেন ; কিন্তু সম্ভাব্য সেনাবিদ্রোহের আশঙ্কা করে তরুণ নবাব তাকে পুনরায় নিজ পদ ফিরিয়ে দিতে

[১] দ্রষ্টব্য : এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮০

বাধ্য হন। আবার, নবাবসুলভ অহম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে বন্ধুপ্রতিম ফরাসি কুঠিয়ালদের সহায়তা নিয়ে ইংরেজ কুঠিয়ালদের উদ্ধত আচরণ দমন করতে ব্যর্থ হন শিরাজ।

তবে শিরাজদ্দৌলা এসময়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের চালচিত্র অনুধাবনে ব্যর্থ হলেও, কিছুটা আন্দাজ করে নিতে পারেন যে, ইংরেজ বেনিয়াদের পাশাপাশি তাঁর অমাত্য ও ব্যবসায়ীরা তাঁর সঙ্গে যেকোনো মুহূর্তে প্রতারণা করতে পারেন। ফলে পলাশির চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে তিনি এদের রাজদরবারে ডেকে এনে যার যার ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ করিয়ে নেন। এসময় প্রধান সেনাপতি মীরজাফর পবিত্র কুরআন শরিফ ছুঁয়ে শপথ করেন যে, তিনি শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করে হলেও নবাবের সাথে থাকবেন। অন্যরাও যার যার ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে শপথ করেন। কিন্তু প্রত্যেকেই উপযুক্ত সময়ে তাদের শপথ ভঙ্গ করে তরুণ নবাবের সঙ্গে বেইমানি করেছেন। সৈয়দ শামসুল হক ইতিহাসের এই ঘৃণ্যতম বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা উল্লেখ করেছেন কুতুবের নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে :

মীরজাফর আলী খান সিপাহ্-সালার আজম
যুদ্ধ নয় – যুদ্ধ পরিচালনার অভিনয় করে, একদিকে
গত রমজান মাসে, তাও শবে কদরের রাতে,
শিরাজের কাছে তার কোরান শপথ, জানবাজি লড়বে সে,
অন্যদিকে ক্লাইভের সঙ্গে তার গুপ্তচুক্তি – নিষ্ক্রিয় থাকার।
এভাবে নিশ্চিত করা শিরাজের পরাজয়। চুক্তি আসলে,
মীরজাফরকে দেয়া হবে শিরাজের শূন্য সিংহাসন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৭৪)

উল্লেখ্য যে, ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশির যুদ্ধে নবাব শিরাজের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের মতো। অন্যদিকে, ইংরেজ সেনাছাউনিতে মাত্র দুই-তিন হাজার সৈন্য ছিলো। অস্ত্র, কামান গোলাবারুদ সবদিক দিয়েই শিরাজবাহিনী ছিল এগিয়ে। তবু তিনি পরাজিত হয়েছেন দুটি কারণে : প্রথমত, তাঁর সেনাপ্রধান মীরজাফর ও অপর সেনানায়ক রায়দুর্লভসহ অন্যদের আয়ত্তে থাকা প্রায় ৪৫০০০ সৈন্য সেদিন কার্যত কোনো যুদ্ধ করেনি। তারা পালন করেছিল নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা। অপরদিকে মোহনলাল, মীরমর্দান ও শিরাজের বন্ধুপ্রতিম ফরাসি সেনানায়কের অধীনে থাকা প্রায় ৫০০০ সেনা বীর-বিক্রমে লড়াই করে ইংরেজদের প্রায় পরজিত করে ফেলেছিল। কিন্তু এসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি হলে শিরাজের গোলাবারুদ ভিজে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তবুও শিরাজের অনুগত সৈন্যরা হাতে হাতে লড়াই করে প্রবল পরাক্রমে

ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজদের উপর। এমতাবস্থায় ইংরেজদের গোলার আঘাতে মীরমর্দান ও ফরাসি সেনানায়কের মৃত্যু হলে শিরাজবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। শিরাজ এসময়ে নিরুপায় হয়ে মীরজাফরের কাছে সাহায্যের জন্য করুণ আকুতি জানান। কিন্তু নবাবির স্বপ্নে বিভোর মীরজাফর তখনও তার বিশ্বাসঘাতকতা বজায় রেখে তাকে উল্টো পরামর্শ দেন – সেদিনকার মতো যুদ্ধ বন্ধ রাখতে। মোহনলাল এতে রাজি না হলেও নবাবের ক্রমাগত অনুরোধে যেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসতে থাকেন – তখনই ইংরেজ সৈন্যরা উপর্যুপরি আক্রমণে তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন। অনন্যোপায় শেরাজ পরাজয় বরণ করেন; জয়ী হন ক্লাইভ-মীরজাফরের যৌথ বাহিনী।

প্রকৃতপক্ষে এটিই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এককভাবে এ উপমহাদেশ শাসনের প্রথম ধাপ। ক্ষমতাগ্রহণ করলেও একদিকে স্থানীয় জনবিদ্রোহের আশঙ্কা, অন্যদিকে দিল্লির মুঘলদের অনুমতির প্রয়োজনে তারা 'ধীরে চলো' নীতি নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। যে কারণে ২৪ জুন ১৭৫৭ সালে লেখা এক চিঠিতে সে মীরজাফরকে নবাব সম্বোধন করে অভিনন্দিত করে লিখেছে :

> I congratulate on the victory which is yours, not mine. I should be glad if you would join me with the utmost expendition. We propose marching tomorrow to complete the conquest […] I hope to have the honour of proclaiming you Nabob. [১]

মীরজাফরের পর যাঁরা নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা সবাই ছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানির হাতের পুতুলমাত্র। বেশ কয়েকবছর তাঁরা কেবলই সিংহাসনে আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন। কেউই ঋজু ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারেননি। যেকারণে সৈয়দ শামসুল হক এ-অবস্থাকে আলোচ্য নাটকে 'বারাঙ্গনা সিংহাসন' বলে মন্তব্য করেছেন।

নবাব শিরাজদ্দৌলা পরাজয় নিশ্চিত জেনে এসময়ে নিজ ছাউনি থেকে কোনোমতে পালিয়ে রাজধানী রক্ষার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। উটের পিঠে চেপে এক রাতের মধ্যেই তিনি ৫০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে এসে তিনি তেমন কারো সহযোগিতাই পাননি। সাধারণ জনগণ বরং শিরাজের

---

[১] ২৪ জুন ১৭৫৭, স্ক্র্যাফটন মারফত মীরজাফরের নিকট রবার্ট ক্লাইভ প্রেরিত চিঠি, উদ্ধৃতঃ Orme Manuscripts, India Office Records, British Library,London, XI, f. 2815, (দ্রষ্টব্য : সুশীল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮)

পতনের খবর শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বিজয়ী লুটেরাদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচতে দলে দলে রাজধানী ত্যাগ করতে থাকে। শিরাজের শ্বশুর ইরেজ খানও এসময়ে পালিয়ে যান। এ-নাটকে ঐতিহাসিক এ ঘটনার বর্ণনা নাট্যকার উল্লেখ করেছেন এভাবে :

বিনা যুদ্ধে পরাজিত বাংলার নবাব।
নবাব শিরাজদ্দৌলা পলাশীর মাঠ ত্যাগ করে
রাজহস্তির সোয়ার হন, পরদিন শুক্রবার
দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে
তিনি রাজধানীতে ফেরেন। [...]
তাঁর সময় যে কম! পুনরায় যুদ্ধ চাই নতুন উদ্যমে।
অবিলম্বে রাজকোষ খুলে দেন তিনি।
জুম্মার মিছিলে তিনি পথে পথে ঘোষণা করান –
তরুণ জোয়ান এসো, অগ্রিম মাহিনা নাও, যুদ্ধ সাজ পরো। [...]
কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না,
দাঁড়ালো না শিরাজের পাশে।
[...] বিপন্ন সময়ে কেউ আত্ম ছাড়া চেনে না অপর! –
শ্বশুর ইরিচ খান মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে সরে পড়লেন –
তবে সরে পড়বার আগে
রাজকোষ তিনিও দু'হাতে লুট করলেন যতটা পারেন।
নগরে যে বাজে লোকজন আর সিপাহীরা ছিলো
তারাও দুহাতে নিলো সিক্কা টাকা সোনার মোহর।
কিন্তু যুদ্ধসাজে তারা সজ্জিত হলো না। [...]
রাজকোষ নিঃশেষিত রাত্রির আগেই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৭৫)

শিরাজ নতুন করে লড়াইয়ের জন্য তখন ফরাসি কুঠির প্রধান জাঁ ল-এর সাহায্য প্রার্থনায় পাটনায় যাবার জন্য স্ত্রী-সন্তানসহ গোপনে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু লোকশ্রুত আছে যে, দান শাহ -[১] নামক এক ফকির

---

[১] 'সিরাজদ্দৌলা রাত্রিযোগে ত্রস্তভাবে মালদহ হইতে বড়াল নামক স্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু নাজের পুরের মোহানা বন্ধ হওয়ার সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং বড়ালিয়ার বড়ালের দান শাহ নামক পীরপুত্রের

বিশ্বাসঘাতকতা করে শিরাজের অবস্থানের কথা রাজধানীতে বিরুদ্ধপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়। ফলে শিরাজ পত্নীকন্যাসমেত অচিরেই মীরকাসিমের হাতে ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে নীত হন। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে এসব ঘটনার প্রায় অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। তবে এ অংশে তাঁর পূববর্তী নাট্যকারগণের অনুসরণে তিনিও ইতিহাসের সামান্যসূত্রকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে আবেগাত্মক ভঙ্গিতে পাঠক-দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন :

বজরায় নয়, পানসীতে নয়,
বাংলার নবাব আজ হাটুরের সামান্য নৌকায়। [...]
পাঁচদিন একটানা চলবার পর
কালিন্দীর তীরে নবাব শিরাজদ্দৌলা
কাহপুর গ্রামে থামলেন ক্ষুধার আহার্য খোঁজে।
পিপাসায় মৃতপ্রায় পত্নী লুৎফা, দুধ বিনা কোলের কন্যাটি।
তীরে এক ফকিরের আস্তানায় খাদ্যভিক্ষা করলেন তিনি। [...]
দানশা ফকির! পশ্চাৎ ধাবনকারী মীরকাশেমের কাছে
নবাবের সংবাদ পাঠায়। [...]
শিরাজেরই অনুগ্রহে জায়গীরভোগী যে কাশেম,
শিরাজকে সে-ই বন্দী করে,
সাধারণ কয়েদীর বেশে তাঁকে পাঠায় মুর্শিদাবাদে।
এরই নাম কৃতজ্ঞতা বটে ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৭৭)

বলাবাহুল্য, এসময়ে ইংরেজদের পরামর্শে মীরজাফর জনগণের মধ্যে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শনের নিমিত্তে রাজনিয়মে পশমি রুমালে বন্দী শিরাজকে না বেঁধে লৌহশৃঙ্খলে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে আনে। এরপর মীরজাফরের পুত্র ১৭ বছরবয়সী মীরনের নিদের্শে মোহাম্মদী বেগের হাতে বাংলার নবাব নির্মমভাবে শহিদ হন। পলাশি গ্রামের এক নিরক্ষর কবির কবিতায়ও এ নিমর্ম ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে নিম্নরূপে :

নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী।

আবাসে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দান শাহ তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি এখন প্রতিশোধ লইবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া সিরাজকে আশা ভরসা দিয়া আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গোপনে মীর মোহাম্মদ জাফর খাঁর ভ্রাতা ও আকবর নগরের ফৌজদার দায়ুদ আলী খাঁকে সংবাদ পাঠাইলেন।' (দ্রষ্টব্য: *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২২৮)

কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি ॥

দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।

মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।[১]

নাটকের শেষে কুতুব চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত ঘটনাংশ নাট্যকার অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে রচনা করেছেন। বস্তুত, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে শিরাজ এবং মুর্শিদাবাদের ট্রাজিক ঘটনা বাঙালির আবেগ-বেদনার সঙ্গে মিশে আছে। ফলে সৈয়দ শামসুল হক নাটকে সেই আবেগটিকে ধরে রাখতে চেয়েছেন নাট্যরস ও নাট্যাবেগ সৃষ্টির প্রয়োজনে। তবে তিনি ইতিহাসের বাস্তবতাকে কখনো অস্বীকার করে যাননি। এ ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সংঘটিত ধানমণ্ডির ট্রাজিক ঘটনার সঙ্গে। বঙ্গবন্ধু এবং রক্তাক্ত ও শোকাবহ পচাঁত্তর যে নাট্যকারের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত এটি তার প্রমাণ। যেমন :

এখনি দেখতে পাই আরো দুটি শতাব্দীর পরে

আরো এক হত্যা হবে এই বাঙ্গালায়।

সেদিনও রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে থাকবে

সেদিনও রাস্তায় লোক নিশ্চেষ্ট নিশ্চল।

সেদিনও অনেকে যাবে ঘাতকের কাছে –

রোষে নয়, প্রতিরোধ প্রতিশোধে নয় –

ক্ষমতার অংশ নিতে রাষ্ট্রক্ষমতার।

হত্যা তো কেবল হত্যা করলেই নয় –

আলিঙ্গন করা হত্যাকারীকে তো এক অর্থে হত্যাই নিশ্চয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৩১)

এখানে সহজেই অনুধাবন করা যাচ্ছে যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে যে ন্যাক্কারজনক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিল, নাট্যকার সেই ঘটনাকে বিগত ইতিহাসের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন; এবং একজন দেশপ্রেমিক নেতার মৃত্যুতে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পরিবর্তে জনগণের একই নির্লিপ্ত অবস্থানকে নিন্দা করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছেন সমাজের সেই শ্রেণিকে – যারা ক্ষমতালোভে মত্ত হয়ে ন্যায় অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে ঘাতকের সঙ্গে হাত মেলায়। তাঁর মতে, হত্যাকারীকে মদদ দেওয়াও একধরনের হত্যাকাণ্ড।

---

[১] মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য, 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৩, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৬ (দ্রষ্টব্য : রজতকান্ত রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা গেছে, পনেরো আগস্টের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা বসেছে তারা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের বদলে তাঁর ঘাতকদের পুরস্কৃত করেছে নানান সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু তনয়ারা থেকে গেছে দেশের বাইরে চরম অবহেলা আর আশংকাময় অবস্থায়। এমনকি শাসকগোষ্ঠী সংবিধান বদলে আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দীর্ঘকাল বন্ধ করে রেখেছে। সৈয়দ শামসুল হক সে প্রসঙ্গটিই এখানে উত্থাপন করেছেন।

কেবল শিরাজকেই নয়, পরবর্তীকালে অত্যাচারী মীরন একে একে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদেরও নির্মমভাবে হত্যা করে। মহলের নারীরা দীর্ঘদিন বন্দি থাকে ঢাকার কেরানীগঞ্জস্থ জিঞ্জিরা প্রাসাদে। এরপর ১৭৬৫ সালে ক্লাইভের সহায়তায় লুৎফুন্নিসা তাঁর কন্যাসহ মুর্শিদাবাদ ফিরে যান ; এবং কোম্পানি-প্রদত্ত সামান্য মাসোহারায় করুণ জীবনযাপন করে ১৭৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

অবশ্য শিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় বসেছে প্রকৃতির বিচারে তারা কেউই শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে কিছুকাল রাজত্ব করলেও অনতিকাল পরেই ইংরেজদের রোষে পড়ে সিংহাসনচ্যুত হন। পরে আবার অল্পসময়ের জন্য সিংহাসন ফিরে পেলেও কুষ্ঠরোগে ভুগে নির্মম মৃত্যু হয় তার। তার পুত্র মীরন বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করে। তবে জনশ্রুতি আছে যে, ইংরেজরাই তার নির্মমতায় বিস্মিত হয়ে আততায়ীর মাধ্যমে তাকে গোপনে হত্যা করেছে। অন্যদিকে, মীর কাসিম কিছুকাল রাজত্ব পেলেও ইংরেজদের সাথে বনিবনা না হওয়ায় ইংরেজদের সঙ্গে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। দিল্লির রাজপথে আমৃত্যু ভিখিরিজীবন যাপনের পর রাজপথেই চরম অবহেলায় তার মৃত্যু ঘটে। স্থানীয় জগৎশেঠ পরিবার ছিল শিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার নেপথ্য শক্তি। মীরকাসিমের হাতে এই শেঠ পরিবারের বড় শেঠ ভাই মহতাব ও স্বরূপচাঁদের সলিল সমাধি ঘটে। উমিচাঁদ ইংরেজদের প্রতারণায় পলাশির ষড়যন্ত্রদলিলের শর্তানুযায়ী স্বত্বভোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এমনকি যে ক্লাইভ ছিল ষড়যন্ত্রের মূল ক্রীড়নক; সেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অপমানিত, লজ্জিত, হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি নিজের গলায় নিজে ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। এভাবেই প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে এবং অনাগত মানুষের জন্য রেখে গেছে দৃষ্টান্ত। কিন্তু মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে একই ভুল বার বার করে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে আততায়ীর হাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড তারই প্রকৃত দৃষ্টান্ত।

শিরাজের পতনের এ ইতিহাস নিয়ে সমকালে অনেকেই গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের রচনার পেছনে একধরণের উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজ কিংবা ফরাসি যে লেখকই এ-বিষয়ে ইতিহাস লিখেছেন, প্রত্যেকেই শিরাজের চরিত্র ইচ্ছাকৃতবাবে বিকৃত করেছেন। ফলে শিরাজ এক শতাব্দীকালেরও বেশি সময় জনগণের কাছে খলচরিত্র হিসেবেই থেকে গেছেন। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইতিহাসবেত্তা ও গবেষক অক্ষয়কুমার মৈত্র শিরাজের জীবনকাহিনি অবলম্বনে নতুন করে গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে শিরাজ সম্পর্কে এতদিন ধরে প্রচলিত তথ্যসমূহের অসারতা প্রমাণিত হয়। এরপর সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচনা করেন অসামান্য শিল্পসফল নাটক *সিরাজুদ্দৌলা (১৯৩৮)*। অতঃপর পলাশির ঘটনা ও শিরাজ প্রসঙ্গ নতুন মাত্রা পায়। মানুষের মুকে মুখে রচিত হতে শুরু করে তার বন্দনাগীত। *নারীগণ* কাব্যনাটকে কুতুব চরিত্রের উচ্চারিত সংলাপে মাধ্যমে শিরাজ চরিত্রের মহিমান্বিত স্বরূপ শিল্পরূপময় হয়ে উঠেছে :

ক্রমে চিড় ধরে যাবে শিরাজের হীরাঝিলে,
ঘসেটির মতিঝিলে, আর মীরজাফরের হাভেলিতে।
একদিন বিরান সুনসান হয়ে যাবে সব,
ইট খসে পড়ে যাবে, সৌধচূড়া মাটিতে গড়াবে,
দেউড়িতে বাসা নেবে শৃগাল বাদুড়।
পলাশীরও লাক্ষাবাগ আম্রবন পড়ে যাবে ভাগীরথী বুকে।
কিন্তু শিরাজের নাম ক্রমে বৃদ্ধি পাবে।
বাঙ্গালার বিদ্রোহে বিপ্লবে
শিরাজ আবার এসে সমুখে দাঁড়াবে।
তার ভুল ভ্রান্তি ভাগ্য যাই হোক,
তার নাম উজ্জ্বলতা পাবে।
তিনি হয়ে উঠবেন মানুষের কাছে এক প্রতীকী মানুষ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৩৩)

শিরাজের মৃত্যুর পর যারাই নবাবি পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ইংরেজদের বশংবদ; পুতুল রাজা। নেপথ্য থেকে তাদের পরিচালিত করেছে ইংরেজ। একপর্যায়ে মীরজাফর, মীরকাসিমের সঙ্গে রাজ্য ও রাজত্বের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ইংরেজদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। অবশেষে মীরজাফরের মৃত্যু ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মীর কাসিমের পলায়নের পর ইংরেজরা সরাসরি তৎকালীন দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহকে নজরানা দিয়ে বাংলার পুরো রাজস্ব আদায়ের ভার নিজেরাই নিয়ে নেয়। আর তখনই আক্ষরিক অর্থে বাংলায়

শুরু হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন। তারা এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যাচারী নায়েব নিয়োগ করে সাধারণ জনগণকে শোষণ ও অত্যাচারের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করে বিদেশে পাচার করতে থাকে। রংপুর অঞ্চলের দেবী সিংহ তাদেরই প্রেরিত এমন একজন অত্যাচারী দেওয়ান। সৈয়দ শামসুল হকের অন্য ইতিহাসভিত্তিক কাব্যনাটক *নূরলদীনের সারাজীবনে* যার অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে। কোম্পানি আর তার সহযোগীদের প্রজাপীড়ন ও নির্বিচার শোষণে বাংলায় অচিরেই শুরু হয় মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬); যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে অধিক পরিচিত।

তবে সৈয়দ শাসুল হক *নারীগণ* নাটকটি রচনা করেছেন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন উদ্দেশ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য দেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা নয়, কিংবা নূরলদীনের মতো ইতিহাসের অনালোচিত বীরকে খুঁজে এনে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়; তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য অতীত ইতিহাসের জমিনে আধুনিক নারীবাদের প্রতিষ্ঠা। বলা যায় বিংশ শতকের শেষের দিকে এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকে বিশ্বজুড়ে নব্যনারীবাদের যে জোয়ার চলেছে, একজন আধুনিক-মনস্ক শিল্পী হিসেবে তাতে সমর্থন জানাতেই তিনি এ নাটক রচনা করেছেন। তিনি রাজদরবারে পুরুষের বীরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে নয়, বরং রাজমহলের অনালোচিত নারীদের আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ও সংক্ষোভের চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনে আলোচ্য নাটক রচনা করেছেন।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে *নারীগণ* নাটক রচিত হলেও নাট্যকার এখানে নারীবাদী তত্ত্বে (Feminism Theory) অনুপ্রাণিত হয়ে রাজমহলের নারীদের অপ্রকাশিত ও অনুচ্চ আর্তির কথা বলতে চেয়েছেন। ফলত, এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সমান্তরালে প্রকটিত হয়েছে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। রাজমহলের নারীরা যেহেতু মুসলিম অভিজাত পরিবারভুক্ত ছিল, সেহেতু সর্বসাধারণের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। নবাবরা তাদের এমন ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখতেন যেন তারা মানুষ নয়, কোনো রত্নভাণ্ডারের গুপ্ত রত্ন ; যা কেবল নবাবরাই ইচ্ছেমতো ভোগ করতে পারেন। রাজনীতি, রাজদরবার কিংবা সামাজিক আচার-প্রক্রিয়ায় প্রকাশ্যে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ঠাটে-ঠমকে নবাবের মনোরঞ্জনই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাদেরও যে প্রাণ আছে, উপভোগের তীব্র স্পৃহা আছে তা জানানোর কোনো উপায়ই তাদের ছিল না। কিন্তু এসব নারীদের মধ্যেও যে প্রাণের স্পন্দন আছে, তারাও যে বাইরের আলো-হাওয়ায় বিচরণের অধিকার রাখে, এ-কথাই সৈয়দ শামসুল হক নিজকল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য নাটকে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নাট্যকার কেবল মহলের হতভাগ্য নারীদের মর্মগাঁথাই উপস্থাপন করেননি, বরং পুরুষসৃষ্ট এই যুদ্ধে অন্তঃপুরিকারা কীভাবে মানবিক বোধে ও অনুভবে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়

অনুভবে সংমিলিত হয়েছেন তাও নাট্যরূপ দিয়েছেন। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন – দুঃসময়ে মানুষে মানুষে ভেদ থাকে না। শোষকের চেহারা যেমন এক, তেমনি শোষিতের ছবিও হয়ে যায় এক। তাঁর ভাষায় :

আমির ফকির যদি মৃত্যুপথে এক –
কাল যদি মন্দ, তবে সেও হয় মৃত্যুরই সমান।
বেগম ও বাঁদীগণ আজ এক কাতারে এখন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৭৩)

পুরুষের চোখে নারী কেবল ভোগের সামগ্রী। নারীর মাতৃরূপ বিস্মৃত হয়ে তাদের অঙ্কশায়িনী করতেই বরং তাদের আনন্দ। নাটকের প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয় :

নারীকে ওরা সন্তানের জন্মসূত্র নয়,
মনে করে কামচক্র ওটি।
যেন প্রাচ্য নারীদের স্তন ঘন নয় মাতৃদুধে –
কামনার সুরাপূর্ণ কোমর সোরাহি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮১)

আঠারো শতকের মাঝামাঝি যখন বঙ্গদেশের নারীদের এই অবস্থা, বহির্বিশ্বের নারী সমাজ তখন থেকেই এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। পুরুষের তুলনায় নারীকে হেয় করে না দেখে বরং একজন মানুষ হিসেবে নারীকে তারা মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছে। আর বাঙালি নারীদের সেই আওয়াজ তুলতে সময় লেগেছে বিংশ শতাব্দীতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) ভূমিকার আগ পর্যন্ত।'[১]

---

[১] পাশ্চাত্য সমাজে মেরি উলস্টোনক্রাফ্‌ট (১৭৫৯-১৭৯৯) হলেন প্রথম নারী, যিনি সমাজে নারীর বৈষম্যচিত্র এবং তার বিপরীতে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমাজে কী কী তার প্রাপ্য তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেন। একদিকে ১৭৯০ সালে নবাব শিরাজদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নিসা ব্রিটিশকর্তৃক সামান্য ভাতায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন, অন্যদিকে এই ১৭৯০ সালেই পাশ্চাত্য সমাজে প্রকাশিত হয় মেরির লেখা প্রথম নারীবাদী গ্রন্থ *A Vindication of the Rights of Woman : With Strictures on Political and Moral subjects.* নারীও যে পুরুষের মতোই একজন মানুষ এবং সমাজ রাষ্ট্রপ্রদত্ত সব সুবিধা নারীরও প্রাপ্যের অধিকার রয়েছে এটিই ছিলো মেরির লেখা আলোচ্য গ্রন্থের মূল বক্তব্য। অন্যদিকে 'বাংলায় মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলন সূচিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। এর প্রবর্তক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রায় তিন দশক সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাঁর সমমমনা কর্মীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের এই উপমহাদেশ ত্যাগ এবং এরপর পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের সময়কালের গণআন্দোলন ও ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় – এসবই বাঙালি মুসলিম নারী সমাজকে প্রগতির পথে অনেক দূর এগিয়ে

সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন বরাবরই ছিলেন নারীবাদী সাহিত্যচর্চার সোচ্চার সমর্থক। তিনি তাঁর লেখনীতে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই নারীর অধিকার, নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন আলোচ্য নাটকে নবাবের অন্তঃপুরিকাদের বঞ্চনা, মনঃকষ্ট, বন্দিদশার নির্মমতার কথা তিনি উপস্থাপন করেছেন শিরাজের মাতা আমিনা চরিত্রের মাধ্যমে। অন্যদিকে রাজমহলের দাসি ও পরিচারিকার জীবনযন্ত্রণার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে পায়েলি ও ডালিম চরিত্র দুটির মাধ্যমে। সমকালীন সমাজে প্রচলিত দাসপ্রথার উল্লেখ রয়েছে ডালিম চরিত্রের সংলাপে :

জানি না কোথায় কবে কোন দূর দেশে
কার কোল থেকে কবে ছিন্ন করে আমাদের আনা হয়,
তোলা হয় গোলামের হাটে।
তারপর এসে পড়ি নবাবের জেনানা মহলে।
আর এই জেনানা মহলই হয় একমাত্র জগত বাঁদীর।
মহলেই নাবালিকা থেকে বালিকা –
মহলেই যৌবন বিগত,
একদিন মহলেই ইন্তেকাল করা।
এই জীবন বৃত্তান্তে পিতা মাতা ভাই বোন নাই – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪১৮)

সেকালের সমাজে বিদ্যমান দাসপ্রথার নির্মম বলী মহলের বাঁদিচরিত্র ডালিম ও পায়েলি। রাজপরিবারের সেবা-শুশ্রূষা কিংবা মনোরঞ্জনের মাধ্যমেই অতিবাহিত হয় এদের জীবন। কিন্তু মহলের কোনো কিছু ভোগদখলের অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। দাসপ্রথার নির্মম বলী হয়ে কোন দূরদেশ থেকে এদেশে এসেছে তাও তাদের অজ্ঞাত। রাজপরিবারের সন্তান-সন্ততিরা তাদের পরিচর্যায় লালিত-পালিত হয়, কিন্তু তারা দাসীই থেকে যায় আজীবন। এমনকি যুদ্ধপরবর্তীকালে মহলের উচুঁতলার নারীরা যখন নিজেদের সম্ভ্রমরক্ষার চিন্তায় অস্থির, তখনও এই দাসীদের কথা তারাও ভাবে না। হাতবদল হওয়া আর সম্ভ্রম হারানোই যেন এসকল নারীদের জীবনভাগ্য। ডালিমের কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হয় ক্ষোভমিশ্রিত অভিযোগ :

খোদার পরেই

নিয়ে গেছে।' (দ্রষ্টব্য : শাহানারা হোসেন, *উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৯-২০)

হাজির নাজির যদি জেনে থাকি আপনাকে

দেখলাম সেই আপনারাই একমাত্র নিজেদের ইজ্জতের কথা ভাবছেন।

শুধু নিজেদের! শুধু আপনার কন্যা আর পুত্রবধূটির।

কেবল তারাই নারী ? নারীধর্ম কেবল তাদেরই ?

আমাদের নারীধর্ম নাই ? কোনো নারীত্ব নাই ?

বাদীদের নেই – তাই নেই হারাবার ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪১৯)

মহলের নারীদের পাশাপাশি নাটকে আরেক শ্রেণির নারীর উল্লেখ করেছেন নাট্যকার, যারা নবাব মহলের নারীদের মতো অসূর্যম্পশ্যা নয়। তারা রাজপরিবারের পরিচয়ে পরিচিত না হলেও রাজপুরুষদের সম্মানে নৃত্যগীত পরিবেশন করে তাদের জীবনকে করে তুলেছিল উপভোগ্য ও আনন্দময়। বাঈজি নামেই এরা সে-সমাজে পরিচিত ছিল। জীবনযাপনে এরা ছিল অনেকটা স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী। সমাজপতি কিংবা সামন্তপ্রভুদের সঙ্গেই ছিল এদের সম্পর্ক। ফলে রাজ্য বা রাজত্বের হাতবদল হলেও এদেরর ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হতো না। যেহেতু রাজপুরুষের ভোগবিলাসে এরা ব্যবহৃত হতো, সেহেতু রাজমহলের নারীরা এদের প্রতি ছিল ঈর্ষাকাতর। মহলের নারীরা যেখানে কেবল নিজেদের স্বার্থ বিবেচনা করছে, সেখানে এরা রাজমহলের সম্মান ও মর্যাদাকে উচ্চাসন দিয়েছে।

অন্যদিকে, নারীগণ নাটকে নাট্যকার সমাজবাস্তবতার আলোকে দেখিয়েছেন যে, পুরুষের নিকট নারীর কোমল-মধুর রূপ অধিক পছন্দনীয়, ফলে তারা নারীর রূপসজ্জা, অঙ্গসজ্জায় যতটা আগ্রহী, নারীর বিদ্যার্জন কিংবা অস্ত্রশিক্ষায় ততটা আগ্রহী নয়। রাজমহলে পুত্রসন্তান শৈশব থেকেই বিভিন্ন অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দক্ষযোদ্ধা হবার পাঠ নেয়। কিন্তু কন্যাশিশুর জন্য এ অধিকার নেই । অথচ মেয়ে শিশুকেও উপযুক্ত অস্ত্রচালনায় দক্ষ করে তুললে তারা পুরুষের পাশাপাশি রাজ্যরক্ষায় অংশ নিতে পারত। অন্তত রাজ্যরক্ষা না হোক, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষায় তাদের এ দক্ষতা কাজে লাগাতে পারত। অবশ্য মহলের নারীরা সামান্য কিছু অস্ত্র কাছে রাখার অধিকার পেতো সম্ভ্রম রক্ষার্থে আত্মহত্যা করার জন্য। সমাজের এই বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়েছে আমিনা চরিত্রের একটি সংলাপে :

হায় নারীর খঞ্জর!

যুদ্ধের জন্যে তো নয়,

শত্রুর পঞ্জর বিদ্ধ করতে তো নয়,

পুরুষ যে নারীকে খঞ্জর দেয়, কেন তারা দেয় ?
আত্মহত্যা করবার জন্যেই তো, বেটি।
পুরুষেরা মনে করে, যুদ্ধে পরাজয়
তখনি সর্বাংশে হয়
যখনি নারীটি তার বিজয়ীর ভোগ্যবস্তু হয়।
তাই পরাজিত হয়েও পুরুষ চায় জয়ী হতে,
আর সেই জয় তাকে দিতে পারে একমাত্র নারী –
যদি নারী আত্মহত্যা করে! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮৬)

অর্থাৎ যে রাষ্ট্রনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষতন্ত্র স্বীকার করে নিতে পারে না, সেখানেই নারী জয়-পরাজয়ের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়। আমিনার প্রাসঙ্গিক সংলাপ উল্লেখ্য :

রাজনীতি শতরঞ্জ খেলায়
নারী তো আসলে এক সামান্যই বড়ে –
তাকেও না খেলে বুঝি কিস্তিমাৎ হয় ?
যুদ্ধের প্রান্তরে নয়, জয়-পরাজয়
নারীর শরীরে হয় নির্ধারিত – ইতিহাসের রয়েছে প্রমাণ। (কাবনাট্যসমগ্র : ৩৮৫)

সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে দেখাতে চেয়েছেন সমাজে নারীরাও রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু কোনো পুরুষ হাতে ধরে নারীকে এ শিক্ষা দেয় না। বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নারীরা তা শিখে নেয় আপনা থেকেই। রাজনৈতিক ঘাত-সংঘাতের অনিবার্যতায় শিরাজপত্নী লুৎফার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ প্রসঙ্গে রাজমাতা আমিনার একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে :

রাজনীতি হাত ধরে শেখায় না পুরুষেরা,
শিখি নিজে নিজে, রক্তে বুক ভেসে গেলে।
আম্মা, এভাবেই আমরা নারীরা শিখি –
প্রয়োগের সুযোগ পাই না শুধু নারীজন্ম বলে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪২৩)

অন্যদিকে পলাশিপরবর্তী অস্থিতিশীল সামাজিক অবস্থা সুস্পষ্ট হয়েছে শরীফার আরেকটি সংলাপের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে সে-সময়কার পলাশির বাস্তব অবস্থা উপস্থাপিত হলেও সবযুগের সবকালের রাজনৈতিক

পালাবদলের পরবর্তীকালীন বিশৃংখলার চিত্রও পরিস্ফুটিত হয়েছে। এমনকি একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়পরিসরে বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক সামাজিক অব্যবস্থাপনাও প্রতীকী হয়ে ধরা দিয়েছে আলোচ্য সংলাপে :

> শরিফা। হস্তী পড়ে গেলে চুহা হস্তী হতে চায়! [...]
> বিধর্মী, কাফের, শেঠ, বানিয়া, গোমস্তা, গোরা,
> দেশবেশ্যা, নীতিবেশ্যা, ধর্মবেশ্যা, চারদিকে ওরাই এখন।
> স্বর্ণলোভী ওরা। বিষ্ঠা থেকে খুঁটে যদি তুলতেও হয়,
> তুলতে পিছপা নয়। ক্ষমতার লোভী!
> কারণ ক্ষমতা যার স্বর্ণ তারই স্বর্ণের ভাণ্ডার।
> অতএব রাষ্ট্রদস্যু সিংহাসন কাড়ে।
> সিংহাসন পাওয়া মানে লুণ্ঠনের সুযোগ অপার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪২২)

আর এভাবেই নাট্যকার অতীত ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জকে সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে বেঁধে *নারীগণ* নাটকটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সামাজিক নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের সূত্রকে পাঠক-দর্শকের সম্মুখে অপরূপ নান্দনিকতায় উপস্থাপন করেছেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৈয়দ শামসুল হকের সামাজিক কাব্যনাটক

সৈয়দ শামসুল হকের শিল্পকর্মের মধ্যে তাঁর সমাজ অভিজ্ঞান কিংবা সমাজ-অনুধ্যানে নিবিষ্ট আন্তরিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায়। তাঁর রচিত কাব্যনাটকগুলোর পরতে পরতে রয়েছে সমকালীন সমাজের গতিচিত্র। বস্তুত, একজন সমাজনিষ্ঠ নাগরিকের মতো তিনি সমাজের শেকড় ও উপরিতল – দুটোকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ফলত, একটি সার্বিক সমাজচিত্রের শৈল্পিক ব্যঞ্জনা আমরা তাঁর কাব্যনাট্যে পাই। সৈয়দ শামসুল হক বলা যায় তাঁর প্রতিটি কাব্যনাটকই সামাজিক ভিত্তি-কাঠামোর উপর নির্মাণ করেছেন। তবে প্রধানত সমাজকে আশ্রয় করে চারটি কাব্যনাটক লিখেছেন। এগুলো হলো : *এখানে এখন*, *ঈর্ষা*, *চম্পাবতী* ও *অপেক্ষমাণ*। *এখানে এখন* কাব্যনাট্যের মৌল বিষয় পঁচাত্তরোত্তর সামাজিক বিনষ্টি। অস্থির সময় ও বিপন্ন রাজনীতিকে ব্যবহার করে একদল মানুষ কীভাবে শুভবোধ হারিয়ে কালোশক্তিতে পরিণত হয় – এটিই এখানে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। *ঈর্ষা* নাটক নর-নারীর একান্ত হৃদয়জাত সম্পর্ককে অবলম্বন করে রচিত হলেও সেখানে সমকালীন সমাজ নেপথ্য কারণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। *চম্পাবতী* কাব্যনাটকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজ ও ভাসমান বেদেসমাজের বাস্তবচিত্র। সর্বশেষ *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হক হেনরিক ইবসেনের পাশ্চত্য সমাজের সঙ্গে এদেশের সমাজব্যবস্থার সাযুজ্য নির্মাণ করে দেখিয়েছেন – এদের মধ্যে খুববেশি পার্থক্য নেই। নিম্নে এ নাটকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

এখানে এখন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত কাব্যনাট্যের মাধ্যমে রূপায়িত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই রচিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের *এখানে এখন (১৯৮১)*। এটি সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে রচিত নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস *কালধর্ম (১৯৮৯)*-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। বস্তুত, একই চরিত্র ও বিষয়

নিয়ে সাহিত্যের দু-দুটি মাধ্যমে কাজ করার ইচ্ছা থেকে বোঝা যায় – সমকালীন বিপর্যস্ত সময়-সমাজ লেখক সৈয়দ শামসুল হকের বোধ ও চেতনায় কতখানি নাড়া দিয়েছিল। পঁচাত্তরে জাতির জনকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরে যে নৈরাজ্য নেমে আসে, মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস-নিপীড়ন, ছদ্ম-গণতান্ত্রিক শাসনপ্রক্রিয়া এবং আর্থ-সামাজিক নৈরাজ্য সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাহিত্য-আঙ্গিকে সৈয়দ শামসুল হক সোচ্চার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। এ-সময়ে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা প্রত্যক্ষ করে জনৈক সমালোচক নিম্নরূপ মন্তব্য করেছিলেন :

> আশির দশক কোনো মননজীবী আর লেখকের জন্য সুখের সময় ছিল না। লেখনী, বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তখন খর্ব। এই সময়ে বাঙালিত্বের সাধনা, চর্চা, অসাম্প্রদায়িকতার কথা উচ্চকণ্ঠে বলা যেত না। বাঙালি সত্তায়ও আচ্ছাদন পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত ছাত্রসমাজের দুর্বিনীত কর্ম ও প্রবণতার ফলে জনজীবন ও গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সৈয়দ হক সমালোচনায় অদম্য হয়ে উঠেছিলেন।[১]

স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশি-বিজাতি-বিভাষী শাসককর্তৃক বাঙালি বার বার শাসিত ও শোষিত হয়েছে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে স্বজাতীয়রাই সে শোষণ-নিপীড়নের ধারা অব্যাহত রেখে সাধারণ জনগণকে নানা উপায়ে ব্যবহার করেছেন, প্রতারিত করেছেন। নাট্যকার আলোচ্য নাটকের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন – শোষকের কোনো জাতপাত নেই, সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্বসমাজে তাদের বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন। নাটকে তিনি বিভিন্ন শ্রেণি-চরিত্রের আচরণের মধ্যদিয়ে এই বিষয়টি জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন। একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মর্তব্য :

> *এখানে এখন* কাব্যনাটকে সৈয়দ শামসুল হক স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য শৈল্পিক সুষমায় উপস্থাপন করেছেন। [...] মূলত এ কাব্যনাটক সমকালীন সমাজ জীবনের প্রামাণ্যচিত্র। আধুনিক মানব জীবনের সমস্যাসংকুল বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে যেসব ঘটনা ঘটে *এখানে এখন* কাব্যনাটকে তা উঠে এসেছে।[২]

---

[১] আবুল হাসনাত, ‘তাঁর সৃজনভুবন নিয়ে কিছু কথা’, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.),*পরানের গহীন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৫-৫৬

[২] অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৭২

কাব্যনাট্যের নামকরণ *এখানে এখন* থেকেই বোঝা যায়, লেখক এ-নাটকে সমকালীন বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতার ছবি আঁকতে চেয়েছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সেই অস্থির সময়ে মানুষ বিবেকবুদ্ধি বিস্মৃত হয়ে উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে কীভাবে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে, স্বার্থের টানে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বোধ বিসর্জন দিয়ে ক্রমাগত উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। নাটকের ভূমিকাংশে তিনি স্বয়ং এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

> এ নাটকের চাবি হচ্ছে একটি অতি পরিচিত শব্দ, চার অক্ষরের, অভিধানে শব্দটির যতগুলো অর্থ ও প্রয়োগক্ষেত্র লেখা আছে তা দিয়ে আজ এই বাংলাদেশে একে আর চেনা যাবে না; শব্দটির নতুন একটি অভিধা আমরা রচনা করে ফেলেছি স্বাধীনতার বৎসরকালের ভেতরেই; বড় ভয়াবহ, নির্মম ও সর্বগ্রাসী সেই শব্দ – 'ব্যবহার'। এই নাটকেরই একটি চরিত্র উচ্চারণ করবে, 'ঈশ্বর, ডলার কিংবা প্রেম-ভালোবাসা, প্রসঙ্গটা যাই হোক / মানুষেরা ব্যবহার ব্যবহার করে আর ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়।' বস্তুত কি তাই নয়? এখানে এখন? বস্তুত কি বাংলাদেশ এখন বিভক্ত নয় দুটি শ্রেণীতে? – ব্যবহর্তা আর ব্যবহৃত। এবং বস্তুত কি ব্যবহৃত মানুষেরাই প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠী নয়? এবং ব্যবহর্তা মাত্র কতিপয়? আমরা কি স্বাধীনতা এ কারণেই চেয়েছিলাম এবং এনেছিলাম, ভিন্ন দেশী ভিন্নভাষী ব্যবহর্তাকে সরিয়ে নিজেরাই তা হতে? এই নাটকেরই সূচনায় থাকবে এ রকম একটি সংবাদ যে, মানুষকে মানুষের মুখ চিনতে হলে / অন্য কোনো আলোকের দরকার হয় / মানুষকে মানুষেরই স্বর শুনতে হলে / কোনো এক প্রলয়ের দরকার হয়।' আমার আশা এই, রঙ্গমঞ্চ সেই আলোক সরবরাহ করবে এবং অভিনয় সেই প্রলয় ডেকে আনবে। এবং তখনি আমরা বিকটভাবে জেনে যাব এ নাটক রফিকের নয়, বা কালো সিগারেটসেবী নামহীন ব্যক্তিটি নয় ; এ নাটক আমাদেরই, আমরা যারা 'ব্যবহার' শব্দটির নতুন অভিধা এনেছি।[১]

এখানে এখন নাটকটি তাই হয়ে উঠেছে সমকালীন সমাজের প্রতিরূপ। নাটকের চরিত্র-পাত্রের গতিবিধি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসূত্রে যে বক্তব্যটি সত্যস্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে – সমকালীন সমাজে ব্যবহার আর ব্যবহর্তার চক্রে সকলেই কম-বেশি জড়িত। ফলে নাটকের মূলসুরের সঙ্গে পাঠক-দর্শক অনায়াসেই নিজেকে মেলাতে পেরেছে। নাটকে সমকালীন সমস্যা ও সংকটকে উপস্থাপন করার এ আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করে কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন মন্তব্য করেছেন :

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৫৩

> তিনি সময়কে ধরেছেন – সময়ের জীবনকে ক্যানভাসে এঁকেছেন – সব্যসাচী লেখকের কলমে আশ্চর্য দক্ষতায় উঠে এসেছে সমকালের বাংলাদেশ। তাঁর উঠে আসার শিল্পমাধ্যম কাব্যনাটক।[১]

এখানে এখন কাব্যনাটকটির মূল কাহিনি খুব একটা বিস্তৃত পরিসরের নয়। নাটকটি সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার ভিত্তিতে রচিত হলেও নাট্যকার কাব্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে সামাজিক সমস্যার বিস্তৃত বিবরণ এড়িয়ে গেছেন ; বরং নাট্যঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ও সংলাপের মাধ্যমে পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নির্মম বাস্তবতার নাট্যিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ নাটকের প্রধান চারটি চরিত্র – রফিক, নাসিরুদ্দিন, সুলতানা ও মিনতির যাপিত জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, পরস্পরকে অতিক্রমের দুর্বার মোহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মূলত সমকালীন বাংলাদেশের বিনষ্টপ্রায় সময় ও সমাজের চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকে দেখা যায়, রফিক অবিবাহিত একজন উদীয়মান ব্যবসায়ী। ছাত্রজীবনের সহপাঠী সুলতানা ও তাঁর স্বামী গাফফারের ফ্ল্যাটে সাবলেট নিয়ে সে বসবাস করে। অপর চরিত্র নাসিরুদ্দিন সমাজজীবনে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আর্ন্তজাতিক পর্যায় পর্যন্ত তার ব্যবসা বিস্তৃত। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে অন্য নারীতে আসক্ত, মদ্যপ। রফিকের সঙ্গে সে বারবিলাসিনী মিনতিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। রফিক ও নাসিরুদ্দিনের মধ্যে তুমুল ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও বাইরে তারা বন্ধুত্বের মুখোশ পরে থাকে। একদিকে যেমন তারা ব্যবসায়িক স্বার্থে সুদ, ঘুষ, কালোবাজারি, টেন্ডারবাজি করে, অপরদিকে সামাজিকভাবে ভালোমানুষির মুখোশ পরে গলায় ঝুলিয়ে রাখে কোরানের মিনিয়েচার সংবলিত লকেট, কথায় কথায় নাম নেয় খাজাবাবার। তবে রফিক যেহেতু অপেক্ষাকৃত কমবয়সী উদীয়মান ব্যবসায়ী; তাই নাটকে তাই দেখা যায়, সে এখনো পুরোপুরি তার চরিত্র থেকে মানববুদ্ধি বিসর্জন দিতে পারেনি। কিন্তু ঝানু ব্যবসায়ী নাসিরুদ্দিনকে টেক্কা দিয়ে অবৈধপন্থায় মানিকগঞ্জ টু ঢাকা রেললাইনের টেন্ডার বাগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে সে-ও আস্তে-সুস্থে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হতে শুরু করেছে। ফলে নাট্যঘটনার শেষে দেখা যায়, সে নাসিরের মতো পুরোপুরি কালো পোশাকে আবৃত। বস্তুত, রফিক চরিত্র বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে কীভাবে বিনষ্টিকে আলিঙ্গন করেছে তা-ই এ-নাটকের কাহিনি; এর সমান্তরাল শাখা কাহিনি হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে মিনতির কাহিনি, যে দারিদ্র্যের কশাঘাতে বাধ্য হয়ে গ্রামীণজীবন ছেড়ে শহরে এসে স্বভাবস্বৈরিণী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, উচ্চমধ্যবিত্ত চরিত্র সুলতানা-গাফফারের অসফল দাম্পত্যের কাহিনি প্রমাণ করেছে শহুরে শিক্ষিত নারীও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক বলয়ে কতটা অসহায়। নাট্যকার অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এই তিনটি টুকরো টুকরো

[১] সেলিনা হোসেন, 'সব্যসাচীর বিদায়', সংবাদ সাময়িকী, *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬. পৃ. ১৯

গল্পকে একইসূত্রে বদ্ধ করে সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য নাটকে।

এখানে এখন নাটকে উপস্থাপিত সমকালীন সময় ও সমাজকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের আশির দশকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকেই নবগঠিত দেশে অরাজকতা শুরু হয়। একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি জান্তার হাত থেকে দেশ মুক্ত হতে না হতেই নতুন করে শুরু হয় লুটপাট, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, কালোবাজারি-মজুতদারি, হত্যা-লুণ্ঠনের মতো ভয়াবহ ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে বরাবরের মতো সমাজের সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী তো ছিলই; কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিত্রবাহিনী যেমন পালন করেছে বৈরী ভূমিকা, ঠিক তেমনি কিছু মুক্তিযোদ্ধাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লুটপাটে, অনৈতিক সুবিধাবাদিতায়। এমন ঘটনার বিবরণ ড. আনিসুজ্জামান তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায়ও লিপিবদ্ধ করেছেন :

> খুলনায় নতুন জেলাপ্রশাসক কামাল সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা হলে দুটি অভিযোগ শুনতে পেলাম। একটি মেজর জলিল ও তাঁর মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধার বিরুদ্ধে অবাঙালিদের সম্পত্তি লুটপাট ও অবাঙালি মেয়েদের প্রতি অত্যাচারের, অপরটি ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সম্পদ অপহরণের।[১]

ফলে নতুন স্বপ্ন ও বিপুলতর সম্ভাবনার আশা নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাগত বঙ্গবন্ধুকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জবানিতে ড. আনিসুজ্জামান অস্থির এ সময়ের চিত্র তুলে ধরে আরও লিখেছেন :

> দেশের সমস্যার বিপুলতা, পুনর্বাসন প্রয়াসের প্রাথমিক সাফল্য, বেআইনি অস্ত্রের ভয়, দেশের মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার বৈপরীত্য, প্রশাসন ও দলের মধ্যে তাঁর অনভিপ্রেত কাজ [...] আমি নিজেই দেখলাম, অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতোজন, নবাবপুর-ঠাঠারিবাজারে দোকানপাট লুট হচ্ছে – পুলিশের সাহায্য চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না।[২]

---

[১] আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

অপরদিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নানান উন্নয়নমুখী উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও একাত্তর-পরবর্তী সময়ে বিশেষত, চুয়াত্তরের দিকে দেশের আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থা চরমে পৌঁছায়। এসময়ে স্বার্থান্বেষী মহলের উচ্চাভিলাষ, নবগঠিত রাষ্ট্রের অনভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ব্যবসায়ীদের কালোবাজারি, মজুতদারী, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র দেশকে করে তোলে সংকটগ্রস্ত, নিয়ে যায় দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে। দেশের এই দুরবস্থায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনগণের প্রতি উদারহস্ত ও সংবেদনশীল। এক আলাপচারিতায় রাষ্ট্রপতি হয়েও সাধারণ জনগণের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'লোককে খেতে দিতে পারি না, পরতে দিতে পারি না, দেখাও যদি না দিতে পারি, তাহলে আমার আর থাকলো কী ? [...] আমার চারপাশে চোর-ডাকাত ভিড় করে আছে। আস্থা রাখতে পারি এমন সৎ লোক চাই কাজের জন্য। [...] চোরদের থেকে রেহাই পেতে চাই।'[১] তৎকালীন সরকারের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কণ্ঠেও বার বার ধ্বনিত হয়েছে এই অস্থির সময়ের অসহনীয় ও অসহায় আক্ষেপ। এই অপপরিস্থিতিতে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী হয়েও তিনি বিপন্ন বোধ করেছেন। ড. আনিসুজ্জামানের স্মৃতিকথায় এই বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নরূপে :

> টেবিলের ওপরে রাখা একটা ফাইলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এটা তাঁর জন্যে এক উভয়-সংকট। বিদেশ থেকে সার আমদানি করতে হবে। নানা কারণে – তাঁর মতে, অকারণেই – উদ্‌যোগ নিতে দেরি হয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের। এখন প্রস্তাব এসেছে, আর্ন্তজাতিক টেন্ডার আহবান না করেই, গত বছর যারা সার সরবরাহ করেছিল, সেই প্রতিষ্ঠানকেই কার্যাদেশ দেওয়া হোক। তিনি বললেন, প্রস্তাবে সম্মত হওয়া মানে আমার পক্ষে নিয়মভঙ্গ করা, সম্ভবত দুর্নীতিতে সাহায্য করা; আর টেন্ডার আহ্বান করতে বলা মানে সময়মতো সার-সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়া। যেটাই করি, সেটাই অসংগত হবে। এইভাবে দেশ চালানো যায় না। [...] বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বব্যাংকের কাছে তিনি খাদ্য সাহায্য চেয়েছেন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণে ও অধিকতর সার-উৎপাদনে অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্যে তাদের সহযোগিতা কামনা করেছেন। এই মুহূর্তে খাদ্যপরিস্থিতি নিয়ে তিনি বেশ চিন্তিত। সরকারি লঙ্গরখানা খোলা হয়ে থাকলেও মানুষ অনাহারে মরছে। আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতিও ভালো নয়। [...] রাজনৈতিক সহনশীলতারও বড়ো অভাব।[২]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮ ও ১৩১

নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক *এখানে এখন* নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র রফিকের মুখ দিয়ে এমনই বিনষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপে :

আসলে মানুষগুলো ভয়
পেয়ে মরে পড়ে আছে। স্বর্গ থেকে শকুন নেমেছে।
কোটি কোটি লাশ দেশ লোবানের ঘ্রাণে ভরে গেছে।
কান্নার আদলে কানে শোনা যাচ্ছে পবিত্র পঠন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০০)

অন্যদিকে স্বার্থান্ধ, মুনাফাখোর, সমাজবিরোধী ব্যবসায়ীদের অনৈতিক সিন্ডিকেট তৈরির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে রফিকের সঙ্গে কথোপকথনসূত্রে নাসিরের একটি সংলাপের মাধ্যমে :

মিয়া, ব্যবসাটা কত বড় ? কোন
দেশ মাল দিচ্ছে ? ডলার না দিরহাম ? কবে রেল
বসবে সেখানে ? বড় দাঁও মেরেছো, মাইরি দোস্ত,
জিন্দাবাদ তুমি। [...] রহস্যটা এই, ঢাকা টু মানিকগঞ্জ,
রেলপথ, কোটি কোটি
টাকার প্রজেক্ট, যেমন আসবে কোটি, ঢালতেও
হবে আধাআধি, এবং অগ্রিম, বাবা, এত টাকা
ক্যাশ তুমি পেয়েছো কোথায় ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৭)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে (১০/১/ ১৯৭২) জনসম্মুখে প্রথম যে ভাষণ প্রদান করেন, সেখানেই তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা দেন – এদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি হবে তিনটি – ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। পাকিস্তানি শাসনামলে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও শোষণের প্রক্রিয়া হিসেবে কারণে অকারণে ধর্মকে ব্যবহার করা হতো। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বঙ্গবন্ধুর এমন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ছিল খুবই স্বাভাবিক বিষয়। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন কমিটিকে বঙ্গবন্ধু অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনার সঙ্গে বিশেষভাবে যে আদেশটি দিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে – রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক স্পষ্টত

ছিন্ন করা।[১] তা না হলে বিনষ্ট হতে পারে সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতি। বলাবাহুল্য, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুপরবর্তী বাংলাদেশে তাঁর এ আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল। এসময়ে ধর্ম ব্যবহৃত হলো স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়াররূপে। *এখানে এখন* নাটকে নাট্যকার ধর্মের এ অপব্যবহারের বাস্তবচিত্র চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রফিক চরিত্রের একটি সংলাপ উল্লেখ্য :

> এই যে দেখছো তুমি পরকালচর্চা বড় বেশি,
> এই যে সর্বদা শুধু ঊর্ধ্বলোকে চোখ,
> সারাক্ষণ অবনত বাস্তবিক এই যে মস্তক,
> এই যে মাজার ঘোরা, রাশিচক্র ফলাফল পড়া,
> আমিতো নিশ্চিত, এর পেছনেই
> আছে কারো গূঢ় রাজনৈতিক কারণ –
> কোনো এক শ্রেণী কিংবা শক্তি বিশেষের।
> আমাদের দুর্বল, দৈবনির্ভর তারা করে দিতে চায়। [...]
> আমরা মায়ের পেট থেকে পড়ে উত্তরাধিকার
> হিসেবে ধর্মটা পাই, তাই কেউ
> আর বড় বেশি তলিয়ে দেখি না, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০১-২০২)

নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র রফিক স্বপ্নমাধ্যমে মানিকগঞ্জে রেল দেখেছে – একথা শুনে নাসিরুদ্দিন তাকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে নবি ইব্রাহিমের স্বপ্নদর্শনের প্রসঙ্গ টেনে পরিহাস করে বলছে : 'স্বপ্ন তো সাধুরা দ্যাখে, গরীবেরা দ্যাখে। / কোন দুঃখে তুমি ? [...] নবী পয়গম্বর – এঁরা তো স্বপ্নেই পান, / এমনকি ছেলেকে কোরবান করবার আদেশ সে তো স্বপ্নেই এসেছিল হে।' (কাব্যনাট্যসমগ্র: ১৬৭) । সে-নাসিরুদ্দিনই আবার রেলের ঠিকাদারি পাওয়ার স্বার্থে আজমির শরিফ, মাজার জেয়ারত, খাজাবাবার শরণাপন্ন হয়েছে :

> কাম অন, কনফেস, শালা। [...]

---

[১] এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন – 'সংবিধানের বিষয়ে পরামর্শ দিতে বঙ্গবন্ধু দু'বার ডেকে পাঠিয়েছিলেন কামালকে – সঙ্গে আমিও ছিলাম। তাঁর প্রথম বক্তব্য ছিল রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংযোগ ছিন্ন করার একটা বিধান থাকতে হবে সংবিধানে।' (প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩)

আর তোমার খরচে সেই নপুংসক গাফফার

তোমারই শিরনি নিয়ে আজমীরে গেছে [...]

খাজা বাবার দর্গায় ? – আহ, আহ, মাফ করো খাজা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৮)

ধর্মীয় লেবাস ধরতে ও অভিজাত্যবোধের প্রমাণ দিতে এরা গলায় পরে কোরানের বাণীসংবলিত সোনার লকেট। আবার পরক্ষণেই সে লকেট খুলে মদ খেয়ে হয় মাতাল। জৈবিক ক্ষুধা মেটাতে দ্বারস্থ হয় বারবনিতার। সমাজের এমন বিনষ্টির চিত্র নাট্যকার অত্যন্ত নিখুঁত বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন মানুষ থেকে পশুতে পরিণত হওয়া নাসির চরিত্রের মাধ্যমে। নাসির চরিত্রটি রফিককে উদ্দেশ্য করে বলেছে :

কোরানের সোনার লকেট অবধি খুলে রেখে এসেছি এখানে,

তোমার বাসাটা খালি, মিনতিকে খবর দিয়েছি,

তুমি মনে করিয়ে দিলে তো খাজা বাবার কথা?

হাতে আমার গেলাশ, সামনে বোতল,

জানো মাল এসে যাচ্ছে, তুমি নিজে পর্যন্ত টানছো,

এর মধ্যে খাজা বাবার নাম তুমি উচ্চারণ করালে আমাকে?

তোমার ও ব্যবসা চলে যাবে অভিশাপে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৯)

স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্যে এরা ধর্মপালন করে থাকে, কখনোই পরিপূর্ণ ভক্তি কিংবা আত্মশুদ্ধির জন্য নয়। তাই দেখা যায়, মানিকগঞ্জে রেলের কাজ পাওয়ার জন্য নাসির বলেছে :

আমিও শিরনি দেবো বাবার দরগায়,

মাজার ভাসিয়ে দেবো চোখের পানিতে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৭৫)

নাসিরের এ-উক্তির মাধ্যমে তৎকালীন মাজার সংস্কৃতির চিত্র সহজেই অনুমান করা যায়। ঢাকা শহরে নামে-বেনামে, সে-সময় গড়ে উঠেছিল মাজার-কেন্দ্রিক ব্যবসা। ধর্মের প্রকৃত সত্য থেকে সেখানে ভিড় করেছিল আচারসর্বস্ব ধর্মের মুখোশধারীরা। আশির দশকের স্বৈরশ্বাসক জেনারেল এরশাদ নিজেও ছিলেন একজন অন্ধ মাজার-পূজারী। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে এই অপধর্মচর্চা ও কুসংস্কার নাট্যকারকে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে অসাম্প্রদায়িক মননের অধিকারী সৈয়দ শামসুল হক মনে-প্রাণে চেয়েছেন – এই সমাজের অন্তর থেকে ধর্মান্ধতা অপসারিত হোক। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন আচারস্বর্বস্ব ধর্মের এই ব্যবহার মানুষকে শোষণ ও পীড়ন করার জন্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের এধরনের কৌশল।

পঞ্চাশের দশকের তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের অধিকাংশ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সৈয়দ শামসুল হক কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেননি। তবে তিনি ছিলেন একজন আদ্যোপান্ত রাজনীতি-সচেতন মানুষ। ফলে ধর্মের লেবাসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত তিনি খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন :

> মুক্তিযুদ্ধের সারকথা [...] আমরা ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি চাই। ধর্মকে যে এই বদমাশগুলো, শয়তানগুলো ব্যবহার করেছে, আমরা তার বিরুদ্ধে, অবস্থান নিয়েছি [...] এটা নিয়ে তো পঁচাত্তর সাল থেকে আমি কথা বলছি। তখনই শনাক্ত করেছি এ থেকে আমরা মুক্ত না হলে আমাদের প্রকৃত মুক্তি আসবে না। ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত করতেই হবে বাংলাদেশকে। [...] মানুষের ভেতরে চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। আর মূল সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, সবগুলোর গোড়ায় তো রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের সংবিধানের পরিবর্তন আনতে হবে। সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।[১]

অন্যদিকে, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নবগঠিত দেশের নবীন প্রজন্মকে সুশিক্ষিত ও অসাম্প্রদায়িক মননসম্পন্ন করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধু দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনসহ বিদেশে সরকারি কাজে – সর্বত্র বাংলার ব্যবহারের সাহসী পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন। একাত্তর-পরবর্তী সময়ে তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেছিলেন : 'আমি চাই বাংলায় অনেক কাজ হোক। আমাদের রাষ্ট্রদূতরা যেসব ক্রিডেনশিয়াল দেয় বিদেশে, আমি চাই, সেসব বাংলায় লেখা হবে। তাছাড়া আরো অনেক কাগজপত্র বাংলায় হতে হবে।'[২] কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন ও উদ্যোগ তাঁর মৃত্যুপরবর্তী সময়ে পাকিস্তানপন্থীদের অপকৌশলে বাস্তবতার মুখ দেখতে পায়নি।[৩] এসময়ে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি প্রচলনের পাশাপাশি বাংলাভাষার ব্যবহারের ওপরও খড়গ নেমে

---

[১] 'রাঢ় বাঙলার মুগ্ধ চিত্রকর', মাসিক *বলাকা*, শরীফা বুলবুল (সম্পা.), বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩৭, নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[৩] 'বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল ব্রাত্যজন, ভাষার জন্য প্রাণও দিয়েছিল তারা। তাই ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রথম পাতায়ই লেখা হলো – প্রজাতন্ত্রের ভাষা হইবে বাংলা'। [...] বাংলাদেশের এলিটবর্গ তা সত্ত্বেও গঠিত নন বাংলা ভাষা নিয়ে। ১৯৭৫ সালের পর ইংরেজি ভাষাপ্রীতি সৃষ্টি করেছে এক বিশেষ শ্রেণী। ইংরেজি স্কুল, অফিস-আদালতে ইংরেজি চর্চা এবং যারা বাংলা চর্চা করে তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ তৈরি করা হয়েছে। শাসকরা সুপরিকল্পিতভাবে আবার বাংলা ভাষাকে

আসে; ব্যাপকভাকে চর্চা হতে থাকে বিদেশি ভাষা-সংস্কৃতির। *এখানে এখন* নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মুখের সংলাপে বিদেশি ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। রফিককে উদ্দেশ্য করে নাসিরের একটি সংলাপে এর উপস্থিতি লক্ষণীয় :

জলদি গেলাশ নিয়ে এসো। সোডা আছে ? নেই ? থাক।
পানিতেই চলে যাবে। বরফ তো আছে ?
চমৎকার বাড়িটি তোমার দোস্ত ; বিলকুল ফাঁকা ;
সারারাত জোর হল্লা হবে। যদি চাও
মহাদেশে তুমি আগে যাবে, ইঁটস এ ফেয়ার ডিল,
ব্যাচেলর আগে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৪)

এখানে বারবণিতাকে তুলনা করা হয়েছে মহাদেশের সঙ্গে; এবং কে আগে পতিতাসম্ভোগে লিপ্ত হবে সেটি নিয়ে তারা ব্যাবসায়িক চুক্তি করছে। বিনষ্ট সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে মদ্যপান, বারবণিতাযোগ এগুলিই যেন তাদের বিনোদনের প্রধান উপায়; ধর্ম, নীতিবোধ মুখোশ মাত্র। বস্তুত, এরা মুখোশধারী। নাট্যকার পুরো নাটকজুড়েই এদের মুখোশ উন্মোচনের মাধ্যমে একটি বিপন্ন সময়ের চিত্র এঁকেছেন।

আলোচ্য নাটকে নাট্যকার সামাজিক বিনষ্টির চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিনষ্টির চিত্র তুলে ধরতে ভোলেননি। যেমন, এসময়ে রাজনীতি চলে গেছে নষ্ট মানুষদের হাতে। বাম রাজনীতির বহুব্যবহৃত 'বিপ্লব' শব্দও ছিনতাই হয়ে গেছে। ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থে এ-শব্দের অপব্যবহার ঘটেছে। এমন কি জিয়াউর রহমান তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে নানান ইস্যুতে সমর্থন দিতে গিয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করতেন।[১] *এখানে এখন* নাটকের চরিত্রপাত্রের সংলাপে বামপন্থী রাজনীতির আবশ্যকীয় শব্দ 'বিপ্লব'-এর উল্লেখ আছে। যেমন, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রফিকের মুখের একটি সংলাপের মাধ্যমে লেখক বিপ্লব শব্দের এই অনাবশ্যক ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন :

আজকাল অবলীলাক্রমে যে-কেউ – সে-কেউ বলে

ব্রাত্যজনের ভাষা আর ইংরেজিকে শাসকশ্রেণীর ভাষা হিসেবে প্রতিপন্ন করছে।'– (দ্রষ্টব্য : মুনতাসীর মামুন, *বন্দুকের ছায়ায় গণতন্ত্র*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৩৫)

[১] আনিসুজ্জামান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'জিয়াউর রহমান কথায় কথায় বিপ্লবের ধুয়া তুলতে থাকেন এবং সাধারণ মানুষ 'বুঝিলাম, নাই বুঝিলাম জয় তব জয় ভাব নিয়ে তাকে সংবর্ধিত করে।' (দ্রষ্টব্য : *বিপুলা পৃথিবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১)

ফেলছে 'বিপ্লব'। আমাদের যেমন জাতীয় ফুল

শাপলা, যেমন দোয়েল জাতীয় পাখি এ দেশের,

এখন জাতীয় শব্দে পরিণত 'বিপ্লব' শব্দটা।

এর প্রতি অধিকার সকলেরই এখন জন্মেছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০০)

আবার, রফিক ও সুলতানার একান্ত ব্যক্তিগত আলাপেও এ প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে। যেমন :

গাফফার বোকা নয়, আসলেই ভীতু। ভয় পায়।

দু'দিকের ভয়।

বিপ্লব করতে গেলে সবকিছু ভুলে যেতে হয়,

নিজের সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে হয়,

যুদ্ধে ঠিক ঝাঁপ দেয় যেমন সৈনিক। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০১)

স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধুর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। এসময় ধর্মের অপব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে পাকিস্তানি কায়দায় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের জিগির উঠতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ও বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের বিরোধিতায় মুখর হয়ে ওঠে একশ্রেণির রাজনীতিবিদ। বঙ্গবন্ধুর জীবৎকালে আরব বিশ্বের যেসকল দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধান্বিত ছিল, বঙ্গবন্ধুর নির্মম মৃত্যুর পর এদেশে নবউত্থিত পাকিস্তানি ভাবধারাকে সমর্থন জানাতে আরব দেশগুলোও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে। এমন কি বাংলাদেশের নানান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অনুদান অথবা ঋণ সহায়তা দিতেও তারা কার্পণ্য করে না। *এখানে এখন* নাটকে প্রধান দুটি চরিত্রের মুখে প্রসঙ্গটি একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। রফিকের স্বপ্নদৃশ্যে কালোবেশধারীর সংলাপেও আছে আরবের টাকায় এদেশের রেলপ্রকল্প বাস্তবায়নের কথা :

[...] আরব – আরব ?

আরবের টাকায় প্রকল্প ?

মাংসখণ্ড মাঝখানে,

থাবা তুলে আপনারা দু'দিকে দু'জন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৮৭)

আবার, দ্বিতীয় অঙ্কে রফিক ও সুলতানার একান্ত আলাপে আরবের টাকায় এদেশের বিভিন্ন প্রকল্প প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে :

আজ এক কাজ ও পেয়েছে

যেটার পেছনে আমি সাড়ে তিন মাস

লেগে আছি, জানতেও পারিনি যে

প্রতিদ্বন্দ্বী সে। যখন জানলাম,

কাজটা সে ততক্ষণে পেয়ে বসে আছে।

আরবের টাকায় প্রকল্প

কল্লোলিত তরল মোহর। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৫)

এখানে এখন নাটকে সৈয়দ শামসুল হক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শহিদ হবার দুঃখজনক ঘটনাকেও তুলে এনেছেন নিবিড় বাস্তবতায়। সুলতানা যখন বিদ্যমান অস্থিতিশীল অবস্থার বর্ণনা করে গাফফারের ধর্মমুখী হবার কার্যকারণ নির্ণয় করে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ঘাতকের হাতে বঙ্গবন্ধুর শহিদ হবার প্রসঙ্গটিও এসেছে :

রাষ্ট্রপতিকে যে দেশে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে

হয়, প্রধানমন্ত্রীর ঘরে চুরি হয়, সেই দেশে

নাগরিক স্বাভাবিক সব ভাববে কিভাবে?

ক্ষমতা, বন্দুকবাজি, খুনী পেয়ে যায় পুরস্কার,

ডাকাত নির্বিঘ্নে হাঁটে, ঘরে সাধু চোর হয়ে থাকে,

মানুষ বাঁচতে পারে? – এই যদি হয় বর্তমান? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৯)

প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন একজন মুজিব-অন্তঃপ্রাণ মানুষ। বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নির্মমভাবে শহিদ হবার ঘটনা নাট্যকারের মানসলোক তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে। সেকারণেই বঙ্গবন্ধুর ঘাতকের হাতে প্রাণ দেবার নির্মম ঘটনার উল্লেখ তিনি তাঁর একাধিক রচনায় প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় *এখানে এখন* কাব্যনাটকের একাধিক স্থানেও প্রসঙ্গটির উল্লেখ রয়েছে। যেমন, নাটকের শেষদিকে চমক হিসেবে অনামা ব্যাক্তি যখন রফিককে সুকৌশলে বন্ধু নাসিরের পূর্ব থেকে পাওয়া দরপত্রকে অপকৌশলে পুনরায় বাগিয়ে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন বিবেকের দংশনে দুলতে থাকা রফিককে উদ্দেশ্য করে অনামা ব্যক্তির সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

নীতি-ফীতি রেখে দিন। বাংলাদেশে গুলি চলে, গুলি।

কথা যাকে মাথায় রাখার,

অবলীলাক্রমে তাঁকে মারেনি কি মানুষ বাংলার ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১৯)

বঙ্গবন্ধুর নির্মম মৃত্যুর পর এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি সুবিধাবাদীদের কবলে পড়ে যায়। রাজনীতি হয়ে যায় ব্যবসায়িক পণ্য। রাজনীতিতে লাভ- লোকসানের হিসেব-নিকেশ হয়ে ওঠে প্রকট। দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদরা কোনঠাসা হতে শুরু করে, আর অনৈতিকভাবে গজে ওঠা ব্যবসায়ী শ্রেণি হয়ে উঠতে থাকে রাজনীতির নিয়ামক। রাজনীতি হয়ে ওঠে অর্থবিত্ত উৎস, পদ-পদবি আর বিলাসিতার যোগানদার। বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই থাকে না। রফিকের একটি সংলাপে তৎকালীন বিবেকশূন্য হৃদয়হীন রাজনীতিবিদের বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে :

মন ছাড়া কত লোক দিব্যি বেঁচে থাকে,
খায় দায়, বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, নেতা হয়, কোটি কোটি টাকা হয়,
জাতীয় দিবসে তারা সিলকের পতাকা ওড়ায়।
আমি কেন পারবো না তবে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২২-২২৩)

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (Proclamination of Independence) সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।'[১] কিন্তু পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে দেখা গেলো এই নীতি উবে গেছে, শুরু হয়ে গেছে শোষণের রাজনীতি, বিভাজনের রাজনীতি। সাধারণ মানুষ তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারও তাদের নেই। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতেও তাদের জীবন বিপন্ন। *এখানে এখন* নাটকের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র সুলতানার একটি সংলাপে সমকালীন বাংলাদেশের নিপীড়ন-বৈষম্যের চিত্র নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে :

স্বাধীনতা এসেছে থেকেই দ্যাখো
মানুষের মনে স্বস্তি নেই – এ স্বাধীনতা নিয়েই।
চিনির ডেলায় তুমি কালো পিঁপড়ে ছাড়লে তো ফের
লাল পিঁপড়ে সারে সার দেখা দিচ্ছে পর মুহূর্তেই।
সেটা তো আছেই ; আর, মানুষের কথা ভেবে দ্যাখো –

---

[১] আবুল বারকাত, *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৪

জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে, বাড়ছেই,

বাড়ছেই, গিয়ে কোথায় ঠেকেছে ;

কিন্তু রোজগার সেই হারে বাড়ছে না ;

তারপর নিরাপত্তা নেই, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৮-১৯৯)

বস্তুত *এখানে এখন* কাব্যনাট্যে স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল, বিশেষত, পঁচাত্তরের অনাকাঙ্ক্ষিত পট পরিবর্তনের পর বদলে যেতে থাকা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। নাট্যকার সৈয়দ হক সমকালীন বাস্তবতা চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের দায় যে অনেকাংশে পূরণ করতে পেরেছেন তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ঈর্ষা

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) রচিত *ঈর্ষা* (১৯৯০) নাটকটি বাংলা কাব্যনাটকের ইতিহাসে বিষয়ের অনন্যতায় ও নির্মাণশৈলীর স্বতন্ত্রতায় এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বলা যায় 'রাজনীতি-তাড়িত কাব্যনাট্যের বাইরে শিল্পকলাকে ভিত্তিভূমে রেখে সৈয়দ শামসুল হকের উচ্চাভিলাষী নাট্যকর্ম *ঈর্ষা*।'[১] মানব মনস্তত্ত্বনির্ভর এ নাটকটি রচনার সময় নাট্যকারের ভাবনালোকে ছিল উইলিয়াম শেকস্‌পিয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) কালজয়ী নাটক *ওথেলো* (১৬০৩)। তবে *ওথেলো* থেকে অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর নাট্যভাবনা এখানে ভিন্নমাত্রিকতায় উপস্থাপিত হয়েছে। *ঈর্ষা* নাটকের প্রারম্ভে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ঈর্ষা আমি দীর্ঘকাল অবলোকন করেছি, দীর্ঘদিন এর সঙ্গে ঘরবাস করেছি; জীবনের সকল প্রসঙ্গের ভেতরে প্রেম ও দেহ-সংসর্গে স্থাপিত ঈর্ষাই আমার কাছে একমাত্র গ্রাহ্য হয়েছে। শিল্পে আমি ঈর্ষাকে যখন স্মরণ করি, অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়, এবং আমার মতো অনেকেরই নিশ্চয়, শেকসপীয়রের 'অথেলো'– ঈর্ষার নির্যাস নিয়ে এর চেয়ে অক্ষয় রচনা আমার জানা নেই। কিন্তু সেখানেও একদিন আমি আবিস্কার করি যে, 'অথেলো'র ঈর্ষা এমন ঈর্ষা নয় যা সম্পূর্ণ মানবিক, সৎ অর্থে 'পশু' শব্দটি ব্যবহার করে বলতে পারি পশুদের ভেতরেও মোটা দাগে 'অথেলো'-র প্রায় অনুরূপ ঈর্ষা এবং পরিণামে হত্যা-সংঘটন দুর্লক্ষ নয়। অচিরেই আমার এ সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে আমি অগ্রসর হই এবং অনুসন্ধান করতে থাকি ঈর্ষার এমন কোন রূপ আছে যা কেবল মানবের ভেতরেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব।[২]

---

[১] পিয়াস মজিদ, 'অপ্রতিম সৈয়দ শামসুল হক', *পরানের গহীন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ২০১৬, পৃ. ১০৭

[২] সৈয়দ শামসুল হক, 'সবিনয় নিবেদন : ঈর্ষা', *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

অতঃপর, প্রবাসে কোনো এক হোটেলে শীতাক্রান্ত কক্ষে নাট্যকার মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন – মানব মনস্তত্ত্বে এমন একটি অনুভূতি আছে যেটি মানুষকে পশুসত্তা থেকে পৃথক করেছে; এবং সেটি হলো 'ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের প্রতি ঈর্ষান্বিত, ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। [...] প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই পারে তার নিজের ভেতরে একাধিক ব্যক্তিত্ব অনুভব করতে।'[১] সৈয়দ শামসুল হক নিজের আবিষ্কৃত একান্ত এই বোধ ও বিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রের মাধমে। সমালোচকের মতে :

> স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নানা ধরনের উচ্চকিত ঘোষণায় বিভিন্ন সময় সোচ্চার হয়েছে, মঞ্চে ঘোষিত আদর্শের বাহক হিসেবে শিল্পসফল একাধিক নাটকের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি কিন্তু একটি বড় ঘাটতি সবসময় রয়ে গেছে। তা হল মানুষের বর্হিজগতের মতো করে অর্ন্তজগতের ওপর জোর দেওয়া হয়নি। অথচ বর্হিজগৎ এবং অর্ন্তজগৎ দুই-ই সমানভাবে তাৎপর্যময়। বহুকালের এই অভাব পূরণে এগিয়ে এলেন আমাদের প্রধান নাট্যরচয়িতা সৈয়দ শামসুল হক, তাঁর একটি মৌলিক নাটক *ঈর্ষা* রচনার মধ্যদিয়ে। [...] নর-নারীর প্রেম সঞ্জাত ঈর্ষা এ নাটকের উপজীব্য বিষয় হিসেবে খুব নতুনত্বের দাবিদার নয়, তবে সৈয়দ হক বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টি থেকে অবলোকন করেছেন।[২]

নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের হাত ধরে এ নাটকটি মঞ্চে এলেও বর্তমানে *প্রাঙ্গণেমোর* নাট্যদলের প্রযোজনায় দেশ-বিদেশে *ঈর্ষা* নাটকটি নিয়মিত মঞ্চস্থ হচ্ছে ; এবং বলাবাহল্য নাটকটির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বস্তুত, 'সৈয়দ হকের মুন্সিয়ানা শুধু লেখার নয়, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ তিনি করেছেন। বিদেশি নাটকের ধাঁচ রপ্ত করে তিনি দেশীয় উপাদানে নাটক সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তার একটি প্রমাণ *ঈর্ষা*।'[৩] *ঈর্ষা* নাটকটির প্রথম পরিচালক – নাট্যজন আতাউর রহমান নাটকটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :

> আমার নির্দেশক জীবনের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল *ঈর্ষা* নাটকের মঞ্চায়ন। যখন বাংলাদেশের মানুষরা বলাবলি করছিল, এই নাটকটি কেবল শ্রুতি নাটক হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে, আমি তখন এই নাটকটি নিয়মিতভাবে মঞ্চায়নে প্রণোদিত হই এবং এই নাটকের মঞ্চায়ন আমার নাট্য-নির্দেশক জীবনে বড় ধরনের সাফল্য নিয়ে আসে। [...] সমগ্র নাটকজুড়ে আছে অনাস্বাদিত রূপকল্প, চিত্রকল্প ও উপমার সমাহার, যা নাট্য-

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] ড. সাবিরা মনির, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.৮৩-৮৪

[৩] স. ম. শামসুল আলম, 'কাব্যনাট্য কারিগর সৈয়দ শামসুল হক', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭

সংলাপকে দিয়েছে অভাবিত অনন্যতা। আমি বিশ্বাস করি *ঈর্ষা* নাটকটি মঞ্চায়নের জন্যে আর কখনো পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। এই নাটক দর্শক ও পাঠকের হৃদয় জয় করবে নিশ্চয়।[১]

সৈয়দ শামসুল হকের *ঈর্ষা* নাটকের ঘটনাবস্তু অতি সংক্ষিপ্ত। প্রেম, প্রতারণা ও ঈর্ষাকে ঘিরেই এর নাট্যকাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এ কাব্যনাটকটির মূল ঘটনাংশ হচ্ছে – আর্ট কলেজের এক ছাত্রীর প্রতি জনৈক প্রবীণ শিক্ষকের জৈবিক প্রেমাকর্ষণ। ছাত্রীটি তার অপরিণত বয়সের আবেগ-সংবেদনশীলতায় কিংবা শিল্পের প্রতি মুগ্ধতার কারণে যাবতীয় আড়ষ্টতা অতিক্রম করে প্রবীণ শিল্পীর নিকট নিজেকে নিবেদন করেছে। কিন্তু একটি পর্যায়ে সে অনুভব করতে পেরেছে যে তার শিক্ষক তার প্রতি সকাম প্রেমে জাগ্রত। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে সে বিয়ে করে ফেলে নিজেরই সহপাঠী বন্ধুকে। বলাবাহুল্য, এই যুবকটি তার প্রতি বরাবরই নিষ্কাম প্রেমবোধে জাগ্রত ছিল, এবং সহজাত মানবিক বোধ ও ভালোবাসায় তাকে জয় করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রবীণ শিল্পীই যেহেতু মেয়েটির প্রথম প্রেমিক, সেহেতু সে চেয়েছে তার কাছ থেকে সুন্দর বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরে আসতে। এই উপলব্ধি থেকে মেয়েটি প্রবীণ শিল্পীর কাছে বিদায় নিতে আসলে তিনি তাকে পরিত্যাগে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, এবং তার সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এখান থেকেই মূলত *ঈর্ষা* নাটকের ঘটনাবস্তু শুরু। একদিকে প্রবীণ শিল্পীকর্তৃক যুবতী ছাত্রীকে যেতে না দেবার পেছনে নানান যুক্তি উপস্থাপন, অতীতের ভালবাসাপূর্ণ দিনের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে তাকে আবেগে বেঁধে ফেলার বাসনা; অন্যদিকে প্রবীণ শিল্পীর উপর মেয়েটির পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, প্রতারিত হবার ইতিহাস, তার মোহভঙ্গের কারণ যখন পারস্পরিক সংলাপে বর্ণিত ও ঘনীভূত হতে শুরু করেছে, তখন উপযুক্ত নাট্যচমক সৃষ্টি করে মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে যুবক চরিত্রটির। দেখা যায় তার হৃদয়ও আকস্মিক প্রতারণার ধাক্কায় ক্ষতবিক্ষত। কেননা আজই যে মেয়েটির সঙ্গে সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, সে এতদিন তার অজান্তে প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে একটি অনৈতিক সম্পর্ক চালিয়ে গেছে, এমনকি প্রৌঢ় শিল্পীর ন্যুড ছবির মডেল হতেও দ্বিধা করেনি। যুবকটি একজন মুক্তিযোদ্ধা। একদিন বঙ্গবন্ধুর ডাকে সে হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র, দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে সে দেশ স্বাধীন করেছিল আকাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে। কিন্তু অচিরেই তার সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃত প্রতারিত এই যুবক যখন এই নারীকে ভালোবেসে নতুন সুখী-সুন্দর জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছে, তখনও সে হয়েছে প্রতারণার শিকার। এমতাবস্থায় সে নিজেকে নারী ও ও প্রবীণ শিক্ষক – উভয়ের নিকট

---

[১] আতাউর রহমান, 'সৃজনের ধ্রুবতারা', *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

থেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে নিয়ে গেছে দূরে। আবার, যুবকটি যেমন নিজেকে প্রতারিত ভাবছে, মেয়েটিও ঠিক তেমনি ভাবেই প্রতারিত হয়েছে। আশৈশব শিল্পের প্রতি মেয়েটির ছিল দুর্বার আকর্ষণ। সে একজন প্রকৃত শিল্পী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই একদিন এই শহরে পা রেখেছিল। এমনকি প্রবীণ শিল্পীর সান্নিধ্যেও সে এসেছে শিল্পের প্রতি মমত্ববোধের কারণেই। কিন্তু দেখা গেল সে কেবলই ব্যবহৃত হয়েছে।

ছাত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর সম্পর্কের কারণে প্রৌঢ় শিক্ষক তীব্রভাবে সমালোচিত হন। তাঁর শিক্ষার্থীরা তাঁর প্রতি তীব্র বিরূপতা প্রকাশ করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রৌঢ় শিল্পী অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন। ক্ষয়ে পড়ে তাঁর অটল ব্যক্তিত্ব, ধসে পড়ে তার অহমবোধ; এবং উন্মোচিত হয় তারও প্রতারিত হওয়ার ইতিহাস। জানা যায়, সে ছিল দরিদ্র পরিবারের সন্তান। শিল্পের প্রতি মুগ্ধতার কারণে, এবং শিল্পী হওয়ার দুর্মর তাড়না নিয়েই সে এই শহরে এসেছিল। কিন্তু এই শহরে যে তিনজন নারী তার জীবনে এসেছে, তাদের সবাই তাকে ব্যবহার করেছে কিন্তু প্রেম দেয়নি। তাদের কারো কাছে সে বঞ্চিত হয়েছে দরিদ্রতার কারণে, আবার কেউবা তাদের অসুখী দাম্পত্য জীবনে সাময়িক সুখপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাকে বিনোদনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলে বঞ্চনাই হয়ে উঠেছে তার বিধিলিপি।

মূলত, *ঈর্ষা* নাটকে তিনটি চরিত্রেরই পৃথক পৃথক জীবন-কাহিনি রয়েছে ; তারা প্রত্যেকেরই প্রেমাকাঙ্ক্ষা ছিল। সবাই চেয়েছিল প্রেম-ভালোবাসায় পরিতৃপ্ত হতে। কিন্তু কারো জীবনেই প্রেম আসেনি। তাদের প্রত্যেকের যুক্তিবোধ পৃথক, জীবনবোধ আলাদা, প্রত্যাশার ধরনও ভিন্ন।

নাটকের শেষদৃশ্য অনেকটা রহস্যমণ্ডিত। শেষদৃশ্যে নারীর প্রৌঢ় বয়সের মঞ্চ-উপস্থিতি বাস্তব নাকি আত্মদ্বন্দ্বে পরাজিত বিকারগ্রস্ত শিল্পীর মনের কল্পনা, সে বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। হয়তো লেখক নাট্যসমাপ্তি কিছুটা রহস্যাবৃত রেখে পুরোটাই ছেড়ে দিতে চেয়েছেন পাঠক-দর্শকের ভাবনা চিন্তার উপর। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> নাট্যকাহিনীর শেষ মুহূর্তে দেখা যায়, শিল্পীর কাঁধে যুবতী হাত রাখে – প্রৌঢ়শিল্পীর এই মহৎ উপলব্ধিতে যুবতী তাঁর প্রতি করুণা বোধ করেছে। অথবা প্রকৃতার্থে প্রৌঢ়শিল্পীকে ভালোবাসে যুবতী, তাই শিল্পীকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। যুবতীকে এই ভালোবাসার পথ বয়সের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। এজন্য নাট্যঘটনার শেষে যুবতী যখন প্রৌঢ়ের কাঁধে হাত রেখেছে তখন দেখা যায়, তার চুলেও সাদা পাকার মিশ্রণ। নাট্যকার যুবতীর চুলে পাক ধরিয়ে অবশ্যই তাকে প্রৌঢ়শিল্পীর বয়সী অভিজ্ঞতার সমান করে তুলতে

চেয়েছেন। প্রৌঢ়ের ন্যায় যুবতীও বয়সের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ভালোবাসার উপলব্ধির সাথে একাত্ম হতে সক্ষম হয়েছে।[১]

আবার, অন্য আরেকজন সমালোচক বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নরূপে :

> একজন শিল্পী তো শেষপর্যন্ত রক্তমাংসের মানুষ। নিজের হাহাকার প্রকাশ করার শেষে দেখা যায় যুবতী প্রৌঢ়ের কাঁধে হাত রেখেছে। প্রৌঢ় মুখ তুলে দেখে। কিন্তু তখন তার চুলে পাক ধরেছে। প্রৌঢ়ের শেষ সংলাপ এবং যুবতী বৃদ্ধাতে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ব্যাখ্যা এ নাটকে মেলে না। প্রচলিত নাটকের ক্ষেত্রে হয়তো নাট্যকার অন্য কোনো ব্যাখ্যা দিতেন। কোনো ঘোষক হয়তো বলত সময়ের হিসেব। এক্ষেত্রে দর্শকের উপর সব দায়িত্ব পড়েছে।[২]

নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক পরবর্তীকালে তাঁর *অপেক্ষমাণ (২০০৯)* কাব্যনাটকে প্রৌঢ় চরিত্রের যে রূপ অংকন করেছেন, সেখানে নাটকের পরিসমাপ্তিতে কোথাও নারীর সঙ্গে প্রৌঢ় শিল্পীর মিলনের দৃশ্য নেই। বরং তিনি দেখিয়েছেন প্রৌঢ় শিল্পী শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত কামনা বাসনার উর্ধ্বে উঠে শিল্পের বিশুদ্বতম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। স্টুডিওর আলো-আঁধারি কক্ষে বসে কোনো তন্বী নারীর ন্যুড শিল্পকলা নয়, বরং কোনো খরায় উজাড় হয়ে যাওয়া প্রান্তরে কীভাবে আশার সূর্য ওঠে – সেটিই তখন তার আরাধ্য বিষয়। অতএব, ধরে নেয়া যায়, *ঈর্ষা* নাটকের শেষে প্রৌঢ় নারীর প্রবীণ শিল্পীর কাঁধে হাত রাখার দৃশ্য শুধুমাত্র বিরহকাতর প্রেমিকের কল্পনা; বাস্তবতা নয়। আবার বয়সের হিসেবেও সেটি অবাস্তবই। কেননা, প্রৌঢ় শিল্পী অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক। অন্যদিকে তন্বী নারীটি প্রৌঢ় অবস্থায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রবীণ শিল্পীর আয়ুষ্কাল অক্ষয় থাকার কথা নয়। এমনকি অনন্ত হীরার নির্দেশনায় *প্রাঙ্গণেমোর* নাট্যদল তাদের প্রযোজিত *ঈর্ষা* নাটকের অন্তিম দৃশ্যে প্রৌঢ় শিক্ষকের সঙ্গে সাদা-পাকা চুলের বয়স্ক ছাত্রীর মিলন দেখাননি।[৩] বরং তারা বেশ শিল্পিত উপায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তুমি কি কেবলি ছবি’ গানটি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে প্রৌঢ়ব্যক্তির ছাত্রীটিকে নতুন করে ব্যক্তিজীবনে ফিরে পাবার মৌন আকুতির মুহূর্তটি আরও আবেগাত্মক হয়ে ওঠে যখন নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথের এই গানের ‘নয়নসমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই’ লাইনদুটো শোনা যায়। অর্থাৎ নাটকের অন্তিম দৃশ্যের পুরোটাই যে প্রৌঢ়শিল্পীর একান্ত ভঙ্গুর মুহূর্তের আবেগাত্মক কল্পনা – তা অনুধাবন করা যায়।

---

[১] অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৯৭

[২] মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৩৮

[৩] দ্রষ্টব্য : *প্রাঙ্গণেমোর* পরিবেশিত নাটক *ঈর্ষা*, Prangonemor Theater’ official youtube channel.

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিয়ম, আমলাতান্ত্রিক বিশৃংখলা, অবক্ষয়িত মুল্যবোধ, মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, বেদনা, হতাশা প্রভৃতি নিয়ে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। সমকালীন বাংলাদেশর সমাজজীবনের নানা ছবি উদ্ভাসিত হয়ে আছে এসব নাটকে। সৈয়দ শামসুল হক বিরচিত *ঈর্ষা* নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। 'নর নারীর প্রেমসঞ্জাত *ঈর্ষা* নাটকের বিষয়বস্তু হলেও এতে আছে স্বদেশ প্রেম, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ।'[১] আবার '৮২ থেকে ৯০ পর্যন্ত দেশে অনেক স্বৈরাচার-বিরোধী মঞ্চনাটক রচিত হয়েছে যা নিয়মিত প্রদর্শনীর মধ্যদিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। [...] বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে একটি বিষয়ে স্পষ্টভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে যে – স্বৈরাচার যেমন একটি ব্যক্তি, তেমনি স্বৈরাচার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও বটে। তাই ব্যক্তি স্বৈরাচারকে যেমন উৎখাত করা প্রয়োজন তেমনি স্বৈরাচারী যে ব্যবস্থা রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান তারও সমূলে উৎপাটন করা প্রয়োজন।'[২] সৈয়দ শামসুল হক তাঁর আলোচ্য নাটকে এমনই এক স্বৈরাচার শিক্ষকের ছবি এঁকেছেন; যে ক্ষমতার দম্ভে নিজ শিক্ষার্থীদের পথভ্রষ্ট করেছে, নিজ মতাদর্শে পরিচালিত করতে চেয়েছে।

সৈয়দ শামসুল হক দেখিয়েছেন ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। খ্যাতিমান শিক্ষক চান, কেবল তাঁর দেখানো পথেই ছাত্রকে চলতে হবে। তাঁকে অনুসরণ করেই ছাত্র এগিয়ে যাবে সম্মুখ পানে। কিন্তু এর বিপরীতে যেই যাবে সেই হবে শিক্ষকের বিরাগভাজন, সেখানে ছাত্রের যুক্তি ও দর্শন মূল্যবান হলেও সেটি গুরুত্ব পাবে না; বরং তার ভাগ্যাকাশে নেমে আসবে বিপর্যয়। নাটকে প্রৌঢ়শিল্পীর অঙ্কনের ক্ষেত্র বিমূর্ত চিত্রকলা। এটি চর্চা বা অনুশীলন করেই তিনি দক্ষিণ এশিয়ার নামকরা শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু তরুণ ছাত্রটি বস্তুর ছবি হুবহু আকঁতে পছন্দ করে। যে কারণে সে শিক্ষকের বিমূর্ত ছবির পথ অনুসরণ না করে বেছে নিয়েছে মূর্ত ছবির পথ। ফলত, তাকে শিক্ষকের ক্রোধের মুখে পতিত হতে হয়েছে। কেননা বিমূর্ত ছবির শিক্ষক মূর্ত ছবিকে আর্ট হিসেবে বিবেচনা করেন না, তিনি মনে করেন এটি ক্যামেরার চোখে আঁকা, যা রং তুলির ব্যবহার বিচারে নগণ্য। শিক্ষক এখানে ছাত্রের আগ্রহ ও পছন্দের মূল্য দেননি, স্বৈরনায়কের মতো তিনিও চেয়েছেন কেবল তার মতকেই প্রতিষ্ঠা করতে। ছাত্রকে বাগে আনতে ব্যর্থ হয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন

---

[১] সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

[২] মান্নান হীরা, 'প্রতিরোধের ঐতিহ্য ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমাদের পথনাটক', জাতীয় নাট্যাৎসব- ৯১ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্যুভেনির, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪০-৪৫

প্রতিশোধপ্রবণ। ফলে ছাত্রটি পরীক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হয়। এ-প্রসঙ্গে শিক্ষকের উদ্দেশে ছাত্রের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক এলাকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

> আমি নিজে গাছ, বাড়ি, মানুষ ঠিক অবিকল করে আঁকতে ভালোবাসি।
> কতদিন বলেছেন, 'রঙ ছেড়ে, ব্রাশ ফেলে, তুমি কি আঁকতে চাও
> ক্যামেরার চোখ দিয়ে ?' শেষবর্ষে আমি যে রেজাল্ট খারাপ করি, সে আমার
> আঁকবার দোষে নয়, আপনার কারণে, [...]
> নিজস্ব পথে চলে কুড়িয়েছি তাঁর নিষ্ঠুর বিরাগ, পরীক্ষায় খারাপ করেছি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২৯)

যে শিক্ষক নিজের মত ও পথের সামান্যতম বিরোধ সহ্য করতে পারেননি, তিনিই আবার নির্জনে ছাত্রীকে ভালোবাসার মিথ্যে ছলনায় ভুলিয়ে, শিল্পের প্রতি তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। পিতার বয়সী একজন শিক্ষক শিল্প-সন্দর্শনের অজুহাতে ছাত্রীকে নিয়ে গেছেন বিভিন্ন স্থানে, নদী দেখার নাম করে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, নৌকার সংকীর্ণ পরিসরের সুবিধা নিয়ে ছাত্রীর নিবিড় সান্নিধ্যে আসতে চাইছেন – এসব নিশ্চয়ই একজন সৎ শিক্ষকের পরিচয় বহন করে না। দেশ-বিদেশের অসংখ্য পুরস্কার পাওয়া এমন একজন গুণী শিল্পীর এসব আচরণ প্রকৃতপক্ষে একটি অসুস্থ সমাজকেই প্রকটিত করে। বাস্তবে বর্তমান সমাজব্যবস্থায়ও এমন মুখোশধারী শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিকের অভাব নেই।

সৈয়দ শামসুল হক যখন তাঁর *ঈর্ষা* নাটক রচনা করেন তখন বাংলাদেশে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের শাসনামল চলছে। 'এই আমল সাধারণ ভাবে স্বৈরাচারী আমল বলে পরিচিত। আমাদের বিবেচনায় স্বৈরাচার, পুরুষতন্ত্রেরই একটি বর্ধিত রূপ – অবশ্য এর সঙ্গে অন্যান্য অনেক উপাদান যুক্ত হয় [...] এই ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সমাজ থাকে অস্থিতিশীল। নারী-পুরুষভেদে সবাই থাকে নিরাপত্তাহীন। এক ধরনের ভয়-ভীতি আক্রান্ত সংস্কৃতির ভিতর বসবাস করতে হয় জনগণকে।'[১] এমনই একটি সমাজের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। যুবক যেমন নিজ প্রেয়সীকে শিক্ষকের কাছে নিরাপদ ভেবেছিল, কিন্তু তারই অজ্ঞাতে শিক্ষক ছাত্রীকে অনৈতিকতায় প্রলুব্ধ করেছে, লিবিডোতাত্ত্বিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে, ধ্বংস করেছে সামাজিক মূল্যবোধ। এ যেন বিদ্যমান অস্থির সামাজিক অবস্থারই প্রতিরূপ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির প্রত্যয়ে। কিন্তু স্বাধীনতার পরও তাদের সে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জিত হয়নি। ১৯৭৫ সালে জাতির জনকের নির্মম হত্যার পর এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

---

[১] সাজেদুল আউয়াল, *বাংলা নাটকে নারী-পুরুষ ও সমাজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮৩

সামরিক শাসন। সামরিক বাহিনী শাসনব্যবস্থাকে পোক্ত করবার জন্য অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নিয়েছে, রাজনীতিকে করেছে কলুষিত, সুবিধাবাদীদের দিয়েছে মদদ। এর ফলে নৈতিকতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে; মানুষ মত প্রকাশের স্বাধীনতা হারিয়েছে, জীবন হয়ে গেছে নিরাপত্তাহীন। যে সমাজে মানুষের নিরাপত্তা নেই, যে সমাজে চলে জবরদস্তি শাসনপ্রক্রিয়া, সে-সমাজে ভালোবাসাও হয়ে পড়ে বিপন্ন। এমন একটি সমাজব্যবস্থার প্রতীকী রূপ স্পষ্টতা পেয়েছে এ-নাটকে। এখানে দেখা যায়, প্রেমিকা ভালোবাসার নামে প্রেমিকের সঙ্গে ছলনা করছে; শিক্ষক তার দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করছেন। এসব যে অবৈধ স্বৈরশাসনের ফল তা যুবক ছাত্রের সংলাপে চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে :

> কাদা, কাদাই তো সব;
> কালো কাদা, ময়লা কাদা হয়ে যায় আমাদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ আর
> ব্যক্তিগত মার্বেল সম্ভবত এই স্বৈরশাসনের কালে।
> গৃহস্থ ঘুমোতে গেছে নিশ্চিন্ত হয়ে,
> আশা করছে আজ সে একটি ভালো স্বপ্ন দেখতে পাবে,
> জেগে উঠে দ্যাখে নিঃশব্দে কখন ট্যাংক রাতের আঁধারে এসে
> অবরোধ করে বসে আছে। কৃষক ফসল কাটতে গিয়ে দ্যাখে লুট হয়ে গেছে,
> মাঠে শুধু পশুভোজ্য খড় পড়ে আছে – আল জুড়ে অসংখ্য পায়ের ছাপ –
> অদূরেই আড়াআড়ি জোগালির লাশ পড়ে আছে।
> এ কেমন কাল আজ বাংলাদেশে,
> প্রত্যেকের দু'পায়ে শেকল কিন্তু চোখে দেখা যাচ্ছে না,
> কান পাতলে শেকলের শব্দ শোনা যেতো – কিন্তু হায়,
> অধিকাংশ ব্যক্তিই বধির; […]
> আজ সব মূল্যবোধ নির্বাসিত – প্রেমিকার হাতে আজ কালসাপ,
> বন্ধুর ছদ্মবেশে আততায়ী পথে, কঠিন মুখোশে আঁটা জননীর মুখ,
> এবং শিক্ষক আজ বিদ্যাদানের বদলে উদগ্রীব বিদ্যা চুরি করে নিতে, […]
> এই হচ্ছে দেশ, আর এই হচ্ছে মানুষ, আর এই হচ্ছে সময় ; (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩০)[১]

---

[১] উল্লেখ্য যে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম, ইসলাম, ড. আনিসুজ্জামানসহ দেশের ৩১ জন গণ্যমান্য-ব্যক্তিবর্গ পত্রিকা মারফত একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেখানে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির বিশৃঙ্খলা তুলে ধরে তারা সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে কিছু মতামত দিয়েছিলেন। সেই

অথচ যুবক একদিন রঙ তুলির জগৎ ছেড়ে এদেশকে ঘাতকের হাত থেকে মুক্ত করতে, দেশের জনগণের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরিয়ে দিতে হাতে রাইফেল আর গ্রেনেড তুলে নিয়েছিল; সে-সব স্মৃতি তর্পন করে যুবক ছাত্র বলছে : আপনার অজানা নয় আমার বয়স আর আমি কোন কালের সন্তান।

এ হাতে এখন তুলি, একদিন গ্রেনেড ছিল এই হাতে;

[...] আমি সেই বাংলার ছেলে যে বাংলা একদিন

রক্তে স্নান করে উঠেছিল, ধর্ষিত হয়েছিল, লুণ্ঠিত হয়েছিল।

যে বাংলা একদিন মুক্তিসেনা গেরিলার জন্ম দিয়েছিল।

আমি সেই মায়ের সন্তান যে মা রক্তাক্ত আঁচল ছিঁড়ে একদিন

রাইফেলে বেঁধে দিয়ে বলেছিল –

'তুই না ফিরিস তাতে দুঃখ নেই, দিন যেন ফেরে।' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩১)

যে স্বপ্নাকাঙ্ক্ষাকে বুকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে সেও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, সে-স্বপ্ন আজ বিপন্নপ্রায়। এদেশের অগুনতি মানুষের বেদনার সঙ্গে সেও তাই হয়ে গেছে একাকার। অপ্রাপ্তি আর বেদনা-বঞ্চনাই এখন তার সম্বল।

স্বাধীনতা, বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু প্রশ্নে সৈয়দ শামসুল হক বরবরই স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও সংবেদনশীল। কোটি মানুষের মতোই তিনি স্বপ্ন দেখেছেন – একদিন জাতির পিতার নেতৃত্বে এদেশের প্রকৃত মুক্তি অর্জিত হবে শ্রেণিভেদ, অর্থনৈতিক অসাম্য থাকবে না; প্রতিষ্ঠিত হবে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র; যাবতীয় শোষণের পথ বন্ধ হবে। কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে ঘাতকের নির্মম বুলেটে মারা গেলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অতঃপর দেশেগণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে জেঁকে বসে সামরিক শাসন; দেশজুড়ে শুরু

বিবৃতিতে দেশের যে পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে – সেটি *ঈর্ষা* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক বর্ণিত স্বৈরশাসনের অবক্ষয়িত সামাজিক পরিস্থিতির সত্যতা প্রমাণ করে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের আত্মজৈবনিক গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক এলাকা উপস্থাপন করা যেতে পারে : 'বাংলাদেশে এখন এক গুরুতর সংকটের মধ্যে আমরা কালাতিপাত করছি। সর্বতোমুখী এই সংকট আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্র স্পর্শ করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গভীর হতাশা বিদ্যমান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি ও অসাম্যের বিস্তার, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, শিক্ষাক্ষেত্রে অনভিপ্রেত পরিস্থিতি, সামাজিক ক্ষেত্রে চরম নৈরাশ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নামে প্রহসনের অবতারণা করায় রাষ্ট্রপতির আসনের মর্যাদা ও জাতীয় সংসদের বিশ্বাসযোগ্যতা যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষের ভোটদানের মতো প্রয়োজনীয় অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে অনেকেই সংশয়গ্রস্ত। তেমনি ক্ষমতাসীনদের ইঙ্গিতে দল ভাঙাভাঙি ও সুবিধাবাদের যে খেলা চলছে, তাতেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা নষ্ট হচ্ছে। (দ্রষ্টব্য : আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, জুলাই ২০১৮, পৃ.৩৭১)

হয়ে যায় অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, নিপীড়ন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থার এ-পরিবর্তন মেনে নিতে পারেননি সৈয়দ হক। জনগণের নির্বিকার অবস্থাসূত্রে তিনি তাই হয়ে উঠেছেন প্রশ্নমুখর :

> বলবেন, এখনতো দুঃসময়, বলবেন, একদিন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলে,
> সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলে, শোষণের শেষ হবে বলেছিলে,
> শোষণ এখনো চলছে, গরীবি এখনো আছে,
> আছে শুধু তাইই নয়, মৌলিক অধিকারও গেছে,
> বাংলার চারিদিকে এখন কান্নার শব্দ, বাগান গোরস্তান,
> গাছে গাছে শকুনের পাল বসে আছে ; – কই, কি করছো তোমরা ?
> বসে আছো পিতার নিঃসাড় লাশ সামনে করে নিশ্চুপ উঠানে ?
> কি হলো অস্ত্রের আর কি হলো যুদ্ধের ? আবার ঝাঁপিয়ে কেন পড়তে পারছো না ?
> আবার বাংলায় কেন গেরিলার দল গড়ে তুলতে পারছো না ? – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩৩)

বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যার ঘটনা নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের মস্তিস্কে এতটা তীব্র আলোড়ন তুলেছিল যে, তিনি পঁচাত্তর-পরবতী সাহিত্যকর্মে যখনই সুযোগ পেয়েছেন এই হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে পিতৃহত্যার বিচার চাইতে জাতিকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। *নূরলদীনের সারাজীবন*, *এখানে এখন*, *গণনায়ক* প্রত্যেকটি নাটকে বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে এ-বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তিনি। এমনকি তাঁর আশিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে আরো কর্তব্য সম্পাদনের আশায় নিজের দীর্ঘায়ু কামনা করেছিলেন।[১] সেই ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিক সম্পর্কের টানপোড়েন নিয়ে রচিত *ঈর্ষা* নাটকেও তিনি 'বসে আছো পিতার নিঃসাড় লাশ সামনে করে নিশ্চুপ উঠানে' বাক্যটি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে নীরবে মেনে

---

[১] ভাষণের শেষাংশে তিনি উল্লেখ করেন : 'লেখার পাশাপাশি জাতীয় জীবনের সবিশেষ কত জরুরি কাজও সমুখে / আমি দেখতে পাচ্ছি। দু'হাজার কুড়ি সালে বাংলার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ / সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী, / দু'হাজার একুশেতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী – / শুধু স্বদেশেই নয়, এই দুটি উৎসবের আর্ন্তজাতিক অনুষ্ঠান গঠনেও / আমার এ সামান্য হাত থাকবে, এমন আশা কি আমাকে ততদিনের আয়ু / দেবে না ? জীবন হ্রস্ব হলেও এতটা হ্রস্ব নিশ্চয় হবে না। / চোখ ফেলে আছি মহাত্মা লালনের দিকে, তিনি একশ' আঠারো বছর আয়ু / পেয়েছিলেন। আমি অপার হয়ে সেই দীর্ঘ জীবনের দিকে তাকিয়ে আছি। / এখনো অপেক্ষায় কত কবিতা কত নাটক কত গল্প। করোটির ভেতরে শব্দের / কী অবিরাম গুঞ্জন। কলমের গর্ভে এখনো তো আমার রক্ত অফুরান। দৃষ্টিভূমিতে / এই দেশ ও এই মানুষেরই দীর্ঘ ছায়া লয়ে আমি লেখার টেবিলে।'(দ্রষ্টব্য : রামেন্দু মজুমদার, 'তাঁর দীর্ঘ ছায়া', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭০০

নেওয়া জাতিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। আবার অন্যত্র যুবকের জবানিতে বাংলার এই নিষ্ঠুরতম ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপে :

যখন প্রস্তুত আমি ব্রাশের ডগায়
স্বাধীন বাংলার, সোনার বাংলার [...] ছবিগুলো ক্যানভাসে নামাতে,
ঠিক তক্ষুণি শকুন আবার এসে হানা দিলো;
দগদগে ঘন কালো রঙে ক্যানভাস ঢেকে দিলো – আমার ক্যানভাস [...]
জাতির পিতার রক্তে ভিজে গেল বাংলার আঁচল।
যুদ্ধশেষে পিতার কি বিশাল করুণায় যারা ক্ষমা পেয়েছিল,
নিষ্করুণ হাতে তারা কেড়ে নিলো স্বপ্নের সমস্ত অর্জন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩৬)

বঙ্গবন্ধুর ডাকে একদিন এদেশের আপামর জনগণ তাদের সর্বশক্তি দিয়ে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। *ঈর্ষা* নাটকের যুবকও তেমনি হাতের রং-তুলি-ব্রাশ ফেলে গেরিলাযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং করে ঢাকা শহরেই একধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। যুবক হয়তো পালিয়ে থাকতে পারত, নয়তো বিদেশে পাড়ি জমাতে পারতো সমকালীন অন্য অনেকের মতো; কিন্তু সে নিজের কর্তব্যে, বিবেকের কাছে পরিচ্ছন্ন থাকতে বেছে নিয়েছে যুদ্ধের পথ। কেননা, তার মতে বাড়িতে ডাকাত এলে বেহালা বাদককেও হাতে বল্লম তুলে নিতে হয়। যুবক সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু যুদ্ধশেষে ফিরে এসে দেখতে পেয়েছে তার জন্মভূমিতে এখনো নতুন সূর্য উদয় হয়নি, বরং দেশজুড়ে নেমে এসেছে অমানিশার অন্ধকার :

যুদ্ধশেষে ফিরলাম; ঘরে পৌঁছে দেখি, গ্রাম এক বিরান গোরস্তান,
বাংলাঘরে বাবা বসে পাথরের মূর্তির মতো,
রাজাকার ও আর্মির হাতে তিনভাই নিহত, ভাবীদের দু'জন ধর্ষিতা –
একজন আত্মহত্যা করেছে এবং আরেকজন হয়ে গেছে বদ্ধ পাগল; (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩৫)

এ অবস্থায়ও যুবক ছাত্র ভগ্নহৃদয়কে সম্বল করে নব উৎসাহে রঙ তুলিতে রূপসী বাংলার ছবি আঁকতে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছে। প্রবীণ-শিল্পী ও শিক্ষক তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলেছিলেন : 'আমাদের গর্ব তুমি, যেমন যুদ্ধে তুমি, আশাকরি শিল্পের প্রাঙ্গণেও জয়ী হবে'। কিন্তু অচিরেই যুবকের স্বপ্ন আরও একবার বাধাগ্রস্ত হয়। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে বাংলার আকাশে শকুনের আবির্ভাব হয় আবারো। এবার একাত্তরের পরাজিত শক্তি যেন নতুন করে প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পরপরই

তারা রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার নিধনের মিশনে নেমে পড়ে। ফলে এই আক্রমণ থেকে বাদ যায় না যুবকের পরিবারও । এমনিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় সবাইকে হারিয়ে কেবল মৃতপ্রায় বৃদ্ধ পিতা আর মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত বোনকে নিয়ে টিকেছিল যুবকের পরিবার। কিন্তু এবার তারাও বাদ পড়ে না অত্যাচারীদের হাত থেকে। পুত্র মুক্তিযোদ্ধা – এই অভিযোগে পিতার চোখ উপড়ে ফেলে তারা। যুদ্ধকালে পানাপুকুরে ডুবে থেকে যুবকের যে বোন নিজ সম্ভ্রম বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল, এবার স্বাধীন বাংলায় সে বোন আর নিজেকে বাঁচাতে পারল না। ধর্ষণের শিকার হয়ে লজ্জায় ও কষ্টে সে আত্মহত্যা করে। এসব দেখে-শুনে আত্মদহনে যুবকের মা হয়ে যান রুদ্ধবাক :

পরাজিত শত্রুর দালাল আর নব্য রাজাকার
একদিন আমার বাবার চোখ উপড়ে তুলে নিলো। অপরাধ ? –
তার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। অপরাধ ? –
মানুষের মৌলিক অধিকার চেয়ে হাতে অস্ত্র ধরেছিল।
অপরাধ ? – তাঁর মেয়ে সুন্দরী যুবতী হয়ে উঠেছিল।
এবার বাংলার জলজ সবুজ পানা রক্ষা তাকে করতে পারে নি ; [...]
ফসলের মাঠে তার নারীর গোপন রত্ন লুঠ হয়ে যায়,
সে আর ফেরেনি, ঈশানের বটগাছে কুমারীর শাড়িতে সে ফাঁসি নেয়।
সেই শোকে আজ-অবধি মা আমার বোবা। – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩৬)

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কারণে যুবক ছাত্র ও তার পরিবার দেশদ্রোহীদের হাতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছে, তার পিতার চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে, বোনকে ঠেলে দেয়া হয়েছে আত্মহত্যার দিকে, আর ভাবির সম্ভ্রম হয়েছে লুণ্ঠিত। অন্যদিকে শিল্পকলার প্রবীণ শিক্ষক প্রেমের নামে তার প্রেমিকাকে কৌশলে শয্যাসঙ্গী করেছে। তাই যুবকের কণ্ঠে শিক্ষকের প্রতি ঝরে পড়েছে শ্লেষ :

এভাবে ওরা যা করেছে,
অন্যভাবে আপনিও তাই করেছেন –
আমার ক্যানভাসে আপনি কালো রঙ ঢেলে দিয়েছেন,
আমার দু’চোখ আপনি উপড়ে নিয়েছেন,
[...] আপনি তো বাংলারই লোক, আপনি বাংলায়ই বর্তমানে বাস করেছেন।
বর্তমানের রীতি যা চলেছে, আপনি তাইই করেছেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩৭)

যুবকের বিচারে বর্তমান সমাজে সবাই মুখোশের আড়ালে নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ আড়াল করে চলেছে। শিক্ষকও খ্যাতিমান আদর্শ শিল্পীর মুখোশের আড়ালে নিজের অবদমিত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে নারীসঙ্গ বেছে নিয়েছে; তার কামনাবহ্নি থেকে রেহাই পায়নি কন্যাতুল্য ছাত্রীও। যুবতী মেয়েটিও উপরিতলে যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, কিন্তু গোপনে সাধনা করেছে প্রৌঢ় শিল্পীকে। নিজের গোপন বাক্সে তার ছবি অতি সযতনে লুকিয়ে রেখেছে, এমনকি যুবকের সঙ্গে বিয়ের দিনই জরুরি কাজের অজুহাতে শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা তরুণ যুবকটি এই দ্বিচারিতা মেনে নিতে পারেনি। সে গ্রামের সরল-সুন্দর পরিবেশ থেকে উঠে আসা সত্যবান যুবক; কিছুতেই অভ্যস্ত হতে পারছেনা শহুরে মেকি সংস্কৃতির সঙ্গে। যুবক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ পর্যায়ে গ্রামের সরলতার তুলনায় শহুরে অন্তঃসারশূন্য সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেছে ‘আমি গ্রাম থেকে উঠে আসা লোক, / কাঁধের গামছা ছেড়েছি, কিন্তু এখনো রুমালে অভ্যস্ত নই’; (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৯) কেননা এখন সমগ্র দেশ জুড়ে চলছে মিথ্যের রাজত্ব। রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ – সর্বত্রই মিথ্যাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচার, মিথ্যার বেসাতি। সবাই মুখোশধারী। সমকালীন এই সমাজচিত্র যুবকের ভাষায় নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> সত্যের ভানে ভরা মানুষের মিথ্যের মুখোশ, [...]
> সে মুখোশ বৈশাখের মেলায় ওঠে না;
> সে মুখোশ দেখতে হলে আয়নার সমুখে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়। [...]
> মিথ্যেরই রাজত্ব এখন – প্রেম, শিল্প, রাষ্ট্র, সমাজ সব মিথ্যের মুখোশ পরে
> কেমন মিছিল করে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ওপর দিয়ে পা টেনে চলেছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৮)

গ্রামীণ পরিবেশে জন্ম-নেয়া ও বেড়েওঠা যুবকের পরিচয়প্রদানসূত্রে এ-নাটকে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে হাজার বছরের গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠানের রূপচিত্র। নাট্যকার এখানে একটি দুটি পঙক্তির ছোট ছোট কোলাজে যেমন করে বর্ণনা করেছেন, তা কেবলই বর্ণ ও শব্দে গঠিত বাক্যবিশেষ নয়, বরং শতরঙ আর তুলির মিশেলে শিল্পীর হাতের বাস্তব ছবি। একটি গ্রামীণ ছবির প্রতিটি ডিটেইলস যেমন বর্ণনা করে থাকেন একজন শিল্পী জিজ্ঞাসু দর্শকের কাছে, নাট্যকার যুবকের সংলাপের মাধ্যমে ঠিক তেমন করেই গ্রামীণ সৌন্দর্য, সরলতার পাশাপাশি নির্মম বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। যেমন –

> জানেন তো, গ্রামের গর্ভে আমার জন্ম, চেঁচিয়ে কথা বলা আমার অভ্যেস –
> যেন আল পেরিয়ে দূরের পথিকের কাছে পৌঁছোয় আমার গলা।
> [...] মাঝরাতে উঠোনের মাঝখানে দুই সতীনের চুলোচুলি,

আর মরা জোছনার ভেতরে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে স্বামীটি নির্বিকার চুলকোচ্ছে উরু।

কিন্তু আমি এও দেখেছি, লাল ডুরে শাড়ি পরা ছোট্ট মেয়ে

আঙিনার এককোণে একমনে সারাবেলা পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে;

জোনাকজ্বলা আঁধারে বাঁশী বাজাচ্ছে কেউ

আর ঘরের ভেতরে জালবন্দী মাছের মতো ঘাই দিচ্ছে কারো ভালবাসা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৫৪)

যুবকের সংলাপে নাট্যকার যখনই সুযোগ পেয়েছেন, বাংলার গ্রামীণ সমাজপ্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। প্রৌঢ় শিল্পী ছবি আকেঁন বিমূর্ত, যেখানে বস্তুর অবিকল ছবি নয়, বস্তুর মৌলিক রং আর ফ্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে অদ্ভুত ভিন্ন এক রূপপ্রকৃতি লাভ করে। কিন্তু গ্রাম থেকে উঠে আসা যুবক শিল্পী গ্রামের মাঠ, প্রকৃতি, জীবন আর নিসর্গের রূপ ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে ভালবাসে। তবে কেবল কোমল প্রকৃতি নয়, গ্রামের দুর্দশা, দুর্ভিক্ষও তাকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। যুবকের এই ছবি আঁকার বিষয়সূত্রে নাটকের মধ্যে নাট্যকার গ্রামীণ নিসর্গের রূপচিত্রণের পাশাপশি অভাব অভিযোগের বাস্তবচিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন :

আমি বাংলাদেশের দূর খর-উত্তরের,

মরে যাওয়া করতোয়া জন্ম থেকে দেখে আসছি, দেখে আসছি

বাংলার দুঃসহ বৈশাখের খরায় পুড়ে যাওয়া মাঠ, ভেঙে পড়া বাড়িঘর,

অনাহারী মানুষের লাশ আর মুমূর্ষু গাভীর বাঁট, উৎসন্ন হয়ে যাওয়া গ্রাম;

নির্মমভাবে সব প্রকাশিত; (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩৫)

নাটকে শহুরে সমাজব্যবস্থার চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে। এক্ষেত্রে প্রৌঢ় শিল্পীর সংলাপে তার প্রাক্তন উচ্চবিত্ত প্রেমিকার বাড়ির গৃহসজ্জা ও আচার-আপ্যায়নের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে আশির দশকের বাংলাদেশের নবউত্থিত ধনিক শ্রেণির রুচি-সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। প্রবীণ শিল্পী তার প্রথম প্রেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

কি সুন্দর সাজানো বাড়ি, বসবার ঘরে আর্টের ওপরে সব দামী বই,

বেয়ারার হাতে চা, অজানা নাশতায় ভরা চাকাওয়ালা ট্রে –

আমার চেয়েও খুব পরিস্কার ধবধবে জামা বেয়ারার। (কাব্যনাট্যসমগ্র ; ৩৪৪)

বস্তুত, নাট্যকার 'প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে এভাবেই এই নাটকে যুগাধিক কালের সামরিক শাসনে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীর্ণতা, সমাজ-সাম্যের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ইত্যাদি অনুষঙ্গের পাশাপশি, উত্তরকালের বাংলাদেশের

সামাজিক বাস্তবতার এ বিষয়টিরও স্পষ্ট উল্লেখ রেখেছেন যে – বুর্জোয়া ঘরানার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনুকূলতায় স্বাভাবিক নিয়মেই দেশীয় এমন একটি বিত্তের উত্থান-আবির্ভাব ইতোমধ্যে ঘটে গেছে, যারা আত্মসমৃদ্ধির চূড়ান্ত স্বার্থাভিজ্ঞানে কুণ্ডলিত, দেশাত্মবোধের চেতনাস্খলিত।'[১] আবার, 'যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ক্যানভাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে চিত্র তাতে ধ্বংস, হত্যা, ধর্ষণ, বঞ্চনা এবং অভাব এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে আমাদের সকলের হৃদয়ে তখন। সেই ক্ষত থেকে চুইয়ে পড়া যে অপ্রাপ্তির আহাজারি, তা আমাদের শিল্প-সাহিত্যকে প্রভাবিত করবে – এই তো স্বাভাবিক।'[২] সৈয়দ শামসুল হক সমকালীন প্রাসঙ্গিকতাকে আত্তীকৃত করে এভাবেই কাব্যনাট্যের চিত্রায়ণ করেছেন। মূলত, 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম আমাদের দেশের মানুষের জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। আমাদের মানুষকে সাহসী হবার প্রেরণা দিয়েছে। এই চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালের জীবনে, সংস্কৃতিতে। ফলে নাটকেও এলো হঠাৎ একটা পরিবর্তন। [...] দর্শক নাটকের মাঝে নিজেদের জীবনকে খুঁজে পেতে চায়। নাটকে নিজেদের হতাশা-বেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে চায়।'[৩] *ঈর্ষা* নাটকে সমকালীন বাংলাদেশের সেই রূপছবিই দৃশ্যায়িত হয়েছে।

চম্পাবতী

কবি জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) বিখ্যাত লোকনাট্য *বেদের মেয়ে* (১৯৫১) অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন *চম্পাবতী* (২০০৮) কাব্যনাটক। মূল লোককাহিনির মধ্যে সৈয়দ হক আধুনিক জীবনোপযোগী অনেক উপাদান লক্ষ করে *চম্পাবতী* নাটক রচনায় আগ্রহী হন। অগ্রজ কবি জসীম উদ্‌দীনও অপত্যস্নেহে তাঁকে এ কাজের অনুমতি ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যের ভূমিকায় এ বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখ করে সৈয়দ হক লিখেছেন :

---

১ সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১১৬-১১৭

২ আলী যাকের, ' সৈয়দ হক : বাংলার সৃজনশীল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ গ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৪

৩ রামেন্দ্র মজুমদার, *বিষয় : নাটক*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩০

জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* আর আমার *চম্পাবতী*-র মিল যতটা না তার অধিক অমিল। লোকজ ঐতিহ্য থেকে নেয়া গল্প ও গীতের সমাহারে আমার অগ্রজ কবি যে নাটকটি রচনা করেছিলেন, বহুদিন থেকেই আমি তার গঠন শরীরে কিছু পঙ্গুতা লক্ষ করে উঠি, বিশেষ করে চরিত্র নির্মাণে ঘটনা রচনে ও এর নাট্যগমনে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কিছু পরেই জসীমউদ্‌দীন লন্ডনে এসেছিলেন, আর আমিও তখন লন্ডনে, যেন বিদেশ বিঁভূইয়ে বড়ভাইকে পেয়েছি – কয়েকটা দিন বড় আনন্দে কেটেছিলো তাঁর সঙ্গে, আর তখন অনেক কথা প্রসঙ্গে তাঁকে আমি বলেছিলাম তাঁর ওই নাটক বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণের কথা। জসীমভাই বড় বিষণ্ন হয়েছিলেন শুনে, আর বলেছিলেন তাঁর সেই অনুপম বাচনভঙ্গিতে, এই কথা! ওই নাটকের গীত আর বাক্য তো আমার বাংলার গেরাম থিকা পাওয়া, তার হকদার আমি একা না, তুমিও! তবে তুমি এই মশলা নিয়া নিজেই রচনা করো না ক্যান! [...] তারপর বহু বছর পার হয়ে যায়; তারপর একদিন আমাদের দেশের অগ্রগণ্য এক নৃত্যশিল্পী লুবনা মরিয়ম আমাকে বলেন *বেদের মেয়ে* নিয়ে আমি ভাবতে পারি কিনা। সেই তাঁরই কথায় নতুন করে মেজাজ এলো, লেখার ব্যাগে রাখতে শুরু করলাম *বেদের মেয়ে* নাটকটি, বয়ে নিয়ে যেতে থাকলাম যেখানেই যাচ্ছি। অবশেষে একদিন ওই লন্ডনে বেড়াতে গিয়ে কন্যা বিদিতা সৈয়দ হকের ফ্ল্যাটে চমৎকার নির্জনতা পেয়ে এই রচনাটি দাঁড় করিয়ে ফেললাম। হলো সে নতুন একটি সার্বভৌম রচনা, তবে তার শরীরে রইলো বীজ নাটকের অনেক কিছুই, বিশেষ করে গান। জসীমউদ্‌দীন বাংলার সবুজ থেকে উত্থিত কবি এবং নাট্য নির্মাণের অধিক তিনি বাংলার বক্ষবিস্তারী আবেগ–প্লাবনে ভাসমান। তাই *চম্পাবতী* রচনা করে উঠে বলতে আমার লোভ হচ্ছে, জসীম উদ্‌দীন যদি প্রকৃতই নাট্যকার হতেন, তবে হয়তো *চম্পাবতী* তাঁরই কলম থেকে আমরা পেয়ে যেতে পারতাম। অধিক কী, এই রচনাটি যেন বাংলার নিসর্গে জসীম ভাইয়ের জন্যে আমারই ভালোবাসার একটি শাপলা কুসুম হয়ে রইলো।[১]

সৈয়দ শামসুল হকের এই বক্তব্য থেকে আমরা অবগত হই যে, মূল *বেদের মেয়ে* রচনার প্রধানত তিনটি দিকের অপূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। এগুলো হলো :

ক. চরিত্র নির্মাণে অসম্পূর্ণতা,

খ. শিথিল প্লট,

গ. নাট্যগুণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা।

তবে গবেষণাকালে উভয় রচনার নিবিড়পাঠসূত্রে এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনাকরে সৈয়দ শামসুল হকের এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া কষ্টকর। কেননা, ১৯৫১ সালে জসীমউদ্‌দীন

[১] সবিনয় নিবেদন, *চম্পাবতী*, *সৈয়দ শামসুল হক : কাব্যনাট্যসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

কর্তৃক রচিত *বেদের মেয়ে* আর ২০০৮ সালে রচিত *চম্পাবতী* নাটকের সময়-সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত এক নয়। জসীমউদদীন তাঁর কালের গ্রামীণ সমাজপরিবেশে লালিত দর্শকমনের রুচির কথা বিবেচনা করে লিখেছিলেন *বেদের মেয়ে*। তিরিশের কবিদের ইউরোপীয় ধাচের নগরভাবনাকে পরিত্যাগ করে তিনি বাংলার লোকগাঁথা, গীত, ছড়া, অলঙ্কার, উপমা, প্রবাদ-প্রবচনকে সাহিত্যের অংশ হিসেবে আধুনিক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যেটি সেসময়ের প্রেক্ষাপটে একধরনের বিপ্লবী চিন্তাই বলা যেতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় জসীমউদ্‌দীন যেসকল নাটক রচনা করেছেন তাতে তিনি শহুরে আধুনিক মঞ্চনাটকের তুলনায় গ্রাম্য পালানাটক বা যাত্রানাটকের বৈশিষ্ট্য দিতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

কবি জসীমউদ্‌দীনের, *বেদের মেয়ে* রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ যাত্রাপালা *রূপবানে*র ঢঙে এক ধরনের পালার মতো করে নাট্যরচনা। তবে তিনি এ নাটকের আধুনিক মঞ্চ উপস্থাপনের ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। *বেদের মেয়ে* নাটকের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :

> *বেদের মেয়ে* নাটকের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন : 'এবার বই খানাকে গ্রাম্য-যাত্রার ঢঙে নুতন করিয়া লিখিলাম। তাই পাত্র-পাত্রীদের মুখে কতগুলি নূতন গান জুড়িয়া দিতে হইল। [...] যাঁহারা থিয়েটার রূপে এই নাটক অভিনয় করিবেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঐ নতুন গানগুলি বাদ দিতে পারেন। কোন গ্রাম্য যাত্রার দল যদি এই নাটক অভিনয় করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পাত্র-পাত্রীদের মুখে প্রয়োজন অনুসারে আরও নতুন গান জুড়িয়া দিতে পারেন। কেহ কেহ এই কাহিনীকে নৃত্যনাট্যে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। সেই জন্য ইহার বহুস্থানে নৃত্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। [...] এই নাটককে গ্রাম্য নাটকে রূপান্তরিত করিতে আমি কোন কোন স্থানে প্রচলিত লোক-নাট্যের অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়া এই নাটকের পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কয়েকটি গ্রাম্য গানেরও প্রথম পদ লইয়া তাহার সঙ্গে নতুন পদ জুড়িয়া দিয়াছি। গ্রামদেশে বহু নাটুকে-দল *রূপবান* যাত্রা অভিনয় করিয়া অপূর্ব নাট্য কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা যদি এই নাটকের অভিনয় করেন আমি সব চাইতে গৌরব বোধ করিব। ১/৬/৬৩, কমলাপুর, ঢাকা।[১]

স্পষ্টত, এ-নাটকের যে- কোনো ধরনের সংযোজন-বিয়োজন কিংবা পরিমার্জনে তাঁর সায় ছিল। তাই অনেক বছর পরে, সৈয়দ শামসুল হক যখন তাঁকে নাটকের ত্রুটি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, তখন কবি বিষণ্নবোধ সত্ত্বেও তাঁর নাটকের গল্পে সৈয়দ হকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অপরিসীম ঔদার্যে। অপরিসীম ঔদার্য নিয়ে তিনি

---

[১] দ্রষ্টব্য : *বেদের মেয়ে*, ' মুখবন্ধ', পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

বলতে পেরেছিলেন 'ওই নাটকের গীত আর বাক্য তো আমার বাংলার গেরাম থিকা পাওয়া, তার হকদার আমি একা না, তুমিও !'

জসীমউদ্‌দীন বস্তুত বাংলা লোকগান ও লোককাহিনিকে বাঙালির গ্রামীণ সমাজের উপভোগ্য করে রচনা করেছেন। গ্রামীণ মানুষ শীতের রাতে একটু আয়েশ করে দীর্ঘ পরিসরের নৃত্য-গীতসম্পন্ন অভিনয় দেখতে বেশি পছন্দ করে; যেখানে একই সঙ্গে উপস্থাপিত হবে গ্রামীণ সমাজের রীতিনীতি, নারীপুরুষের দাম্পত্যকলহ, সুখ-দুঃখ-ঘরকন্নার জীবনছবি। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বেদের মেয়ে নাটকে তাঁর প্লট নির্বাচন, ঘটনামুহূর্ত নির্মাণ ঠিক আছে। কিন্তু এ রচনাকে আধুনিক কাব্যনাটকের বিচারে বিবেচনা করলে গীতরসের প্রাবল্যে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। *চম্পাবতী* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক ঠিক এ-স্থানেই কাজ করেছেন। তিনি জসীমউদ্‌দীনের নাটকের প্লট অক্ষুণ্ন রেখে, কাহিনিটিকে আরও সুসংহত করে আধুনিক নাগরিক মানসের উপযুক্ত করে নির্মাণ করেছেন। যার ফলে সৈয়দ হক রচিত *চম্পাবতী* কাব্যনাটকটি হয়ে উঠেছে আধুনিক সার্থক কাব্যনাটক।

বেদের মেয়ে নাটকের কাহিনি রচনা করতে গিয়ে জসীমউদ্‌দীন বেদেসমাজ সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতা [১]কাজে লাগিয়েছিলেন, এবং এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন উত্তরবঙ্গে প্রচলিত জনপ্রিয় লোকনাট্য *হুমরা বাইদ্যার* কাহিনির প্রভাব। এ বিষয়ে জসীমউদ্‌দীন গবেষক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে :

[১] বেদেসমাজ-গবেষক নাজমুন নাহার লাইজু তাঁর গবেষণা গ্রন্থে জসীমউদ্‌দীনের বেদেসমাজ সম্পর্কে সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে গিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন :

> জসীমউদ্‌দীন নিজে কতখানি এই সম্প্রদায়কে সম্মান করতেন তার একটা বাস্তব ঘটনা না বললেই নয়। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব শামসুজ্জামান খানের কাছে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কবি জসীম উদ্‌দীনকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য মানিকগঞ্জে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত হয়ে উদ্যোক্তাদের ঐ অনুষ্ঠানে বেদেদের নিয়ে আসতে বলেন। উদ্যোক্তারা খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন, বেদে কোথায় পাবেন তাই ভেবে। যাই হোক আয়োজকরা বহু খোঁজাখুঁজি করে বেদেদের কবি জসীমউদ্‌দীনের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি সবাইকে সতর্ক করে জানান, যদি কেউ বেদেদেরকে অসম্মান করে তবে তিনি অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যাবেন। একই সঙ্গে তিনি আরো জানান যে, বেদেরা যে গান গাইবে তিনিও বেদেদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেই গান গাইবেন। এই ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যায়, তিনি বেদে সম্প্রদায়কে কতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। (দ্রষ্টব্য : নাজমুন নাহার লাইজু, *বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ২৫-২৬)

এ-নাটক রচনার ব্যাপারে তিনি উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত *হুমরা বাইদ্যা* নামক লোকনাট্যের কাছে অনেকটা ঋণী। বিশেষত *হুমরা বাইদ্যা* নাটকের চরিত্রের আদলেই যে তিনি *বেদের মেয়ে* নাটকের মোড়ল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, এমন আভাস জসীমউদ্‌দীন স্বয়ং *লোকনাট্য* সম্পর্কিত স্বরচিত একটি প্রবন্ধে দিয়েছেন। *বেদের মেয়ে* নাটক রচনার ব্যাপারে জসীমউদ্‌দীন যে লোকনাট্য ও গ্রাম্য গানের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী তা তিনি নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় অকপটে ব্যক্ত করেছেন। [...] মোটকথা একজন সচেতন শিল্পীর মন নিয়েই জসীমউদ্‌দীন লোকনাট্য ও গ্রাম্যগানের উপাদান সমীকৃত করে, গ্রহণ বর্জন, পরিমার্জন ও সংযোজন ব্যাপারে ব্যাপক স্বাধীনতা গ্রহণ করে *বেদের মেয়ে* লোকনাট্যটি রচনা করেছেন।[১]

এ নাটকে চম্পাবতী নামক এক বেদে-নারীর করুণ জীবনালেখ্য উপস্থাপিত হয়েছে। চম্পাবতী বেদেসর্দার গয়ার সুন্দরী, তন্বী স্ত্রী। জীবিকার তাগিদে গ্রামে গ্রামে নিজদলের সঙ্গে মিশে সে সাপের খেলা দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। এমন সময় তার প্রতি চোখ পড়ে গ্রামীণ মোড়লের। এখান থেকেই শুরু হয় মূল নাট্যদ্বন্দ্ব। মোড়লের অত্যাচার থেকে বেদেবহরকে রক্ষার্থে মোড়লের নিকট সে নিজেকে সমর্পণ করে। এরপর নানান ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকের শেষ দৃশ্যে স্বামী গয়াকে বিষাক্ত সাপের বিষ থেকে রক্ষা করে নিজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কাব্যনাটকে *বেদের মেয়ে* নাটকের কাহিনির বীজ গ্রহণ করলেও সেটিকে নিজস্ব সৃষ্টিশীল মনন দিয়ে করে তুলেছেন সার্বভৌম ও মৌলিক ।

তবে নাট্যকাহিনি, নাট্যগুণ, চরিত্র, সংলাপ সবকিছু ছাপিয়ে উভয় নাটকে যে বিষয়টি অধিক প্রস্ফুটিত হয়েছে, তা হলো আবহমান কালের বাংলার নিম্নবিত্ত ভাসমান বেদেশ্রেণির জীবনবাস্তবতা। সেইসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে চলে আসা নিগ্রহের রূপ, রাজনীতির মূলসুত্র – দুর্বলের ওপর সবলের নির্যাতন-নিপীড়নের বাস্তব চিত্র। জসীমউদ্‌দীন পুরোপুরি সমাজবাস্তবতা তুলে ধরার মানসিকতা নিয়ে নাটকটি রচনা করেছেন, কিন্তু সৈয়দ শামসুল হকের উদ্দেশ্য ছিল লোককাহিনিকে আধুনিক কাব্যনাটকের মর্যাদাদান। তবে তাঁর *চম্পাবতী* নাটকের পঙ্‌ক্তি জুড়ে ছড়িয়ে আছে আবহমান গ্রামবাংলার অর্থনীতি-সমাজ ও সংস্কৃতির চালচিত্র।

আলোচ্য নাটকে মোড়ল প্রসঙ্গে জানা যায় মাইনক্যা নামক চরিত্রের মুখনিঃসৃত সংলাপে। বেদে নারীরা যখন সাপের খেলা দেখানোর বিনিময়ে মাইনক্যার কাছে অর্থ দাবী করে, তখন সে বলে যে, এত টাকা দিয়ে এ গ্রামে

---

[১] সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘বাঙলা লোকনাট্যের ধারা ও জসীমউদ্‌দীন’, *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য*, সৈকত আসগর (সম্পা.), বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৬

মোড়লই কেবল সাপের খেলা দেখতে পারে। কেননা তার ‘ভরন্ত সংসার’ এবং তার ‘টাকাও আছে, হাউসও আছে’। তবে মাইনক্যার উদ্দেশ্য কেবল বেদে নারীদের সাপখেলানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া নয়, মাইনক্যা মোড়লের চারিত্রিক অসততা, বহুগামিতা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত। তাই সে ভেবেছে ভাসমান বেদে নারীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে মোড়লের কাছে নিতে পারলে মোড়ল খুশি হয়ে তাকে অনুগ্রহ করতে পারে, আবার কোনো অর্থ ব্যয় না করে সেও বেদেদের সাপ খেলা দেখে নিতে পারে। বেদেনারীদের মন ভোলাতে সে বলেছে :

> খবর যদি দেই তারে আর মনে যদি তার ধরে –
> তোমার ঝুলি ভইরা দিবো সোনার মোহরে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৫)[১]

মোড়ল তার এই অর্থবিত্ত আর সম্পদের জোরে গ্রামে যথেচ্ছাচারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম-অধর্মের পরোয়া সে করে না। ফলে নাটকে মোড়লের প্রথম উপস্থিতির দৃশ্যে দেখা যায়, ধানভানারত গ্রামীণ নারীদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে। এসব নারী মোড়লের কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়েও তার অর্থবিত্ত আর ক্ষমতার দাপটে কিছু বলতে পারে না। এমন কি স্বয়ং মোড়লের বউও সে সাহস করতে পারে না। মোড়লের অনৈতিক আচরণে যখনই মোড়লপত্নী বাধা দিতে গেছে, মোড়ল তখনই তাকে তালাক দিয়ে বের করে দেবার হুমকি দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে। গ্রামীণ সমাজে ধনবান মোড়ল শ্রেণির একাধিক নারীসঙ্গ কিংবা স্ত্রীগ্রহণ যে একটি সামাজিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) *লালসালু (১৯৪৮)* উপন্যাসেও দেখা যায়। বস্তুত গ্রামীণ সমাজে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নয়, ফলে পুরুষের অন্যায় মেনেও সেখানে টিকে থাকার সাধনা করতে তাদের। পুরুষেরা অর্থ, সামাজিক রীতিনীতি এবং সর্বোপরি ধর্মের ধ্বজা তুলে নারীদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরকম একটি চিত্র রয়েছে আলোচ্য নাটকে; যেখানে অন্যনারীদের সঙ্গে লাম্পট্যের প্রতিবাদ করতে গেলে মোড়ল তার স্ত্রীকে শাসিয়েছে। এমতাবস্থায় মোড়লের স্ত্রী পুরুষ নির্ধারিত ধর্মীয় অনুশাসনের দিকেও প্রতিবাদের আঙুল তুলেছে। যেমনটা দেখা গেছে সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর মাতবরের মেয়ে চরিত্রের মধ্যে। *চম্পাবতী* কাব্যনাটকের মোড়ল ও মোড়ল বউয়ের কথোপকথনের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

---

[১] আলোচ্য প্রবন্ধে সৈয়দ শামসুল হকের *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যের যাবতীয় উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত *সৈয়দ শামসুল হক : কাব্যনাট্যসমগ্র* গ্রন্থ থেকে।

মোড়ল। তেড়িবেড়ি করলে তোরে তালাক দিমু নি। [...]

বয়স গেছে তোর সাথে আর আমার দরকার কি? [...]

চোপ, হারামজাদী।

স্বামীর সুখে বাধা দেয় যে বউ সে দোজখে যায়।

মোড়ল বউ। আর, আকাম কুকাম কইরাও বুঝি স্বামী বেহেস্ত যায় ?

মোড়ল। কথার পিঠে কইতে কথা শরম নাই রে শুয়ার ?

যা যেখানে বেহেস্ত আছে, খোলাই আছে দুয়ার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৮)

এরপর মোড়লের নজর পড়েছে বেদেবহরের নারীদের দিকে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত বেদে সম্প্রদায় পেটের দায়ে গ্রামে গ্রামে সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়। নিজেদের কোনো স্থায়ী আবাস নেই তাদের। ভাসমান নৌকাই তাদের সংসার। ফলে তাদের সমাজের নারীরা আরও বেশি অরক্ষিত। মোড়ল এই অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে গয়াবেদের স্ত্রী চম্পাবতীকে তার কাছে রেখে যাবার জন্য সম্পদের লোভ দেখিয়েছে। গয়ার উদ্দেশে রূপকার্থে নৌকার উদাহরণ টেনে সে বলেছে :

মোড়ল । এই নাও রাইখা যদি যাও,

নায়ের অভাব কি তোমার, পাইবা কত নাও।

আমার বিলাস হইছে তোমার এই নাওখান রাখি।

বড়ই চঞ্চল হইছে অন্তরের পাখি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৩)

গয়া বাইদ্যা যখন বলেছে – অর্থ দিয়ে সব কেনা গেলেও মানসম্মান-ইজ্জত কেনা সম্ভব নয়, এবং চম্পা যেহেতু তার বিবাহিত স্ত্রী, সেহেতু সে কিছুতেই কোনো কিছুর বিনিময়ে চম্পাকে এখানে রেখে যেতে পারে না। কিন্তু অর্থ, ক্ষমতা আর সম্পদের দম্ভে মোড়ল উন্মাদ। সে গয়া বেদেকে ব্যঙ্গ করে বলেছে :

হা হা কত যে দেখলাম আর কত শুনলাম –

নারীর সতীত্ব তার কিবা আছে দাম!

যখন ইচ্ছাই হইছে সেই ইচ্ছা ঠেকাবার চাও ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৩)

তার এই অনমনীয় জেদ দেখে অসহায় গয়া শেষপর্যন্ত তাকে সত্যনাশের ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু মোড়ল তার ইচ্ছাপূরণে কৃতসংকল্প, অনড়। একদিকে নারীসান্নিধ্য-স্পৃহা, অন্যদিকে অসহায়ের ওপর ক্ষমতা প্রদর্শনের পাশবিক উল্লাসে নৃশংস হয়ে উঠেছে সে। দম্ভ ভরে গয়ার উদ্দেশ্যে বলেছে – সে মোড়ল, মহাশক্তিধর! ফলে তাকে নিবৃত্ত করার শক্তি এ সমাজে নেই। এসময়ে তার চ্যালা মাইনক্যা ও মোড়লের

কথোপকথনে উঠে এসেছে গ্রামীণ সমাজে মোড়ল শ্রেণির অত্যাচারের চিত্র; প্রশাসনের সহযোগিতায় দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি নির্যাতনের আবহমান বাস্তবতা। প্রাসঙ্গিক এলাকা উল্লেখ করা হলো :

মোড়ল। আমারে দেখাস ভয় ? আরে রে পাগল,
আমি যে মোড়ল ! তুই দ্যাখ শক্তিবল –
দ্যাখ আমি কি না করতে পারি –
আপোষে না দিবি যদি কাইড়া নেবো নারী।

[...] এই মোড়ল কী পারে ! [...] লাঠি দিয়া মাথা ভাঙতে পারে। / [...] বাইদ্যার নায়ের বহর ডুবায়া দিতে পারে।

[...] বাইদ্যার নারীদের কেশ কাইটা দিতে পারে। [...] তাগো সব পোলাপান আছড়ায়া মারতে পারে।

[...] যায় যদি থানায় বিচারে –
টাকা দিয়া কেনা আছে সব দারোগারে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৪)

মোড়লের এহেন আচরণ দেখে যখন চম্পাবতী অবাক হয়ে বলেছে যে, এত অত্যাচারের পরও এদেশে বিচার কি নেই, তখন মোড়ল বলেছে – যুবতীতে মন মজে গেলে তার কোনো বিচার নেই, এবং সে পুরাণ থেকে রাবণের সীতাহরণের উদাহরণ দিয়ে নিজেকে অত্যাচারী শাসক রাবণের সঙ্গে তুলনা করেছে।

তবে মোড়লের উপর্যুপরি হুমকির মুখেও গয়া বাইদ্যা এতটুকু বিচলিত হয়নি। সে সাহসের সঙ্গে জানিয়েছে – বেদেরা ভাসমান ও উন্মুল হলেও তাদের মান-সম্মান রয়েছে। হতে পারে তারা ছোট জাতের; কিন্তু মনে রাখা উচিত বিষাক্ত সাপ নিয়েই তাদের নিত্যকার খেলা। ফলে বেদে নারীদের দিকে দৃষ্টি দেবার আগে মোড়লের সাবধান হওয়া উচিত। গয়ার এই দৃঢ় মানসিকতা সম্পর্কে সমালোচকের একটি মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে :

> এখানে বেদে সর্দার গয়া নিজেকে নীচু জাতের মানুষ বলে পরিচয় দিলেও নিজের আত্মসম্মানের কথা ভোলেনি। যা একজন মর্যাদাবান মানুষের চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ। বেদে সম্প্রদায়ের মানুষের ভেতর যে জাত্যভিমান এবং যে সংস্কৃতি ক্রিয়াশীল তা গেরস্থ সমাজের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। দুই সমাজের

সংস্কৃতি ভিন্ন। গয়া বেদে গ্রাম্য মোড়লের কাছে নিজের স্ত্রী চম্পাকে রেখে যেতে যখন বাধ্য হলো – এই ঘটনাতে সামন্তবাদী সমাজের এক নির্মম দিক ফুটে উঠেছে।[১]

কিন্তু গয়ার মুখে এমন সংলাপ মোড়লের অহমবোধে প্রচণ্ড আঘাত করে। ফলে সে অচিরেই নিজ লাঠিয়াল বাহিনীকে বেদেদের উপর হামলা করার হুকুম দেয় :

এক্ষণ নদীর পাড়ে লাঠিয়াল পাঠা,
বাইদ্যার বহরে চাই মরণের ঠাঠা। [...]
বাইদ্যারা একজনও য্যান বাঁচতে না পারে –
পোলাপান একটাও না রক্ষা পাইতে পারে
আগুন জ্বালায়া তোরা গাঙেতে ডুবায়া দে রে বাইদ্যার বহর।
বাইদ্যার বাহাদুরি! আইজ তার এইখানে কব্বর। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৫)

ফলে মাতবরের অত্যাচারের হাত থেকে নিজ সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য চম্পাবতী মাতবরের নিকট অসহায় আত্মসমর্পণ করে। চম্পার এহেন সিদ্ধান্তে অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন গয়াবেদে মনোক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ বহর নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এরপর একান্ত পারিবারিক পরিসরে চম্পাকে মাতবর প্রথমে নানা উপায়ে ভোলানোর চেষ্টা করে। মিষ্টি আলাপ, অলঙ্কার উপহার প্রদানসহ নানান চেষ্টার পরও যখন চম্পা তার সতীত্ব থেকে বিচ্যুত হয় না, ঠিক তখনি দেখা যায় মাতবরের অন্য আরেক রূপ। সে তখন পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার দম্ভে অসহায় চম্পাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে :

সর্প নিয়া খেলাস রে তুই, চম্পা বাইদ্যানি।
আমিও কিন্তু কয়া দিলাম – সর্প হইতে জানি।
সহজে বশ না মানিলে, ছোবল দিমু ছোবল !
বাঘ ছাগলে পানি খাওয়াই – আমি সেই মোড়ল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৮)

চম্পা তবু তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এরপর মোড়ল অতি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রথমা স্ত্রীকে গিয়ে হুকুম করে বেদে-নারী চম্পাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে বশে এনে যেন তার ঘরে পাঠায়। নিজ স্ত্রীকে অন্য নারীকে ঘরে পাঠাতে বলতে তার এতটুকু বিবেকে বাধে না। অন্যদিকে চম্পা অনড়, তার দিন-রাত অতিবাহিত হয় বেদে-স্বামী

---

[১] ড. নাজমুন নাহার লাইজু, *বাংলাদেশের বেদেসম্প্রদায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

গয়ার চিন্তায়। ফলে প্রতিশোধপরায়ণ মোড়ল চম্পার ওপর সমস্ত বাড়ির রান্নার কাজ অর্পণ করে; মাথার চুল কেটে দেয়। বোষ্টমীর সঙ্গে চম্পার সংলাপে পরিস্ফুট হয়েছে তার দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপনের চিত্র :

চম্পা। দুঃখের কথা কবো কি আর, বোষ্টুমি ঠাকরুণ।
মোড়ল সাবে পারলে আমায় কইরা ফালায় খুন।
তার পালংকে যাই না বইলা কেশ কাইট্যা দিছে।
পুরা বাড়ির রান্ধনের কাম আমার হাতে দিছে।
কয় বেটি তুই জব্দ হবি গতরে পাড় পরলে –
তখন লাত্থি খাবি আমার পায়ের উপর পড়লে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৭)

এরপর বোষ্টমীর সঙ্গে আলাপরত চম্পাবতীকে দেখে মোড়ল আরও ক্ষেপে যায়; এবং তাকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করে :

এখনো হস নাই সিধা, গোলামের বেটি!
এই তোর ধরলাম ঘেটি। [...]
ক' তোরে বুদ্ধি কী দিছে বোষ্টুম ঠাকরুণ।
ক' জলদি, আইজ তোরে আমি করছি খুন।
হারামজাদী, বেজম্মার মাইয়া ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৮)

নিজের শত অপমান নারীকুল সহ্য করতে পারে, কিন্তু নিজ পরিবার, বিশেষত পিতা-মাতা, বংশপরিচয় নিয়ে অপমানসূচক বক্তব্যে নারী হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। আলোচ্য কাব্যনাট্যে চম্পাও তার ব্যতিক্রম নয়। মোড়ল যখন চম্পার বাবা-মা নিয়ে অপমানসূচক কথা বলেছে, তখন সে আর নীরব থাকেনি, বরং প্রতিবাদী সত্তায় জেগে উঠেছে। তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে মোড়ল বলেছে :

মোড়ল। কী ! আমারে শাসাস তুই ? আমারে ? আমারে ?
লাঠিয়াল পুষি আমি হাজারে হাজারে।
গেরাম বিরাণ করি চক্ষের পলকে –
আমারে সেলাম দিয়া কূল পায় না লোকে।
বাঘের গরুর মতো খাওয়াই আমি ঘাস।
আর কি না আমারেই কোপাইতে চাস ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৯)

জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকে গ্রামবাংলার সমাজজীবনে সমাজপতিদের দর্পিত উপস্থিতি এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর অসহায়তা যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় ঠিক তেমনি কৃষিভিত্তিক সমাজবাস্তবতার চালচিত্র সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। একজন সমালোচক এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

> *বেদের মেয়ে*-তেই আমরা সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করি আমাদের পল্লীবাংলার নর-নারীর স্নেহ–ভালবাসা–সিক্ত অথচ বিয়োগব্যথা–কণ্টকিত জীবনকে। আমাদের বেদে সমাজের একটি বলিষ্ঠ চিত্র হিসেবে এই লোকনাট্যটি বিশেষ মূল্য বহন করছে বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। যদিও এ নাটকে 'চম্পা' নাম্নী এক বেদের মেয়ের ট্র্যাজেডিই মুখ্য বিষয়, তবু ঐ ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নাট্যকার আমাদের বেদে সমাজের একটি বাস্তবানুগ ছবিও উপহার দিয়েছেন। ঐ উপলক্ষ্যে আমাদের সামনে বৃহত্তর বাংলার কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের চেহারার সুস্পষ্ট আভাসও উপস্থাপিত করেছেন লেখক।[১]

সৈয়দ শামসুল হক যেহেতু জসীমউদ্‌দীন কর্তৃক অনুপ্রাণিত, সেহেতু *বেদের মেয়ে*র মতো *চম্পাবতী* কাব্যনাটকেও কৃষিজীবী সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষযোগ্য। এখানেও বেদেদের জীবনাচারের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে কৃষিনির্ভর গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনধারা, সংস্কৃতি, দুঃখ-সুখের জীবনকথা। এমনকি উপমা, অলঙ্কার প্রয়োগেও নাট্যকার গ্রামীণ সংস্কৃতি বজায় রেখেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মাতবরের চ্যালা মাইনক্যা চরিত্রটি যখন বেদে নারীদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছে তখনও তাতেও মিশে আছে কৃষিভিত্তিক গ্রামবাংলার বাস্তব উদাহরণ :

> কই কি আমি, ও বাইদানি,
> তোমাগো দেখি রসে চোবানি –
> পউস মাসে খাজুর গাছের রস ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৪)

গ্রামবাংলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষত নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের অন্যতম বিনোদনের উৎস বেদে-নারীদের সাপের খেলা, নৃত্যকলাদর্শন। সাধারণত ধান-চাল বা অন্যান্য ফসলের বিনিময়ে এই নৃত্যকলা তারা উপভোগ করে। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিত্তবান শ্রেণি বেদেদের সাপ খেলা দেখার পরিবর্তে আধুনিক সিনেমার প্রতি প্রলুব্ধ হচ্ছে। কিন্তু যাদের পয়সা নেই তারা এই আধুনিক বিনোদন উপভোগ করতে পারছে না। বিনোদনের ক্ষেত্রে বিবর্তনের এমন একটি ইঙ্গিত

---

[১] সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

রয়েছে আলোচ্য নাটকে। মাইনক্যার কাছে যখন বেদে-নারীরা সাপ খেলার পারিশ্রমিক নিয়ে দর-কশাকশি করছে, তখন তারা ১০০ টাকা থেকে নামতে নামতে যখন পঁচিশ টাকা প্রাপ্তির আশা করেছে, তখন মাইনক্যা চরিত্রের দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত সংলাপে অভিব্যক্ত হয়েছে শহুরে সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত :

চম্পা। পঁচিশ! আছে পঁচিশ?
মাইনক্যা। ইসস!
থাকলে পঁচিশ টাউনেই যাইতাম !
সাপের খেলার অধিক মজা সিনামা দ্যাখতাম ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৪)

নাটকে মোড়ল চরিত্রের প্রথম আগমনের দৃশ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে সম্পন্ন কৃষিজীবী এক গৃহস্থঘরের জীবন-ছবি; যেখানে দেখা যাচ্ছে নারীরা ঢেঁকিতে ধান ভানছে আর আনন্দে গান গাইছে। ঢেঁকিতে ধানভানার সময় একধরনের ছন্দ তৈরি হয়। গ্রামীণ নারীরা এই ছন্দের তালে কায়িক পরিশ্রম লাঘবের জন্য নিত্যকার ঘরকন্না, হাসি-আনন্দ, ব্যথা-বেদনা, স্বপ ও স্বপ্নভঙ্গের কথামালা নিয়ে চমৎকার গান পরিবেশন করে, যা 'ধান ভানার গীত' হিসেবে গ্রামীণ সমাজে বহুকালধরে প্রচলিত রয়েছে। আলোচ্য নাটকেও এমন ধান ভানার গীতের উপস্থিতি রয়েছে, যেখানে কৃষিজীবী সমাজ প্রদর্শিত হয়েছে অত্যন্ত বাস্তবতার নিরিখে। যেমন :

রাঙা বউ ঢেঁকি পারায় আলতা পরা পায়,
সোহাগে কাঠের ঢেঁকি নাইচা না কুল পায়।
কালা বউ ঢেঁকি পারায় মাথায় ঠেকে চাল,
কাতলা দুইটা নড়বড় করে দিতে দিতে ফাল।
নানীবিবি যখন আইসা ঢেঁকির উপর চড়ে,
হাসতে হাসতে ঢেঁকি তখন নোটে আছড়ে পড়ে।
মেঝো বউ বারা বানে গুনগুনায়ে গায়,
কাতলা দু'টার পাখা মেলে ঢেঁকি উড়ে যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৭)

আবহমান গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ সম্পন্ন মোড়লশ্রেণি। এই নাটকেও মোড়ল প্রবল ক্ষমতাধর। সে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে এই বলে যে- 'আমি মোড়ল গেরাম কাঁপে আমার তরাসে–' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৯); অর্থাৎ সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে মোড়লের অবস্থান ভিন্নতর। সাধারণের তুলনায় তাদের সাজসজ্জায়ও রয়েছে ভিন্নতা। নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে বিষয়টিও কাব্যনাটক *চম্পাবতী*তে

উল্লেখ করতে ভোলেননি। বেদে নারীদের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার জন্য মোড়লের যে-সাজসজ্জা, তা মোড়ল ও মাইনক্যার কথোপকথনসূত্রে উল্লেখ্য :

(মোড়ল পকেট থেকে রঙিন ঝালরদার টুপি মাথায় দেয়।)

মাইনক্যা। হ, হ, এখন বড় সোন্দর শোভা হইছে মোড়ল সাব।

মোড়ল। আত্তর, আত্তর, দে বাপ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫০)

তবে আলোচ্য নাটকে বেদেদের ভাসমান জীবন-কথন ও সমাজচিত্র সবথেকে বেশি উপস্থাপিত হয়েছে। বেদেদের জীবনযাপন, দারিদ্র্য, পেশা, দৈনন্দিন সমস্যা, তাদের দাম্পত্যজীবনচিত্র, কলহ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, হাসি-আনন্দ চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। এক্ষেত্রে বেদে-জীবন উপস্থাপনে নাট্যকার সংগীতের আশ্রয় নিয়েছেন কখনো, কখনো আবার নাট্যদৃশ্যে সংলাপের মাধ্যমে বেদেদের সমাজ-সংসারের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। যেমন, মোড়লের জলসায় বেদেদের, বিশেষত, গয়া বেদের পরিচিতিমূলক সংগীতের মাধ্যমে বেদেদের ঠিকানা, পেশা, যাপিত জীবনের ছবি অনেকটাই ফুটে উঠেছে। গয়াবেদে ও তার দল মোড়লের সম্মুখে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে গানে গানে :

মোরা পঙ্খী মারি পঙ্খী ধরি, পঙ্খী বেইচা খাই,
মোদের আরাম বিরাম নাই।
সাপের মাথার মণি কাইড়া করি যে কারবার।
মোরা এক ঘাটেতে রান্দি বাড়ি,
আরেক ঘাটে খাই।
মোদের ঘরবাড়ি নাই, সব দুনিয়া বাড়ি মোদের
সকল মানুষ ভাই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫১)

বস্তুত, বেদে মানেই নৌকাবাস, যাযাবর জীবন। সেখান থেকে চম্পাবতী মোড়লগৃহে আবদ্ধ হয়ে গৃহীজীবনের জটিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। একজন বেদের মেয়েকে গৃহপরিসরে নিয়ে এলে কী বিয়োগাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে, নাট্যকার তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাটকে।

অপেক্ষমাণ

সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) নিরীক্ষাধর্মী কাব্যনাটক *অপেক্ষমাণ (২০০৯)*। 'হেনরিক ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০০৯'-এ মঞ্চায়নের জন্য নাট্যপরিচালক আতাউর রহমানের বিশেষ অনুরোধে নাটকটি তিনি রচনা করেন।[১] নাটকটিতে তিনি স্বরচিত কাব্যনাটক *ঈর্ষা (১৯৯০)* এবং নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক যোহান ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) রচিত নাটক *এ ডলস হাউস (১৮৭৯)* ও *এন এনিমি অব দ্য পিপল (১৮৮২)* নাটকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও চরিত্রের অসাধারণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তবে হেনরিকের বিশ্বখ্যাত নাট্যকর্ম থেকে উৎসরস আহরণ করলেও তিনি তাঁর মধ্যে নবপ্রাণরস সঞ্চার করে নাটকটিকে সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা হিসেবে দাঁড় করাতে পেরেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের এ-ধরনের নিরীক্ষাধর্মী রচনার সফলতা নিয়ে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে :

> কখনো কখনো মনে হয় একই লেখা দুইবার, তিনবার, চারবার লিখছেন একজন লেখক। সৈয়দ হক সম্পর্কে এই অভিযোগ তোলার কোনো অবকাশ নেই। কারণ একটা লেখার পরে তিনি সেই লেখার বিন্যাসের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাননি। তাঁর নতুন লেখা মানেই নতুন বিন্যাস।[২]

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক *ঈর্ষা*র প্রৌঢ় চরিত্র, *এ ডলস হাউস*-এর নোরা চরিত্র ও *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার চরিত্রকে একই মঞ্চে উপস্থাপন করে উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সমাজ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যসমাজের মিল-অমিল ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনটি পৃথক সমাজের পৃথক চরিত্রকে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন – জীবনে সত্যের সম্মুখে দাঁড়ানোর মতো মহৎ আর কিছুই নেই; নিজেকে আবিষ্কার করতে হলে মানুষকে নিজের মনের আয়নাতেই নিজেকে চিনে নিতে হয়। শত বছর পূর্বে নাট্যকার ইবসেন আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা ও সত্যের বিজয়ের যে কথা তাঁর নাটকে বলে গেছেন, শতবর্ষ পরে সৈয়দ শামসুল হক তেমনি একটি চরিত্র নির্মাণ করেছেন *ঈর্ষা* নাটকে – যেখানে অনুশোচনার

---

[১] এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে আতাউর রহমান বলেন : 'ইবসেনের উৎসবে নাটক মঞ্চায়নের কথা বলা হলে মাথার মধ্যে একটা ভিন্ন কাজ করার পরিকল্পনা আসে। সেই মতো সৈয়দ শামসুল হককে আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী এভাবেই নাটকটি লেখার অনুরোধ করি।' (দ্রষ্টব্য : আতাউর রহমান, 'রক্তকরবী থেকে অপেক্ষমাণ', আনন্দ পাতা, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১২ নভেম্বর, ২০০৯)

[২] জাকির তালুকদার, 'সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্য : শক্তিকেন্দ্রের সন্ধানে', *পরানের গহীন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯৩

আগুনে দগ্ধ এক প্রৌঢ়চরিত্র চরম একাকিত্বের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করছেন। *অপেক্ষমাণ* নাটকের কোরাসচরিত্র ব্রেকডান্সার দল নাচের তালে তালে নাটকের প্রারম্ভে এ কথাই বলে গেছে দর্শকের উদ্দেশ্যে :

> হক আর ইবসেন [...]
>
> বলবেন – বলেছেন
>
> একা হয়ে যেতে হয় সত্যের সমুখেই
>
> শক্তিটা আছে শুধু সত্যেই – সত্যেই (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৩) [১]

মূলত, সৈয়দ শামসুল হক বরাবরই পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের বাস্তববাদী ধারার পথিকৃৎ, নওরেজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের অনুরাগী ছিলেন; তাঁর লেখনীতে নওরেজিয়ান এ-লেখকের প্রভাব নাটকের ভাবাদর্শ ও রচনারীতি উভয়দিক থেকেই প্রতীয়মান হয়। বিশেষত রচনার ভাবাদর্শগত দিক বিচার করলে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে সৈয়দ শামসুল হকই হেনরিক ইবসেনের নাট্যাদর্শের যথার্থ উত্তরসাধক; কলুষমুক্ত, বৈষম্যমুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত একটি সুসভ্য সমাজ নির্মাণ ও সুশিক্ষিত জাতিগঠনই ছিল উভয় লেখকেরর রচনার মৌল উদ্দেশ্য; তাঁরা উভয়েই সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, অপসংস্কৃতি, ধর্মের নামে অনাচার, রাজনীতির নামে স্বৈরাচার, রাষ্ট্রক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী আচরণে ব্যথিত হয়েছেন এবং সমাজলগ্ন নাট্যরচনার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরিয়ান সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল – সমাজ সর্বদা একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজ প্রচলিত নিয়ম-নীতি যতই ভ্রান্ত হোক, মানুষের জন্য ক্ষতিকর হোক, তবু সেই ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার কারো নেই। হেনরিক ইবসেন তাঁর *অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকে প্রচলিত এ-ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করেছেন। তিনি অদক্ষ সংঘশক্তির অসারতা দেখিয়ে বলেছেন – দশজন মিলে একটি মিথ্যাকে সত্য বললেই সেটি সত্য হয়ে যায় না, বরং সেটি মিথ্যাই থাকে। আর সমাজে যদি এগারোতম ব্যক্তি একাই সে সত্য প্রকাশ করে তবে সেটি সত্যই। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সবসময় কল্যাণ বয়ে আনে না। জনগণকে আগে প্রকৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে হয়, ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান থাকতে

---

[১] মূল কাব্যনাটকের সব উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬ গ্রন্থ গ্রন্থ থেকে।

হয়। মানুষ কেবল আকারে মানুষ হলেই হয় না, তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করে নিতে হয়। হেনরিক ইবসেন তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকে সত্যান্বেষী নির্ভীক ডাক্তার চরিত্রটির জবানিতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'জনগণ'-এর মতো জাদুশব্দ দিয়ে আর আমার মগজধোলাই করা যাবে না। না, আর না। একদল প্রাণী মনুষ্য-আকৃতির হলেই জনগণ হয়ে যায় না। জনগণের সঙ্গে সম্মান জড়িত এবং সে সম্মান নিজেদেরই অর্জন করতে হয়। [...] আমি বিপ্লবী। সংখ্যাগরিষ্ঠ সবসময়ই সঠিক – যুগপ্রাচীন এই মিথ্যার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করছি। [...] যিশু যখন ক্রুশে চড়েছিলেন তখনও কি সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ভুল ছিল ? পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এ কথা বিশ্বাস না-করে সংখ্যাগরিষ্ঠ যখন গ্যালিলিও-কে কুকুরের মতো হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করে তখনো কি সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ভুল ? সঠিক কী সেটা বুঝতেই সংখ্যাগরিষ্ঠের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে যায়। নির্ভুল কাজটি যতক্ষণ পর্যন্ত না- করে ততক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সঠিক নয়। (২য় অঙ্ক, দৃশ্য ২, পৃ. ৮৩-৮৫) [১]

এন এনিমি অব দ্য পিপল নাটকের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে নরওয়ের ছোট্ট একটা শহরে নবনির্মিত পাবলিকবাথ প্রকল্পের পানি দূষণ নিয়ে। শহরের নাগরিকদের পানিসমস্যা দূরীকরণের জন্য সরকারি প্রকল্প হিসেবে এটি নগর মেয়রের তত্ত্বাবধায়নে নির্মাণ করা হয়েছে; কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাব, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে পানিপ্রকল্পের সঠিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় বিভিন্ন শহর থেকে আগত নাগরিকরা সুস্থ হবার বদলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এসময়ে সত্যান্বেষী ডাক্তার থমাস স্টকম্যান গবেষণা করে দেখেছেন পানিদূষণের মূলকারণ প্রকল্পের অদূরে অবস্থিত ট্যানারি কারখানা। তাই অতিদ্রুত বাথপ্রকল্পের স্থান সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন; তা না হলে এটি দীর্ঘমেয়াদে শহরের নাগরিকের স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ডাক্তারের এই আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে প্রথমে সাংবাদিক, সুশীলসমাজ তাকে সাধুবাদ দিলেও, নগরপিতা পিটার স্টকম্যান যখন স্বীয়স্বার্থে ডাক্তারের বিরোধিতা করেছেন, তখন তারাও ক্ষমতাকাঠামোর দম্ভে ভীত হয়ে দুর্নীতিবাজ মেয়রকে সম্মিলিতভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এঁদের কেউই সত্যের জন্য নিজেদের ব্যাক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিতে কিংবা মেয়রের রোষানলে পড়তে চাননি। মেয়র তাঁদের বুঝিয়েছেন – এই পানিপ্রকল্প নগরবাসীর জীবনমানে পরিবর্তন এনেছে, শহরে পর্যটক আসছে, জনগণের উন্নতি হচ্ছে। অন্যদিকে ডাক্তারের কথায় পানিপ্রকল্প পুনর্নির্মাণ করতে গেলে নগরবাসীকে অতিরিক্ত কর দিতে

---

[১] আলোচনায় ব্যবহৃত *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের সব উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে খায়রুল আলম সবুজ অনূদিত *এন এনিমি অব দ্য পিপল*, বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৮ গ্রন্থ থেকে।

হবে। ফলত, সুবিধাবাদী জনগণ তাদের দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার কথা চিন্তা না করেই, আপাতপ্রাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে গা ভাসাতে চাইছে।

কিন্তু ডাক্তার নিজের স্বার্থের কথা না ভেবেই একা শেষপর্যন্ত সত্যের পক্ষে লড়ে গেছেন। ফলস্বরূপ, তার পৌরসভার চাকুরি গেছে, মেয়ে স্কুলের চাকুরি হারিয়েছে, ছেলেরা স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, এমনকি জনগণ উন্মত্ত হয়ে তাকে 'জনতার শত্রু' উপাধি দিয়ে ঘর-বাড়ি ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিয়েছে। এরকম বিরূপ পরিস্থিতিতে তিনি প্রথমে ভেবেছেন প্রিয় শহর পরিত্যাগ করে তিনি অন্যত্র চলে যাবেন ; কিন্তু পরক্ষণেই সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেছেন, এবং সত্যের পক্ষে সংগ্রাম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তিনি অনুধাবন করেছেন – প্রতিকূল পরিবেশে যে মানুষ সত্যকে অবলম্বন করে একা দাঁড়াতে পারে, পৃথিবীতে তার মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই; এবং সত্যকে অবলম্বন করে একা সংখ্যাগরিষ্ঠ মিথ্যার সঙ্গে লড়াই করে যাওয়াই হওয়া উচিত মানবজীবনের ব্রত। ইবসেনের এমন নাটক লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে খায়রুল আলম সবুজ নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> অর্গানাইজড লিবারেলদের প্রতি ইবসেন আগে থেকেই চটে ছিলেন। *গোস্ট* নাটকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সেই আগুনে যেন ঘি ঢাললো। রাষ্ট্র ধারণাকেও তিনি এক সময় ব্যাক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। [...] গণতন্ত্র অপরিহার্যভাবেই বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং দুঃখজনকভাবে প্রায় সবসময়ই দল রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করাই দলগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সেক্ষেত্রে যে যত মানুষ দলে টানতে পারবে লাভের আশা তার তত বেশি। দেশ ও দশের মঙ্গল চিন্তা তখন অন্তরালে চলে যায়। [...] মানুষের মানসম্মত মূল্য সেখানে গৌণ হয়ে যায় – ভোটাভুটির ক্ষেত্রে সংখ্যাই সবশেষ কথা। এমন পরিস্থিতিতে ইবসেন বলেছেন, – The state is the curse of individual ! ব্যক্তি সেখানে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাসের কথাই তিনি তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল*-এ উপস্থাপন করেছেন। অর্গানাইজড লিবারেলদের প্রতি তার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তথাকথিত লিবারেল সংবাদপত্রের প্রতি বিরক্তি।[১]

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর হেনরিক ইবসেন রচিত নাটকের এ বিষয়টি অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে *অপেক্ষমাণ* নাটকের ঘটনাংশ বিন্যস্ত করেছেন।

---

[১] খায়রুল আলম সবুজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

অন্যদিকে, ইবসেনের *এ ডলস হাউস* বিশ শতকের ইতিহাসে সবথেকে বেশিবার প্রর্দশিত নাটক। ১৮৭৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কোপেনহেগেন থেকে প্রকাশিত এ-নাটকটি সারাবিশ্বে সাড়া-জাগানিয়া একটি দর্শকনন্দিত নাটক। নাটকটির বিষয়ও চমকপ্রদ। নাটকটির মূলভাব সম্পর্কে সমালোচক একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন :

> নারীর দাসত্বের ওপরে যে সমাজের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে, নারীত্ব, সতীত্ব, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি নীতির শ্লোগান আউড়িয়ে, নারীকে শৃঙ্খলিত করেছে যে সমাজ, সেই সমাজ ইবসেনের মতে কোনোদিনই সত্যিকার মনুষ্যত্ব-লাভের সহায়ক নয়। *A Doll's House*- এর বাণী সত্যিই বিস্ফোরক – [...] নারীকে নিয়ে আর পুতুলখেলা চলবে না[১]

বস্তুত, হেনরিক ইবসেন তাঁর *এ ডলস হাউস* নাটকে দেখিয়েছেন – পারিবারিক পরিসরে একজন নারী সাধারণ মানুষের মতো পরিচর্যিত ও বিবেচিত হন না; তাঁর জন্য রয়েছে সমাজ নির্ধারিত পৃথক নিয়ম। এমনকি প্রচলিত ধর্মও নারীকে কেবল সমাজের প্রতি, স্বামীর প্রতি, পরিবারের প্রতি, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা বলে; কিন্তু সমাজ বরাবরই তার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে। তাকে মানুষরূপেই গণ্য করে না। আলোচ্য নাটকে সাধারণভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে প্রধান দুই চরিত্র নোরা এবং হেলমার দাম্পত্য জীবনে বেশ সুখী। হেলমারের নতুন ব্যাংকে চাকুরির সুবাদে অতীতের সমস্ত দৈন্য কাটিয়ে সন্তান, সহকারী, স্ত্রী, বন্ধু পরিজন নিয়ে হেলমার উদযাপন করছে সুখী-সমৃদ্ধ পারিবারিক জীবন। এমন কি হেলমারের স্বামী হিসেবে স্ত্রী নোরার প্রতি ভালবাসারও কোনো কমতি নেই। কিন্তু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, আপাত সুখী এ-সংসারজীবনে কোথাও যেন একটি লুকায়িত দীর্ঘশ্বাস বিদ্যমান; এবং বলাবাহুল্য সেটি নোরার একজন মানুষ হিসেবে সংসারে বঞ্চিত হবার দীর্ঘশ্বাস। একজন নারী কেবল কন্যা, স্ত্রী, জননী হতে পৃথিবীতে আসেনি। একজন মানুষ হিসেবে পুরুষের মতোই তার ভূমিকা রয়েছে সমাজে। অথচ সমাজ-সংসারে সে ক্রমাগত অবমূল্যায়িতই থাকে। পিতার সংসারে নোরার জীবন ছিল পুতুলের মতো। দাম্পত্যজীবনেও সে পুতুলের মতোই বিনোদনের অংশীদার। এমনকি সন্তান-সন্ততিও তার কাছে পুতুলতুল্য। তাদের ভালোমন্দ নির্ধারণে কিংবা সংসারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তার ভূমিকা নেই। ফলে তার হৃদয়ে ক্রমাগত অনুরণিত হয়েছে আক্ষেপ ও বিষাদের সুর। যেকারণে সে সংসার ছাড়ার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখিয়েছে – চাইলে একজন নারীও

---

[১] সুনীল কুমার ঘোষ, *ইবসেন নাট্য-সম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*, সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৬

জীবনের ব্যাপারে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নোরার এ আক্ষেপ *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হক নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেছেন :

> বাবা আমাকে আদর করে পুতলি ডাকতেন।
> আমি যেমন পুতুল খেলা করতাম, তিনিও আমাকে নিয়ে পুতুলই
> খেলতেন।
> তারপর যখন তোমার কাছে থাকতে এলাম – [...]
> তুমি তোমার রুচি তোমার ভালো লাগা তোমার ইচ্ছে নিয়ে বাড়িতে,
> আর আমি তোমার রুচি তোমার ভালো লাগা নিয়ে তোমার
> ইচ্ছের পুতুল। [...]
> আজ পেছন ফিরে দেখে সব – মনে হচ্ছে –
> দাসীর জীবন ছিলো আমার। দাসীরই জীবন আমি কাটিয়ে গেছি।
> তোমার সুঁতোর টানে নেচে গেছি শুধু। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১১-৫১২)

এ ডলস হাউস নাটকের বিবৃত কাহিনি সৈয়দ শামসুল হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করেছেন। শুরু থেকে মূল কাহিনি না দেখিয়ে নোরা যখন সংসারত্যাগী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, *অপেক্ষমাণ* নাটকে তখন থেকেই নাট্যঘটনা নারী ও পুরুষ চরিত্রের সংলাপ-প্রতিসংলাপের মাধ্যমে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার, নাট্যকার *অপেক্ষমাণ* নাটকে নোরা চরিত্রের দৃঢ়তা পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রাখলেও হেলমার ও নোরার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ বদলে দিয়েছেন । যেমন *এ ডলস হাউস* নাটকে নোরা ক্রগসতাদের হুমকিতে ভীত হয়ে তাকে চাকুরিতে বহাল রাখার জন্য স্বামী হেলমারকে সুপারিশ করেছে; হেলমার সে শুপারিশ রাখেনি দেখে নোরা রুষ্ট হয়েছে। কিন্তু *অপেক্ষমাণ*- নাটকে দেখা গেছে স্ত্রী চরিত্রটি বারবার নিষেধ সত্ত্বেও স্বামী কেবল তার ব্যক্তিস্বার্থে একটি নেতিবাচব চরিত্রকে ব্যাংকে চাকুরি দিয়েছে। এখানে স্ত্রীর অনুরোধ, ভালোবাসা, মর্যাদার থেকে বেশি হয়ে গেছে স্বামীর ব্যক্তিস্বার্থ। আর এই ভালোবাসাহীনতার কষ্ট, সংসারে আত্মমর্যাদাহীন অবস্থানের যন্ত্রণা ভুলতেই স্ত্রী সংসার ছাড়তে চেয়েছে; নিজেকে শিক্ষাদীক্ষায় আত্মিক উন্নয়নে এমন শিখরে নিতে চেয়েছে, যেখানে পুরুষের অমর্যাদাকর প্রত্যক্ষণ কোনো ভূমিকাই রাখতে পারবে না। *এ ডলস হাউসে* এতদসংক্রান্ত সংলাপ নিম্নরূপ :

নোরা। আট বছর ধরে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলাম আমি– কারণ, আমি জানতাম যে অলৌকিক ঘটনা রোজ ঘটে না। তারপরে, এই বিপদটা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। [...] ক্রগসতাদের চিঠিটা যতক্ষণ ওই চিঠি-ফেলার বাক্সের মধ্যে পড়েনি ততক্ষণ আমি একমুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারিনি যে তার শর্তের কাছে তুমি মাথা নোয়াবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি তাকে বলবে : 'আমিই অপরাধী।' সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। [...]

হেলমার। নোরা, তোমার জন্যে দিনরাত আমি খুশী হয়ে কাজ করতে পারি – সহ্য করতে পারি দুঃখ আর দারিদ্র্য।

কিন্তু যাকে মানুষ ভালবাসে তার জন্যে সে নিজের সম্মানকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না।

নোরা। লাখো লাখো নারী সে কাজ করছে।

হেলমার। মূর্খ শিশুর মতো কথা বলছো তুমি। (পুতুলের সংসার : ৮৭) [১]

অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে এ অংশকে নিম্নরূপে রূপান্তরিত করে নিয়েছেন :

স্ত্রী। [...] আজ সন্ধ্যায় দেখলাম তুমি দেবতার স্থান থেকে নেমে এলে। [...] যখন দেখলাম তুমি আমার কথা রাখলে না।

তুমি একটা ভণ্ড প্রতারককে – যে আমার বিরুদ্ধে এতকিছু করেছে,
তাকে তুমি ব্যাংকের চাকরির জন্যে সুপারিশ করলে, চাকরিটা পাইয়ে দিলে !
সে আমার চেয়ে বড় হয়ে গেলো তোমার কাছে, কারণ আমি
তো ঘরের নারী !
আর সে, ব্যাংকে কাজ পেলে তোমার ব্যবসাবাণিজ্যে, ব্যাংক
থেকে ঋণ টিন পেতে,
সে তোমার সাহায্যে লাগবে।
যখন আমার ভালোবাসাকে পায়ের নিচে ফেলে তুমি তোমার
ব্যবসার স্বার্থটাকে বড় করে দেখলে, তখন আমার চোখ খুলে গেলো।
আমার চেয়ে ব্যবসাই তোমার বড়। ভালোবাসার চেয়ে
অর্থ–বিত্ত–সম্পদ !
তখনি আমি দেখতে পেলাম –

---

[১] হেনরিক ইবসেনের *এ ডলস হাউস* নাটকের যাবতীয় উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা হয়েছে সুনীল কুমার ঘোষ অনূদিত এবং সম্পাদিত *ইবসেন নাট্য-সম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*, সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৩ গ্রন্থ থেকে।

আমি যে মানুষটার সঙ্গে আটটা বছর ঘর করেছি, তাকে আমি একটুও চিনি না।

সে অজানা একটা মানুষ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৭)

তবে *অপেক্ষমাণ* নাটকের মূল সমস্যা কেবলই নোরা তথা নারীর অধিকার স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এ সমস্যাটি সর্বজনীন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমস্যা। নাট্যকার নাটকটির মাধ্যমে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, আধুনিক বিচ্ছিন্ন মানুষের উচিত – নিজের আমিত্ব বা অস্তিত্বকে প্রশ্ন করা, এবং মর্যাদারক্ষার লড়াইয়ে যাবতীয় সামাজিক পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে আত্মাকে মুক্ত করা।

অন্যদিকে, সৈয়দ শামসুল হক *ঈর্ষা* নাটকটি রচনা করেছন প্রচলিত নাট্যধারার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। তিনি এ নাটকে কোনো অঙ্ক বা দৃশ্যবিভাজনে না গিয়ে একই দৃশ্যে পুরো ঘটনাক্রিয়া সাজিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনো পারিবারিক, সামাজিক বা ব্যাক্তিগত কাহিনি প্রদর্শন নয় বরং মানব-মানবীর প্রেমজনিত ঈর্ষার রূপ উদ্ঘাটনই ছিল তাঁর মৌল উদ্দেশ্য। আর এ কারণেই তিনি তিনটি চরিত্রের সাতটি মাত্র সংলাপে পুরো নাট্যঘটনা সাজিয়েছেন।

এই তিনটি নাটকের অন্তঃসার সমীকৃত করে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটক। বস্তুত *অপেক্ষমাণ* নাটকের তিনটি চরিত্রই তিনটি আদর্শকে ধারণ করে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে। তিনটি চরিত্রই একাকিত্বকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। প্রৌঢ় চরিত্রটি ছাত্রীর মোহ কাটিয়ে, শরীরী প্রেম ভুলে প্রকৃতির মধ্যে শিল্পের শুদ্ধতা সন্ধানে উন্মুখ। নারী চরিত্রটি সংসারে, সমাজে নারীর আত্মমর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্যদিকে পুরুষ চরিত্রটি সমাজ থেকে মিথ্যের মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে নিপাট সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প।

অপেক্ষমাণ নাটকের প্রধান অবলম্বন প্রচলিত সমাজ। এখানে নাট্যকার যে তিনটি নাটকের সমন্বয়সাধন করেছেন, তাতে ইবসেন রচিত নাটক দুটির মূল বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও মানুষের পশ্চাৎপদ মানসিকতার বিরুদ্ধে ব্যক্তির দ্রোহ। অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হকের নাটক *ঈর্ষা* নারী-পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে হলেও তাতেও সমাজচিত্রের উপস্থাপনা রয়েছে। নাট্যকার সেখানে সমাজ ও দেশের বিপন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের মূল্যবোধ বদলে যাওয়ার বাস্তবচিত্র অংকন করেছেন। *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ হক নারী ও পুরুষ চরিত্রের মাধ্যমে ইবসেন বর্ণিত সময় ও সমাজকে নিজ দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে ঢেলে সাজিয়েছেন। ফলে *অপেক্ষমাণ* হয়ে উঠেছে সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক জীবনচিত্র।

প্রচলিত সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে সমাজের কাছে বলি দেয়। সামাজিক মানুষের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ায় সমাজের ভাবনা। লোকে কী বলবে, লোকে কী ভাববে এটিই যেন হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়; তার নিজস্ব পছন্দ, নিজস্ব আনন্দ বা সুখ-সুবিধার সেখানে কোনো মূল্য নেই। নাট্যকার সমাজের এই দিকটি *অপেক্ষমাণ* কাব্যনাটকে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্ত্রী যখন নিজের আত্মমর্যাদার প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে গৃহত্যাগী হতে চাইছে, তখন স্ত্রীকে জীবনভর হারাবার চিন্তা থেকে স্বামীর একমাত্র ভাবনা হয়ে উঠেছে তার স্ত্রীর এহেন কর্মকাণ্ডে লোকে কী ভাববে! ফলে সে স্ত্রীকে যুক্তি দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে নয়, সমাজ-নির্ধারিত কর্তব্যগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। যে সমাজে নারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানেই তাকে প্রতিমুহূর্তে মূর্খতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় :

স্বামী। সুস্থতা ? বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ? স্বামী ছেড়ে যাওয়া ? বাচ্চাদের
ফেলে যাওয়া ?
একবারও ভাবছো না– লোকে কী বলবে ?
স্ত্রী। লোকের কথা তুলো না। আমার কথা বলো। [...]
স্বামী। মূর্খ মেয়েমানুষ ! নিজের পবিত্র কর্তব্যের কথা ভুলে যাচ্ছো ?
[...] স্বামী, সন্তান – তোমার কোনো দায়িত্ব
কর্তব্য কিচ্ছুই কি নেই ?
স্ত্রী। পবিত্র – আরো অন্য দায়িত্বও তো থাকতে পারে। [...]
আমার নিজের প্রতি কর্তব্য– দায়িত্ব। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৪)

বস্তুত, স্ত্রী চরিত্রটি জেনে গেছে সমাজে মানুষ হয়ে বাঁচতে গেলে নারীকে প্রথম আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। সর্বক্ষেত্রে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে, এবং তা পুরুষের সাহায্য ছাড়াই। কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে হেয় করা, ছোট করে রাখাই যেখানে কাজ, সেখানে কেউ-ই চাইবে না একজন নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। আর এটা বুঝতে পেরে সে সংসার ছেড়েছে, এবং স্বামীর দেয়া কোনো কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি ; কেননা সে অর্থনৈতিক ভাবে পুরোপুরি স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে। যে কারণে স্বামী-কর্তৃক প্রতিমাসে অর্থপ্রেরণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে বলেছে :

এখন আমাকেই যোগ্য করে তুলতে হবে আমাকে।
আমাকেই নিতে হবে পাঠ।

সে পাঠ দেবার যোগ্যতা তোমার নেই।

আজ আমিই আমাকে পাঠ দেবো। [...]

আমাকে এখন থেকে একাই পথ চলতে হবে – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৩)

প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ একজন নারীর প্রতি বরাবরই বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে। শৈশব থেকেই নারী বুঝে যায়, প্রচলিত সমাজে পুরুষের সমতুল্য সে কিছুতেই নয়। অথচ নারীরও অধিকার রয়েছে এ সমাজে পূর্ণাঙ্গ মানুষের অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার। আর এ কারণে স্ত্রী চরিত্রটি চেয়েছে সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও বাঁধা-বন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে। স্বামী চরিত্রটি যখন সমাজ-নির্ধারিত বিধান এবং স্বামী-সন্তানের প্রতি তার দায়িত্বের কথা বলে তাকে গণ্ডিবদ্ধ করতে চেয়েছে, তখনই নারী চরিত্রটি প্রতিবাদ করে বলেছে :

ওসব বড় বড় কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই।

আমাকে মানুষের মতো বাঁচতে হবে,

যেমন তুমিও মানুষের মতোই বাঁচতে চাও।

আমাকে স্ত্রী নয়, মা নয়, মানুষ হয়ে উঠতে হবে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৪)

এরপর স্ত্রীকে গৃহপরিবেশে অবরুদ্ধ রাখার শেষ উপায় হিসেবে পুরুষ চরিত্রটি তাকে ধর্মীয় বিধি-বিধানের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী নারীচরিত্রটি তখন প্রচলিত ধর্মকেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে জানিয়েছে, ধর্ম তো আসলে পুরুষেরই রচনা, পুরুষেরই বর্ণনা; সেখানে নারীর মতামত, অধিকার পুরোপুরি উপেক্ষিত। ফলত নিজ কর্তব্য, নিজধর্ম সে নিজেই এখন বুঝে নিতে চায় :

ধর্ম তো এই – মোল্লারা যা বলে, পাদ্রীরা যা বোঝায়, যা ব্যাখ্যা করে !

এবার আমাকে নিজের মতো করে বুঝতে হবে।

জীবনের পাঠ নিয়ে দেখতে হবে সত্যটা আছে কোথায়।

আমাকে জানতেই হবে মোল্লারা যা বলে তার কতখানি সত্য,

আর কতটা মনগড়া।

বা, ওরা যা বলে তা আমার বেলায় খাটে কিনা ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৫)

বিদ্যমান সমাজে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মাপকাঠিও নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করেছে পুরুষ। ফলে সেখানে নারীর স্বার্থ বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। সংসারে তাই নারীর স্বাধীন জীবনমান-আকাঙ্ক্ষা পুরুষের কাছে

অনুচিত বলেই বিবেচিত হয়। বস্তুত, যে সমাজের বিধি-বিধান পুরুষ স্বীয় স্বার্থে তৈরি করেছে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কিংবা স্বাধীনচারী মনোবৃত্তি সেখানে অন্যায় ও অবান্তর। কিন্তু নারী আজ কেবল পুরুষের চোখে নয়, বরং নারীর চোখে সমাজকে দেখতে চাইছে :

নারীর কোনো নিজস্ব মত পথ নেই এ সমাজে।
একবার নারীর চোখ দিয়ে সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখো,
দেখে বোলো – তোমরা যে চোখে দ্যাখো, সে চোখেই কি নারী দ্যাখে –
কোনটা তার জন্যে ভালো আর কোনটা মন্দ ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৬)

শিরদাঁড়া রুজু করে দীপ্রভঙ্গিতে তাই সে উচ্চারণ করেছে :

স্ত্রী। শুনেছি কারো স্ত্রী যখন স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যায়, যেমন আমি যাচ্ছি,
সমাজ বলে, তখন স্বামী সব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়।
সমাজ পড়ে থাক, আজ আমিই তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে
যাচ্ছি।
আমাদের কারো কোনো দায় দায়িত্ব আর নেই কারো প্রতি।
দুজনেরই এখন পূর্ণ স্বাধীনতা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৮)

অপেক্ষমাণ নাটকে সৈয়দ শামসুল হক দেখিয়েছেন, ইবসেন রচিত নাটকের নোরার যাপিত জীবন ও সমাজব্যবস্থা এখন আর সেবকম নেই; সময়ের ব্যবধানে মানবভাবনায়ও অনেক পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু নারীসম্পর্কিত ভাবনার অনেক কিছুই এখনও বহাল রয়েছে। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী এখনও অসহায়। পুরুষের পক্ষে যে-কাজটি স্বাভাবিক, নারীর জন্য তা এখনও অশোভন ও অকল্পনীয়। আলোচ্য নাটকেও দেখা যায়, গভীর রাতে জনমানবশূন্য রেলস্টেশনে নারীকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রৌঢ় চরিত্রটি বিস্মিত হয়েছে; তার নিরাপত্তা ভাবিত হয়েছে, এবং সম্ভাব্য সামাজিক পীড়ন ও প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সতর্ক করে বলেছে :

প্রৌঢ়। একা নারী। দিনের বেলাতেই পথে ঘাটে তাকে কত সামলে
চলতে হয়।
আর রাতে ? পথে প্রান্তরে, শহরে বিরানে – নারীর জন্যে ওঁৎ
পেতে আছে ভয়।

আর সেই আপনি কিনা, দিনে নয়, রাতে, নিশুতি রাতে – একা ?
একা বেরিয়ে পড়লেন ? একেবারে একা ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২২)

নাটকের প্রারম্ভদৃশ্যেও নারীকে দেখে প্রৌঢ়ের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। প্রৌঢ় চরিত্রটি অবাক চোখে ভেবে নিয়েছে এ হয়তো মানবী নয়; দেহাতি বা অশরীরী কিছু। কেননা আবহমান সামাজিক বিধিব্যবস্থা তার মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে যে, একেলা নারীর পক্ষে রাতে বাইরে থাকা অশোভন ও অন্যায়। কিন্তু যখন সে নিশ্চিত হয় যে, এ একজন সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ; তখনই তার মাথায় আসে এ নারী হয়তো সমাজবঞ্চিতা, গৃহহীন, অসহায় ! ফলে প্রথমেই সে কৌতূহল ও সমবেদনা নিয়েই নারীটির সঙ্গে আলাপে মগ্ন হয়েছে। এসময়ে নারীকে উদ্দেশ্য করে প্রৌঢ়ের যে উক্তি তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে :

ভেবেছিলাম দেহাতি কেউ। [...]
আপনি যে পুরুষ নন, সেটাও চোখে পড়লো।
একটু অবাক হলাম। ভাবিনি আপনার মতো কেউ
এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। [...]
মানে, একা একজন মহিলা,
অন্ধকারে, নিশুতি রাতে, প্লাটফরমের বাইরে,
পুরুষ হয়ে কতক্ষণ চোখে দেখা যায় বলুন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৪)

অপেক্ষমাণ নাটকের নারী চরিত্র সামাজিক এই বিধিব্যবস্থা সম্যক অবগত। তাই তার খেদোক্তি :

নারী। নারী নেবে সিদ্ধান্ত ? নারীকে তো সিদ্ধান্ত দেয়া হবে !
আর নারী সেটা মেনে নেবে – বিনা প্রশ্নে, বিনা তর্কে ! তাই না ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৮)

ইবসেন-রচিত নাটকে নোরার সশব্দে দরোজা বন্ধ করে স্বামীগৃহ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি সেকালের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একান্তই বৈপ্লবিক। সংসারী নারী উপভৌগিক সমস্ত সুবিধা পেয়েও কেবল আত্মমর্যাদার প্রশ্নে এতটা দ্রোহী হতে পারে, সেটি ছিল সেকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অকল্পনীয়। বলাবাহুল্য, এরকম একটি নাটক লেখার জন্য হেনরিক ইবসেনকে কট্টরপন্থীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। আত্মমর্যাদাবোধে তাড়িত হয়ে নোরাই যে গৃহত্যাগের মতো দুঃসাহসী ভূমিকার মাধ্যমে সমাজে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ রেখেছিল, সেটি সৈয়দ শামসুল হক মনেপ্রাণে বিশ্বাস

করতেন। তবে তিনি এও জানতেন এই ঘুণেধরা প্রাচীন প্রথার পরিবর্তন কোনো একক প্রয়াসে সম্ভবপর নয়। তবু নোরার এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ়ের মুখের সংলাপে নাট্যকারের এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রৌঢ় এবং নারী চরিত্রের প্রাসঙ্গিক কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে :

প্রৌঢ় । আপনার ওই দরোজাটা !

নারী। দরোজা !

প্রৌঢ়। মানে – দরোজা বন্ধ করবার শব্দটা! [...]

নারী। দরোজাটা ভেঙেই ফেলেছি কিনা ?

প্রৌঢ়। না, না। ভাঙা অত সহজ নয়।

এ তো আর আজকের দিনের হালকা পল্কা দরোজা নয়।

ওক কাঠের দরোজা, ঊনবিংশ শতাব্দীর। কঠিন !

নারী। সমাজটার মতোই!

প্রৌঢ়। ঠিক বলেছেন। কঠিন ছিলো সমাজ। [...]

কিন্তু এখন আর তেমনটা নেই।

ভাঙতে শুরু করেছে। বদলাতে শুরু করেছে। বদলাচ্ছে। [...]

আপনার বেরিয়ে যাওয়া থেকেই শুরু হয় নতুন পথে চলা। [...]

আপনার ওই বেরিয়ে আসাটা ছিলো বৈপ্লবিক।

দরোজা খুলে দড়াম করে বন্ধ করাটা ছিলো একটা প্রতীক। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২১)

সৈয়দ শামসুল হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে ইবসেনের অনুগামী হয়ে নারীর প্রতি বিরূপ সমাজব্যবস্থার চিত্র যেমন উপস্থাপন করেছেন, তেমনিভাবে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই স্বদেশ ও স্বসমাজের কপটচারী স্বভাবের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। যেমন, প্রৌঢ়চরিত্রের একটি সংলাপের মাধ্যমে এদেশে রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশার কথা প্রকাশিত হয়েছে নিম্নরূপে :

ছোট্ট ইস্টিশান। মেল গাড়িগুলো দাঁড়ায় না।

লোকাল কখন আসবে ঠিক নেই।

আজকাল টাইম টেবলের যা অবস্থা।

স্টেশন মাস্টার বললেন, ঘন্টা দেড় দুই দেরী হবে।

তিনি কোয়ার্টারে চলে গেলেন।

তার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট মাস্টার, কুলি, কেরানী সবাই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৫)

আবার, প্রৌঢ়চরিত্রটি নারীটির কাছে নিজের পরিচয় যখন তুলে ধরেছেন, তখন বাঙালিজাতির বাগাড়ম্বরতা ও মাতৃভাষার তুলনায় ইংরেজি ভাষাপ্রীতির হঠকারী মনোবৃত্তিও প্রকাশিত হয়েছে :

হ্যাঁ, আপনাকে বলা হয়নি। আমি ছবি আঁকি।
ছবি আঁকি বললে যেন হালকা শোনায়।
চিত্রকর বললে – ওরে বাবা! ভারী ভারিক্কি।
ইংরেজিটা বাংলায় খুব চলে।
আমরা নিজেরাও আক্‌সার ব্যবহার করি। পেইন্টার ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৬)

অন্যদিকে, হেনরিক ইবসেনের *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকটি পুরোপুরি সামাজিক নাটক। সৈয়দ শামসুল হক এ নাটকের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বাঙালি সমাজের অদ্ভুত মিল প্রত্যক্ষ করেছেন। যে কারণে তিনি যখন ইবসেন থেকে ভাষান্তর করে *অপেক্ষমাণ* নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন একবারের জন্যও মনে হয়নি যে, এটি ভিনদেশি কোনো নাট্যকারের রচিত শতবর্ষ অতীতের ঘটনা; বরং দর্শক এ কাহিনির সঙ্গে এতটাই আত্মিক টান অনুভব করেন, যেন মনে হয় – এ তো এদেশেরই ঘরের গল্প; এ যে বাংলাদেশের অস্থির ও মেরুদণ্ডহীন, সুবিধাবাদী রাজনীতির প্রতিচিত্র। ইবসেনের নাটকে ঝরনা প্রকল্প নষ্ট হয়েছে ট্যানারির বর্জ্য দূষণে; স্বীয়স্বার্থে ও ক্ষমতার দম্ভে যেটিকে আড়াল করতে চেয়েছেন নগরের মেয়র পিটার। এর সঙ্গে রাজধানী ঢাকার হাজারিবাগের ট্যানারি শিল্প আর বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণচিত্র অনায়াসেই মেলানো যায়। এদেশের অধিকাংশ সরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও এরকম দুর্নীতিতে আমূল আবদ্ধ। ঢাকার ওয়াসা (Water Suply And Sewarage Authority) ও নগর ভবনও (City corporetion) জনগণকে বিভ্রান্তমূলক তথ্য দিয়ে নিজেদের অপকর্মের পক্ষে নির্লজ্জ সাফাই গায়। ফলে ইবসেনের এ কাহিনি যেন বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনের কাহিনি।

রক্ষণশীল পশ্চাৎপদ সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা প্রথাবিরোধী ও ভিন্নমত একেবারেই গ্রহণ করতে পারে না; হোক তা যতই অমূলক, অবৈজ্ঞানিক, যুক্তিহীন ক্ষতিকারক বিষয়, তবু জোটবদ্ধভাবে সেটাতেই পরে থাকা এদের বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, রক্ষণশীল এই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে গুটিকয়েক স্বার্থপর শক্তিধর মানুষ; এরা নিজেদের স্বার্থেই জনগণকে অন্ধ করে রাখে; নিজেদের প্রয়োজনেই জনগণের

সংখ্যগরিষ্ঠতার সুবিধা ব্যবহার করে। এরা বাইরে শক্তির আধার হলেও অন্তরে এতটা হীনমন্যতায় ভোগে যে, সমাজের ভেতর থেকে হঠাৎ হঠাৎ কেউ জেগে উঠে যদি নির্মম সত্যিটা প্রকাশ করে দেয়, তবে তাকে সর্বদিক দিয়ে হেনস্তা করে বিপর্যস্ত করে দেয়াই এদের স্বভাব। কেননা একবার এসকল সত্যান্বেষী মানুষদ্বারা জনগণ প্রভাবিত হলে, এসব সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেসী মানুষের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। *অপেক্ষমাণ* নাটকে পৌরপিতার চরিত্রের মাধ্যমে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে। ডাক্তার যখন নদীদূষণের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে, পৌরপিতা নিজের দোষ আড়াল করে জনমনে ডাক্তার সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে বলেছে :

> পৌরপিতা। আমি একটা ভিতরের কথা বলি। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে –
> এই ডাক্তার – একটা বাজে হুজ্জত তুলে – এই আমার ভাই –
> আপনাদের মন খুশি করা কিছু কথা বলে –
> আগামী নির্বাচনে – শহরের পৌরপিতা হতে চায় – আপনাদের ভোটে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৬)

পৌরপিতার এই কূটকৌশলী ও দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিয়ে নির্ভীক ডাক্তার তার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে বলেছেন :

> ডাক্তার। ইতিহাস আরো একবার দেখছে,
> কয়েকজন মুনাফাখোর লুটেরা সত্যকে কীভাবে বিকৃত করছে।
> সত্যবাদীকে কীভাবে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে।
> আর, বিত্ত আর সম্পদ আর ক্ষমতার লোভে
> কীভাবে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে দলে টানা হয়েছে। ধিক। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৬)

বস্তুত, সমাজে এমন কিছু দৃঢ়চেতা মানুষ থাকেন যারা জীবনের সবটুকু দিয়ে সত্যের জন্যে লড়াই করে যান। সৈয়দ শামসুল হকের *অপেক্ষমাণ* নাটকের পুরুষ চরিত্রটি এমনই একজন নির্ভীক ও সত্যান্বেষী মানুষ। একটি নির্ভেজাল সত্যকে উন্মোচনের তাগিদ থেকে তিনি নিজ এলাকার জনগণ, সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, সকলের সঙ্গে লড়াই করে বেরিয়ে এসেছেন সত্য উন্মোচনে। নাট্যকার ডাক্তার চরিত্রটির সমাজহিতৈষী মানসিকতা উপস্থাপন করেছেন নিম্নরূপে :

> আমি প্রাইভেট প্রাকটিসে যাইনি, আমি সামান্য বেতনে চাকরি
> নিয়েছি পৌরসভার –

যেন আপনাদের পাশে রোগেশোকে দাঁড়াতে পারি। [...]

ডাক্তারের কাজ শুধু রোগের চিকিৎসা করা নয়,

ডাক্তারের প্রথম কাজ – আমার বিবেচনায় – রোগের কারণ নির্মূল করা।

জনজীবনের নীরোগ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৯)

স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদেরা নিজেদের স্বার্থে জনতাকে ব্যবহার করে। মুখে মুখে জনতাকে নিয়ে বড় বুলি আওড়ায়। কিন্তু নজর থাকে আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার দিকে । কিন্তু রাজনীতিবিদদের এই কূটচাল ডাক্তার জনসম্মুখে প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন – জনতা পুতুলমাত্র। কেননা সত্যমিথ্যা যাচাই করার সক্ষমতা জনতার সবসময় থাকে না। ফলে সব ক্ষমতা থেকে যায় রাজনীতিবিদের হাতেই। ডাক্তার এবং পৌরপিতার সংলাপে সমাজ ও রাজনীতির এই গতিচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নরূপে :

পৌরপিতা। তোমার উদ্দেশ্যটা কী বলো তো ? আমাদের অপমান করা ?
আমরা জনতার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি ?
জনতাই হচ্ছে আসল শক্তি – শক্তির উৎসই হচ্ছে জনতা।

ডাক্তার। এর চেয়ে বড় মিথ্যে আর কিছু নেই। দড়ি তোমাদের হাতে।
জনতা পুতুল – তোমরা নাচাচ্ছো। যেমন নাচাও, তেমনি নাচে !
শক্তি তাদেরই হাতে যারা সত্যমিথ্যা বিচার করতে পারে,
ভালোমন্দ স্পষ্ট করে নির্ণয় করবার ক্ষমতা রাখে।
আর, ভালোমন্দ বা সত্যমিথ্যা নির্ণয় করবার জন্যে চাই তথ্য –
পর্যাপ্ত শুধু নয়, সকল তথ্য, সব তথ্য,
আর সেই তথ্য বিশ্লেষণ করবার মতো মেধা।
জনতা তো একটা ধারণা মাত্র –
জনতার ভেতরে একটি একটি করে মানুষ।
সেই একটি একটি মানুষের সবারই কি আছে একই মাপের মেধা ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩১)

কিন্তু ডাক্তারের এ সংলাপের পরেও শোনা গেছে পৌরপিতার দাম্ভিক স্বৈরতান্ত্রিক স্বর :

পৌরপিতা। আমাদের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ করছেন উনি !
এতবড় অভিযোগ এনে তুমি পার পাবে না।

এ শহরে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩২)

রাজনীতিবিদের এই অপকৌশল সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হক আমাদের সোচ্চার করেছেন নারী চরিত্রটির মাধ্যমে উচ্চারিত অপর একটি সংলাপে :

মিথ্যাচারের কথা বলুন।
তিক্ত সত্যকে মিথ্যার মিষ্টি মোড়কে গেলবার কথাও বলুন। [...]
মিথ্যা গিলিয়ে জনসাধারণকে মৌতাতে ফেলে
সমাজকর্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা !
আপনি তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩৪)

আবার, আলোচ্য নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রটির উক্তির মাধ্যমে ইবসেনের দুটি নাটকের সামাজিক বাস্তবতার মূলসার উঠে এসেছে নিম্নরূপে :

প্রৌঢ় । আপনি সংসারে নারী অবস্থান –
আসল তার রূপ – কোটি কোটি সংসারে –
সারা পৃথিবীতে, প্রতিটি সমাজে –
আপনার ব্যাক্তিগত জীবন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে –
সব নারীর হয়ে – উপলব্ধি করেছেন। [...]
আর আপনি – আপনি তো
একটা শহরের পরিস্থিতির ভেতরে উপলব্ধি করেছেন –
ক্ষমতা আর সম্পদের লোভে গুটিকয় মানুষ – ওপরতলার কিছু মানুষ –
কীভাবে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে –
তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েও –
কীভাবে ক্ষমতাধরেরা তাদের আসন পাকা করে –
সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩৬)

ঈর্ষা নাটকের প্রৌঢ় যখন মনে করেছে অপর দুই চরিত্রের সমাজঘনিষ্ঠ কাহিনির ভেতরে তারও কাহিনি নিছকই ব্যক্তিগত, তখন পুরুষ চরিত্রটি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে – ব্যক্তিও সমাজের অংশ। তাই তার জীবনবাস্তবতাও প্রকারান্তরে সামাজিক বাস্তবতা।

পুরুষ। কে বলে মূল্য নেই! ব্যক্তি ব্যক্তি ব্যক্তি নিয়েই তো সমাজ।

বিন্দু বিন্দু পানি নিয়েই তো সাগর ! একটি একটি ফুল নিয়েই উদ্যান! [...]

জীবনের প্রতারণা যদি শিল্পে ছায়া ফেলে –

শিল্প তো সমস্ত মানুষ – গোটা একটা সমাজ –

মানুষ আর সমাজের জন্যেই;

শিল্পে প্রতারণা থাকলে সমাজটাকেই তো প্রতারণা করা হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩৭)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে ইবসেনের পথে হেঁটেই সমাজের যাবতীয় অসঙ্গতি, অন্যায়, অনাচার তুলে ধরেছেন। হেনরিক ইবসেন তাঁর বাস্তববাদী ধারার নাটকের মাধ্যমে যেমন সমাজের সকল প্রকার অন্ধ সংস্কার, যাজকশ্রেণির অন্যায় আচরণ ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছিলেন; নারীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, মালিকশ্রেণির শোষণ ও নিষ্পেষণ থেকে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে জনগণের শুভচেতনা জাগ্রত করে সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন একটি সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৈয়দ শামসুল হকের রাজনীতি-আশ্রিত নাটক

সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন লেখক ছিলেন। তিনি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ আমৃত্যু একরৈখিক ছিল এবং মতপ্রকাশে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ ও নির্ভীক। সৈয়দ হক বাংলাদেশের সূচনালগ্ন থেকে স্বাধীনতার পক্ষে, প্রগতির পক্ষে কলম ধরেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল – বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছিল অপরিসীম দরদ। এমনকি পঁচাত্তরোত্তর সামরিক-শাসিত অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এ সমর্থন অব্যাহত রেখেছিলেন। বিশেষত, পনেরো আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হবার ঘটনা তাঁর মনে এতটাই দাগ কেটেছিল যে – তিনি প্রায় তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যনাটকেই গভীর মমত্বের সঙ্গে এ প্রসঙ্গটির উত্থাপন করেছেন। তিনি একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সঙ্গে যুক্ত থেকে এদেশের বুকে চেপে থাকা মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যেমন প্রত্যক্ষ লড়াই করেছেন, তেমনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমেও পরোক্ষ যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। সৈয়দ হক বাংলাদেশের সমকালীন

রাজনীতি-প্রসঙ্গকে প্রধান অবলম্বন করে তিনটি নাটক রচনা করেছেন। এগুলো হলো – *গণনায়ক, মরা ময়ূর* এবং *উত্তরবংশ*। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

গণনায়ক

সৈয়দ শামসুল হক বিশ্বাস করতেন 'ঈশ্বরের পরেই সর্বাধিক স্মরণীয় মানুষ সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার শেকসপীয়র।'[১] শেকস্পিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) সৃষ্ট *জুলিয়াস সিজার* (১৫৯৯) নাটকের সেই মানুষকে নবরূপে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর *গণনায়ক* (১৯৭৬) নাটকে।[২] এ কারণে এ নাটকটিকে তিনি সরাসরি অনুবাদ নাটক বলতে নারাজ, এমনকি রূপান্তরিত নাটকও নয়। তাঁর ভাষায় এ নাটকটি একটি রাজনৈতিক পরীক্ষামূলক নাটক; যে রাজনীতি আদি ও মৌল; এবং যা বিশ্বের নানাপ্রান্তে নানাদেশে নানাযুগে বহুবার সংঘটিত হয়েছে।

গণনায়ক নাটকের প্লট পুরোটাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে ঘিরে। সৈয়দ হক দেখিয়েছেন – হত্যা যেখানে ব্যক্তিবিশেষের জন্য পাপ, সমষ্টির কল্যাণে গোষ্ঠীবদ্ধ হত্যাকাণ্ড সেখানে বিপ্লবের নামান্তর। নাট্যকারের মতে, দেশ ও জাতির ত্রাণকর্তা যিনি, তিনিও দেশকে ভালবেসে জনগণের জন্য সিদ্ধান্ত নেন, আবার তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় বসার স্বপ্ন দেখে, তারাও জনগণের কাছে দেশপ্রেমের নামেই গুপ্ত হত্যাকে বৈধ করে তোলে। তবে দেশপ্রেম কি মানুষভেদে পৃথক? এই প্রশ্নে উদ্বেলিত নাট্যসত্তাই নাট্যকারকে *গণনায়ক* কাব্যনাটক রচনায় প্রভাবিত করেছে। লেখক যাকে বলেছেন পূর্ববর্তী কবির মানসলোকের সঙ্গে একীভূত হয়ে বিষয়গুলো নতুন করে ভাবা। *গণনায়ক* নাটক লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নাট্যকার নাটকটির 'সবিনয় নিবেদন' অংশে মন্তব্য করেছেন নিম্নরূপ :

> *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* কাব্যনাট্যটি লিখে ফেলবার পর *গণনায়ক* লেখা আমার পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই রচনাগুলোতে রাজনৈতিক কিছু অভিজ্ঞতাকে আমি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছি। [...] রাজনীতির লক্ষ্য কি জীবনের লক্ষ্য থেকে ভিন্ন? ন্যায়-অন্যায়বোধ কি ব্যক্তিগত পর্যায়ে একরকম, সমষ্টিগত পর্যায়ে

---

[১] দ্রষ্টব্য : রামেন্দ মজুমদার, সবিনয় নিবেদন, *হ্যামলেট*, 'থিয়েটার' , ৪৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৭

[২] 'শেকসপিয়রের নাটক অনুবাদে সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি নিজে একজন বড় কবি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই উপমহাদেশের প্রবাদ-প্রতিম অভিনেতা, নির্দেশক ও নাট্যকার উৎপল দত্ত মনে করতেন, সৈয়দ শামসুল হকের শেকসপিয়ারের সমতুল্য অনুবাদ পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে বিরল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শব্দের দ্যোতনা একীভূত করে ফেলতে পারে কেবল অনন্য একজন প্রতিভাবান লেখক, নাট্যকার ও কবি। হক ভাই ছিলেন তা-ই।'(দ্রষ্টব্য : আতাউর রহমান, 'সাহিত্য-সৃজনে অনন্য পুরুষ সৈয়দ শামসুল হক', 'কালিকলম' (অনলাইন সংস্করণ), ১৮ মে, ২০১৫)

অন্যরকম? এবং সেটাই কি পতনের সূত্র? দেশপ্রেম কি পাত্রভেদে পরস্পরবিরোধী? [...] এমন আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়েই, প্রায় কুড়ি বছর পরে, নতুন করে আবিষ্কার করি উইলিয়াম শেকসপিয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকটি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য করবেন, অনুবাদ আমি করিনি, রূপান্তরিত রচনাও একে বলা যাবে না; আমি বরং বহুপূর্বে গত এক অগ্রজের সঙ্গে বসে সচেতনভাবে নতুন একটি রচনায় হাত দিয়েছি। শেকসপিয়র রচিত কিছু চরিত্র, কিছু দৃশ্য বর্জন করেছি, আবার নতুন কিছু অংশ রচনা করেছি, কিছু চরিত্রে নতুন লক্ষণ ও পরিণতি দিয়েছি; এবং সবই করেছি আমার অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্তগুলো স্থাপিত করবার জন্যে। আমার বিশ্বাস বহু দেশে বহু ভাষায় আজ এ পালা রচিত হতে পারত এবং তা এভাবেই।[১]

গণনায়ক নাটকের পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড় ঐক্যে সম্পর্কিত। সৈয়দ হক যখন এ নাটক রচনা শুরু করেন, তখনো এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ঘটনা – পঁচাত্তরের কালরাত নেমে আসেনি; তখনো জাতির জনক এদেশের আলো-হাওয়ায় প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, সব চূড়ান্ত ঘটনার একটি আবহকাল থাকে, থাকে পূর্বসংকেত, পূর্বাভাস। হয়তো বিদ্যমান অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা, থমথমে পরিবেশের কারণে নাট্যকারের সংবেদনশীল হৃদয় তেমন কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল। রোমের রাজনৈতিক ইতিহাসের যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে উপজীব্য করে নাটক রচনায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; তাঁর নিজবাসভূমে, নিজ জাতির মধ্যেই ততক্ষণে ঘটে গেছে সেই নির্মমতম ঘটনা। রোমান মহানায়ক জুলিয়াস সিজারকে ঈর্ষাবশত, ক্ষমতার মোহে নির্মমভাবে ছুরিকাঘাতে সিনেটসভা প্রাঙ্গণে হত্যা করে কিছু ব্রিদ্রোহী সিনেটর। ঠিক তেমনিভাবে বঙ্গবন্ধুও কিছু বিপথগামী বিদ্রোহী সেনা ও বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিকের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সপরিবারে নিজবাসভবনে নির্মম মৃত্যুবরণ করেন। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় অর্ধশত বছর আগে ইতালিতে ঘটে যাওয়া এক করুণ আখ্যান, পুনরায় মঞ্চায়িত হয় খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড়-দুইহাজার বছর পরে দক্ষিণ এশিয়ার এক ঘনবসতিপূর্ণ ক্ষুদ্র দেশে। এভাবেই ঘটে যায় রাজনৈতিক ইতিহাসের পুনারাবৃত্তি।

নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন ১৩ জুন ১৯৭৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ কালপর্বে । এসময় তিনি বিবিসি বাংলায় চাকুরিসূত্রে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড শহরে বাস করতেন। উল্লেখ্য যে, তিনি তাঁর প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর রচনাকাল হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন – ১লা মে ১৯৭৫ থেকে ১৩ জুন ১৯৭৫ সাল। অর্থাৎ যেদিন তিনি *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটক লেখা শেষ করেন, ঠিক সেদিনই তিনি

[১] সৈয়দ শামসুল হক সম্পাদিত *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২২৯

গণনায়ক নাটক রচনায় হাত দেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় – *জুলিয়াস সিজার* নাটকের অনুবাদ করার কথা তিনি অনেক আগে থেকেই হয়তো ভেবে রেখেছিলেন। হতে পারে, নাটকের কিছু ঘটনাংশ তাঁর মাথার ভেতর আগে থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু নাটকটি রূপান্তর শুরুর অনতিকাল পরেই এদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনা ঘটে; লেখকের চেতনায় তখন অদ্ভুত এক বোধ কাজ করে । দুই কালের দুই দেশের ঘটনার এমন আশ্চর্য সাযুজ্য লক্ষ্য করে তিনি নাটকটি নতুন করে ঢেলে সাজান। *গণনায়ক* নাটকে বঙ্গবন্ধুর ট্রাজিক ইতিহাসের ছায়া প্রসঙ্গে নাট্যগবেষক জিয়া হায়দার নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অনুপ্রেরণায় লিখিত এ নাটকে জুলিয়াস সিজার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটা সাদৃশ্য অঙ্কন করা হয়। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং কাব্যময়তার সুতায় গাঁথা হয়েছে শেখ মুজিবের করুণ পরিণতি এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা প্ররোচিত তার হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যাবলী।[১]

বঙ্গবন্ধুর করুণ মৃত্যুর পর তিনি হয়তো কালোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে শেকস্পিয়রের কিছু চরিত্রকে নবরূপে রূপায়িত করেন; কিছু চরিত্রের পরিণতি এদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যরকম করে নির্ধারণ করেন। যে কারণে দেখা যায় – নাট্যকার নাটকটির শুরুর দিকে শেকস্পিয়রের মূল নাটকের অনুরূপ ঘটনাপরম্পরা এবং চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেও শেষের দিকের কিছু অংশ নতুন করে বিন্যাস করেছেন। যেমন : শেকস্পিয়রের মূল নাটকে জুলিয়াস সিজারকে হত্যার পরের ঘটনা খুব সামান্যই বর্ণনা করেছেন নাট্যকার; সেখানে খুব দ্রুততার সঙ্গে প্রতিশোধের ঘটনা, জনগণের বিপ্লব, ব্রুটাস, ক্যাসিয়াসের হত্যা, এন্টনিওর সহায়তায় সিজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টাভিয়াসের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসার ইতিবৃত্ত উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু *গণনায়ক* নাটকে নাট্যকার তাঁর দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন কিছু দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এসব দৃশ্যে ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে ক্ষমতাদখলের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে দেশের সামরিক বাহিনীর সরাসরি সংযোগের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এভাবেই নাটকটি অনুবাদের খোলস পরিত্যাগ করে হয়ে উঠেছে এদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের করুণ ইতিহাসের অমোঘ দলিল; মর্যাদা পেয়েছে লেখকের পরিপূর্ণ মৌলিক কাব্যনাটকের। আবার, *জুলিয়াস সিজার* অনুবাদকালে অনুবাদকের মাথায় যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি ছিল, একথা অনুবাদক নিজেই তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন :

---

[১] জিয়া হায়দার, 'বাংলাদেশের সমকালীন নাটক', *সমকালীন বাংলা সাহিত্য*, খান সারওয়ার মুরশিদ (সম্পা.), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৮৭

প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের বিচারে সীজার-বধ-নাটক বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের এক পৌনঃপুনিক ঘটনাবর্তের অংশ মাত্র। [...] ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। [...] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ক্ষমতায় আসীন থাকা কালে নিহত হন। স্বভাবতই 'জুলিয়াস সীজার'-এর প্রসঙ্গ আমার স্মরণে এসেছিল এবং সেটাই আমার অনুবাদ-কর্মের প্রেরণা।[১]

শেকস্‌পিয়র রোমান সাম্রাজ্যের অবিসংবাদিত নেতা জুলিয়াস সিজারের[২] করুণমৃত্যু এবং তৎপরবর্তী রোম সাম্রাজ্যের সংকট ও উত্তরণের ঐতিহাসিক সত্যঘটনাকে অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন বিশ্বখ্যাত ট্রাজিক নাটক *জুলিয়াস সিজার*। আর বিংশ্ব শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে পূর্বতন লেখকের অনুভূতিকে নিজ দেশ-কাল-রাজনীতির ছাঁচে ফেলে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন তাঁর সাথর্ক রাজনৈতিক-কাব্যনাটক *গণনায়ক*। গল্পের পরিণতির নতুনত্বে, ভাষার আভিজাত্যে, নান্দনিক অলঙ্করণের মাধুর্যে সৈয়দ শামসুল হকের এ নাটকটি কালোত্তীর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে; হয়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাসগ্রন্থ। বলাবাহুল্য,

---

[১] ড. মফিজ চৌধুরী, 'নেপথ্য ভাবনা', *উইলিয়াম শেকস্‌পীয়রের জুলিয়াস সীজার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৫

[২] ইতিহাসের বিখ্যাত সমর-নায়ক জুলিয়াস সিজার খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দে রোম শহরের অদূরে অবস্থিত অ্যালবা লংলা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গ্যাইয়াস জুলিয়াস সিজার; যিনি প্রাচীন রোমের একজন সিনেটর ছিলেন। জুলিয়াস সিজারের মা অউরেলিয়া কোট্টাও একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী ছিলেন। সিজার মাত্র ষোলো বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। এর মধ্যে তাঁকে একবার রাজনীতির কারণে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। কিন্তু ২২ বছর বয়সে তৎকালীন রোম-শাসকের মুত্যুর পর দেশে ফিরে আইন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এসময়ে তাঁর পরিপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনও শুরু হয়। দেশের উচ্চতর সামরিক পদ, বিচারকের পদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্করণ করেন; এবং বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে একে একে পার্শ্ববর্তী দেশ জয় করতে নেমে পড়েন। রোমের নতুন শাসক পম্পেইর সঙ্গে শুরুতে তাঁর সুসম্পর্ক থাকলেও ক্রমশ এ সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। একটা পর্যায়ে পম্পেইকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই রোমান সাম্রজ্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জন করেন। সিজার ছিলেন বীর চরিত্রের অধিকারী, অসীম সাহসী। তিনি বিভিন্ন দেশ জয় করে রোম সাম্রাজ্যের পরিধি যেমন বাড়িয়েছেন তেমনি দেশের অভ্যন্তরে নানান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে দরিদ্রদের ভূমি পুনর্বন্টন, পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি, ট্যাক্স সিস্টেম তুলে দেয়াসহ অনেক কিছুই। সিজার ধীরে ধীরে এতটাই জনপ্রিয় নেতা হয়ে পড়ছিলেন যে, একটা সময় অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সিনেটরদের মতামত না নিয়েই একা গ্রহণ করে ফেলতেন। ফলত, পম্পিভক্ত সিনেটরদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। যে কারণে তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ অব্দে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এই হত্যাকাণ্ডে তাঁর বিশ্বস্ত সিনেটরবন্ধু গেইয়াস ক্যাসিয়াস লঙ্গিনাস ও মার্কাস জুনিয়াস ব্রুটাসের নেতৃত্বে প্রায় ৬০ জন সিনেটর জড়িত ছিল। সিজারকে হত্যার পর ষড়যন্ত্রকারীরা হতবিহবল হয়ে বুঝতে পারছিল না এরপর করণীয় কী! কেননা, সিজার শাসক হিসেবে রোমান মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। যে কারণে হত্যার পর প্রায় তিনঘন্টার মতো সিজারের লাশ ঘটনাস্থলে পড়েছিল। অতঃপর সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা লাশ সরিয়ে নেন। সিজারের হত্যার পর রোমান রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সিজারের উত্তরসূরি ভাইপো অক্টাভিয়াসের সঙ্গে ব্রুটাস-কেসিয়াসের তুমূল যুদ্ধ হয়। অবশেষে সিজারের সেনাপতি এন্টনিওর সহায়তায় অক্টাভিয়াস যুদ্ধ জয়লাভ করে রোমান সাম্রাজ্যের নতুন শাসক হন। (সূত্র : আন্দালিব আয়ান, *দেশ রূপান্তর*, ঢাকা, (অনলাইন সংস্করণ), জুলাই ২৩, ২০১৯)

‘একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন একটি রচনা কাব্যে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য মনে হলেও সৈয়দ হক তাঁর লেখনী শক্তি দিয়ে সফলকাম হয়েছেন।’[১]

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *গণনায়ক* নাটকটি রচনার মাধ্যমে অনুবাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করতে চেয়েছেন তা নয়; বরং এর মাধ্যমে সমকালের অস্থির সমাজ ও বিপর্যস্ত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দেশের ক্ষমতার পালাবদলের বাস্তবিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন। এটি সহজেই অনুমিত হয়, যখন দেখা যায়, পঁচাত্তরপূর্ব ও পঁচাত্তরপরবর্তী কালের বেশকিছু সত্য ইতিহাস তিনি শিল্পিত রূপাবয়বে আলোচ্য নাটকে উপস্থাপন করেছেন।

উইলিয়াম শেকস্‌পিয়র রচিত নাটকে জুলিয়াস সিজারকে যেমন তাঁর স্ত্রী স্বপ্নসূত্রে প্রাপ্ত আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, এমনকি দৈবজ্ঞ চরিত্রটি মার্চের ১৫ তারিখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে সতর্ক করতে চেয়েছিল; বাস্তবে বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধুকেও ১৫ আগস্ট-পূর্ববর্তী সময়ে নানান সূত্র থেকে বারবার সতর্ক করা হচ্ছিল, কিন্তু তিনি এতটাই বিশ্বাস করতেন এদেশের জনগণকে যে, কখনোই মনে করেননি, তাঁরই স্বজাতি, বাঙালিরা তাঁকে হত্যা করতে পারে। বরং তিনি আত্মবিশ্বাসে ভর করে এমন সম্ভাবনা হেসে উড়িয়ে দিতেন। তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দিন আহমেদের এক লেখায় এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় :

> ১৫ আগস্টের দুই সপ্তাহ আগে আমি সুইডেনের গণমাধ্যমের কিছু কাটা অংশ (ক্লিপিংস) নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এতে ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেতরে অসন্তোষ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন এবং সেনা কর্মকর্তাদের অভ্যুত্থান পরিকল্পনার বার্তা। এই বার্তার গুরুত্ব খারিজ করে দিয়ে তিনি আমাকে জানান, সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে ফোন করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বলবেন।[২]

সৈয়দ শামসুল হক এ বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে। এখানে দেখা গেছে বরিশালের সংসদ সদস্য নরেন্দ্রনাথ পঞ্জিকার সূত্রধরে তাঁকে সাবধান করে দিচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ওসমান তাঁকে গুরুত্ব না দিয়ে পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রাসঙ্গিক এলাকা উপস্থাপন করা যেতে পারে :

> নরেন্দ্র। রাষ্ট্রপতি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি। গণনায়ক। [...]

---

[১] স. ম. শামসুল আলম, ‘কাব্যনাট্য কারিগর সৈয়দ শামসুল হক’, ‘দৈনিক জনকণ্ঠ’, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭

[২] ফখরুদ্দিন আহমেদ, ‘১৫ আগস্টের ট্র্যাজেডি ও তাণ্ডব এবং তারপর’, *ফিরে দেখা ১৫ আগস্ট*, আহমেদ ফিরোজ (সম্পা.), কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৮

গতকাল বাড়ি থেকে বেরুবো, স্টিমারে ওঠার আগে
পঞ্জিকা দেখতে হলো। দেখলাম,
অঘ্রানের কৃষ্ণা দশমী, মাসদগ্ধা, আগামীকাল। [...]
সর্বপ্রকার শুভকর্ম নিষিদ্ধ, শাস্ত্রে তাই বলে।

ওসমান। পাগল একটা । চলো যাই। এগিয়ে যাই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৩৬-২৩৭)

উইলিয়াম শেকস্‌পিয়র তাঁর নাটকে সিজারহত্যা-পরবর্তী সময়ে এন্টনিও ও অক্টাভিয়াস কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধ ঘোষণার চিত্র এঁকেছেন। সৈয়দ শামসুল হক এক্ষেত্রে শেকস্‌পিয়রকে অনুসরণ করেননি। তিনি *গণনায়কে* বঙ্গবন্ধুহত্যা-পরবর্তীকালের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। এরকম একটি দৃশ্য দেখা যায় রশীদ আলী ও জেনারেল চৌধুরীর তৎপরতাসূত্রে। এখানে প্রাথমিক বিচারে মনে হতে পারে তারা উভয়েই একই দলভূক্ত; উভয়ের উদ্দেশ্যই ওসমানের হত্যাকারীদের বিনাশ করে দেশকে কলঙ্কমুক্ত করা। কিন্তু দেখ গেছে রশীদ আলী বাস্তবিক অর্থে কাপুরুষ, সুযোগ-সন্ধানী চরিত্রমাত্র; সামরিক শাসকের চোখরাঙানি উপেক্ষা করার সাহস সে রাখে না। রশীদ আলী যখনই জেনারেল কর্তৃক ওসমানের সদ্যবিধবা স্ত্রীকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলে যেতে চায়, তখনই দুজন অস্ত্রসজ্জিত সৈনিক তাকে বাধা দেয়। রশীদ আলীও কলের পুতুলের মতো সে আদেশ মেনে নিশ্চুপ হয়ে যায়। মঞ্চনির্দেশে ফুটে ওঠে জেনারেলের বাঁকা হাসি :

টেলিফোন বেজে ওঠে। জেনারেল অনুচ্চস্বরে কথা বলতে থাকেন পেছন ফিরে। রশীদ দরোজার কাছে যেতেই দু'জন প্রহরী উদিত হয়। রশীদ আবার নিজের আসনে ফিরে যায়। তার দিকে তাকিয়ে জেনারেল একবার অন্যমনস্ক অস্ফুট হাসেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৯৯)

এই নাটকে রাজনীতিবিদ রশীদ আলী চরিত্রটি উইলিয়াম শেকস্‌পিয়রের মূল নাটকের এন্টনিও চরিত্র থেকে পৃথক হয়ে তৎকালীন সুযোগ-সন্ধানী রাজনীতিবিদ খন্দকার মোশতাকের ছায়া হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাসে দেখা যায় – ১৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে খন্দকার মোশতাক আইনত রাষ্ট্রপতি হলেও তিনি ছিলেন নখর-দন্তবিহীন ব্যাঘ্রশাবক; ছিলেন মূলত সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল। এ সংক্রান্ত বাস্তবচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের এক লেখায়। তিনি পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

আমাকে বলা হল বেতারকেন্দ্রে আমার উপস্থিতি জরুরী। প্রস্তুতির জন্য কয়েক মিনিট সময় চাইলাম। মাথার পেছনে বন্দুক তাক করে আমাকে জিপে তোলা হলো, আমি যেনো ভয়ঙ্কর কোনো সন্ত্রাসী। [...] বেতারকেন্দ্রের ভেতরে খন্দকার মোশতাককে দেখলাম। বঙ্গবন্ধুর বিশেষ প্রিয়ভাজন তথ্যমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুরকে দেখে চরমাশ্চর্য হলাম। তাদের পাশে সদ্য ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তার কয়েকজন সদস্য ছিলেন। তাদের কয়েকজনকে উদ্দেশ্য করে খন্দকার মোশতাক জানতে চাইলেন, আলাদা কক্ষে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন কি না। তাঁকে ত্বরিত বলা হলো, ওই কক্ষের এক কোণায় কথা বলতে। তাদের ওপর খন্দকার মোশতাকেরও যে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তা স্পষ্ট হলো।[১]

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক *গণনায়কের* একটি দৃশ্যে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি ওসমানকে হত্যা করার পূর্বমুহূর্তে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহ নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনসহ অন্যান্য সংসদ সদস্যকে গণনায়ক ওসমান সম্পর্কে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপূর্ণ বিকৃত তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। আবার, অন্য আরেকটি দৃশ্যে ওসমানের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুন শান্তি-মুক্তি-গণতন্ত্রের নামে সকলকে উজ্জীবিত করেছে। দ্বিধাগ্রস্ত বাকি সাংসদদের ঘৃণ্য এই অপরাধে যুক্ত করে বলেছে :

বন্ধুগণ, সবল রাখো বাহু। এসো, আজ প্রত্যেকে
রঞ্জিত করি বাহু এই কালাপাহাড়ের রক্তে,
যাই জনসমুদ্রে, ঊর্ধ্বে তুলি মুষ্টিবদ্ধ বাহু এবং
এক কণ্ঠে ঘোষণা করি, 'শান্তি, মুক্তি, স্বাধীনতা।' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৬৬)

ইতিহাস থেকে জানা যায় একই উপায়ে মুজিব-হত্যার অন্যতম ঘাতক মেজর ফারুক ও মেজর রশীদ তাদের অধীন সেনাদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অসত্য তথ্য দিয়ে, ভুল বুঝিয়ে হত্যায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ বিষয়ে ফখরুদ্দিন আহমদ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন নিম্নরূপে :

ফারুক ও রশীদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন সেনারাই অভ্যুত্থানে অংশ নেয়, তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের কিছুই জানানো হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করার জন্য দলে দলে ভাগ করে ছড়িয়ে দেওয়ার আগে ফারুক সেনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বলেন, শেখ মুজিবের সরকার ভারতের সঙ্গে মিলে দেশকে হিন্দু কর্তৃত্বাধীন

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

করবে, তাই বাংলাদেশে ইসলামকে রক্ষা করতে হবে। এখন যদি তারা আক্রমণ না-করে তবে বাংলাদেশ হিন্দুদের দ্বারা শাসিত হবে।[১]

গণনায়ক নাটকে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি ওসমানকে হত্যার পূর্বে তার বাড়িতে মন্ত্রণালয়ের সদস্যরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। রংপুরের প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মীর্জা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহ, সাংসদ দাউদসহ অনেকেই সেদিন ওসমানের বাড়িতে জমায়েত হয়েছিলেন। মূলত, এটি ছিল রাষ্ট্রপতি ওসমানের অবস্থান ও মনোভাব জানার একটি পরিকল্পিত কৌশল। তারা চেয়েছিলেন কোনোভাবেই যেন ওসমান সংসদে যাবার সিদ্ধান্ত থেকে সরে না যেতে পারেন। প্রাসঙ্গিক এলাকা উল্লেখ করা যেতে পারে :

ওসমান। দাউদ, সংসদে তুমি বলে দিও, রাষ্ট্রপতি আজ আসছেন না। [...]
দাউদ। [...] আপনি কি জানেন, জাতীয় সংসদ
সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনাকে বরণ করা হবে আজ
আজীবন রাষ্ট্রপতি পদে ? প্রায় সমস্তই ঠিক হয়ে আছে।
এখন আপনি যদি বলে পাঠান যে যাবেন না, তাহলে
সদস্যদের বড় একটা আশাভঙ্গ হবে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৫৯)

বঙ্গবন্ধু-হত্যার প্রাক্কালেও ঠিক এমন ঘটনা ঘটেছিল। ঘাতক-সহযোগী খন্দকার মোশতাক এসেছিলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে। রাষ্ট্রপতির তৎকালীন একান্ত সচিব মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের ভাষ্যে এমনই ষড়যন্ত্রের চিত্র রয়েছে। তিনি এক লেখায় লিখেছেন :

১৪ আগস্ট গণভবন [...] থেকে তিনি সরাসরি গেলেন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে। পরে জেনেছি, রাতে সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, যাকে যথার্থভাবেই বলা হয় নাটের গুরু। [...] একই রাতে একটি প্রস্তুতি সভা হয়েছিল অভিজাত এলাকার এক বাড়িতে। [...] কয়েকঘণ্টা পর যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে চলেছে তার প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্ব সেখানে পর্যালোচনা করা হয়। [...] বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল শিথিল। ঘাতক বজলুল হুদার অনুগত সেনাদের একটি

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.২২

দল রাষ্ট্রপতির বাসভবনের প্রহরার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল। এ কারণে খুনিরা প্রায় বিনা বাধায় ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।[১]

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক *গণনায়ক নাটকের* ভূমিকায় বলেছিলেন – এটি তাঁর একটি রাজনৈতিক পরীক্ষামূলক শিল্পকর্ম। নাট্যকার নাটকটির ছত্রে ছত্রে সেই কথার প্রমাণ রেখেছেন। সমাজের প্রতিটি সেক্টরের অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থান্ধতার মুখোশ উন্মোচন করে তিনি দেখিয়েছেন যে, একটি জাতির, একটি দেশের উত্থানে যেমন একজন জননেতার সুদৃঢ় নেতৃত্বগুণের প্রয়োজন হয়, তেমনি ভাবে সমাজের সামষ্টিক বিনষ্টিই সম্মিলিতভাবে একটি দেশের ধ্বংস অনিবার্য করে তোলে; এবং এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তারা তাদের নেতাকে হত্যা করে দেশকে নেতৃত্বশূন্য করে নেয়। পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, সামাজিক অনাচার, মৌলবাদী শক্তির হিংস্রতম উত্থান আমাদের সে কথাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দেশের কল্যাণ, জনগণের কল্যাণের ধুয়ো তুলে যে কালোশক্তি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে তারাই দেশকে সবথেকে বেশি অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে রাষ্ট্রপতি ওসমানের হত্যার পর অস্থিতিশীল ক্ষমতাকাঠামোর প্রকৃত ছবি দেখিয়ে প্রতীকী অর্থে আমাদের পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক চিত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ফলে আলোচ্য নাটকটি কাব্যনাটকের শিল্পিত কাঠামোর ঊর্ধ্বে উঠে একটি রাজনৈতিক সময় ও সমাজের অকাট্য দলিল হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছে।

মূলত, রাজনৈতিক নাটকের বৈশিষ্ট্যানুসারে এ নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব আবর্তিত হয়েছে দেশের রাজনৈতিক নেতা, সাংসদ, নীতিনির্ধারকদের আদর্শের ভিন্নতা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কুৎসিত ষড়যন্ত্র নিয়ে। রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা এখানে অধিক প্রভাব বিস্তারী শক্তি। বিপরীতে জনমত, জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, দাবী-দাওয়া এখানে তীব্রভাবে উপেক্ষিত। বরং এই অপশক্তি নিজেদের স্বার্থে জনগণকে বিভ্রান্ত করে একটি অগ্রহণযোগ্য নির্মম হত্যাকাণ্ডকে সমাজে বৈধ করতে চেয়েছে; রক্তপাতকে জনস্বার্থে মহৎ কর্মের মর্যাদা দিতে চেয়েছে। এটিই একটি গণতান্ত্রিক দেশের দুর্বলতম রাজনীতি-চিত্রের প্রমাণ যে – যেখানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য ক্ষমতায় বসে জনস্বার্থের কথা ভুলে একান্তই ব্যাক্তিগত ফায়দা নিয়ে ভাবেন। জনগণের মতের ভিত্তিতে, জনগণের ভোটে যারা নির্বাচিত হয়, তারাই জনমতকে হেয় করে, তুচ্ছজ্ঞান করে, তাদের ওপর নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে জোর করে চাপিয়ে দেয়। বস্তুত, দুর্নীতিগ্রস্ত, অসৎ রাজনীতিবিদদের ব্যবহারের শিকার হয় সাধারণ জনগণ। সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে রাজনীতির এই অন্ধকার দিকটি

---

[১] মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও একটি নিখোঁজ ব্রিফকেস' *ফিরে দেখা ১৫ আগস্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫-২৬

নিপুণ বাস্তবতায় উপস্থাপন করেছেন। যেমন, এখানে তথ্যমন্ত্রী মীর্জা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দার জনভোটে নির্বাচিত সদস্য। জনগণের কল্যাণেই যাদের কাজ করা উচিত। কিন্তু জনগণ সম্পর্কে এরা নিজেরাই যথেষ্ঠ নেতিবাচক ধারণা পোষণ করছে। তথ্যমন্ত্রী মির্জার ধারণা – জনগণ রমণীর মতো। অন্যদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দার আরও নিচুতে নেমে, সংঘশক্তির সিদ্ধান্তকে বেশ্যার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন :

বেশ্যার মতো। যার হৃদয়ে একমুহূর্ত দাঁড়ায় না
কোনো অনুভূতি, স্থায়ী হয় না কোনো বেদনা, আচ্ছন্নতা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৩৪)

তবে সৈয়দ শামসুল হকের কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি রাজনীতির সূত্র নির্ণয়ে একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেননি; এবং নাটকের প্রথম দৃশ্যেই সেটি স্পষ্ট করেছেন সিকান্দার চরিত্রের একটি সংলাপে। তিনি দেখিয়েছেন একজন রাষ্ট্রনায়ক কখনোই দেশকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠতে পারেন না। কোনো নেতা যদি জনসিদ্ধান্ত আমলে না নিয়ে, সহকর্মী সুহৃদদের মতামত উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন, তখন অন্যদের কাছে মনে হতেই পারে, হয়তো ব্যক্তির মহিমা সেখানে রাষ্ট্রের থেকে বড়ো হয়ে উঠছে। আর তখনি জনরোষ, অসন্তোষের বিষয়টি আসে। স্বাধীনতা-উত্তরকালের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে – সেসময়ের প্রতিটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সম্মিলিত মত দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধকে সফল করে তুলেছিল। তবে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশগঠনের প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর কিছু কিছু সিদ্ধান্ত এরা মেনে নিতে পারেনি। এগুলোর মধ্যে 'বাকশাল' গঠন করার সিদ্ধান্ত ছিল অন্যতম কারণ। আলোচ্য নাটকেও এমনই একটি রাজনৈতিক অসন্তোষের ছবি পাওয়া যায়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে তথ্যমন্ত্রী মীর্জা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দারের আলাপে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। সিকান্দার আক্ষেপের সঙ্গে বলেছে :

এই হয়, প্রথমত মনে হয়, রাষ্ট্রের
কল্যাণেই করা, পরে দেখা যায়, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় হয়েছে
ব্যক্তি, সমস্ত উদ্যমের লক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে সেই ব্যক্তিটির
প্রতিষ্ঠা রক্ষা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৩৪)

নাটকের আরো কিছু দৃশ্যে নাট্যকার সুকৌশলে রাষ্টপতি ওসমান কর্তৃক কিছুটা স্বৈরতান্ত্রিক, একপেশে সিদ্ধান্ত নেবার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ গণরোষের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওসমানের প্রতি জনতার উচ্ছ্বসিত আবেগকে পুঁজি করে নেতার চারপাশে ঘিরে থাকা যুক্তি-বুদ্ধিহীন, চাটুকারশ্রেণি যখন ওসমানকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হবার

আহবান জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকে, তখন হুমায়ুন এবং মীর্জার মনে হয় রাষ্ট্রপতি মুখে আপত্তি জানালেও হয়তো মনে মনে এটাই চান। এখানেই মূলত তাদের আপত্তি ছিল। কেননা, একটি গণতান্ত্রিক দেশে যত যাই হোক, কারও একক সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারিত হতে পারে না। ফলে প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুন কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন :

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সংবিধানের সংশোধন ? আগে শুনিনি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৪৪)

একজন জননেতাকে যে ক্ষমতার মোহ কাটিয়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে জননেতা হয়ে উঠতে হয়, এরকম বক্তব্য *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাট্যেও উচ্চারিত হয়েছে। সেখানে আব্বাস বন্ধুপ্রতিম গণনেতা নূরলদীনকে বারবার সাবধান করেছিল এই বলে যে, জনগণ যতই তাঁকে তাদের নবাব নির্ধারণ করুক, নূরলদীনের অন্তর যেন নবাবীর মোহে জনসেবার প্রকৃত লক্ষ থেকে বিচ্যুত না হয়। *গণনায়ক* নাটকেও ঠিক এমনই একটি আবহ কাজ করেছে। তবে আজীবন রাষ্ট্রপতি হবার ব্যাপারে ওসমানের সিদ্ধান্ত শেষপর্যন্ত কী হয়, তা পুরোপুরি জানার পূর্বেই তাঁকে নির্মমভাবে খুন হতে হয়েছে, যেটি কখনোই কাম্য ছিল না। ওসমান হত্যার পরে রশীদ আলীর জবানিতে আমরা সেটিই জানতে পারি। রশীদ আলী জনগণের উদ্দেশে স্পষ্ট করে বলেন – রাষ্ট্রপতি ওসমান ক্ষমতাধর হয়েও এতটাই সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর মধ্যে লোভের ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যায় না। আর সে নিজেই যখন রাষ্ট্রপতি হবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তবে তাঁকে নিয়ে এমন কুৎসা-রটনা ষড়যন্ত্রকারীদের হীনচক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। নাট্যকার বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে প্রচলিত কুৎসার একটি মোক্ষম জবাব দিতে চেয়েছেন নিম্নোক্তরূপে :

রাজার ক্ষমতা হাতে পেয়েও
জীবন যাপন করেছেন সংসার বিমুখ সন্ন্যাসীর মতো।
এই কি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের লক্ষণ?
মানুষের ক্রন্দন যখন শুনেছেন, কেঁদে উঠেছেন নিজে।
উচ্চাকাঙ্ক্ষীর হৃদয় এতো কোমল হলে চলে না। [...]
আমি তাঁকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হবার প্রস্তাব দেই তিনবার।
তিনবারই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এই কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা? [...]
হায় মানুষের বিবেক, তুমি পলাতক; যুক্তি পথভ্রষ্ট। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৭৫)

অন্যদিকে, নাট্যকার অথর্ব রাজনীতিবিদদের চিত্র তুলে ধরেছেন কাশেম খাঁ প্রসঙ্গে মীর্জা চরিত্রের আরেকটি সংলাপে। রাষ্ট্রপতি ওসমানের অসুস্থতার সুযোগে জনতার উদ্দেশে কাশেম খাঁ যখন বক্তব্য রাখতে চান, তখন

তিনি রাজনীতির কতিপয় প্রচলিত বুলি ছাড়া তেমন আর কিছুই বলতে পারেন না। রাজনীতির ময়দানে অধিকাংশ নেতাই এমন। জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা না থাকলেও মঞ্চে ওঠার ব্যাপারে সবাই সরব। এ প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী মীর্জার সংলাপ উল্লেখ্য :

তিনি একটা লম্বা বক্তৃতা দিলেন। মাথামুণ্ডু বোঝা গেল না।
কেবল 'বন্ধুগণ' আর 'বাংলার নিপীড়িত মানুষ' আর
'রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব' ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ তাঁর সে ভাষণ। [...]
কাশেম খাঁ যেন সদরঘাটে কোনো বিক্রেতা,
সালসার বোতল হাতে পথচারীকে চিৎকার করে ডাকছে,
'আসুন, স্বপ্নাদ্য অমৃত সুধা, আসুন, কিনুন।' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৪৬)

আবার, নাট্যকার নাটকে ওসমানের রাজনৈতিক জীবনের যে সংগ্রাম ও ত্যাগের ছবি দেখিয়েছেন, তাতে একজন প্রকৃত জনদরদী নেতার বাস্তব ছবিই চিত্রিত হয়েছে। ওসমান ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির ময়দানে সক্রিয়। সানাউল্লাহর জবানিতে জানা যায় – রাজনৈতিক জনসভা শেষ করে ফেরার পথে তারা একবার মেঘনায় জীবন-বিনাশক প্রচণ্ড স্রোতের কবলে পড়েছিলেন। অন্যত্র মীর্জার আরেকটি সংলাপে জানা গেছে – স্বাধীনতাপূর্ব-সময়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ওসমান নিজ-প্রাণ তুচ্ছ করে জনগণের ভোটের দাবিতে সারাবাংলা চষে বেড়িয়েছেন। এমনকি এসময় অনিদ্রা, অনাহারে তাঁর পাকস্থলীতে তীব্র অসুখ দেখা যায়। বস্তুত, এসব বর্ণনায় দেশের প্রতি গণনায়ক ওসমানের আত্মত্যাগ যেমন চোখে পড়ে, তেমনি স্মরণে আসে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অপার ত্যাগ ও শ্রমের কথা । মীর্জার সংলাপ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উল্লেখ্য :

আপনাদের হয়ত মনে আছে, স্বাধীনতার কিছুদিন আগে
সেই সাধারণ নির্বাচনের কথা। বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে
ওসমান তখন উল্কার মতো ধাবমান, দাবানলের মতো জ্বলন্ত।
তিন মাসে এক হাজার বক্তৃতা, রাত্রি নিদ্রাহীন, দিন উপবাসে।
সেই তখন পাকস্থলীতে হয় ক্ষত, শুধু শুকনো মুড়ি খেয়ে
তিন মাস। অস্ত্রোপচার হয় পরে, কিন্তু ব্যথাটা থেকে যায়; (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৪৫)

বলাবাহুল্য, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। কেননা, এ নির্বাচনেই আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে দেশের প্রধান দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। ফলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় বাঙালির অধিকার ন্যায্যতা পেয়েছিল। তবে এ নির্বাচনে এককভাবে বিজয়লাভের

পশ্চাতে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ-তিতিক্ষা কম ছিল না। ওসমানের সভা সভাবেশ, মিছিল মিটিং, অনাহার অনিদ্রার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু অনায়াসেই মিশে যান। এছাড়া 'বঙ্গবন্ধুর' আদলে নাট্যকার ওসমানকে সম্বোধন করেছেন 'দেশবন্ধু' নামে; মুজিবকোটের আদলে 'ওসমানী কোট' নামক বিশেষ পোশাকের ইঙ্গিত রয়েছে নাটকে। সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-দক্ষতা ভুবনখ্যাত একটি বিষয়। নাট্যকার সে বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন ওসমানের 'যে জিহ্বার ভাষণে বাংলাদেশ ভাবাবেগে ভাসে' সংলাপের মাধ্যমে।

অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধুর পেটের পীড়ার প্রসঙ্গটি বাস্তবিকভাবে সত্যঘটনা। উইলিয়াম শেকস্‌পিয়র তাঁর নাটকে এ স্থানে দেখিয়েছিলেন সিজার মৃগীরোগে ভুগছে। সৈয়দ শামসুল হক যদি নাটকটি নিছকই অনূদিত করতে চাইতেন তবে রাষ্ট্রপতি ওসমানকেও মৃগীরোগে আক্রান্ত দেখাতে পারতেন। কিন্তু সেখানে তিনি বঙ্গবন্ধুর পেটের পীড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, ১৯৫২ সালে ফরিদপুর কারাগারে বঙ্গবন্ধু রাজবন্দীদের মুক্তি এবং ভাষার দাবিতে রাজনৈতিক সহকর্মী মহিউদ্দীনের সঙ্গে মিলে অনশনধর্ম পালনকালে তীব্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন; যার রেশ বঙ্গবন্ধুর শরীরে আমৃত্যু থেকে গিয়েছিল।[১] এছাড়াও ১৯৬৬ সালে কারাগারে থাকাকালে বঙ্গবন্ধু অনিদ্রা ও ক্ষুধামান্দ্যে ভোগেন। অজীর্ণতা, গ্যাস্ট্রিক, পাইলসসহ নানা সমস্যায় ভুগতে থাকেন। এমনকি, দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালেও বঙ্গবন্ধু পেটের পীড়ায় লন্ডনের হারলে স্ট্রিটে প্রাইভেট হাসপাতাল দ্য লন্ডন ক্লিনিকে চিকিৎসাগ্রহণ করেন। গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিচালক ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর এক লেখায় জানা যায় :

> ১৯৭২ সালের এপ্রিলে বঙ্গবন্ধু মাঝে মধ্যে বদহজম, পেটের নিম্নাংশে চিনচিনে ব্যথা ও পিত্তথলির সমস্যায় আক্রান্ত হন। [...] লন্ডন ক্লিনিকে শৈল্য বিশেষজ্ঞ স্যার এডওয়ার্ড মুইর এফআরসিএস ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশকরা ডা. নজরুল ইসলাম এফআরসিএস পেট কেটে বঙ্গবন্ধুর রোগ নির্ণয় করেন 'Cholecystitis, Inflammed Common Bile Duct but no obstruction'।[২]

১৯৭২ সালে সৈয়দ শামসুল হক লন্ডনে বিবিসি বাংলা অফিসে চাকুরিসূত্রে অবস্থান করছিলেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুর অসুখ এবং চিকিৎসাগ্রহণের পুরো প্রক্রিয়া তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। ফলে রাষ্ট্রনায়কের মৃগীরোগের স্থলে পিত্তথলির পীড়ার কথা উল্লেখ করে তিনি তাঁর বাস্তবধর্মী চেতনালোকের প্রমাণ দিয়েছেন।

---

[১] দ্রষ্টব্য : শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৭, পৃ. ২০১

[২] জাফরুল্লাহ চৌধুরী, 'কারাগারে বঙ্গবন্ধুর চিকিৎসা', ই.বনিকবার্তা, সম্পাদকীয়, ১০ জানুয়ারি, ২০২০

স্বাধীনতা উত্তরকালে যে সেনাবাহিনীকে বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, তাদের জন্য আধুনিক সমরাস্ত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন, নানারকম সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে একাধিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন – সেই বাহিনীরই কিছু বিপথগামী সেনাসদস্য পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের কালরাতে তাঁকে আক্রমণ করবে, এটি বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। যে কারণে প্রথম দিকে গুলির শব্দ পেয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে সাহায্য চেয়ে যোগাযোগ করেছিলেন; বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহকেও ফোন করে বলেছিলেন : 'শফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে, কামালকে বোধ হয় মেরে ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।'[১] কিন্তু সেদিন আর সেনাবাহিনী তাঁকে সাহায্য করতে আসেনি। অতঃপর ঘাতকদলের অন্যতম সদস্য মেজর মহিউদ্দিন ও তার সঙ্গীরা যখন বঙ্গবন্ধুকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে যেতে থাকে, তিনি তখনও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে নিজ হাতেগড়া এই জোয়ান সেনাদের উদ্দেশে বলেন : 'তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি, কী করবি – বেয়াদবি করছিস কেন?'[২] কিন্তু শেষরক্ষা আর হয়নি। অপর দুই বিশ্বাসঘাতক খুনি – বজলুল হুদা ও নুর স্টেনগানের গুলিতে বঙ্গবন্ধুর হিমালয়সম দেহ ঝাঁঝড়া করে দেয়। সিজারের মতোই হয়তো বঙ্গবন্ধু নিকটজনের প্রতারণায় কষ্ট বেশি পেয়েছিলেন। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *গণনায়ক* নাটকে একজন রাষ্ট্রনায়কের এমন হতবিহবল অনুভূতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাষ্ট্রপতি ওসমানকে তথ্যমন্ত্রী মীর্জা প্রথম হত্যার জন্য আঘাত করে। এক এক করে অন্য সাংসদরাও তখন রাষ্ট্রপতি ওসমানকে ঘিরে ধরে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। কিন্তু সবশেষে যখন প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুন ছুরিকাঘাত করেন, তখন কাছের বন্ধুর এমন বিশ্বাসঘাতকতা মৃত্যুযন্ত্রণার থেকেও কষ্টকর মনে হয়। ফলে পরম হতাশায় মৃত্যুপথযাত্রী ওসমান বলে ওঠেন :

> তুমি ? হুমায়ুন ? – তাহলে, এভাবেই ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৬৫)

আবার, রাষ্ট্রনেতা ওসমানের মৃত্যুর পর রশীদ আলীর স্বগতোক্তিতে যে আবেগাত্মক আবহ তৈরি করেছেন নাট্যকার, তাতে ওসমানের প্রতিরূপে বঙ্গবন্ধুর প্রতি নাট্যকারের অনুতাপদগ্ধ হাহাকারই ভাষারূপ পেয়েছে। রশীদ আলী যখন জনতার উদ্দেশে ওসমানের প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু বলতে চেয়েছে – তখন সানাউল্লাহ, হুমায়ুন তাকে বার বার সতর্ক করেছে এই বলে যে – 'বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোনো উচ্চারণ নয়।'

---

[১] 'পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট, সেদিন যা ঘটেছিল', (সূত্র : আহমেদ ফিরোজ সম্পাদিত *ফিরে দেখা ১৫ আগস্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭)

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

পঁচাত্তর-পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ইতিহাসেও দেখা গেছে ক্ষমতাসীন সেনাশাসিত সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের হত্যার বিচার করা তো দূরের কথা, তাঁর ঘাতকদের আইন করে দায়মুক্তি দিয়েছে। এমনকি এ হত্যার বিচার চাওয়াও তখন নিষিদ্ধ ছিল।[১] তবে এখানে জনগণের উদ্দেশে রশীদ আলীর যে বক্তব্য তা যেন পঁচাত্তর-উত্তর বাংলার জনগণের প্রতি নাট্যকারের অন্তরের আকুল আকুতি। যে কারণে উপমা ও চিত্রকল্প নির্মাণে তিনি এখানে বড়ো বেশি বাস্তব, সামরিক শাসনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে থেকেও অনেক বেশি সাহসী। স্পষ্টত শেকস্‌পিয়রের সিজার চরিত্রের রূপকল্প ছাপিয়ে এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এমনকি তিনি এখানে যে চিত্রকল্পের প্রয়োগ করেছেন – সেটি বঙ্গবন্ধুর ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার হতে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাসঙ্গিক এলাকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

> ঢাকায় লক্ষ লক্ষ লোক
> চৈত্রের উজ্জ্বল রোদে দিগন্ত পর্যন্ত একটা সমুদ্র,
> তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে
> বরণ করল গণনায়ক বলে। লক্ষ লক্ষ হাত
> উৎক্ষিপ্ত হলো আকাশে, যেন লক্ষ লক্ষ পতাকা (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৭৬)

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের স্মৃতিচারণ করেছেন ব্রিটিশ লেখক রবার্ট পেইন। এ আনন্দময় দিনটির মাধুর্য প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

> তোপধ্বনিতে ঢাকা কেঁপে কেঁপে গর্জে উঠেছিল মহাবীরের বীরোচিত সংবর্ধনায়। আবেগে অশ্রুসিক্ত মুজিবুর রহমান বিমানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। প্রিয় নেতাকে দেখামাত্রই এয়ারপোর্টে সমবেত লাখো জনতা অবিস্মরণীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। [...] মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবর্গ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপচে পড়া তরঙ্গাভিঘাতের মুখেও আনুষ্ঠানিকভাবে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন। [...] জনতার হাতের রঙ বেরঙের পোস্টার,

---

[১] বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা এক সাক্ষাৎকারে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রসঙ্গে বলেন : ঐ সময়টা আসাটা বেশ ভয়াবহ ছিলো। তার কারণ খুনিদের কিন্তু বিচার হয়নি। এতগুলো খুন যারা করল, একটা ছোট্ট শিশুকেও তারা ছাড়েনি। তাদের বিচার করা যাবে না, এমন ইনডেমনিটি বিল তারা পাশ করল। আইন করে দেয়া হল খুনিদের বিচার করা যাবে না। আমি আমার বাবা-মাকে হারিয়েছি আমি বিচার চাইতে পারব না। আমি মামলা করতে পারব না।' (দ্রষ্টব্য : 'লেটস টক উইথ শেখ হাসিনা', প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, *দ্যা ডেইলি স্টার*, ঢাকা , ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১)

ফেস্টুন, ব্যানার। শেখের বিভিন্ন সাইজের ছবি শোভা পাচ্ছে উল্লসিত জনারণ্যে। সবার কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাদায়ক ধ্বনি – জয় বাংলা।[১]

অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় পাকিস্তানের কারাগারে নয় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সদ্য স্বাধীনদেশে প্রত্যাবর্তনের আনন্দের সঙ্গে *গণনায়ক* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক বর্ণিত রাষ্ট্রপতি ওসমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন-ঘটনার সাযুয্য অত্যধিক। বলাবাহুল্য এ-সাদৃশ্য নাট্যকারের একান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখনীর বহিঃপ্রকাশ ।

গণনায়ক নাটকে সৈয়দ শামসুল হক উইলিয়াম শেকসপিয়রের মূল কাহিনির বাইরে গিয়ে ওসমান হত্যা-পরবর্তী সময়ে দেশের তৎকালীন বিপর্যস্ত রাজনীতি, সমাজ আর ক্ষমতার নয়া মেরুকরণের যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন, সেটি পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।[২] *জুলিয়াস সিজার* নাটকে শেকস্পিয়র একজন পত্রবাহক দ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টাভিয়াস সিজারের কাছে রাষ্ট্রনেতা জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর খবর প্রেরণ করে তাকে রাজধানীতে আনয়নের মাধ্যমে এ অংশের দায় মিটিয়েছেন। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের নিরিখে ওসমান হত্যা-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল চৌধুরী, এয়ার মার্শাল আমিন এবং পুলিশ প্রধানের সম্মিলিত উদ্যোগের কথা বলেছেন :

কিছুক্ষণ আগে জেনারেল চৌধুরী আর এয়ার মাশার্ল আমিন
বৈঠক করেছেন সব অফিসারদের নিয়ে।
[...] সৈন্য পাঠানো হয়েছে রাজধানীর সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে।
[...] পুলিশ প্রধানও আছেন, তিনি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন
প্রধান সেনাপতির প্রতি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৭৯)

---

[১] দ্রষ্টব্য : *পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু*, ভাবানুবাদ : ওবায়দুল কাদের, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৩৭-১৩৮

[২] *গণনায়ক* নাটকে নাট্যকারের সচেতনভাবে উইলিয়াম শেকসপিয়রের মূলকাহিনীকে এড়িয়ে নিজস্ব রচনা প্রবণতা লক্ষকরে নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার এক লেখনীতে মন্তব্য করেছেন : শেক্সপীয়রের *জুলিয়াস সীজার*কে অবলম্বন করে রচনা করেছেন *গণনায়ক*। প্রথম দু অংকের পর তিনি স্বাধীনভাবে লিখেছেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি নিয়ে। *জুলিয়াস সিজারের* সাথে তুলনা করেছেন বঙ্গবন্ধুর। দু'জনেই ষড়যন্ত্রের শিকার, দু'জনেই ট্রাজেডির নায়ক। (দ্রষ্টব্য : রামেন্দু মজুমদার, 'তাঁর দীর্ঘ ছায়া', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, হয়াৎ মামুদ ও পিয়াস মজিদ (সম্পা.), চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ.৭০১)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পরদিন – ১৬ আগস্ট দেশের প্রথম সারির পত্রিকা *দৈনিক বাংলার* শীর্ষখবর ছিল : 'খন্দকার মোশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি।' ওই খবরের উপশিরোনামে ছোট্ট করে বলা হয় : 'শেখ মুজিব নিহত : সামরিক আইন ও সান্ধ্য আইন জারি : সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আনুগত্য প্রকাশ।' সরকারি বার্তা সংস্থা *বাসস*-এর বরাত দিয়ে একই খবরে বলা হয়, সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক আইন ঘোষণা ও সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ, নৌবাহিনী প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকার পৃথক পৃথক বেতার ভাষণে মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন নয়া সরকারের প্রতি আনুগত্য ও দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সাবিউদ্দিন আহমেদ এবং আইজিপি এ. এইচ. নুরুল ইসলাম বেতার মারফত মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন মর্মে খবর প্রকাশ করা হয়।[১] ফলে *গণনায়কে* বর্ণিত ওসমান হত্যা-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর ক্ষমতার নতুন মেরুকরণের সঙ্গে বাংলাদেশের পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের সাযুজ্য স্পষ্ট।

আবার, ১৯৭১ এ 'জয় বাংলা' ছিল মুক্তিকামী বাঙালির অন্তরমথিত শ্লোগান। বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদের অবদান মাথায় রেখেই খাঁটিবাংলা ভাষায় এই দ্বৈতশব্দের শ্লোগানটি নির্মাণ করেছিলেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও মানুষ যেকোনো আনন্দ কিংবা আন্দোলনে এই শ্লোগানটিকেই ব্যবহার করতো। কিন্তু পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই চিত্রপট সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। 'জয় বাংলা' শ্লোগানের স্থানে জায়গা করে নিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদে'র আদলে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' শ্লোগান। বস্তুত, এর মাধ্যমে উত্থান ঘটল সেই মৌলবাদী শক্তির, যারা উর্দুকে এদেশের রাষ্ট্রভাষা করার হীনষড়যন্ত্রে মদদ যুগিয়েছিল; যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন দেশগঠনের স্বপ্ন দেখেছিল। সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে বাংলাদেশের রাজনীতির এই পরিবর্তনটিও অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। নাটকের প্রারম্ভিক পর্যায়ের দৃশ্যগুলোতে দেখা গেছে, যে-জনগণ 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে মুখর হয়ে রাষ্ট্রপতি ওসমানকে স্বাগত জানাচ্ছে, তারাই ওসমান হত্যা-পরবর্তী সময়ে তাদের শ্লোগান বদলে ফেলেছে :

> জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ।

---

[১] '১৯৭৫ সালের সংবাদ পত্রে ১৫ আগস্ট', *দৈনিক প্রথম আলো*, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৫ আগস্ট ২০১০, (সূত্র : আহমেদ ফিরোজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৯)

অত্যাচারের বদলা খুন। নতুন নেতা হুমায়ুন।

এতদিনের দুঃখ শেষ। গঠন করো বাংলাদেশ। (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ২৭৩)

গণনায়ক নাটকে নাট্যকারের রাজনীতি-মনস্কতার আরেকটি প্রমাণ – জেনারেল চৌধুরী চরিত্রটি নির্মাণ। দেশের কল্যাণের নামে এ-চরিত্রটি নিজক্ষমতা পোক্ত করতে নানা ষড়যন্ত্রে জড়িত। একটি পর্যায়ে সে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য করে রাষ্ট্রের কল্যাণে রাজনীতিকের তুলনায় সেনাসদস্যদের কার্যকারিতা ও তাদের একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ করে বলেন :

রক্তপাতের অস্ত্র রাজনীতিকের হাতে, তা ইতঃপূর্বে তো
চোখেই দেখা যাচ্ছে। বলা নিষ্প্রোয়োজন যে একমাত্র সৈনিকেরই
দেশপ্রেমের প্রকাশ কিছু অপটু হলে চলে না। কারণ,
সৈনিকের সমুখে শুধু দু'টি পথ, জয় অথবা মৃত্যু ;
রাজনীতিকের আরো একটা পথ আছে, হয়তো সেটাই প্রথম
এবং প্রধান – পলায়ন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৮২)

মূলত, জেনারেল চৌধুরীর এই উক্তিই প্রমাণ করে – সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় তাঁর মনোভাব কেমন। তিনি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ধীরে ধীরে সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। একদিকে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠ নেতাদের কাউকে হত্যা করেছেন, আবার প্রয়োজনানুসারে কাউকে করেছেন বন্দি। যেমন : প্রবীণ নেতা কাশেম আলী, সাংসদ নরেন্দ্রনাথ। অন্যদিকে বিপক্ষের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী সানাউল্লাহ, হুমায়ুন পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে ; সিকান্দারকে ক্রসফায়ারের নামে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এবং পুরো প্রক্রিয়া নিজের দখলে নিতে বিদ্রোহী সংসদ সদস্য দাউদ চৌধুরী ও ফজলুল হককে করা হয়েছে রাজসাক্ষী।

জাতির জনকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দেশ যখন সামরিক জান্তার নিয়ন্ত্রণাধীন, তখনো রাজনীতির ময়দানে ধরপাকড় চলেছে; রাষ্ট্রনায়কের প্রত্যক্ষ মদদে চলেছে জেল হত্যা। দেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষের শক্তিকে চিরতরে বিলীন করে দিতে নানা কর্মকাণ্ড চলেছে। অন্যদিকে, বিপথগামীদের হত্যার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে ; কাউকে কাউকে দলে টানতে করা হয়েছে পুরস্কৃত। মানুষের মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করানো হয়েছে – দেশশাসনে রাজনীতিবিদ নয়, বরং সেনাসদস্যরাই অধিক সক্ষম। সৈয়দ শামসুল হক বাস্তবতার আলোকে এসব দেখে-শুনেই বোধ হয় নাট্যকাহিনিতে এগুলোর প্রতীকী সংযোজন ঘটিয়েছেন।

অন্যদিকে রশীদ আলী চরিত্রটি একেবারেই সুবিধাবাদী শ্রেণির প্রতিনিধি। সময় ও স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে চলা তাঁর স্বভাব। রাষ্ট্রপতি ওসমানকে তিনি ভালবাসতেন ঠিক-ই, কিন্তু ওসমানের অবর্তমানে অতঃপর নিজেকে দেখতে চাইছেন নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকায়। তাই চতুর জেনারেল চৌধুরী যখন ওসমানের সদ্য বিধবা স্ত্রীকে রাষ্ট্রপ্রধান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তার শ্লেষাত্মক মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে তারা প্রতিপক্ষকে সন্দেহ করার পাশাপাশি পক্ষভুক্তদেরও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছেন। যে কারণে প্রবীণনেতা কাশেম আলীকে পর্যন্ত সেনাছাউনির অভ্যন্তরে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন তাঁরা :

জেনারেল। আমার সন্দেহ, আজ রাতে পালাবার চেষ্টা তিনি করবেন।
প্রহরী শুধু সতর্ক নয়, দেশপ্রেমিক ; বাধ্য হবে গুলি ছুঁড়তে।
সৈনিক কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, আশাকরি জানেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৮৭)

পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম ন্যাক্কারজনক ঘটনা জেলহত্যা। বস্তুত, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর তাঁর অতিঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের হত্যার উদ্দেশ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যান্তরেই ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর এ-হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এইচএম কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী – রাষ্ট্রযন্ত্রের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের অনাগ্রহে বঙ্গবন্ধু হত্যার মতো এ হত্যাকাণ্ডটিও বিচারের মুখ দেখতে পায়নি। পঁচাত্তর-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি এভাবেই চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। শেকস্পিয়রের *জুলিয়াস সিজার* থেকে এখানেই *গণনায়ক* হয়ে উঠেছে সমকালীন রাজনৈতিক আখ্যান চিত্রণের অনন্য দলিল; হয়ে উঠতে পেরেছে নাট্যকারের স্বতন্ত্র শিল্পিত কাব্যনাটক।

রাষ্ট্রনায়কের নির্মম মৃত্যুর পর জেনারেল যখন ঘোষণা দেন – রশীদ আলী নন, ওসমানের বিধবা স্ত্রী-ই রাষ্ট্রপতির আসনে বসবেন – তখন রশীদ আলী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন :

রাষ্ট্রপতির আসনে তাঁর বিধবা পত্নী ?
[...] রাষ্ট্রপতির গায়ের চাদর ধবধবে রাখা, তাঁর জন্যে
কই মাছের ঝোল নিয়মিত রাঁধা, এ ছাড়া
দ্বিতীয় কোনো উদ্যমে যাঁকে কখনো দেখিনি,
রাষ্ট্রের সম্মানিতা বিধবার বদলে, রাষ্ট্রের কর্ণধার তিনি ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৯৮)

তখন জেনারেল জানায়, রাষ্ট্রপতি হবার জন্য জনগণের সম্মুখে যে প্রতীক প্রয়োজন, ওসমানের বিধবাপত্নী হবেন তা-ই। তিনি রশীদ আলীকেও পুরস্কারস্বরূপ তার পূর্বপদে বহাল রাখার কথা বলেন। তখন রশীদ আলী নিশ্চিত হন, রাষ্ট্রপতির স্ত্রীকে পুতুল সরকার বানিয়ে ভেতর থেকে জেনারেলই ক্ষমতায় বসতে চান। রশীদ আলী তখন কার্যত সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে পড়েন। মঞ্চ নির্দেশের মাধ্যমে যেটি সুস্পষ্ট হয়েছে :

> রশীদ দরোজার কাছে যেতেই দু'জন প্রহরী উদিত হয়। রশীদ আবার নিজের আসনে ফিরে যায়। তার দিকে তাকিয়ে জেনারেল একবার অন্যমনস্ক অস্ফুট হাসেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৯৯)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে পঁচাত্তর-পরবর্তী ঘটনাবলিও এ-নাট্যঘটনার সঙ্গে মিলে যায়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাণিজ্য মন্ত্রী মোশতাককে প্রতীকী সরকার বানিয়ে সেনাবাহিনী প্রথমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এরপর স্বল্পকাল ব্যবধানে নানা নাটকীয়তা ও উপর্যুপরি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সামরিক জান্তা বহাল তবিয়তে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়। **১৯৭৫** সালেই নাট্যকার যেন বাংলাদেশের ক্ষমতার পালাবদলের ভবিষ্যৎ দেখতে পেরেছিলেন। কেননা, একজন প্রয়াত রাষ্ট্রপতির বিধবা স্ত্রীকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানোর বাস্তবিক ইতিহাসও এদেশের রয়েছে। অনায়াসেই তাই বলা যায় সৈয়দ শামসুল হক একজন রাজনীতিসচেতন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা লেখক।

সৈয়দ শামসুল হক শেকসপিয়রের নাটকের রূপান্তর ঘটিয়ে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেই যে চিত্রিত করতে চেয়েছেন তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এই রাজনীতির চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি দেশের অতীত ইতিহাস, সমকাল, সমাজকে অস্বীকার করতে পারেননি। বরং একজন বিজ্ঞ সমাজমনস্ক নাগরিকের দৃষ্টিতে অতীত ইতিহাসের ছাঁচে ফেলে রাজনৈতিক চক্রের রহস্য উন্মোচনে সচেষ্ট থেকেছেন। সৈয়দ শামসুল হক মনে করেন – যে-জাতি অতীত ইতিহাস স্মরণ করে না, সে-জাতি উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে অক্ষম। কিন্তু বাঙালি জাতি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ক্ষণিক স্বার্থের মোহে ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জকে নিমিষেই ভুলে গেছে। *গণনায়ক* নাটকের প্রারম্ভেই নাট্যকার সিকান্দার চরিত্রের একটি সংলাপের মাধ্যমে এই বিস্মৃতিপ্রবণ সুবিধাবাদী বাঙালি জাতিকে শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করে বলেছেন : 'নির্বোধ মূর্খের দল, দেহে প্রাণের বদলে পাষাণ? মাথায় ইতিহাসের বদলে মাকড়শার বাসা – '(প্রথম অংক প্রথম দৃশ্য, কাব্যনাট্যসমগ্র: ২৩৩)। আত্মঘাতী বাঙালি জাতিকে সঠিক ইতিহাসজ্ঞান দিতে তিনি শিল্পের আশ্রয় নিয়েছেন বারবার। *গণনায়ক* নাটকের পূর্বে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকেও আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের মহান

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। এরপর *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকে ইতিহাসের প্রায় অজানা পাতা থেকে খুঁজে এনে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নূরলদীন নামক এক মুক্তিকামী কৃষকযোদ্ধাকে। *গণনায়ক* নাটকের ছত্রে ছত্রেও আমরা নাট্যকারের ইতিহাসবোধের প্রমাণ পাই। এখানে পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস প্রধান আলেখ্যরূপে উপস্থাপিত হলেও নাট্যকার প্রাসঙ্গিকভাবে সত্তরের নির্বাচন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশপ্রত্যাবর্তন, দেশ শাসনের ইতিবৃত্ত থেকে পলাশীর ট্রাজেডি, মুঘল ইতিহাসের হুমায়ুন-ভিস্তিওয়ালার ঘটনাসহ ভিয়েতনাম যুদ্ধ, লেনিন, ফিদেল ক্যাস্ত্রোর সংগ্রামের ইতিহাসও উপস্থাপন করেছেন অসামান্য দক্ষতায়[১]:

> মুক্তির মূল্য ছাড়া প্রাপনীয় নয়। বাড়ির কাছেই ভিয়েতনাম।
> চীনও খুব বেশি দূরের উদাহরণ নয়। লেনিনকে স্বদেশ থেকে
> পালাতে পর্যন্ত হয়েছিল। পর্বতে যেতে হয়েছিল ফিদেল কাস্ত্রোকে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩০৫)

সৈয়দ শামসুল হক সুকৌশলে সানাউল্লার মুখের এই একটি সংলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর তাবৎ বিপ্লবের ইতিহাসকে একসাথে স্মরণ করেছেন। কার্ল মার্কসের সাম্যবাদকে ভিত্তি করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪), কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো (১৯২৬-২০১৬), হো চি মিনের (১৮৯০-১৯৬৯) নেতৃত্বে আধুনিক ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত চীনা বিপ্লবের ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরোটা জুড়েই বিশ্বে রাজনৈতিক ক্ষমতাবদলের চিত্র দেখা গেছে। বিপ্লবের তোড়ে পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্র, রাজতন্ত্রের বড়ো বড়ো দুর্গগুলো ধসে পড়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণমানুষের শাসন; গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র। জাতির জনক যখন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে সম্বল করে দেশের মানুষকে যুগান্তরের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্ত করতে

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক তাঁর এই ইতিহাস-সচেতন লেখনীর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন :

> আমরা বেড়ে উঠেছিলাম গণতান্ত্রিক একটা চেতনার মধ্য দিয়ে। আমরা তো বাহান্নর সন্তান, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সন্তান। [...] আরেকটা দিক হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমরা দেখেছি। [...] ভবিষ্যতের প্রজন্ম আমাদের ঈর্ষা করবে, আমরা এমন সব ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা এই দেশটাকে গড়ে তুলেছে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর কথা যদি বলি, তাঁর সময়ে আমরা বেঁচে ছিলাম। তাঁকে আমরা সাতই মার্চের ভাষণ দিতে দেখেছি, তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি পেতে দেখেছি, তাঁকে আমরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় পেয়েছি। এই পুরো ব্যাপারের যে প্রত্যক্ষদর্শী, এটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হবে। এমনকি তারা বলবে, আপনারা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আপনাদের লেখার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেছেন। [...] আমি যে লেখা লিখে চলেছি, [...] তার ভেতরে আমার স্বপ্নগুলো রেখে যাচ্ছি। (সাক্ষাৎকার : জীবন ও বন্ধুত্ব, *থিয়েটার*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ঢাকা, ৪৬ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১৩১

চেয়েছেন, তখনই ক্ষমতা-অন্ধ ভ্রষ্টাচারী রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। দেশশাসনের অধিকার হারায় মানুষ। দেশে দেশে কালে কালে জননন্দিত নেতাদের হত্যা করে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যে ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়, এবং জনস্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থকে বড়ো করে দেখে, গণনায়ক ওসমানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে-বক্তব্যই প্রতিপাদনের প্রয়াস পেয়েছেন সৈয়দ হক। শেকসপিয়রের *জুলিয়াস সিজার* নাটকটিকে সমকালীন জনজীবনের সঙ্গে লগ্ন করে তিনি তাঁর অসামান্য নাট্যপ্রতিভাকেই সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এ-নাটকে।

মরা ময়ূর

সৈয়দ শামসুল হক রচিত কাব্যনাটকগুলোর মধ্যে স্বল্পায়তনিক কাব্যনাটক *মরা ময়ূর* (২০১২)। এটি মূলত তাঁর রচিত ইংরেজি নাটক দ্য ডেড পিকক (১৯৯০)-এর বঙ্গানুবাদ।[১] স্বল্পকায় হলেও কাব্যনাটকটিতে নাট্যকারের প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। এখানে সৈয়দ হকের নিরীক্ষাধর্মী মননের আরও বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

মরা ময়ূর রূপক ও সাংকেতধর্মী নাটক। এখানে রূপকার্থে সমকালীন রাজনীতি, বিনষ্ট সভ্যতা ও সামাজিক পঙ্কিলতা উপস্থাপন করা হয়েছে; যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা শোষক হয়ে ওঠে, সামান্য খাদ্যাভাবে মানুষ মনুষত্ব হারায়; অর্থাভাবে, রোগে-শোকে ভুগতে ভুগতে বিবেককে গলা টিপে হত্যা করে। নাটকটি প্রথম বাংলাদেশের মঞ্চে আসে ২০১৩ সালে নাট্যদল 'চারুণীড়মে'র পরিচালক গাজী রাকায়েতের হাত ধরে। গাজী রাকায়েত নিজে নাটকটির এই রূপকধর্মিতা ও নান্দনিকতা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> The dead body of peacock is a symbol of urban hypocrisy through which the cleaner claims to lose his love. The play has every element of modern theatre, including metaphors, satires and more and we tried to do justice to it. We have plans to take the production abroad. [২]

---

[১] *The Dead peacock* an experimental drama by Syed Shamsul Haq, had been written in English during his stay in London in 1990. Recently, the play has been translated into Bengali as *Mora Moyur* by the litterateur himself. (*THE ASHIAN AGE*, Dhaka, 18 october 2016, Entertainment Desk.)

[২] সূত্র: প্রাগুক্ত

বস্তুত 'দেশভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক একটি মাইলফলক। যিনি ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যকে গ্রামনির্ভরতা থেকে প্রথম নাগরিকমনস্কতায় তুলে ধরেন।'[১] এরই ধারাবাহিকতায় *মরা ময়ূর* কাব্যনাটকটিতেও নগরকেন্দ্রিক মানুষের নিষ্ঠুর জীবনবাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে।

মরা ময়ূরের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ঢাকা শহরের বস্তিতে বসবাসকারী একজন ধাঙড়ের জীবনের কর্মচাঞ্চল্য, হতাশা, প্রাপ্তি, ব্যর্থতা, স্বপ্ন আর বাস্তবতার বিস্তর ফারাক নিয়ে। ধাঙড়দের জীবনের কর্মচাঞ্চল্য শুরু কাকডাকা ভোরে; যখন পুরো শহরের মানুষ সুপ্তিমগ্ন থাকে। এ সময়ে ধাঙড়রা জমে থাকা অথবা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জঞ্জাল নিজহাতে কুড়িয়ে কিংবা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে শহরটিকে বসবাসের উপযোগী করে তোলে। নগরবাসী কেবল চকচকে পরিষ্কার শহরটাকেই দেখে; কিন্তু এর নেপথ্যে থাকা লোকগুলির জীবনকথা, সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই; তারা থেকে যায় সমাজে অস্পৃশ্য, অস্ফুট; তাদের জীবনে কেবলি অন্নাভাব, অর্থাভাব। রোগে-শোকে কাতর হলেও তাদের মেলে না চিকিৎসা; এমনকি তাদের জীবনলালিত ভালোবাসাও বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয় শহুরে 'ভদ্রলোক'শ্রেণির লাম্পট্য আর লালসার কাছে। তাই সর্বনাশা নেশার মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। এমনই এক ধাঙরের জীবনকথার উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখক সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপস্থাপন করেছেন তাঁর মরা ময়ূর কাব্যনাটকে।

বস্তুত, আলোচ্য নাটকে চরিত্র আর কাহিনির অন্তরালে মানুষের ভেতরকার রক্তাক্ত হৃদয়কথন এবং অব্যক্ত ও অধরা স্বপ্নগুলোর শিল্পিত উপস্থাপনই নাট্যকারের মূল অন্বিষ্ট। কেননা, 'তাঁর সকল রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বার বার 'মানুষ'- কেই পাওয়া যায়। মানুষ নিয়েই তাঁর ভাবনা। মানুষকে তিনি ভাষা, সমাজ ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে চিত্রিত করেছেন। ৬০ বছরের দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে যত সৃষ্টি তিনি করেছেন সব সৃষ্টিতেই মানুষকে তিনি কেন্দ্রে রেখেছেন। মানুষকে ঘিরেই রাজনীতি, দেশ, সমাজ ও কাল আবর্তিত হয়েছে তাঁর রচনায়।'[২] দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম উপস্থাপনায় তাঁর নাটকও তাই হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট।

সৈয়দ শামসুল হক যেমন *খেলারাম খেলে যা* (১৯৭৩) উপন্যাসে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর কারণে সমকালে তীব্র নিন্দা ও বির্তকের শিকার হন, তেমনি ২০১৪ সালে *মরা ময়ূর* প্রকাশের পর থেকে তিনি নতুন করে আবারও বিতর্কিত হন। তাঁর মুত্যুর পর ধর্মীয় মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হয় – কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান

[১] আহমেদ মাওলা, 'কথাকেবিদ সৈয়দ শাসুল হক', *কালি ও কলম* (অনলাইন সংস্করণ), ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ২০১৬

[২] লিয়াকত আলী লাকী, 'জয়তু সৈয়দ হক', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ গ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪২

যেন সৈয়দ শামসুল হকের জানাজা-দাফন-কাফন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত না হন। প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ এই গোষ্ঠী এসময়ে সৈয়দ হকের বিভিন্ন লেখনী থেকে কাট-ছাঁট করে পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। এসব উদাহরণের মধ্যে *মরা ময়ূর* কাব্যনাটকের প্রারম্ভে ধাঙড়কর্তৃক উচ্চারিত আজান বিষয়ক একটি সংলাপ অন্যতম। বলা হয়, এ সংলাপের মাধ্যমে আজানের সু-মধুর ধ্বনিকে অপমান করে সৈয়দ শামসুল হক সুচিন্তিত ভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন। এমন কি দৈনিক *প্রথম আলো*-র ঈদ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদকের বিরুদ্ধেও মুসলিম-প্রধান দেশে নাস্তিক্যবাদ প্রচারের অভিযোগ ওঠে।

মরা ময়ূর নাটকে বর্ণিত সময় খুব ভোরবেলা। অর্থাৎ যখন ফজরের নামাজের সময়কাল। এসময়ে ধাঙড় লোকটি যখন আবর্জনা ফেলার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামে, তখন চারিদিক থেকে একদল সর্বভুক কাক কর্কশ – কা কা স্বরে তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। লোকটি প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে প্রথমে কাকগুলিকে তাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু দলবদ্ধ কাকের বিচরণ, ঠুকরে ময়লাঘাটা ও কর্কশ আওয়াজ কিছুর উপরেই সে নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে না। এরমধ্যে চারপাশ থেকে উচ্চরবে শুরু হয় আজানের শব্দ। ফলত, কাকের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, মাইকের উচ্চস্বর মিলেমিশে তার শ্রবণশক্তি, ধৈর্যশক্তিকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। ফলে সে তখন কাককে উদ্দেশ্য করে বলে :

লোক।   কা কা কা! কা কা কা!! কা কা!!!
জন্মের মধ্যে কর্ম ওই – কা! কা! পারিস তো
আজানের আওয়াজটা ডুবিয়ে দে দেখি! দেখি গলার জোর! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮১)

উপর্যুক্ত সংলাপের প্রথম চরণভুক্ত কা কা শব্দের পরে বিস্ময়বোধক চিহ্নের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সারারাত নিদ্রাহীন, অভুক্ত ধাঙড়লোকটি – প্রথমত কাকের কর্কশ আওয়াজের ওপরই প্রচণ্ড বিরক্ত। আজান নয়, বরং তার বিরক্তির মূল কারণ ভোরের নির্জনতার বুকচিরে ভেসে-আসা সুউচ্চ শব্দ। বস্তুত, সমাজের অস্পৃশ্য শ্রেণিভুক্ত একজন সুইপারের ধর্মীয় মূল্যবোধ কিংবা ধর্ম-অবমাননা কিছুই ধারণ করা সম্ভব নয়। সে শুধু জানে ক্ষুন্নিবৃত্তি; জানে কীভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। ফলে আজানের শব্দ কেবল নয়, যে-কোনো শব্দই তার কাছে তার শ্রমকাতর এ-মুহূর্তে অতি বিরক্তিকর বলে বিবেচিত হতে পারে। অন্যদিকে, মসজিদের নগরী বলে পরিচিত ঢাকা শহরে এত ভোরে আজানের শব্দ ছাড়া নাটকে অন্য শব্দের ব্যবহারও অযৌক্তিক ও আরোপিত মনে হবার সম্ভাবনা ছিল। ফলে আজানের শব্দটির প্রয়োগ কিংবা কাকের শব্দ দিয়ে

আজানের শব্দকে ডুবিয়ে দেবার আহবান মুসলমানদের মনে আঘাত দেবার জন্যে নাট্যকার রচনা করেননি, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। বরং জীবনযুদ্ধে পোড়-খাওয়া খাওয়া ধাঙড় লোকটি জীবনের প্রতি, কর্মের প্রতি যে অনেক বেশি বীতশ্রদ্ধ, তা বোঝানোর প্রয়োজনে নাট্যকার এ-সংলাপটি ব্যবহার করেছেন।

প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মব্যবসায়ীরা যে পুরো নাটক না পড়েই নাটকের খণ্ডিত অংশ নিয়ে নাট্যকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিল, তা ছিল মূলত লেখকের প্রতি মৌলবাদী-গোষ্ঠীর পূর্বতন বিদ্বেষের অংশ। কেননা, নাট্যকার সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও, পরোক্ষভাবে দেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের একজন বড়ো সমর্থক ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর বিরুদ্ধ পরিবেশে দাঁড়িয়েও তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। তাঁর প্রায় সবগুলো কাব্যনাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে বঙ্গবন্ধু-হত্যার তীব্র নিন্দা করেছেন, এবং পরবর্তী দিনগুলিতে এই হত্যার বিচার না হওয়া প্রসঙ্গটি তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। নব্বইয়ের দশকে শহীদ-জননী জাহানারা ইমামের (১৯২৯-১৯৯৪) সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এদেশ থেকে রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ বাহিনির শেকড় উৎপাটন করতে *ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি*তে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। ফলত, এসব বিষয় মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পরাজিত শক্তি ও তাদের এদেশীয় সমর্থকদের গাত্রদাহনের কারণ হয়। যার ফলে শুরু থেকেই নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠীর হিংস্র আক্রমণের শিকার হন।
বস্তুত, মৌলবাদ-সমর্থিত রাষ্ট্রব্যবস্থা বরাবরই গণমাধ্যম, লেখক-প্রকাশকের বাক-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। যখনই কোনো প্রগতিশীল লেখক প্রগতির পক্ষে কথা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণমানুষের অধিকার, নারীস্বাধীনতা, লৈঙ্গিক বৈষম্য দূরীকরণ নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন – তখনই তাঁদের নাস্তিক্য অপবাদ দিয়ে একঘরে করার চেষ্টা করা হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত নাটক দ্য ডেড পিকক যখন রচনা করেন, তখন এদেশের শাসনক্ষমতায় ছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। এরা 'নব্বইয়ের পর থেকেই বিভিন্ন কারণে নিজেদের দুনীতি, অপকর্ম, স্বজনপ্রীতির তথ্য প্রকাশের 'অপরাধে' [...] ভেতরে ভেতরে চক্রান্তও করেছে স্বাধীন ও সাধারণ মানুষের পছন্দের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতি করার।'[১] নাট্যকার তাঁর *মরা ময়ূর* নাটকেও এই মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং দেশ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি সরিয়ে যারা দেশকে পুরাতন পাকিস্তানের আদলে সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, তাদের প্রতি তীব্র

[১] দ্রষ্টব্য : '*প্রথম আলোর* সম্পাদক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রতিক্রিয়া', *দৈনিক প্রথম আলো* (অনলাইন সংস্করণ), ঢাকা, ২১ জানুয়ারি ২০২০,

কটাক্ষ হেনেছেন। নাটকের শেষপর্যায়ে যখন নারী চরিত্রটির নাটকীয় রূপান্তর ঘটে, যখন তার কোমল শান্ত মুখাবয়ব থেকে বেরিয়ে আসে সত্যস্বরূপ; কণ্ঠে থেকে নিঃসৃত হয় পরিবর্তিত ভাষারূপ। বাংলা নয়, তার ভাষা-সংলাপে উঠে আসে উর্দু ভাষা। প্রতিশোধপরায়ণ কণ্ঠে সে বলে ওঠে :

হঠ যাও সব, হঠ যাও!
তফাৎ তফাৎ হো যাও!
দেখো মেরি জান,
হামারি হাত ছে ক্যায়সে বানউ
দেশ মে নয়াস্তান।
ফির নারা লাগায়া! ফির মেশিনগান!
হল্ট! মেশিনগান ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯৬)

আলোচ্য নাটকের এই নারী চরিত্রটি মূলত একটি প্রতীকী চরিত্র। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় আসীন সামরিক সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি চর্চায় উৎসাহ যুগিয়েছে। বন্দুকের নলের জোরে ক্ষমতায় বসে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে পাকিস্তানের আদলে ধর্মভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চর্চা করেছে। আশির দশকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের ধারায় স্বৈরাচারী শাসক পদত্যাগে বাধ্য হলেও এর অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, অচিরেই দেখা গেছে তারাও সামরিক শাসকের সেই পুরোনো নীতি থেকে বের হতে পারেনি। বরং দেশবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তবতায় বাংলাদেশের বিনষ্ট রাজনীতি আর স্বার্থান্ধ ক্ষমতার প্রতীক হয়ে উঠেছে নাটক-বর্ণিত এই নারী; যার ক্ষমতারোহণ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে হয়নি; বরং তার পেছনে যে ছিল আর্ন্তজাতিক ষড়যন্ত্র, এবং পাকিস্তানের অপপ্রভাব, তা 'হঠ যাও, হল্ট, মেশিনগান' প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগে সুস্পষ্ট হয়েছে। ১৯৭১ এবং তৎপূর্ববতী সময়ে পাকসেনা-শাসিত সরকারব্যবস্থা যেভাবে এদেশের জনগণের মৌলিক অধিকারকে বারবার ক্ষুণ্ন করেছে, অস্ত্র ও মেশিনগানের ভয় দেখিয়ে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করতে সচেষ্ট থেকেছে, নাটকের এই নারী চরিত্রটিও তেমনিভাবে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সত্যভাষী ধাঙড় ও ধাঙড় সর্দারকে তার পথ থেকে সরে যেতে হুকুম দিচ্ছে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রচলনের দাবিতে এদেশের ভাষাসংগ্রামীরা রাজপথে আত্মদানের মাধ্যমে যে-ইতিহাস তৈরি করেছে, তাকে অবজ্ঞা করে ইংরেজি ও উর্দু ভাষার মিশ্রণে সংলাপ বলেছে নারী চরিত্রটি।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে, এ সময় জিন্নাহকর্তৃক উর্দুভাষাকে অখণ্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার একপেশে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে লাখো বাঙালি রাজপথে নেমে আসে। ধীরে ধীরে উপ্ত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়, এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় ভাষারাষ্ট্র বাংলাদেশ। কিন্তু এদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদীগোষ্ঠী বরাবরই বাংলাভাষাকে তাদের নিজেদের ভাষা হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার প্রাণের স্লোগান জয় বাংলাকে পঁচাত্তর-পরবর্তী অস্থির সময়ে যারা বর্জন করে 'নারায়ে তকবির', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানের আদলে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' স্লোগান প্রচলন করে; – নারী চরিত্রটির মুখে উর্দুভাষায় উচ্চারিত শব্দাবলি আমাদের সেকথাই নির্দেশ করে। এবং নারী চরিত্রটি উর্দুভাষাতেই ঘোষণা দিচ্ছে প্রাণের বাংলাদেশকে তিনি পুনরায় পাকিস্তানের আদলে নয়াস্তান বানাতে চান। বলাবাহুল্য এ 'নয়াস্তান' যে ১৯৭১ পূর্ব অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতিরূপ সেটি পাঠক দর্শকের বুঝে নিতে সমস্যা হয় না। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ণের সময় সংবিধানের প্রথম পাতাতেই স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন 'প্রজাতন্ত্রের ভাষা হইবে বাংলা।' কিন্তু পঁচাত্তরের কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর একের পর এক সামরিক সরকার বাংলাকে ব্রাত্যজনের ভাষারূপে চিহ্নিত করে, এবং বিজাতীয় ভাষাকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন এক লেখায় আক্ষেপ করে জানান :

> ১৯৭৫ সালের পর ইংরেজি ভাষাপ্রীতি সৃষ্টি করেছে একটি বিশেষ শ্রেণী। ইংরেজি স্কুল, অফিস-আদালতে ইংরেজি চর্চা এবং যারা বাংলা চর্চা করে তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনম্নন্যতাবোধ তৈরি করা হয়েছে। শাসকরা সুপরিকল্পিত ভাবে আবার বাংলা ভাষাকে ব্রাত্যজনের ভাষা আর ইংরেজিকে শাসকশ্রেণীর ভাষা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। [১]

আবার, নাটকের শেষের দিকে রহস্যময়ী নারীচরিত্রটি যখন প্রচণ্ড আলোকচ্ছটার মাঝে নিজের প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন করে, তখন সে উন্মত্ত আক্রোশে ধাঙড় ও ধাঙড়-সর্দারকে লক্ষ করে বলতে থাকে :

আগুনে আমার ভোটের বাকসো
পুড়ে হয়ে যায় ছাই!
আমি কচকচ করে খাই
প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের সবকটা পৃষ্ঠাই।

---

[১] মুনতাসীর মামুন, 'রাষ্ট্রভাষা আজ ব্রাত্যজনের ভাষা', *বন্দুকের ছায়ায় গণতন্ত্র*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৫

আমি থু থু দিই জনতার মুখে
যত আছে ভুখা নাঙা,
জানিসনে তোরা আমার স্বপ্ন
ওই নৌকার হাল ভাঙা!
মুক্তিযুদ্ধ, সোনার স্বদেশ, স্বপ্নের সব বাড়ি –
ভেঙে ফেলি আমি –
লাথি মারি – লাথি মারি !
আরো কী ?
ইতিহাস আমি চিবিয়ে চিবিয়ে
থেতো করে তবে ছাড়ি ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯৫)

আলোচ্য সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার বেশ কয়েকটি চিত্রের সমন্বিত উপস্থাপন ঘটিয়েছেন। এখানে যেমন জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ভোট জালিয়াতি, ভোট ডাকাতির মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহণের কুৎসিত দিকটি প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে পঁচাত্তর-পরবর্তীকালের একাধিক সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের উদারনৈতিক সংবিধানকে একটি সাম্প্রদায়িক সংবিধানে পরিণত করার হীনচক্রান্তের দিকটিও স্পষ্ট হয়েছে। বস্তুত, 'পাকিস্তান ছিল ধর্মান্ধতা ও ধর্মব্যবসায়ী, পশ্চাদমুখী, গণতন্ত্রহীন বন্দুকধারী পরিচালিত রাষ্ট্রের প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধ ছিল ঐ বৃত্ত ভেঙ্গে প্রজাপতির মতো রঙিন পাখা মেলে মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ানো। বাঙালির সে আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানে।'[১] কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর একে একে হত্যা করা হয় এমন জাতীয় চার বীরকে, যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাহাত্তর সালে প্রণীত সংবিধানের ১ থেকে ৫ সংখ্যক স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এরপর সামরিক শাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে ৭২-এর সংবিধানে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা – এ প্রধান চারস্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সংবিধান, জিয়াউর রহমান সেটিকে সংশধোনের নামে সাম্প্রদায়িক রঙ যুক্ত করেন, যেটি ছিল বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ও নীতির পরিপন্থী।'[২]

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আরেক সামরিক শাসক জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ; তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক আদর্শ ও বৈদেশিক-নীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে, জেনারেল এরশাদ হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ উপাধি 'নিশান ই হায়দার' পেয়েছেন। তিনিও ক্ষমতায় এসে প্রথমেই বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনে মাঠে নামেন; এবং অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, নানান পট পরিক্রমায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে পালাবদল হলেও পরবর্তীকালে কোনো সরকারই মৌলবাদী গোষ্ঠীকে ভোটের রাজনীতিতে তুষ্ট রাখার প্রয়োজনে এই সংশোধনীগুলোর কালিমা মোচনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। আলোচ্য সংলাপে নাট্যকার বাংলাদেশের রাজনীতির এই অন্ধকার দিকগুলি বাস্তবতার নিরিখে শ্লেষাত্মক ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

নাচকে ধাঙড় চরিত্রটি অতি দুঃখের সঙ্গে জানায় – সে এমন একটি সময় ও সমাজে বাস করে, যেখানে তার নিজের বলতে কিছুই নেই। নিজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি তো দূরের কথা, ঈশ্বরদত্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপরও তার কোনো অধিকার নেই। এগুলি সমাজের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে; ক্ষুধার কাছে জিম্মি হয়ে গেছে; রাজনৈতিক নেতার স্বার্থোদ্ধারে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। ধর্ম, রাজনীতি, প্রশাসন মিলে-মিশে সমাজের নিম্নবিত্তকে শাসন-শোষণ করছে। ফলে নিজের ওপরও এই গরিবদের নিয়ন্ত্রণ নেই। ধাঙড় ব্যক্তিটি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বিদ্যমান সমাজের এই অসঙ্গতি প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছে :

> আর এই যে হাত, নেতাদের দখলে কবেই চলে গেছে!
> নেতারা যখন ময়দানে বক্তৃতা ঝাড়ে,
> এই হাত দুটো তখন তালি মারে, জোর তালি!
> আর এই চোখ, এই যে চোখজোড়া দেখছেন,
> কিছুদিন থেকে পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব
> কবলা করে নিয়েছেন – (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৪৮৬)

আলোচ্য নাটকে ধাঙড় ও ধাঙড়-সর্দারের পারস্পরিক সম্পর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে নাট্যকার রাজনীতির আরেকটি মৌল দিক তুলে ধরেছেন। এটি হল – দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্যের রাজনীতি। ধাঙড়-সর্দার সিটি করপোরেশনের নিম্নপদস্থ চাকুরীজীবী। কিন্তু ধাঙড়ের তুলনায় কিছুটা উচুঁশ্রেণির হওয়ায় তার কণ্ঠ ও ভাষায় রয়েছে প্রভুত্বের বলিষ্ঠতা। ধাঙড়কে কারণে-অকারণে পরিহাস করা, তার দুর্বলতা নিয়ে তামাশা করা,

এমনকি তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় তাকে চাকুরিচ্যুত করার হুমকি দেওয়া – প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান দরিদ্রশ্রেণির মধ্যেও ভেদাভেদের দৃশ্যটি পরিষ্কার হয়েছে। ধাঙড়সর্দার এখানে নিম্নবিত্ত, গরিব। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসের কুবের মাঝির মতো এখানে ধাঙড় লোকটি গরিবের মধ্যেও গরীব; ছোটলোকের মধ্যেও ছোটলোক। যে কারণে সে অনায়াসেই ধাঙড় সর্দারকর্তৃক তিরস্কৃত হওয়াকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়ে তার সঙ্গে জীবনের একান্ত বিষয়গুলো বিনিময় করেছে। তাকে আপন ভেবে শুনিয়েছে জীবনের হতাশা, ব্যর্থতা আর স্বপ্নের অজানা আলেখ্য। ধাঙড়সর্দারও ধাঙড়ের জীবনকথা শ্রবণ করে তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে, সান্ত্বনাবাক্যে তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছে, এবং তাকে সামরিক-মদদপুষ্ট সরকারের শাসনামলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আলাপ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। হতে পারে ধাঙড়সর্দার নিজেও একদিন ধাঙড়ের মতোই মানবেতর বস্তিজীবন পার করে এসেছে। তাই এ জীবনের অলি-গলি তার জানা। এ জীবনের কষ্টগুলো, দুঃখগুলো অতি পরিচিত। কিন্তু জীবন পরিক্রমায় আজ অপেক্ষাকৃত কিছুটা উঁচু অবস্থানে উঠে সে অপরতাবোধে (otherness) ভুগছে। কেননা সে সমাজে বিদ্যমান শ্রেণি-বিভাজনচক্রের বাস্তবতার আলোকে দেখেছে – উঁচুতলার মানুষেরা নিচুতলার মানুষের সঙ্গে কী ভাষায় আলাপ করে, তাদের কতটা হীন দৃষ্টিতে দেখে থাকে। ফলে সে ধাঙরের প্রতি সংবেদনশীল হয়েও নিজ অবস্থান, পদ আর শ্রেণির কথা সচেতনভাবে মাথায় রেখে ধাঙড়ের সঙ্গে প্রভুত্বসুলভ আচরণ করে গেছে। এর বাস্তব প্রমাণ নাটকের মাঝখানে যখন দামি গাড়ি চাপিয়ে স্ত্রীলোকটি ঘটনাক্ষেত্রে আসে, তখন সর্দার কথাপ্রসঙ্গে তাকে আপাত মাতাল ধাঙর লোকটির সরল-কোমল হৃদয় প্রসঙ্গে জানাতে ভোলে না । কিন্তু সে আবার গাড়িওয়ালা নারীর শ্রেণি-অবস্থান আন্দাজ করে তাকে তুষ্ট করতে নিমিষেই ধাঙরকে চাকুরিচ্যুত করার ঘোষণা দেয়। এমনকি উচ্চবিত্ত নারীটিকে খুশি করতে নিজেই উদ্যোগী হয় রাস্তা থেকে জঞ্জাল সরানোর কাজে। সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকের স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মন ও মনস্তত্ত্ব পাঠক-দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। আবার, ধাঙড় চরিত্রটির আরেকটি সংলাপের মাধ্যমে সৈয়দ শামসুল হক সমকালীন সমাজমানসের প্রতিচ্ছবি অংকন করেছেন নিম্নরূপে :

> সারা শহর আবর্জনায় বুঁজে এসেছে। গন্ধ! গন্ধ!
> কী দুর্গন্ধ রে বাবা!
> গলা নোংরা পচা আবর্জনার পাহাড়!
> শহরটাকে চেপে ধরেছে। [...]

নাহ, কাক তো কাক! মানুষও আজকাল!

কেউ কাউকে দেখে না! সাহায্য করে না!

উহ, দুর্গন্ধ! নাক চেপেও নিস্তার নেই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮২)

বস্তুত, ধাঙড় লোকটি নিজ জীবন-যন্ত্রণায় আত্মমগ্ন হয়ে সবকিছু ভুলে থাকতে চায় ; ভুলে যেতে চায় জাগতিক সব কলরব। যে কারণে চারপাশের আওয়াজ তাকে প্রচণ্ড উত্যক্ত ও বিরক্ত করে তোলে। তার এই বিরক্তি যে কেবল বিরুদ্ধ প্রকৃতির ওপর নয়, বরং শহরের মানুষরূপী অমানুষের ওপর – তা অচিরেই প্রকাশ পায়। তার ভাষায় গলা-পচা আবর্জনার পাহাড় শহরটাকে চেপে ধরেছে। চারপাশে কোনো পবিত্রতা নেই, শুদ্ধতা নেই। তীব্র দুর্গন্ধময় আবর্জনায় শহরটা যেন বুঁজে এসেছে। কিন্তু এগুলো পরিষ্কার করার লোকের বড়ো অভাব। যাদের দায়িত্ব এই আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করার – তারা কেউই তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না। বস্তুত, এই ময়লা কেবল দৃশ্যমান সড়কের ময়লা নয়; বরং নাগরিক মানুষের দূষিত হৃদয়; যেখান থেকে মানবিকতা, সততা, কর্মনিষ্ঠা উধাও হয়ে গেছে; জেঁকে বসেছে প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-কুটিলতা। নাট্যকারের মতে, মানুষ আজকাল কাকের থেকেও নিকৃষ্ট প্রাণী হয়ে উঠেছে।

মৃত ময়ূরটি আলোচ্য নাটকে একটি প্রতীক মাত্র। তাই সেটিকে ঘিরে বাস্তবতার পাশাপাশি নাটকীয় মুহূর্তও তৈরি হয়েছে একাধিকবার। যেমন, একটি পর্যায়ে ধাঙড় সর্দার অবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছে – মরা ময়ূরটি ক্রমশ ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। এ-দ্বারা নাট্যকার সমকালীন সময়ে বিনষ্ট রাজনীতি ও বিপর্যস্ত সমাজে মানুষের বিবেকহীন হয়ে নির্জীব প্রাণে পরিণত হবার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর এরই মধ্যে চলেছে মানুষের স্বার্থান্ধ হয়ে বিলাসিতা পূরণের কারবার। বস্তুত, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ধ্বংস করে প্রকৃতিকে বিলাসের সামগ্রী করে তোলার ইতিহাস মানবসভ্যতায় বহুদিনের। যেমন, ময়ূরের পালক কলম কিংবা পাখারূপে প্রাক্তন রাজা-বাদশাহরা তাদের নিত্যদিনের কর্মযজ্ঞে বিলাস-সামগ্রীরূপে ব্যবহার করতো। কিন্তু এখন রাজতন্ত্রের বদলে ক্ষমতায় আসীন সামরিক মদদপুষ্ট শাসক। যে সামরিক বাহিনী দেশের প্রতিরক্ষায় সদাসর্বদা নিয়োজিত থাকার কথা, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। তারা কখনো সরাসরি শাসকের ভূমিকা নিয়েছে, আবার কখনো কখনো ছায়া-শাসক হয়ে ক্ষমতাসীন দলকে প্রভাবিত করে নিজেদের ব্যাক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিল করেছে। পূর্বেকার রাজা-বাদশাহদের বিলাসী জীবন এখন পরিণত হয়েছে সামরিক বাহিনীর বিলাসী জীবনে। অথচ জনগণ রয়ে গেছে সেই আগের মতোই – বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত, নির্যাতিত। সৈয়দ শামসুল হক *মরা মূয়ুর* নাটকে রাজনীতির এই বিনষ্ট দিকটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন সর্দার চরিত্রটির সংলাপে, যেখানে একদিকে যেমন সমকালীন স্বার্থান্ধ

রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মানুষের স্বার্থপরতার নগ্নরূপটিও প্রকাশিত হয়েছে মৃত ময়ূরটির দ্রুত পালক খসানোর ঘটনায়। ময়ূরটির মরেও নিস্তার নেই। ধাঙড় সর্দারের প্রাসঙ্গিক সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

তাজ্জব মরা! মরেছে তো মরেছে,
প্রতি মুহূর্তে ফুলে ডাবল হচ্ছে।
আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।
আর, মানুষেরাও যেমন!
এরই মধ্যে ময়ূরের পালক তুলে সাফ!
রোজ তো আর ময়ূর পাওয়া যায় না।
ময়ূরের পালক দিয়ে চমৎকার কলম হয়। হাত পাখা হয়।
আগে রাজা বাদশারা ময়ূরের পাখা দিয়ে হাওয়া খেতেন,
এখন তো মিলিটারি জেনারেলদের ভাগ্যে
ময়ূর পাখার হাওয়া খাওয়া!
অবাক কী! রাত পোহাতে না পোহাতেই
ময়ূরের পালক সব উপড়ে নিয়ে গেছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮৩)

আবার, ধাঙড় চরিত্রটি একদা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের আশায় সস্ত্রীক শহরে এসেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও সে প্রতারণার শিকার হয়। তার স্ত্রী এক গাড়িওয়ালার প্রলোভনে তাকে ত্যাগ করে। স্ত্রী চলে যাবার বেশ কিছুদিন পরে একবার ধাঙড়ের সঙ্গে তার দেখা হয় সংসদ ভবনের রাস্তায়। তখন সে আর সেই সাদামাটা গরিব ঘরের মেয়ে নয়; বড়লোক রাজনীতিবিদের সান্নিধ্যে এসে সে নিজেকে আমূল বদলে নিয়েছে। তাকে দেখে ধাঙড়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সংসদভবনের সামনে থাকা খাঁচাভর্তি আশ্চর্যসুন্দর পাখিগুলোর মতোই তার বউকে মনে হয়। বড়লোকেরা বিলাসের নেশায়, শখে বনের মুক্ত পাখিকে যেমন খাঁচায় পোষে, তার স্ত্রীও তেমনি উন্নতজীবনের মোহে, লোভ-লালসার খাঁচায় বন্দি হয়েছে। এ পর্যায়ে ধাঙড় যখন রাজনীতিবিদদের নিয়ে শ্লেষাত্মক সংলাপ উচ্চারণ করে, তখন ধাঙড়-সর্দার তাকে সতর্ক করে যে – এখন এমন একটি সময় ও সমাজ চলছে, যেখানে রাজনীতিবিদ নিয়ে সামান্য কথা বলাও গর্হিত অপরাধ। রাশিয়ার প্রসঙ্গ তো দূরে থাক, আমেরিকা, চীন, ভারত, ইসরায়েল, আফ্রিকা কারো নামই নেয়া যাবে না। কেননা, ক্ষমতাসীন সরকারের পছন্দের তালিকায় এরা নেই। এদের কথা তুললেই তাকে বিরুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ভাবা হবে এবং

প্রতিশোধ নেয়া হবে। এর দ্বারা সমকালীন রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং লোকজনের বাক-স্বাধীনতা হরণের বাস্তব পরিস্থিতি সহজেই অনুমান করা যায়। ধাঙড়সর্দারের বক্তব্য উল্লেখ্য :

সর্দার । চুপ ! একবারে চুপ!
রাজনীতি তুলবে না!
গ্যাঁড়াকলে পড়লে
তখন বোলো না।
আমি তোমাকে সাবধান করিনি।
কান পেতে আছে! চারদিকে!
আর, ওই রাশিয়া –
ভুলেও কখনো উচ্চারণ করবে না।
না আমেরিকা, না চীন –
মুখ এক্কেবারে খুলবে না।
ইসরায়েল, আফ্রিকা – উঁহু, চুপ!
মুখ বন্ধ রাখবে!
এমনকি ভারতের ব্যাপারেও। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯০)

উপর্যুক্ত সংলাপের মাধ্যমে সমকালীন সরকারের বৈদেশিক-নীতিও অনুমান করা যায়। পাশ্চত্যের আধুনিক দেশগুলোর তুলনায় তাদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও পছন্দ ছিল মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোকে বশে নিতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পাকিস্তানের মতোই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাইতো। এ-সময়ে সাধারণ মানুষ কর্মসূত্রে মধ্যপ্রাচ্যে যেতে শুরু করেছে। একপর্যায়ে ধাঙড়ও এই স্রোতে গা ভাসাতে চায়। সেও স্বপ্ন দেখে আরবদেশে গিয়ে প্রচুর টাকা আয় করবে; এবং দেশে ফিরে প্রথমেই একটি মস্তবড় শাদা গাড়ি কিনবে। কেননা, তার বিশ্বাস এই গাড়ি আর নগদ অর্থই তার বৌকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। সমকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রের এই রাজনৈতিক দমন-পীড়ন, বাক-স্বাধীনতাহরণ এবং মাত্রাতিরিক্তভাবে আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রতি অনুরক্তি সর্দার ও ধাঙড়ের নিম্নোক্ত সংলাপে প্রতীয়মান হয়েছে চমৎকারভাবে :

লোক। আর দুবাই ?
বলবো না ?
আবুধাবি ?

সৌদি আরব ?

শুনেছি আমাদের এখান থেকে

লোকেরা পাগলের মতো আরব দেশে যাচ্ছে।

বিস্তর রিয়াল দিরহাম দিনার কামাচ্ছে।

আপনার জানাশোনা কেউ আছে ?

দয়া করে আমাকে নবীর দেশে

পাঠিয়ে দিন না ?

আমিও টাকা কামাতে চাই।

ইয়াব্বড় শাদা একটা গাড়ি কিনবো ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯১)

প্রবাসে গিয়ে ধাঙড়ের প্রচুর অর্থোপার্জনের স্বপ্নে বাধ সাধে ধাঙড়সর্দার। তাকে বোঝায় আরব বিশ্বের দেশে টাকা আছে সত্যি, কিন্তু নিয়মের বিষয়টি এতই কড়া যে, সেখানে কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এবং অবসরে সামান্য বিশ্রামকেও ওরা সহ্য করে না। বিশেষত সৌদি আরবে অপরাধের প্রকাশ্য সাজা হিসেবে মানুষের শিরশ্ছেদ হয়। ধাঙর লোকটি তখন সর্দারকে জানায় – সে তার মস্তক নিয়ে ততটা ভাবিত নয়, বিশেষত যেখানে পেটের ক্ষুধায় সে নিয়ত মৃত্যুর দিকে ধবিত হচ্ছে। এ পর্যায়ে সে সর্দার লোকটির কাছে আরও একটি গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। সে জানায় তার বৌ তাকে ছেড়ে যাবার পূর্বে আশ্বাস দিয়ে গেছে – সে ফিরে আসার সময় অগাধ টাকা পয়সা নিয়ে আসবে; ধাঙড়কে আর না খেয়ে থাকতে হবে না; থাকার মতো ঘর হবে, অসুখে চিকিৎসা হবে। ধাঙড় লোকটি পরবর্তীকালে তার প্রাক্তন স্ত্রী ও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আগন্তুক নারীটিকেও তার পূর্ব আশ্বাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে :

মনে পড়ে ? – সেই শাদা গাড়িতে করে যাবার সময়

তুমি আমাকে কী বলেছিলে ?

বলেছিলে না – তুমি আমার জন্যে ভাত আনবে,

কাপড় আনবে,

আমাকে তুমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে,

পেটের শূল ব্যাথাটার চিকিৎসা করাবে,

বুকের যক্ষ্মাটার জন্যে হাসপাতালে নেবে – বলোনি ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯৩)

বস্তুত, ধাঙড় লোকটির স্ত্রীর এই কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় ভোটের আগে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সঙ্গে। প্রতিটি নির্বাচনের প্রাক্কালে তারা যখন ব্যক্তিগত প্রচারে কিংবা জনসভায় সাধারণ

লোকের নিকট ভোট প্রার্থনা করেন – তখন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নানান মৌলিক অধিকার পূরণের অঙ্গীকার করে থাকেন। কিন্তু ক্ষমতা আরোহণের পর ভুলে যান জনগণকে দেয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি। তারা তখন আরাম-আয়েশে, বিলাস-ব্যাসনে মত্ত হয়ে নিজেদের স্বার্থে দেশ ও ক্ষমতাকে পরিচালনা করেন; ঠিক যেমন করে ধাঙড়ের স্ত্রী ভুলে গেছে তার পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা। এমন কি সে এখন ধাঙড় লোকটিকে চিনতেও পারছে না। ধাঙড় যখন নারীটিকে উদ্দেশ্য করে বলে – তাকে কি সে সত্যিই চিনতে পারছে না, নাকি তামাশা করছে, তখন ধাঙড়ের এহেন বক্তব্যে নারীটি তাকে ধমক দেয় এবং বেয়াদব বলে আখ্যায়িত করে। কেননা সে আর বিগত দিন, বিগত দিনের লোকজন কিছুই মনে রাখতে চায় না। ঠিক যেমন ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিক সাধারণ জনগণকে ভুলে যেতে চায় তেমনি। বস্তুত, এভাবেই সৈয়দ শাসুল হক আলোচ্য নাটকে একটি মৃত ময়ূরের প্রতীকে সমকালীন বিনষ্ট রাজনীতি আর বিপন্ন সমাজবাস্তবতার ছবি এঁকেছেন।

উত্তরবংশ

শক্তিমান কবি-নাট্যকার-কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, কলম-যোদ্ধা। দেশের যেকোনো সংকটে তাঁর নির্ভীক লেখনী জাতিকে সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখরাঙানি, জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর হুমকি, নেতিবাচক সমালোচনা, নিন্দা কিছুই তাঁকে সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি কখনো কোনোকিছুর বিনিময়ে তাঁর বিবেচনাবোধ ও শৈল্পিক নিষ্ঠার সঙ্গে আপস করেননি। একারণেই তাঁর সমগ্র কাব্যনাটকে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ, রাজাকারদের ভূমিকা, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, সুবিধাবাদী স্বৈরশাসক, অসাধু রাজনীতিক প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এসবের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সর্বশেষ কাব্যনাটক *উত্তরবংশে* (২০০৮)। এখানে তিনি সমকালীন রাজনীতি, সমাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ উপস্থাপনের সমান্তরালে **১৯৭১** সালের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত স্পষ্টাকারে শিল্পরূপ দিয়েছেন ।

তিনি যে সময়পরিসরে এই নাটক লিখেছেন, সে-সময় এদেশের রাজনীতিতে চলছে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপট; রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে সমরশক্তি, চলছে ছদ্ম সামরিক শাসন।[১] এর পূর্বে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বীরদর্পে তাদের গাড়িতে উড়িয়েছে লাল-

---

[১] এক লেখায় এদেশের বুকে সামরিক শক্তির উত্থান প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছিলেন :
এখন ফিরে দেখি আমার জীবনের অর্ধেকটাই, আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠদিনগুলোই কেটেছে চার জেনারেলের বুটের তলায়। (দ্রষ্টব্য : সৈয়দ শামসুল হক,'হৃৎকলমের টানে', *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ২৫৬)

সবুজের পতাকা। একদিকে জঙ্গিবাদের উত্থান, বাক-স্বাধীনতা হরণ, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, প্রগতিশীল রাজনীতিকদের দমন-পীড়ন-গ্রেফতার, বোমা-গ্রেনেড হামলা; অন্যদিকে মানবতাবিরোধী রাজাকার-আলবদরদের বিচারহীনতার সংস্কৃতি সমাজকে অন্ধকার ও হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সেই মজ্জমান, অবরুদ্ধ রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক দৃঢ় কণ্ঠে একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচার চেয়েছেন। জনগণকে তাদের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহবান জানিয়েছেন তিনি। 'দেশমাতা আর মাতৃভাষার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধাশীল এই শিল্পী-প্রতিভা বরাবরই সত্য আর বর্তমানের জিজ্ঞাসা রূপায়ণে নিষ্ঠাবান। ইতিহাস-ঐতিহ্য তাঁর সাহিত্যবোধের একটি প্রধান অনুষঙ্গও। উনিশশ' একাত্তর, পাকিস্তান-বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জনের সংগ্রাম, প্রতিকূলতা-অনতিকূলতা, বিপরীত স্রোতের মানুষ, সৃজনশীল সমাজের প্রত্যাশা-প্রচেষ্টা, বিবর্ণতা আর আনন্দ-বিষন্নতার গল্প সৈয়দ শামসুল হকের কবিতানাট্য *উত্তরবংশ*। [...] একজন নাট্যকার, তার কন্যা, আর তার এক রাজনীতিক বন্ধুকে ঘিরে মূলত আবর্তিত হয়েছে *উত্তরবংশ* কাব্যনাট্যের ক্যানভাস। তাদের আলাপচারিতায় নির্মিতি লাভ করেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, আমাদের প্রকৃত অর্জন, সাফল্য ব্যর্থতা। পাশাপাশি লেখক-উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন ব্যর্থতার কারণ আর বাতলে দিয়েছেন এ থেকে উত্তরণের পথ।'[১]

বস্তুত, 'আবহমান বাংলা ও বাঙালির অন্যতম সেরা ভাষাশিল্পী, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। [...] চিরকাল মানুষকে তিনি স্থান দিয়েছেন আর সবকিছুর উপরে। বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের ইতিহাস তিনি ধারণ করেছেন মর্মে মর্মে।'[২] তাঁর শিল্পিমানসের এই বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে *উত্তরবংশ* নাটকে। এ-প্রসঙ্গে *উত্তরবংশ* নাটকের নির্দেশক গোলাম সারোয়ার বলেছেন :

> মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশের সব মানুষ আরেক যুদ্ধ করে চলেছে বাংলাদেশের ভেতরে যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবি নিয়ে। কালের পরিক্রমায় এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে এগিয়ে আসে নতুন প্রজন্ম। এমনই একটি বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার তাঁর *উত্তরবংশে*।[৩]

---

[১] ড, ফজলুল হক সৈকত, *দৈনিক যায়যায় দিন* (অনলাইন সংস্করণ), ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯, সাহিত্যপাতা

[২] গোলাম সারওয়ার, সম্পাদকীয়, 'কালের খেয়া' সংখ্যা নম্বর : ৫০৯, *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৩

[৩] 'কণ্ঠশীলনের নতুন নাটক উত্তরবংশ' সংস্কৃতি সংবাদ, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৫ আগস্ট ২০১২

সৈয়দ শামসুল হক বর্তমান প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন যে কতটা জরুরি সে প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করেছিলেন একটি সাক্ষাৎকারে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

> এই যে বাংলাদেশ যুদ্ধের ভেতর দিয়ে এসেছে। গণতন্ত্র বিকৃত হয়েছে এখানে। আবার গণতন্ত্র ফেরত এসেছে, আবার বিকৃত হয়েছে। এই যে সময়কাল, এর ভেতর মানুষের প্রতিক্রিয়া পাল্টেছে। এই পাল্টানোর মাঝে একটা সাধারণ প্রবণতা আছে। এর মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ পরীক্ষিত হয়। সত্য কথা বলা উচিত, সত্য পথে চলা উচিত – এটা আগেও যেমন সত্য ছিল, এখনও আছে। কিন্তু রিঅ্যাকশন পাল্টাচ্ছে সময়ের উপর নির্ভর করে।[১]

মূলত, যুদ্ধাপরাধী এবং মানবতাবিরোধী অপরাধীদের প্রশ্নে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক বরাবরই আপসহীন এবং সোচ্চার ছিলেন। ২০০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধসংকলন *কথাসামান্যই*-এর 'না' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

> একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর কৃত বাংলার মাটিতে নৃশংসতম গণহত্যার বিরুদ্ধে বাঙালি বলে উঠেছিল না না না, জন্ম নিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা। বাংলার এই মাটিকে তারা মুক্ত করেছিল পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের বুকে লাথি মেরে, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ বিচারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, শোষণের বিরুদ্ধে উত্থানের দেহ ধরে। সেই বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের জাতক সেই আমাদের বাংলা, তিরিশ লাখ শহীদ আর বঙ্গবন্ধুর বুকের রক্তভেজা বাংলা, এই বাংলায় আমরা কি আরেকবার বলে উঠব না? – না না! না, আমরা ইতিহাস বিকৃতি মেনে নেবো না। না, আমরা গণতন্ত্রের নামে না-গণতন্ত্র মেনে নেব না। শাসনের নামে না-শাসন আর সইব না। বিচারের নামে প্রহসন আর চলতে দেব না। অধিকারের নামে অধিকার হরণ আর চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে ভয় দেখানো চলবে না। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা চলবে না। মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা চলবে না। রাজাকারকে বাংলার মন্ত্রী বানানো আর হতে দেব না। রাজাকারের গাড়িতে বাংলাদেশের রক্তসূর্য খচিত পতাকা আর উড়তে দেব না। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার ভিন্ন আমরা শান্ত হব না।[২]

বলা যায়, সৈয়দ শামসুল হক তাঁর সর্বশেষ কাব্যনাটক *উত্তরবংশ* রচনা করেছেন একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও যখন এদেশের মাটিতে একাত্তরের

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, (৭৭ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২০১২ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত একান্ত সাক্ষাৎকার : আবার ফিরে এই জীবনই আমি চাইব) পুনঃ প্রকাশ : 'কালের খেয়া', *দৈনিক সমকাল*, প্রাগুক্ত

[২] সৈয়দ শামসূল হক, 'কথা সামান্যই', 'না', *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

যুদ্ধাপরাধীদের উপযুক্ত বিচার সম্ভব হচ্ছিল না, বরং একাত্তরের কালোশক্তি এদেশের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্ধগোষ্ঠী দ্বারা পুর্নবাসিত হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় চড়ে বসেছিল, দেশবাসীর অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধকে হরণ করে ধর্মান্ধতা চাপিয়ে দিচ্ছিল, তখন সৈয়দ শামসুল হক নাটকটি রচনার মাধ্যমে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এখানে যেমন তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, তেমনি রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীর ঘৃণ্য ভূমিকার চিত্রাঙ্কন ইতিহাস-বিকৃতির মধ্যে বেড়ে-ওঠা নবীন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে চেয়েছেন। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখেছেন এদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের উপযুক্ত বিচার হবে, বিচার হবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের।

একথা সত্য যে, সৈয়দ শামসুল হকের জীবদ্দশায় তরুণপ্রজন্মের আন্দোলনের মাধ্যমে এ দুটি স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। এদেশের আদালত যখন একাত্তরের রাজাকার কাদের মোল্লার ঘৃণ্য অপরাধের বিচারে মাত্র যাবজ্জীবন শাস্তি দিয়েছে, তখন এদেশের তরুণ-ছাত্র সমাজ ক্ষোভে, দ্রোহে ফেটে পড়েছে। তারা গণজাগরণ মঞ্চ নির্মাণ করে এ রায়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে শহীদজননী জাহানারা ইমাম যে আন্দোলন শুরু করেও রাষ্ট্রিক বিরোধিতার যাঁতাকলে পড়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবারের উত্তরপ্রজন্ম আর থেমে থাকেনি; তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নতুন করে রায় বিবেচনা করেছে; পৃথক ট্রাইবুনাল গঠন করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত কাদের মোল্লাসহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির রায় প্রদান করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে জাতির জনকের খুনীদেরও বিচার করা সম্ভব হয়েছে। দেশ হয়েছে পিতৃহত্যার কলঙ্ক থেকে মুক্ত। ২০০৮ সালে *উত্তরবংশ* নাটকের মাধ্যমে সৈয়দ শামসুল হক যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, অনতিকাল পরেই সেটি সত্যে পরিণত হয়েছে। একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা শিল্পীর মতোই সৈয়দ শামসুল হক যেন এই ভবিষ্যৎ দেখতে পেরেছিলেন। নাটকের নামকরণ থেকেই সুস্পষ্ট হয় – অতীতে পূর্বপুরুষের কৃত ভুলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার এবং উত্তরপ্রজন্মকে সচেতন করে তুলতেই তিনি *উত্তরবংশ* নাটক রচনা করেছেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আহবান করেছেন :

> ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই ঘাতকের।
>
> ক্ষমা নেই দালালের।
>
> ক্ষমা নেই ধর্ষকের।
>
> [...] যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করো।
>
> সভ্যতা তোমাদের ডাক দিচ্ছে।

ইতিহাস তোমাদের আহবান করছে।

দেশমাতৃকা তাকিয়ে আছে।

আর কতকাল তোমরা নিষ্ক্রিয় নীরব থাকবে?

[...] আর কতকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে –

একটি বিচারের জন্যে ? [কাব্যনাট্যসমগ্র : (৬০৫)

মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ হক অসংখ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি যখনই কোন বিশেষ বক্তব্যের সঙ্গে একটি বৃহৎজনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন তখনই কাব্যনাটকের আশ্রয় নিয়েছেন। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে প্রান্তিক মানুষকে সম্পৃক্ত করা। যে কারণে এ-দুটি নাটক শহুরে শিক্ষিত শ্রেণির দর্শককে ছাপিয়ে গণমানুষের নাটকে পরিণত হতে পেরেছে। সৈয়দ শামসুল হক যখন মনে করলেন একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারছে না; বরং প্রগতিশীল কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিতে সমাজে মৌলবাদের উত্থান ঘটছে, জঙ্গিবাদ, বোমাহামলা, মুক্তচিন্তকের ওপর আঘাত বেড়ে চলছে, এবং এ বিষয়ে নেতা-বুদ্ধিজীবীরা যখন উপযুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন মানবতা বিরোধীদের সঠিক বিচারের নিমিত্তে উত্তর প্রজন্মকে এর সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। আর সে কারণেই প্রথমত তাদের প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা। কেননা পঁচাত্তর-উত্তর সময়ে এদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হতে হতে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এ-নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে দেয়া এক বক্তব্যে সৈয়দ শামসুল হক নাটকটির বিষয়বস্তু নিয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :

> পাঁচ বছর আগে যখন এই নাটকটি লিখি, তখন এর বিষয়বস্তু যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি এখনো সমান গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবী নিয়েই এই নাটক।[১]

উত্তরবংশ কাব্যনাটকের বিশাল একটি অংশজুড়ে রয়েছে বীরাঙ্গনা নারীকে অশ্রদ্ধার মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজকে হেয় করার হীন রাজনৈতিক চক্রান্তের চিত্র। সেইসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ প্রসঙ্গ। এমনকি নাটকের মূল ঘটনাটিই নারী নির্যাতনের বাস্তব ঘটনাকেন্দ্রিক। নাটকের অন্যতম নেপথ্য চরিত্র নাট্যকারের স্ত্রী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদারদের লালসার শিকার হয়ে দীর্ঘকাল ক্যাম্পবন্দি ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর হানাদারদের ক্যাম্প

[১] দ্রষ্টব্য : 'কণ্ঠশীলনের নতুন নাটক *উত্তরবংশ*' *দৈনিক প্রথম আলো*, প্রাগুক্ত

থেকে মুক্তি পেলেও আত্মগ্লানি ও বিবেক-দংশন থেকে তিনি এখনও মুক্ত হতে পারেননি। ফলে ক্যাম্প থেকে ফিরে নাট্যকারের সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্যসম্পর্ক তৈরিতে প্রতিমুহূর্তে জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। তবে নাট্যকারের দুর্মর ভালোবাসা আর অকুণ্ঠ সমর্থন তাকে কিছুটা স্বাভাবিক জীবন এনে দেয়। যার ফলে তাদের কোল জুড়ে আসে পরির মতো কন্যা সন্তান। অতঃপর দিনবদলের সঙেগ সঙ্গে রাষ্ট্রের অবস্থাও বদলে যেতে শুরু করেছে। যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাও ফিকে হতে শুরু করেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেটে বঙ্গবন্ধুর ক্ষতবিক্ষত শরীরের মতোই ঝাঁঝরা হতে শুরু করেছে রাষ্ট্রের শরীর। রাষ্ট্রপরিচালনায় ততদিনে গণতন্ত্রের স্থানে জায়গা করে নিয়েছে স্বৈরতন্ত্র। রাষ্ট্রের চার মূলনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দেশময় চর্চা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে জাতিসত্তার পরিচয়জ্ঞাপক অনুষঙ্গরূপে বেছে নেয়া হয়েছে। সমাজে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অরাজকতার প্রসার ঘটে চলেছে। অন্যদিকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করে প্রকৃতপক্ষে জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকেই গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তখন, যখন এদেশে সশস্ত্র স্বাধীনতাবিরোধীদের ফিরিয়ে এনে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে।[১] যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছে, তাদের হাতে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বপর্যায়ে এই বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে নাট্যকারের স্ত্রী হয়ে পড়ছেন বিস্ময়ে বিমূঢ়, তীব্রভাবে হতাশাগ্রস্ত। তাঁর মানসলোকে ভেসে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদারদের ক্যাম্পে নির্যাতিত হওয়ার সেই দুঃসহ স্মৃতি। নাট্যকারের স্ত্রীর হৃদয়ে ক্যাম্পে নির্যাতিত হওয়ার পুরাতন ক্ষত বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনি নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও অত্যন্ত শংকিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর উদ্বিগ্ন অবস্থাসূত্রে নাট্যকার তাঁর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

---

[১] ১৯৭২ সালে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু রাজাকার-আলবদর শ্রেণিকে এদেশ থেকে বিতরণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর দেশের নতুন সামরিক সরকার একে একে সেসব আইন ও বিধি অবৈধ ঘোষণা করে নতুন আইন করে দেশবিরোধীদের পুর্নবাসনে সাহায্য করে। ১৯৭৬ সালে ১৮ জানুয়ারি নাগরিকত্ব ফেরত পাবার জন্য তাদের মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে বলা হয়। যে সূত্র ধরে স্বাধীনতা-বিরোধীরা বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ পায়। (দ্রষ্টব্য : শেখ হাসিনা, 'বেগম জাহানারা ইমাম', *শেখ মুজিব আমার পিতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃ.৮৬-৮৭)

ততদিনে জাতির জনক নিহত,
মানুষের হাত থেকে ছিনতাই হয়ে গেছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা,
শুরু হয়েছে স্বৈরশাসন, রাজাকারের পুনর্বাসন।
ঘাতকদের দালাল দোসরদের ডেকে আনা হলো –
অভয় দেয়া হলো তাদের। তারা জাঁকিয়ে বসলো মাঠ।
আমাদের যুদ্ধের ইতিহাসকে তারা মুছে দিলো।
আমাদের সংবিধানকে তারা হত্যা করলো।
একাত্তরের বিজয় পরিণত হয়ে গেলো পরাজয়ে।
তোকে কোলে পেয়ে আরো অস্থির হয়ে পড়লো তোর মা
আতংক তার মনের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো দ্বিগুণ দশগুণ।
একেক রাতে কোল থেকে তোকে আছাড় দিয়ে ফেলে
তোর মা চিৎকার করে উঠতো – [...]
এই শিশুকেও একদিন ছিঁড়ে খাবে! [...]
কিছুতেই ভুলতে পারতেন না বাংকারেরর সেই দোজখ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০০)

পরিবর্তিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি নাট্যকারের স্ত্রীকে এতটাই বিধ্বস্ত ও এলোমেলো করে দেয় যে, তিনি নিজের তিন বছরের শিশু কন্যাকে রেখে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহননের পথ বেছে নেন তিনি। নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধকালে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গটি তাঁর প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এও উল্লেখ করেছিলেন। সে কাব্যনাটকের প্রধান নারী চরিত্র মাতবরের মেয়েটিও পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে আত্মগ্লানি আর হতাশায় জনসম্মুখে বিষপানে আত্মহত্যা করে। নাট্যকারের স্ত্রীর শঙ্কা যে অমূলক ছিল না তা পঁচাত্তর-উত্তর বাংলাদেশে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যখনই এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, তখনই ঘটেছে নারী নির্যাতনের মতো অপ্রত্যাশিত ঘৃণ্য ঘটনা। ১৯৯১ সালে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামে ব্যাপক নারী নির্যাতনের চিত্র দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতে *উত্তরবংশের* নারী চরিত্রের শংকাকে সত্যভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৯১ সালে লেখা ব্যক্তিগত দিনলিপিতে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা লিখেছিলেন :

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন ক্যাম্পে বাঙালি মেয়েদের বন্দি করে রেখেছিল এবং তাদের উপর নির্যাতন চালাত। [...] ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর কাছে হানাদার বাহিনীর

> আত্মসমর্পণের পর বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে যখন সেই নারীদের উদ্ধার করা হয়েছিল, তখন তাদের যে চেহারা আমরা দেখেছিলাম, আমার আজকের চট্টগ্রামকে দেখে সেই ধর্ষিতা বিবস্ত্রা নারীদের কথাই বারবার মনে পড়ছে। একমাত্র তাদের সাথেই আজ চট্টগ্রামের তুলনা করা চলে।[১]

১৯৭১ সালে যে-সকল মা বোন ধর্ষিত হয়ে আত্মগ্লানিতে ভুগে আত্মহত্যা করেছেন, তাদের মর্মান্তিক পরিণতির মতোই যন্ত্রণাদায়ক ছিল যারা বেঁচে থেকে ক্রমাগত নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলেন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। তাদের প্রত্যাশা করেছিলেন – স্বাধীন রাষ্ট্রে এই ধর্ষকদের বিচার হবে। কিন্তু তারা অত্যন্ত আশাহত চিত্তে দেখেছেন যে, রাষ্ট্র এই অপরাধীদের বিচার করার পরিবর্তে ডেকে এনে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়েছে। স্বাধীন দেশে বীরাঙ্গনাদের প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয়নি; বরং তাদের নামের তালিকা মুছে ফেলা হয়েছিল এই ভেবে যে, তাদের আলাদা কোনো পরিচয় না থাকাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক। অত্যন্ত গোপনে, নিভৃতে এসকল বীরাঙ্গনারা অতীত স্মৃতি বুকে চেপে দিনাতিপাত করে গেছেন। নীরবতা ভেঙে যদি দু-একজন নিজের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করে সমাজে এসকল অপরাধীর বিচার চেয়েছেন, তারাই হয়েছেন ধিক্কৃত, হাসিঠাট্টার পাত্র। নব্বইয়ের দশকে যখন জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে জনতার আদালতে রাজাকারদের প্রতীকী বিচারকার্য পরিচালিত হয়, তখন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দুজন নির্যাতিত নারী এসেছিলেন একাত্তরের মানবতাবিরোধীদের বিচার চেয়ে সাক্ষ্য দিতে। এরপর তারা যখন নিজ ঠিকানায় প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন তাদের সামাজিক ভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে। সে-সময়ে গণআদালতের একজন উদ্যোক্তা, শাহরিয়ার কবির সেই ঘটনা সম্পর্কে এক লেখায় জানিয়েছেন :

> শহীদ জননী জাহানারা ইমামেন নেতৃত্বে '৯২-এর ২৬ মার্চ যখন গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার হয় – কুষ্টিয়া থেকে তিনজন বীরাঙ্গনা ঢাকা এসেছিলেন সাক্ষ্য দিতে। তখন বিভিন্ন দৈনিকে তাঁদের কথা লেখা হয়। এঁরা তিনজন গ্রামে ফিরে নিজেদের আবিষ্কার করেন একরকম একঘরে অবস্থায়। লোকজন তাদের বিভিন্নভাবে বিদ্রূপ করেছে। তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে আরেক বিড়ম্বনা। একাত্তরের নির্মম ক্ষত আবার তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণের কারণ হয়েছে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবেন এ রক্তক্ষরণ বন্ধ হবে না। তাঁদের একজন ক্ষেভের সঙ্গে বলেছেন, বিচারের আশায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন। আজ অবধি তাঁরা বিচার পাননি অথচ প্রতিনিয়ত গঞ্জনার শিকার হচ্ছেন।[২]

---

১ দ্রষ্টব্য : শেখ হাসিনা, 'একানব্বইয়ের ডায়েরি', *শেখমুজিব আমার পিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

২ শাহরিয়ার কবির, ভূমিকা, *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *উত্তরবংশ* নাটকে ১৯৭১ সালে বেঁচে যাওয়া ধর্ষিত নারীর যে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নিগ্রহ ও রক্তমোক্ষণের তীব্র যন্ত্রণা তা নাট্যকারের স্ত্রীর যন্ত্রণার সঙ্গে সমীকৃত করে এ-নাটকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাট্যকারের বন্ধু, জনৈক নেতা যখন নাট্যকারের স্ত্রীর হতাশা ও প্রাক-আত্মহনন পর্বের তীব্র মানসিক দহনের কথা উল্লেখ করে বলেন – 'তোমার স্ত্রী বেঁচে ছিলেন তারপরও বারোটি বছর – / একবার মনে করে দ্যাখো কতটা আগুন নিয়ে দিন কেটেছে তাঁর' – তখন তার প্রত্যুত্তরে নাট্যকার জানান :

> সেই বন্দীশালা থেকে তার ফিরে আসবার পরে,
> আমি জানি, চোখেই আমি দেখেছি কী তার দহন!
> আর আমার অবিরাম চেষ্টা তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে।
> ফেরাতে যে পারিনি – প্রমাণ তার আত্মহত্যা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৭২)

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এ বিনষ্ট রাজনীতির কবলে-পড়া জনগণের দুর্দশার চিত্র এঁকেছিলেন। সেখানে গ্রামবাসী প্রশ্ন করেছিল, 'খুনি কে ?' ১৯৭৫ সালে নাট্যকারের লেখা এই প্রশ্নের জবাব সৈয়দ শামসুল হক তাঁর সর্বশেষ কাব্যনাটকে এসে যেন দিয়ে দিলেন। এখানে নেতা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন – রাষ্ট্রিক ও সামাজিক এই বিপর্যয়ে কালোশক্তির সক্রিয়তা যেমন দায়ী, তেমনি সমান দায় আছে এদেশের জনগণ, বিশেষত রাজনীতিবিদদের। কেননা যে প্রবল বিক্রমে এদেশের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, তারাই পরবর্তী সময়ে নিজেদের আদর্শ, নীতি ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ অপশক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় বসার পাঁয়তারা করেছেন, আবার কেউবা নির্লিপ্ত থেকে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে জনগণও স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চুপ থেকেছেন; ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তায় মগ্ন জনগণ রাষ্ট্রিক বিনষ্টি ও অধোগতির কথা একবারও ভাবেননি। স্ত্রীর নির্মম মৃত্যুর পরও নির্লিপ্ত থাকায় নাট্যকারকে উদ্দেশ্য করে নেতার উত্তর তাই – ধর্ষিত স্ত্রীর খুনী আসলে তারা নিজেরাই। তারাই নীরব থেকে অন্যায়কে সমর্থন দিয়ে গেছে। অর্থাৎ এ জাতিই এ জাতির প্রকৃত হত্যাকারী। এ প্রসঙ্গে নেতার সংলাপ :

> ব্যক্তিগত শোক আর দেশের জন্যে শোক – আমি আলাদা করে দেখি না।
> তুমি যদি জীবনসঙ্গী হারিয়েছো, দেশ তার রাষ্ট্রস্বপ্ন হারিয়েছে।
> তুমি যদি আগুনে দেখেছো তাঁকে আত্মহত্যা করতে –

আমি এই আমাদেরই দেখছি আদর্শকে বলি দিতে। [...]
আর দেশটাকে আমরা হাসতে হাসতে পঁচাপাঁকে পুঁতে ফেলেছি।
আমরাই আমাদের খুনি। আমরাই আত্মহত্যাকারী। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮৬)

নাট্যকার পিতার মুখে নিজ মায়ের এমন করুণ ও দুঃখজনক ইতিহাস শ্রবণ করে দ্রোহে-প্রতিবাদে ফেটে পড়ে নাট্যকারের মেয়ে। সে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, এত কিছু হয়ে যাবার পরও পিতা কেন রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদ করেনি; বরং মাকেই বলেছে মেনে নিতে, সব কিছু ভুলে যেতে। নিজের ঘরেই যখন সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে আপস করার কথা বলেছে, অন্যদের মতো ভুলে যেতে চেয়েছে, সেখানে সে কীভাবে লেখনীর মাধ্যমে জনগণকে দেশপ্রেমের গান শুনিয়েছে। দেশের শিল্পী-বুদ্ধিজীবী চরিত্রের এই দ্বিমুখী ভূমিকার কারণেই এদেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ঘাতক-দালালরা প্রশ্রয় পেয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আহমদ ছফা এই দ্বিধাগ্রস্ত পোশাকি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সম্পর্কে এক বলেছিলেন :

> যাঁরা মৌলবাদী তারা শতকরা একশো ভাগ মৌলবাদী। কিন্তু যাঁরা প্রগতিশীল বলে দাবী করে থাকেন তাঁদের কেউ কেউ দশ ভাগ প্রগতিশীল, পঞ্চাশ ভাগ সুবিধাবাদী, পনেরো ভাগ কাপুরুষ, পাঁচ ভাগ একেবারে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। [...] দিনে দিনে প্রতিক্রিয়ার শক্তি যে হারে সংহত হচ্ছে এবং মৌলবাদের প্রতাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা তার বিরুদ্ধে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ রচনাই করতে পারেননি।[১]

আলোচ্য নাটকে নাট্যকারের মেয়েও ঠিক তার লেখক-পিতার দিকে একই অভিযোগ তুলে বলেছে :

বাবা, বাড়িতে সংসারে, তুমি সেই কথাই বলেছো তোমার স্ত্রীকে
যে কথা আজ শত্রুরা দিনের পর দিন বলছে।
অথচ বাইরে তুমি – এই তুমি – কলমের তুমি – সভামঞ্চের তুমি
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় আগুন ধরিয়ে, মানুষের রক্তকে চঞ্চল করে
বক্তৃতায় মাইক ফাটিয়ে অবিরাম বলে গেছো – ভুলো না, স্বদেশ!
এই তোমার আশ্চর্য বিপরীত এক দেখছি, আমি বিস্মিত হচ্ছি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০১)

---

[১] আহমদ ছফা, *সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*, প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.১৩-১৪

নাট্যকারের মেয়ের মুখে এমন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ আর সাহস দেখে নাট্যকারও নতুন করে প্রেরণা ফিরে পান। তাঁর অন্তর্সত্তায় জেগে ওঠে অনুশোচনা আর অনুতাপ। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। মেয়ে যখন তাঁকে পরামর্শ দেয়, রাষ্ট্রিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর লোক-দেখানো প্রতিবাদ নয়, জাতিকে এবার জেগে উঠতে হবে সত্যিকার ভাবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ক্ষমতায় আসীন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কিংবা বাংলাদেশের অলিতে গলিতে লুকিয়ে থাকা মানবতাবিরোধী অপরাধীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তাদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। একাত্তরে যুদ্ধ হয়েছিল দেশের সার্বিক মুক্তির, দেশ স্বাধীন হবার পর এখন নতুন করে যুদ্ধে নামতে হবে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে। দেশকে করতে হবে কলঙ্কমুক্ত।

বস্তুত, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়টি সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। যখনই বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তখনই শাসকগোষ্ঠী কিংবা অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত রাষ্ট্রের জনসাধারণের উপর নির্যাতন পরিচালিত হয়েছে; অসংখ্য নিরপরাধ ব্যক্তি খুন হয়েছে, অসংখ্য নারী বীভৎস উপায়ে হয়েছে ধর্ষিত। মানবতার এই লঙ্ঘনই বিশ্বজুড়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ নামে পরিচিত। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের সংবিধি অনুসারে বলা হয়েছে যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, শ্রমে বাধ্যকরা প্রভৃতি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।[১]দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে নাৎসি বাহিনী কর্তৃক যে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়, তার বিচারের জন্য বিশ্বে প্রথমবারের মতো বিচারিক আদালত নুরেমবার্গ ট্রায়াল গঠিত হয়। নুরেমবার্গ ট্রায়ালে অভিযোগকারীরা বিচারের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে এ কথাই বলেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ নিরাপদ পৃথিবীর জন্যই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রয়োজন। এদের অপরাধের তালিকা করে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে যে, ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের কথা কেউই না ভাবে। বস্তুত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করাটাই একটি মানবিক অপরাধ; অন্যায়কারীকে সমর্থন দিয়ে আরও অপরাধ সংঘটনের সুযোগ করে দেয়ার নামান্তর।

বাংলাদেশে যখনই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলা হয়, তখনই একটি গোষ্ঠী তৎপর হয়ে ওঠে এই বলে যে – ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। ফলে যারা রাষ্ট্রকর্তৃক পূর্বেই ক্ষমাপ্রাপ্ত, তাদের নতুন করে বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত, যুদ্ধাপরাধীদের এই ক্ষমা করার বিষয়টি একটি ধোঁয়াশাপূর্ণ অসত্য প্রচারণা। কেননা, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেই

---

[১] দ্রষ্টব্য : শাহরিয়ার কবির, *সভ্যতার মানচিত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৭ ১৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। যার ধারাবাহিকতায় তিনি সে বছরই দেশীয় অপরাধীদের শাস্তির আওতায় আনার জন্য 'দালাল আইন-১৯৭২' প্রবর্তন করেন। তাঁর শাসনামলেই পাকিস্তানি বাহিনীর ভেতরকার অপরাধীদের মধ্য থেকে গুরুত্বের বিচারে প্রায় পাঁচশত অপরাধীর একটি তালিকা করা হয়, যা পরবর্তীকালে কাটছাঁট করে দুশো জনে নামিয়ে আনা হয়।

কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের ক্ষেত্রে ছিল আন্তর্জাতিক। এছাড়া তৎকালীন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোও অনমনীয় মনোভাব পোষণ করে জানান – বাংলাদেশ সরকার যদি আত্মসমর্পণকৃত বিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সেনার একজনকেও যুদ্ধাপরাধের বিচারে শাস্তি প্রদান করে, তবে তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানে আটকে পড়া পাঁচ লক্ষের অধিক বাঙালির একজনকেও ফেরত দেবেন না। এছাড়া ছিল আর্ন্তজাতিক বিশ্ব, বিশেষত ইসলামি বিশ্বের চাপ। এত কিছু সামলে নবগঠিত একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে সেসময় পাকিস্তানি অপরাধীদের বিচার করা সম্ভব হয়নি। তবে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সহযোগী এদেশীয় দালাল, রাজাকার, আলবদর , আলশামস, যারা প্রধানত জামায়েতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী প্রভৃতি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বিচারের প্রয়োজনে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসেই 'দালাল আইন' প্রণয়ন করা হয়। এবং এতে বলা হয় :

> যে বা যারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা সংগঠিতভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে নির্যাতন, সম্পদহানি, ধ্বংসযজ্ঞে সমর্থন দিয়েছে বা সহযোহিতা করেছে বা নিজেরা এতে অংশগ্রহণ করেছে কিংবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দখলদার বাহিনীর যুদ্ধ এবং তাদের অবৈধ দখলদারিত্বকে সমর্থন দিয়েছে, তাদের বিচারের জন্য এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।[১]

কিন্তু 'দালাল আইন' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল সে সময়। লোকস্বল্পতার কারণের অভিযুক্ত দালালদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যায়নি। থানার একজন ওসির পক্ষে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের পরও অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এত সংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদান অসম্ভব ছিল। ১৯৭২ সালের ২৩ জুলাই *দৈনিক বাংলার বাণী*র একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল :

---

[১] ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ সরকারের গেজেট। শিরোণাম : President Order No. 8 of 1972: Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972.(18)

> দালাল আইন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রয়েছে আইন বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা বলেছেন, দালাল আইন করা হয়েছে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার জন্য। কাজেই সে অপরাধ প্রমাণের জন্যে থাকতে হবে সাক্ষ্য প্রমাণের বিশেষ ধরন। কিন্তু বর্তমান আইনে সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য অনুসরণ করতে হয় একশ বছরের পুরনো 'এভিডেন্স এ্যাক্ট। এই এ্যাক্ট হয়েছে বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য। কাজেই বিশেষ পরিস্থিতির অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রণীত এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা জটিলতা। ফলে অপরাধ প্রমাণ করা হয়ে উঠছে অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য।[১]

এসব কারণে ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ সালে এক সরকারি প্রেসনোটের মাধ্যমে এই বিপুল সংখ্যক প্রমাণ না থাকা সাধারণ যুদ্ধাপরাধীকে সাধারণ ক্ষমাপ্রদান করা হয়। তবে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ও তাদের প্রধান সহযোগী গোলাম আযমসহ অন্যান্য কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের কখনোই ক্ষমা করা হয়নি।

পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে সেনা-সমর্থিত সরকারগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে দেশে মানবতাবিরোধীদের বিচারের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আইন করে নাগরিকত্ব প্রদান করা, দেশের রাজনীতিতে এমনকি নির্বাচনেও তাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া হয়। চালু হয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। এই সুযোগে একাত্তরের পরাজিত শক্তি ক্ষমতার কাছাকাছি যাবার সুযোগ পায়। সৈয়দ হক এ বিষয়টি তাঁর নাটকে উল্লেখ করতে ভোলেননি :

> ক্ষমতার লোভে তারা
> সেদিনের শত্রুদের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করেনি।
> একাত্তর ভুলে গিয়ে ঘাতকের হাত তারা চুম্বন করেছে।
> অপরাধ – রয়ে গেছে অপরাধ। অন্যায়, অন্যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৬০২)

১৯৯১ সালের ২৮ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী তাদের সংগঠনের আমির হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আজমের নাম ঘোষণা করে; যিনি স্বাধীনতার পর পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গোলাম আজমকে আমির ঘোষণা করায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ১৯৯২ সালের ৮ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে গোলাম আজমের বহিষ্কার ও শাস্তি দাবি করে। *উত্তরবংশ* নাটকে সৈয়দ হক নাট্যকারের মেয়ে চরিত্রটির মাধ্যমে মৌলবাদী গোষ্ঠীর ক্রমশ এদেশে জেঁকে বসার চিত্র অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে তুলে ধরেছেন :

---

[১] *দৈনিক বাংলা*, ২৩ জুন ১৯৭২, (দ্রষ্টব্য : একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯)

তোমরা ওদের বিচার না করে ভুল করেছিলে।
বিচার না করবার কারণেই ওরা সুযোগ পেয়ে যায় –
ফিরে আসে, ক্রমে মিশে যেতে থাকে সমাজে,
কিছুদিন মাথা নিচু করে থাকে – তারপর সংঘবদ্ধ হতে থাকে –
তারপর আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে – মদদ জোগায় ভ্রষ্ট রাষ্ট্রপতিরা,
প্রকাশ্যেই রাজনীতি শুরু করে – উত্থান ঘটে মৌলবাদের –
সশস্ত্র হামলা চলতে থাকে তোমাদেরই বিরুদ্ধে – তোমরা যারা
মানুষের জন্যে কলম ধরেছিলে, রাজনীতি করেছিলে। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৬০৪)

১৯৭১ সালের অনেক মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক কারণে বা ব্যক্তিস্বার্থে নীতিভ্রষ্ট হয়ে রাজাকার আলবদরের সাথে সখ্যভাব গড়ে তুলেছে। তবে একাত্তরের শহিদ পরিবার কিংবা নির্যাতিত পরিবারগুলোর মনে এদের প্রতি ছিল তীব্র ঘৃণা। যে কারণে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম নতুন করে এই ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, এবং দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তি, লেখক, বুদ্ধিজীবী শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠন করেন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগও এদের নীতিগত সমর্থন দেয়। ১০১ সদস্যের কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, সোহরাওয়ার্দী ময়দানে গোলাম আজমসহ একাত্তরের মানবতাবিরোধীদের বিপক্ষে গণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে। সৈয়দ শামসুল হকও উক্ত আদালতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করে এক লেখায় বলেন :

> আলোচনার পরে স্থির হলো, গণ-আদালতে অভিযোগকারী হবো আমরা তিনজন : বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গোলাম আযমের ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করবেন সৈয়দ শামসুল হক; মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করবে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর; আর বাংলাদেশ-প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর নানাদেশে তাঁর বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করবো আমি। গণ-আদালতে গোলাম আযমের বিচার হবে – এমন একটি সংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্র মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল।[১]

---

[১] আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী* , প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪২৪-৪২৫

নব্বইয়ের দশকে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের এ-আন্দোলন প্রসঙ্গে ইঙ্গিত রয়েছে আলোচ্য নাটকে। নেতার প্রতি অভিযোগ করে নাট্যকার চরিত্রটি যখন বলে – আমাদের কবিতা রাজনীতির মঞ্চে ব্যবহার করে তোমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছে যাও; কিন্তু ক্ষমতায় বসেই আমদের ভুলে যাও তোমরা। যেহেতু আলোচ্য নাটকের নেতা চরিত্রটি একটি সৎ, কর্মপরায়ণ ও নীতিনিষ্ঠ চরিত্র, সেহেতু তিনি রাজনীতিতে শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকের অবদান অনায়াসে স্বীকার করেছেন। এ পর্যায়ে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধ আন্দোলনের ইতিহাস টেনে বলেছেন, সাধারণ মানুষ যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়ে আন্দোলনের মাঠে নেমেছে, তখন তাদের দল সাগ্রহে এ নৈতিক দাবির পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু সেসময়ে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতার কারণে বিচারপ্রক্রিয়া অগ্রসর হয়নি। তবে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী যে, বাংলার মাটিতে একদিন দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। নেতার বলিষ্ঠ উচ্চারণ :

> বিশেষ করে যখন যুদ্ধপরাধীদের বিচার চেয়ে
> রমনার সবুজ বিশাল মাঠে তোমরা দাঁড়ালে – তখন
> রাজনীতির মাঠে আমরাও জোরেশোরে সমর্থন দিয়েছি।
> তখনই যদি – তখনই যদি বিচারটা শুরু করা যেতো,
> তবে কবেই উদ্যত ওদের হাত গুঁড়ো হয়ে যেতো। ...
> হাওয়া লেগেছিলো পালে, মাস্তুলে উড়ছিলো নিশান।
> মনে পড়ে তোমার সেদিনের সেই কবিতা।
> ‘একাত্তরের যুদ্ধে আমার অস্ত্র হাতে ছিলো –
> এবার হাতে অস্ত্র আমার সত্য প্রতিষ্ঠার –
> যাদের হাত আমার দেশের রক্তে ভিজেছিলো –
> কাঠগড়াতে তুলবো তাদের – দণ্ড দেবো তার।’ (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮৫)

এরপর নাট্যকার চরিত্রটিও স্বপ্ন দেখছেন, একজন দেশনেতা এসে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন। সে আলো-ঝলমল নেতৃত্বের প্রত্যাশা করে তিনি বলেছেন :

> মন্থনে মন্থনে জাগিয়ে তোলো চেতনা। জন্ম দাও নেতা।
> রাতের আঁধার ভেঙে জন্ম নিক সূর্যের মতো সে মানুষ।(কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৩)

তখন নাট্যকারের মেয়ে উত্তরবংশের প্রতিনিধি হয়ে তাদের আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে, একদিন পূর্বপ্রজন্ম যে বিচার করতে পারেনি উত্তরপ্রজন্ম সেই বিচার অবশ্যই সম্পন্ন করবে। সে শপথ করে বলেছে :

তোমরা শান্ত হও, শান্ত হও, হে অশান্ত আত্মা,

আমার মা, আমার বোন, আমার ভাই, আমার পূর্বপুরুষেরা,

আমি উত্তরবংশের মেয়ে, আমরাই করবো বিচার।

বাবা, আমি তোমার উত্তরপ্রজন্ম – তোমরা যেখানে ব্যর্থ,

আমরা সেখানে হতে চাই সফল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৫)

যারা ১৯৭১ সালের দেশ স্বাধীন হবার প্রাকপর্যায়ে বেছে বেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিকদের রাতের আঁধারে নিজ বাসভবন থেকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে নির্মম অত্যাচার করে হত্যা করেছিল, তারাই পঁচাত্তর-উত্তর সময়ে ধর্মীয় মৌলবাদের ক্রম-উত্থানের সুযোগে পুনর্বার প্রগতিশীল লেখক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মিশনে নেমেছে। এদেশের বুক থেকে চিরতরে মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ রুদ্ধ করতে তারা জঙ্গিবাদি তৎপরতা নিয়ে মাঠে নেমেছে, আদালতে বোমা হামলা চালিয়েছে, নিষ্ঠুর কায়দায় প্রগতিশীল শির্পী-সাহিত্যিকদের হত্যার মিশনে নেমেছে। সৈয়দ হক লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ওপর এই জঙ্গিবাদী তৎপরতার তুলনা করেছেন ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে :

কখন ওরা কলমটা আমার কেড়ে নেয়।

কখন ফুসফুস থেকে কেড়ে নেয় নিঃশ্বাস।

কখন কব্জি কেটে দেয়, কখন চোখ উপড়ে নেয়।

আমাদের সেই বিজয়ের মাত্র, দু'দিন আগে যেমন –

বাড়ি থেকে না তুলে নেয় আমাকে, চোখে কাপড় বেঁধে দেয়,

জীপের পাটাতনে না আমার মাথা ঠেসে ধরে চেপে নিয়ে যায় –

বধ্যভূমিতে। তারপর – তোকে না একদিন যেতে হয় লাশ খুঁজতে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬১)

সমকালীন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় মুক্তবুদ্ধিচর্চাকে কীভাবে দমিয়ে রাখা হয়েছে, কীভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে, সেটিও নাট্যকার সমান দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য নাটকে। তিনি দেখেছেন, সমকালীন মূলধারার পত্রিকাগুলো কীভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকারের মৌলবাদপ্রীতি বাস্তবায়ন করতো, অথবা সরকারের তাবৎ অন্যায় ঢেকে মিথ্যে প্রশংসা করতে বাধ্য হতো। কোনো লেখক যদি সরকারের নীতি-বিরোধী, জনকল্যাণকর লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করতে চাইতো – তবে তা প্রচুর সম্পাদনার পর প্রকাশের ব্যবস্থা হতো। নাট্যকার যেটিকে বলেছেন ইঁদুরের দাঁতেকাটা ক্ষত-বিক্ষত রচনা। বস্তুত, ২০০১ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর *দৈনিক প্রথম আলো*, *দৈনিক জনকণ্ঠ*সহ

একাধিক পত্রিকা সরকারের রোষানলে ছিল। তুচ্ছ কারণে পত্রিকার সম্পাদকদের ডেকে নিয়ে মামলা- হামলার ভয় প্রদান করা হতো; অজ্ঞাত অবস্থান থেকে লেখকদের দেয়া হতো প্রাণনাশের হুমকি। সৈয়দ শামসুল হক এসব বিষয় তুলে ধরেছেন নাট্যকার চরিত্রটির নিম্নোক্ত সংলাপে :

রাজনীতি থেকে কেন ধর্ম আলাদা রাখা দরকার –
কেন ধার্মিক আর ধর্মব্যবসায়ীদের ভেতরে তফাত করা চাই –
[...] এ সব যে লিখেছিলাম স্বাধীনতা দিবসের জন্যে আমি এক প্রবন্ধে –
আমাদের পত্রিকার প্রগতিশীল আর নির্ভিক সেই সম্পাদক –
আমার লেখাটা তিনি এতখানি কেটেকুটে ছাপলেন –
[...] তাঁর হাতে আমার লেখাটা হয়ে দাঁড়ালো ইঁদুরের দাঁতে কাটা।
সম্পাদকের প্রাণ ও তাঁর পত্রিকা বাঁচলো বটে – আপাতত।
কিন্তু সত্যের ও রাষ্ট্রের ক্রন্দন কেউ শুনতে পেলো না।
[...] আসতে লাগলো আমার কাছে ফোন – মধ্যরাতে হঠাৎ ঝনঝন –
অনামা গলা – কর্কশ উচ্চারণ – পাঠাচ্ছি কাফন ! (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৫৬২)

পঁচাত্তর-উত্তর সময়ের সেনাশাসিত সরকার কিংবা মৌলবাদ-সমর্থিত সরকারের শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন চরমভাবে অবহেলিত। প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরা ছিলেন অসহায়। সেই বঞ্চনাময় অসহায়তার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে নাট্যকারের মেয়ের সংলাপে :

দেশ-মানুষের পক্ষে এতকাল যারা করেছে রাজনীতি –
মুক্তিযুদ্ধে ছিলো সমুখের সারিতে যারা –
তারাই যে ক্রমে এখন হয়ে পড়েছে কোণঠাসা! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৪)

যেসব রাজনীতিবিদ দেশের পরিবর্তে আত্মস্বার্থকে বড়ো করে দেখেন, তারাই সমকালীন রাজনীতির মাঠে দাপটের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। এসব রাজনীতিবিদ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে আড়াল করে স্বার্থোদ্ধারে মগ্ন। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিনের পর দিন তোষামুদে লেখকেরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছে। এই ইতিহাসবিকৃতি প্রসঙ্গে ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী এক নিবন্ধে লিখেছেন :

যেহেতু বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিকাংশ সময়ই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের চাইতে সামরিক, আধা-সামরিক ও তাদের প্রতিষ্ঠিত দলই বেশি সময় অধিষ্ঠিত ছিল, তাই এ সব সরকার মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে কোনো কোনো ব্যক্তির ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত

ইতিহাস দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরেও যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি। [...] ১৯৯৬ সালে পাঠ্যপুস্তকসমূহে এ সংক্রান্ত ত্রুটি যেটুকু সংশোধন করা হয়েছিলো ২০০১ সালে তা শুধু বাতিলই করা হয়নি, প্রাথমিক স্তরের বেশকিছু পাঠ্যপুস্তকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্দোলন ও ভূমিকাকে ইচ্ছেমতো লেখা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, প্রধান ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের ভূমিকাকে গুরুত্বহীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ।[১]

সৈয়দ হক তাঁর *উত্তরবংশ* নাটকে এই ইতিহাসবিকৃতির প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করতে ভোলেননি। তিনি নাট্যকার চরিত্রটির মাধ্যমে বলেছেন :

হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে একদা পরাজিত ওই ওরা
ইতিহাসকে ওদের পক্ষে লিখিয়েছে – বীরকে স্থবির দেখিয়েছে,
কলমকে ছিন্ন করেছে তলোয়ারে, মুক্তিকে দাসত্ব বলেছে,
আমাদের হাজার বছরের পরিচয় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ওরা –
জাতির গায়ে ভুল মার্কা ও নতুন লেবেল সেঁটে দিয়েছে।
[...] নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে আবৃত ইতিহাসের অন্ধকারে।
বিকৃত ইতিহাস আর ধর্মলোপের জুজু যখন জাপটে ধরে জাতিকে –
তখন বিশ্লেষণ করবার অবকাশ আর মানুষ পাবে কী করে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৯৬)

নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির এই নিদারুণ বাস্তবতা উপস্থাপনের পাশাপাশি প্রগতিশীল রাজনীতিকদের প্রতিবাদী সত্তায় আত্মপ্রকাশের আহবান জানিয়েছেন, এবং প্রগতিশীল লেখক-কলামিস্ট-বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান করেছেন দেশ, মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার :

এমন রাজনীতিও দেশে আছে দেশ বা মানুষ যার লক্ষ্য নয় –
ইতিহাস তাদের বিষয় নয়।
সেই ইতিহাসটা কতভাবেই না বিকৃত করে চলেছে
ওই ভ্রষ্ট রাজনীতিকের দল।
আজ তাদেরই বিপরীতে সক্রিয় হতে হবে আমাদের –

[১] মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, *পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৩-১৪

দেশটাকে বাঁচাবার স্বার্থে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৫)

আবার, ২১শে আগস্ট ২০০৪ সালে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলাসহ অন্যান্য হামলার প্রসঙ্গ একটি মঞ্চনির্দেশনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। নাটকের অষ্টম দৃশ্যটি রচিত হয়েছে কেবল গ্রেনেড হামলার বাস্তবচিত্রসংবলিত মঞ্চনির্দেশের ওপর ভিত্তি করে :

> অবিলম্বে শূন্য মঞ্চস্থানে বিপরীত মানুষেরা আসে। এবার তাদের টানটান শাদা জামা পাজামা। মুখের অর্ধেকটা কালো কাপড়ে ঢাকা। তারা নিঃশব্দে সতর্ক পায়ে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোমর থেকে গ্রেনেড হাতে নিয়ে তাক করে ছুঁড়ে মারে। এবং মুহূর্তে পালিয়ে যায়। মঞ্চে বিস্ফোরণ ঘটে। তীব্র আলোর ঝলকানি। তারপর আলো নিভে যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৭৪)

বস্তুত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোয় অবৈধ উপায়ে দীর্ঘকালব্যাপী সমাসীন সমরশাসন, এবং মৌলবাদ-সমর্থিত জোট সরকারের আমলে যে মাৎস্যানায়ের রাজত্ব চলছিল, যে কালাকানুন প্রগতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল, লুপ্ত হতে চলেছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তা উত্তরপ্রজন্মকে জানানোই শুধু নয়, তার ন্যায্য প্রতিকারের প্রয়োজন থেকেই রচিত হয়েছে *উত্তরবংশ* নাটক। একদিন উত্তরপ্রজন্ম প্রতিক্রিয়াশীলতার তিমির হনন করে এ জাতিকে আলোর মুখ দেখাবে; বিচার হবে যুদ্ধাপরাধীর, বিচার হবে পঁচাত্তরের ঘাতকদের, গ্রেনেড হামলার। নাট্যকারের প্রত্যাশা – জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সরিয়ে উত্তরপ্রজন্ম বাংলাদেশ নামক এই বদ্বীপকে মুক্ত ও শুদ্ধ করতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক : শৈলিবিচার

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* শিল্পসার্থকতায় অনন্য। এ নাটকের কাহিনি সংঘটিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট স্থানে, এবং উপস্থাপিত কাহিনির কালপরিসরও একদিন। নাটকে মাতবরের সভাগৃহ বা বৈঠকখানার খণ্ড কালপরিসরের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালের সমগ্র কাহিনি। চরিত্রপাত্রের মুখনিঃসৃত সংলাপে দর্শক-পাঠক সে-সময়ের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন।

নাট্যকার টানটান উত্তেজনার মধ্যদিয়ে নাটকের মূলগল্প উপস্থাপন করেছেন। নাটকের প্রারম্ভেই দেখা যায়, সতেরো গ্রামবাসী নিজেদের সমস্যা-সংকটের কারণ ও প্রতিকার জানতে চেয়ে মাতবরের নিকট এসেছে। এ দৃশ্যটিকে গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিসের (৪৯৬-৪০৬ খ্রি.পূ.) *ইডিপাস* নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বস্তুত, কোরাস চরিত্রের এই প্যাটার্ন প্রাচীন গ্রিক নাটকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার, পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) কাব্যনাটকের মধ্যেও আমরা 'জনতা' চরিত্রের এই প্রবণতা প্রত্যক্ষ করি। তবে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তখন, যখন

মাতবরের মেয়ে হঠাৎ সভায় প্রবেশ করে; এবং ব্যক্ত করে বিগতরাতে পাক-সেনাকর্তৃক তার ধর্ষিত হওয়ার করুণ কাহিনি। একজন পিতা যখন নিরুপায় হয়ে বিবাহ নামক প্রহসনের দোহাই দিয়ে স্বীয় কন্যাকে মিলিটারি বাহিনীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়, তখন সহজেই অনুমান করা যায় ১৯৭১-এ বাংলাদেশের আপামর জনগণের করুণ অবস্থা। এরকম আরও একটি কাহিনির বর্ণনা আছে ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *দুইসৈনিক (১৯৭৩)* নামক উপন্যাসে। সেখানেও পাকিস্তানি আদর্শে উদ্বুদ্ধ মিলিটারিদের সেবক মখদুম হাজী মিলিটারি সদস্য মেজর হাকিম ও ক্যাপ্টেন ফৈয়াজের লালসার হাত থেকে নিজকন্যা সাহেলী ও চামেলীকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর আত্মহত্যার মাধ্যমে সে তার পাপাচারদগ্ধ জীবন সাঙ্গ করে। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে মেয়েটি লজ্জায়, ঘৃণায়, শঙ্কায় বিষপানে আত্মহত্যা করেছে, আর মাতবরকে জনতা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হত্যা করেছে।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকে প্রকাশ্য চরিত্র চারটি – মাতবর, মাতবরের মেয়ে, পীরসাহেব ও পাইক। আর বৃন্দচরিত্র – গ্রামবাসী। এছাড়া নেপথ্যচরিত্র হিসেবে আরও কিছু চরিত্রের নাম ও তাদের ভূমিকা প্রকাশ্য চরিত্রগুলোর মুখে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন – শেষদৃশ্যে আগত মুক্তিযোদ্ধারা, পাকিস্তান আর্মির ক্যাপ্টেন, মাতবরের স্ত্রী, মাতবরের মেয়ের হবুস্বামী, মুক্তিযোদ্ধা স্কুলমাস্টার প্রমুখ চরিত্র। নাটকে গ্রামবাসী চরিত্রের আদল কিছুটা গ্রিক নাটকের কোরাস চরিত্রের মতো। এখানে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পেশার মানুষ একত্র হয়ে একটি সামগ্রিক চরিত্র সৃষ্টি করেছে। বস্তুত, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের গ্রামীণ সাধারণ মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের সর্বজনীন চিত্র প্রকাশিত হয়েছে এই কোরাস চরিত্রের মাধ্যমে। গ্রামবাসী চরিত্রে কারা থাকবেন, তার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা লেখক সৈয়দ শামসুল হক নাটকের প্রারম্ভেই প্রদান করেছেন। চরিত্রের সংলাপ রচনার সময় গ্রামবাসী লেখা থাকলেও এগুলোকে ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন বয়সের চরিত্রের মুখে ঢেলে সাজাবার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। এ-কারণেই এখানে অশীতিপর বৃদ্ধা, যুবক, কৃষক, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের একটি সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকারের নির্দেশনা ছিলো নিম্নরূপ :

> গ্রামবাসীর সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত করা যেতে পারে। তবে নারী-পুরুষ অবশ্যই বিভিন্ন বয়সের হতে হবে। নিরপেক্ষ গ্রামবাসীর সংখ্যা কুড়ি হলে ভালো হয়। আমি অন্তত একজন বৃদ্ধকে কল্পনা করেছি যার বয়স একশত বৎসরের কাছাকাছি; একজন বৃদ্ধা, যে অন্তত নব্বই।[১]

উল্লেখ্য যে, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে কোরাসকে প্রথমে সাধারণ নিরুপায় নির্যাতিত ও অসহায় চরিত্র মনে হলেও ক্রমশ তারাই হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী চরিত্র। শোষকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিশেষে জাগরণ ঘটেছে সংঘশক্তির। কোরাসের এই মানস-বিবর্তনকে ১৯৭১-এর প্রেক্ষাপটে সাধারণ বাঙালির মানসিকতার বিকাশ-বিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অত্যাচারিত বাঙালি একটা সময় হয়ে উঠেছে প্রতিবাদমুখর, এবং বলাবাহুল্য যুবসম্প্রদায়ই মুক্তিযুদ্ধকে ইতিবাচক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যার ফল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

অন্যদিকে, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকের প্রধান চরিত্র এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মাতবর। তার মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকশক্তি : রাজাকার আলবদর ও শান্তিবাহিনী। নাট্যকার গ্রামবাসীর মুখের সংলাপে সমাজের এই ঘৃণ্য চরিত্র সম্পর্কে নিম্নরূপ ধারণা দিয়েছেন :

> মানুষের বেশে
> এরচেয়ে বড় কোনো দাঁতাল আপনারা
> গহীন জঙ্গলে গিয়া ঘেরা দিয়া, পিটাইয়া ঢেড়া
> পাইবেন না, মুশকিল আছে।
> আমাদের সুখ শান্তি আশা
> নিজের স্বার্থের লোভে জলে দিছে ভাসা
> এই সেই লোকটা যতক্ষণ জীবিত সে আছে
> নাই আমাদের নিজের জীবন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬-৫৭)

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকের মাতবর একটি খল চরিত্র হলেও নাট্যকার আশ্চর্য কুশলতায় তাকে অপেক্ষাকৃত সংবেদনশীল করে নির্মাণ করেছেন। যে কারণে নাটকে মাতবরের রাজাকার ভূমিকার তুলনায় ধর্ষিত-মেয়ের অসহায় পিতা-রূপ অধিক মূর্ত হয়ে উঠেছে। নাটকের শুরুতে মাতবর চরিত্রটিকে বলিষ্ঠ, দাম্ভিক ও খল মনে হলেও মাতবরের মেয়ের মঞ্চ-উপস্থিতির পর থেকে মাতবর চরিত্রটি যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে; এবং

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৩

দর্শকের নিকট থেকে সে শেষপর্যন্ত সমবেদনা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য নেতিবাচক চরিত্রের প্রতি নাট্যকারের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য কাব্য নাটকেও লক্ষ করা যায়। যেমন *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২) নাটকের ইংরেজ খল চরিত্রগুলির সংকট, নেতিবাচক আচরণের কার্যকারণ, স্বপ্ন, হতাশার ছবি তুলে ধরে নাট্যকার এক ধরনের ইতিবাচক আবহ তৈরি করেছেন। একই কথা বলা চলে তাঁর *এখানে এখন (১৯৮১)*, *গণনায়ক (১৯৭৬)*, *ঈর্ষা (১৯৯০)* প্রভৃতি কাব্যনাটকের নেতিবাচক চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রেও। আলোচ্য নাটকটি মঞ্চে বাস্তবে দেখার পর মাতবরের পরিণতিতে অশ্রুসিক্ত একজন দর্শক নাট্যকারকে প্রশ্ন করেছিলেন – আপনি রাজাকার চরিত্রটিকে এমন সংবেদনশীল করে কেন নির্মাণ করলেন – যার ফলে আমার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হলো! দর্শকের প্রশ্নের উত্তরে নাট্যকার মন্তব্য করেছিলেন নিম্নরূপ :

> পানি আসে এজন্য যে, ঐ লোকটির এরকম হওয়ার কথা ছিল না। এজন্যই ঈশ্বরের মত আপনার চোখেও পানি আসে। একজন যখন পাপ করে এবং পাপের শাস্তি হিসেবে সে যখন দোজখে যাবে। ভাবার কোন কারণ নেই যে ঈশ্বর তাকে হেসে হেসে দোযখে পাঠাবে। ঈশ্বরের অবশ্যই মায়া হবে কারণ তার সৃষ্টির তো এমন হওয়ার কথা ছিল না। যেহেতু হয়ে গেছে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাজা দিতে হলো। তো আমি যখন লিখি তখনতো আমি ঈশ্বর। এক একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছি। আবার দর্শক যখন দেখে সেও একজন ঈশ্বর, তাই সৃষ্টির পতন দেখে কাঁদে।[১]

তবে নাটকে মাতবর চরিত্রের অন্তর্গত শূন্যতা, হাহাকার, মানসদ্বন্দ্ব কাব্যনাটকের আবশ্যকীয় অংশ হিসেবে নাট্যকার চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। একদিকে মাতবর ধর্মের দোহাই দিয়ে নানান কথায় জনতাকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোলানোর চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে তার মন জানে যে, গতরাতেই মিলিটারি কর্তৃক তার কন্যা সম্ভ্রম হারিয়েছে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব চমৎকার একটি লোকপ্রবাদের মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন। পাইক যখন মাতবরকে গ্রামীণ যুবকদের প্রতিরোধে মিলিটারিকে সংবাদ দেবার কথা বলে, তখন মাতবর বলে ওঠে :

> শরীলের কোনোখানে যখন চুলকায়
> মানুষ হাতের কাছে যাই তাই পায়
> তাই দিয়া চুলকানি থামায়।

---

[১] ইনামুল হক, 'হকভাই এবং আমার কিছু কথা', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭১৭

সময়ে হাতের কাছে গোক্ষুরার ল্যাজ,

যখন মালুম হয় সাপে কাটা শ্যাষ

আর কোনো পথ নাই ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৯-৩০)

প্রকৃতপক্ষে মাতবর তার অহংবোধ আর পরাধীন মানসিকতা থেকে বের হতে পারছে না। বস্তুত, 'ইংরেজদের ২০০ বছরের শোষণ শেষে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর [...] ব্রিটিশদের পরিবর্তে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় পাকিস্তানিরা। বাঙালি-অধ্যুষিত এ অঞ্চলে পাকিস্তানি শাসন জন্ম দেয় আরেকটি নব্য উপনিবেশের।'[১] *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ের* মাতবর চরিত্র সেই নব্য উপনিবেশবাদী মানসিকতার শিকার। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রভুকর্তৃক অত্যাচারিত হয়েও সে প্রভুর আজ্ঞাবহ গোলাম হয়ে বেঁচে থাকাকে উপযুক্ত কর্তব্য বলে মনে করেছে। সৈয়দ শামসুল হক এক সাক্ষাৎকারে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর মাতবর চরিত্র নির্মাণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বাস্তব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এটি দ্বারা মাতবর চরিত্র প্রসঙ্গে নাট্যকারের ভাবনালোক উন্মোচিত হয়। জনৈক সমালোচক এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে লিখেছেন :

> ৭২-এ আমি দেশে এসেছিলাম। আমাদের বাণিজ্য এলাকার নাম মতিঝিল। সেখান দিয়ে দুপুরবেলা আমি হাঁটছি। সেই মাসেই ছিল স্বাধীনতা দিবস। হঠাৎ দেখলাম ৭০-৭৫ বছর বয়সের আধা গ্রাম্য এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তিনি মাটিতে পড়ে কাতর হয়ে ক্ষমা চাইছেন আর তিন দিক থেকে ঘেরাও করে আছে ছেলেরা। [...] একটা ১২-১৩ বছরের ছেলে একটা লোহার শিক দিয়ে ওকে খোঁচাচ্ছে। যেখানে খোঁচাচ্ছে রক্ত বেরুচ্ছে আর বলছে, তুই রাজাকার।' [...] বৃদ্ধ বলে, 'না বাবা, কখনো নয়।' কিন্তু ছেলেটা সমানে খোঁচাচ্ছে। চারপাশে এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে, কেউ জিজ্ঞেস করছে না, It's true or not, [...] বিষয়টা আমি কখনোই মানতে পারিনি। [...] সে আমারই লোক। তার এমনটা না হওয়ারই কথা ছিল। অন্তত এরকম না হলেও পারত। এজন্য আমার চোখে জল আসে। [...] কেন সে (এরকম?) হলো, সেটা রাজনীতিবিদ, Sociologist, Historian তারা বুঝবে, আমিত লেখক।[২]

আলোচ্য নাটকে মাতবর চরিত্রের আদর্শিক অবস্থান সুস্পষ্ট ও সংহত হলেও পীরসাহেব চরিত্রটি কিছুটা রহস্যে ঘেরা। নাটকের প্রারম্ভে তাকে মনে হয় সে রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে আপসকারী ব্যক্তিত্ব; মাতবরের ঘনিষ্ঠ সহচর।

---

[১] সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, 'জাতির পিতা', *ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*, নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩০

[২] শান্তনু কায়সার, *বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ.১৮১

কিন্তু নাট্যকাহিনি যতই অগ্রসর হতে থাকে, ততই স্পষ্ট হয় যে, পীরসাহেব ধর্মের ধ্বজাধারী হলেও সে মূলত স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। সমালোচকের মতে :

> পীরসাহেবের ভাবনার সাথে সাধারণ মানুষের প্রাথমিক যে বিরোধ তা মূলত ধর্মের সাথে বস্তুজাগতিক জীবনের অসামঞ্জস্যের। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ধর্মে কারো নিষ্ঠা থাকার কারণে আমরা কোনো মানুষকে নঞর্থক চিন্তা চেতনার মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি না।[১]

আমাদের বিবেচনায় পীরসাহেব চরিত্রটি একটি স্থিতিস্থাপক চরিত্র; ধর্ম যার প্রধান অস্ত্র, ধর্মকে কাজে লাগিয়ে সে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সহজেই বিবর্তিত করে অভিযোজিত হতে পেরেছে সমাজে, জনমনে। উল্লেখ্য, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকটি যখন নাট্যকার রচনা করেন, তখন পীরসাহেব চরিত্রটি নির্মাণ করার সময়, এ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বার বার অগ্রজপ্রতিম নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর কথা তাঁর স্মরণে এসেছিল। এক লেখনীতে সৈয়দ শামসুল হক এ প্রসঙ্গে জানান :

> আমার 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' যখন লিখি, তখন পীরসাহেবের চরিত্র রচনা করতে গিয়ে আমার বারবারই মনে হতো মুনীর ভাই থাকলে এই চরিত্রটিতে তাঁকে অভিনয় করতে বলতাম।[২]

আলোচ্য নাটকে মাতবরের পেয়াদা আর একটি সুবিধাবাদী চরিত্র। একদিকে সে যেমন মাতবরের স্বার্থের পক্ষে কথা বলেছে, অন্যদিকে পরিস্থিতি বিরূপ দেখে সহজেই ভোল পাল্টে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ভিড়ে নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। এমনকি নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে স্বীয় মুনিব মাতবরকে গুপ্তির আঘাতে হত্যা করেছে। বস্তুত, নাটকে পাইক চরিত্রটি বিশ্বাসঘাতক শ্রেণির। সে তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে, যারা গোপনে এদেশ ও জাতির বুকে ছুরি চালিয়েছে। যুদ্ধকালে এরা পাকিস্তানিদের সহায়তা করে স্বজাতির সাথে বেইমানি করেছে। আবার দেশ স্বাধীন হবার পূর্বলগ্নে ভোল পাল্টিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ভিড়ে গিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের কলঙ্কিত ও বিতর্কিত করে তুলেছে। এরা সেই পুরোনো চেনা শকুন, যারা বার বার এদেশের বুকে নেমে এসে জাতির লালসবুজের পতাকাটিকেই খামচে ধরেছে। এদের বিনাশ নেই। এরা এদেশের বুকে অমোচনীয় কলঙ্ক, দীর্ঘশ্বাসময় অন্ধকার। নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক ইতিহাসের এই নির্মম বাস্তব সত্যটিকে

---

[১] অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩২৮

[২] সৈয়দ শামসুল হক, 'নাটকে নিজের মুখ', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, রামেন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭৮

অত্যন্ত ছোট অথচ গভীর পরিসরে এ-চরিত্রের মাধ্যমে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকাহিনির প্রথম পর্যায়েই পাইক চরিত্রটির মধ্যে মাতবরের আদেশ উপেক্ষা করার প্রবণতা তার সুযোগসন্ধানী মানসিকতাকেই প্রকটিত করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এ পর্যায়ে মাতবরের স্বার্থরক্ষা কিংবা নিরাপত্তা বিধানে তার নির্লিপ্ত মানসিকতা প্রকাশ করেছেন নাট্যকার :

ওর মইধ্যে কি আছে জানি না
অচিন হইয়া যায় চিরকাল্যা চিনা
এতকাল যা দেখেছি দুইচক্ষু দিয়া
য্যান কেউ নিয়া গ্যাছে এক্কো থাবা দিয়া
য্যান একটা ছোঁ মারলো আচাভুয়া পাখি
সোনার দালান খইসা ঝরে কাদামাটি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২)

যুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তানি সৈন্যদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে-কারণে মাতবর যখন প্রতিবাদী যুবককে গ্রেফতারের জন্য তার পাইককে নির্দেশ দেয়, তখন সে সরাসরি গ্রেফতারের বিষয়টি এড়িয়ে হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা নিতে বলে। অথচ যুদ্ধের শুরুতে পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরা হত্যা, গুম, ধর্ষণ, ঘরবাড়ি জ্বালানোসহ ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। অন্যদিকে, যুদ্ধশেষে মুখোশ পাল্টে এরা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এ নাটকের শেষে তাই দেখা যায়, মাতবর খুন হয় তারই সকল অপকর্মের বিশ্বস্ত দোসর পাইকের হাতে। আর পাইক চরিত্রটি সহজেই মিশে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে :

পাইক। এইমাত্র শেষ করছি বড় শয়তান
ছোটখাটো আরো আছে। এখনি সন্ধান করা না গেলে আবার
বেবাক চম্পট দিয়া হয়া যাবে পার। [...]
অবিলম্বে সারা দেশ ঘেরা প্রয়োজন
জলদি জলদি সব চলেন এখন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৯)

তবে নাটকের সব থেকে ট্রাজিক ও মর্মস্পর্শী চরিত্র হলো মাতবরের মেয়ে চরিত্র। নাটকের ভুক্তভোগী অন্যচরিত্রগুলোর সমস্যা সামষ্টিক সমস্যার সঙ্গে একীভূত; সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যেটা অনিবার্য ছিল। কিন্তু মাতবরের মেয়ের সংকট, পরাজয় একান্ত ব্যক্তিগত। নিজ পিতার কুকীর্তির ফলভোগ করতে হয়েছে

তাকে সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে। রক্ষক পিতাই তাকে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়ে বিনাশকের ভূমিকা পালন করেছে। নিজ পিতার এহেন আচরণ তার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। তাই নাটকের মধ্যবর্তী পর্যায়ে তার এই ব্যক্তিগত শোকের অন্তরবিদারী হাহাকার স্পর্শ করে গেছে নাটকের চরিত্র ছাপিয়ে নাট্য-দর্শক ও পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে। জন্মদাতা পিতা যেখানে তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লালসাবহ্নি থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, ধর্মও যখন তাকে বর্ম হয়ে রক্ষা করেনি, তখন সে শোকে উন্মাদপ্রায় হয়ে জনক ও আচারসর্বস্ব ধর্মের বিরুদ্ধেই হয়ে উঠেছে দ্রোহী। সে স্পষ্টভাবে সন্দেহের আঙুল তুলেছে ধর্মের সেসব বিধি-বিধানের প্রতি, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণে কার্যকর নয়। তার কেবলি মনে হয়েছে ধর্ম এবং ভিন্নভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ কেবলি চিত্তমোহন বুলিমাত্র; ব্যক্তির রক্ষাকবচ নয় মোটেও। পীরকে উদ্দেশ্য করে তাই সে বলেছে :

> আমপারা, সুরা, দোয়া দরুদ, কোরান
> পার হইয়া গেছি বাবা আপনের সহায়ে
> য্যান এক বিশাল গেরাম, আমার ডাইনে বাঁয়ে
> লোকে কথা কয় কিন্তু অচিন ভাষায় তার কিছুই বুঝি না ;
> নিশ্চয় নিশ্চয় বাবা, নিরঞ্জন আল্লা নিরাকার –
> আরো সত্য, তাঁর ভাষা বহুদূরে আমার ভাষার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১)

উল্লেখ্য, *পায়ের আওয়াজ পাওয়া* যায়-এর নারী চরিত্রের মুখে এই আল্লাহ, ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ-সম্পর্কিত সংশয়বচন নাট্যকারের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া। নাট্যকারের পিতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একজন সার্থক প্রতিনিধি হিসেবে নানা কারণে স্ত্রীকে বেত্রাঘাত করতেন, যা কিশোর শামসুল হকের চেতনালোকে এক ক্ষোভ ও বেদনামিশ্রিত অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল। নাট্যকারের জননী একটা সময় চরম ক্ষোভে নাট্যকারকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রশ্নে এমন একটি গভীরতর উক্তি করেছিলেন যে, লেখক সারাজীবনেও তা ভুলতে পারেননি। এমন কি মাতবরের মেয়ের ঈশ্বরসংক্রান্ত এ ভাবনার উৎস যে তাঁর জননী, সে কথা পরবর্তীকালে তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *প্রণীত জীবন* (২০১০)- এ উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক এলাকা উপস্থাপন করা হলো :

> আমি যখন কিশোর, মায়ের মুখে এরই বিপরীতে আচমকা একবার শুনেছি –‘ আল্লা যে আছে, আমার আপদকালে বিশ্বাসও তো পাই নাই তিনি আমার পাশে!’ মর্মমূলে এখনো আমি চমকে উঠি – এই উক্তি ছিল তাঁরই ? – রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া, বড় হওয়া, এক পীরেরই পুত্রবধূ, নিয়মিত নামায-রোযা

করা সেই বধূটির! [...] মায়ের কথাটি নিয়ে যে অনেক ভেবেছি ও নারীর অবস্থান থেকে আপদকাল নির্ণয় করে মন্তব্যটির সততা ও বাস্তবতা বুঝে উঠতে চেয়েছি, এর প্রমাণ নিশ্চয় পাওয়া যাবে আমার কাব্যনাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এ। [...] গ্রামপ্রধানের মেয়ের [...] অন্তিম উচ্চারণে আমারই মায়ের কণ্ঠস্বর হয়তো আবিষ্কার করা যাবে :

আল্লাতালার নাম যদি দয়াময়
যদি সত্যই পারেন বান্দারে নির্ভয়
যদি সত্যই সকল শক্তি তাঁর হাতে হয়
যদি সত্যই সকল বিষ তাঁর নামে ক্ষয়
তবে কোথায় সে দয়াময় আছিলেন, কোথায় ? কোথায় ?[১]

সৈয়দ শামসুল হক যতগুলো মৌলিক কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তার প্রায় সবগুলো নাটকই ছিল মঞ্চসফল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ের* মঞ্চসফলতা ছিল শিখরস্পর্শী। কেননা সমকালীন সমরশাসনের রুদ্ধ পরিবেশে '*পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকটি শুধু তাৎপর্যময় মঞ্চসাফল্য অর্জনই করেনি, এ হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের এক দর্পণ। ১৯৭৬ সালের ২৬ নভেম্বর এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সে-সময় বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় এটি ছিল সাহসী মঞ্চায়ন। [..] সামাজিক অন্ধকার বুকে নিয়েও মহৎ উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছা থাকলে বৃহৎ কাজ যে করা যায় *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* তারই প্রমাণ।'[২] নাটকের সমাপ্তিতে মঞ্চনির্দেশের অংশ হিসেবে একটি ব্যঞ্জনাধর্মী গুরুত্ববহ বাক্যে নাট্যকার লিখেছেন :

সবশেষে পতাকার ওপর আলো থাকে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০)

এটির মাধ্যমে নাট্যকার দেশের সামগ্রিক বাস্তবতায় ইতিবাচক আশার কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। দীর্ঘকালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অর্জিত এদেশে বিরাজিত অন্ধকারের মধ্যেও জাতীয় পতাকাই যে এদেশবাসীর আশার আলো, উজ্জ্বল ঠিকানা, এ-সত্যই যেন অভিব্যঞ্জনা পেয়েছে এই উক্তিতে।

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, *প্রণীত জীবন*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৫-৪৯

[২] আবুল হাসনাত, 'তাঁর সৃজনভুবন নিয়ে কিছু কথা', *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৭

এ-নাটকে সৈয়দ শামসুল হকের মঞ্চনির্দেশনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সরাসরি মঞ্চের মানুষ না হয়েও মঞ্চনাটকের কৌশল সম্পর্কে তাঁর ছিল নিবিড় জ্ঞান। হতে পারে নাট্যকার প্রবাসকালে লন্ডনের থিয়েটার হলে অসংখ্য মঞ্চনাটক দেখার অভিজ্ঞতাকে এখানে দক্ষ হাতে কাজে লাগিয়েছেন। আবার, স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকার মঞ্চনাটকের পুরোধা ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও তাঁকে মঞ্চাভিনয় বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করেছে। নাটকের প্রারম্ভে 'সবিনয় নিবেদন' অংশে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকের মঞ্চায়ন নিয়ে নাট্যকারের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

> আমার কল্পনায়, বর্তমান নাটকের মঞ্চ তিনদিকই কালো পর্দায় সজ্জিত। মঞ্চের মাঝখানে একটি চেয়ার; কাঁঠাল কাঠের তৈরী, বহু ব্যবহারে তৈলাক্ত এবং মসৃণ। [...] নাটকের শেষভাগে যে পতাকার কথা বলা হয়েছে তার আয়তন গোটা মঞ্চ-ক্ষেত্রের এক চতুর্থাংশ হতে হবে। দর্শক সমাগমের শুরু থেকেই মঞ্চ অনাবৃত থাকবে ; স্তিমিত একটা সাধারণ আলোর ভেতরে অপেক্ষাকৃত জোরালো আলোয় চেয়ারটি উদ্ভাসিত থাকবে। নেপথ্য থেকে বাঁশি ও ঢাকের মিলিত একটা সঙ্গীত শোনা যাবে ; সে সঙ্গীত হৃদস্পন্দন অথবা তালে তালে বহু পদশব্দ এগিয়ে আসবার অভিব্যক্তি। প্রতিভাবান পরিচালক উপরোক্ত যেকোনো বা সব ক'টি নির্দেশই অনুপস্থিতি গণ্য করে নিজের কল্পনা প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্য রাখবেন। [১]

নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে পরিচালককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের এই বিষয়টি তিনি যে বাস্তবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, তা নাট্যপরিচালক আতাউর রহমান এক স্মৃতিচারণমূলক রচনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

> পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' *থিয়েটার* নাট্যদলের যোগ্য প্রযোজনায় এবং সু-অভিনয়ের কারণে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করে। পরবর্তীকালে 'থিয়েটার স্কুল' এর ছাত্র-ছাত্রীরা আমার নির্দেশনায় স্কুলের বার্ষিক প্রযোজনা হিসেবে এই নাটকটি ধানমণ্ডি ২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জার্মান কালচারাল সেন্টারের মিলনায়তনে মঞ্চায়ন করে। আমি সৈয়দ হকের সর্বাধিক নাটকের নির্দেশক হিসেবে বেশ কিছু স্বাধীনতা নিয়েছি। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান নাট্যকারের মতো তা সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন।[২]

তবে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ের* প্রথম মঞ্চায়নে নাট্যনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছিলেন খ্যাতিমান নাট্যপরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন। 'থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী প্রায় ছয় মাস মহড়ার পর ১৯৭৬-এর ২৫ নভেম্বর

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্যসংগ্রহ*, , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[২] আতাউর রহমান, 'সৃজনে ধ্রুবতারা', *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তবর্ণ আলেখ্য *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* মঞ্চে আনে। এর প্রথম প্রদর্শনী হয় মহিলা সমিতি মঞ্চে। এ প্রদর্শনীতে দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ পঞ্চাশজন এবং *টিকেটের* মূল্য ছিল পাঁচ, দশ ও পনের টাকা।'[১] নাটকের প্রথম মঞ্চায়নের কলাকুশলীদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো :

মঞ্চাভিনয় :

মাতবর চরিত্রে আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাতবরের মেয়ে চরিত্রে ফেরদৌসী মজুমদার। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন তারিক আনাম খান, খায়রুল আলম সবুজ, ঝুনা চৌধুরী, শংকর দাস, ভাস্বর চক্রবর্তী, তোফা হাসান, রেখা আহমেদ, মুসা আহমেদ, জোবায়ের জার্জিস, নাসরীন রিয়াজ, নাসরীন লাকী, আব্দুল কাদের, সাজ্জাদ খান, হাফিজুর রহমান সুরুজ, নাহিদ রেজা রুমু, সমর দেব, রিয়াজ উদ্দীন বাদশা, আব্দুর রহীম দুলাল, আবরার মো. শাহীন, খুরশীদ আলম এবং ফরিদউদ্দীন।

আর মঞ্চের নেপথ্যে কাজ করেছেন :

নির্দেশনা : আব্দুল্লাহ আল মামুন, মঞ্চ : কেরামত মাওলা, রূপসজ্জা : সালাম, আবহসঙ্গীত : আলম খান, আলো : তারিক আনাম খান, কোরিওগ্রাফি : আমির হোসেন বাবু, প্রযোজনা : রামেন্দু মজুমদার।[২]

নাটকটির প্রথম প্রযোজনা দর্শক-সমালোচকের বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছিল। বিশেষ করে নাটকের প্রধান দুটি চরিত্রের অভিনয় দর্শক-সমালোচক ছাপিয়ে সরাসরি নাট্যকারের হৃদয়তন্ত্রী নাড়া দিয়েছিল। সৈয়দ শামসুল হক পরবর্তীকালে এক আলাপচারিতায় মাতবরের মেয়ে চরিত্রে রূপদানকারী ফেরদৌসী মজুমদারকে এ-প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে বলেছিলেন :

> আপনার এবং আবদুল্লাহ আল মামুনের অভিনয়ের কারণেই অন্তত এ মাধ্যমটি, কাব্যনাট্য মাধ্যমটি একটি স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছে।[৩]

---

[১] ড. সাবিরা মনির, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৪০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১

তবে নাটকটির মঞ্চপরিবেশনা নিয়ে সমকালে যথেষ্ঠ সমালোচনা হয়েছিল। বিশেষত এ ধরনের সিরিয়াস নাটকে চটুল সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োগ অনেকের কাছে বাহুল্য ও নাটকটির পক্ষে মর্যাদাহানিকর বলে বিবেচিত হয়েছে।[১]

'আঞ্চলিক ভাষার যথার্থ ব্যবহারে যে নাট্যকার পারঙ্গম তা *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকের সমগ্র শরীর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।'[২] তবে নাটকের সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করায় প্রশংসার পাশাপাশি নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক সমালোচনারও শিকার হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন বিশেষ একটি অঞ্চলের ভাষা দিয়ে নাট্যকার সার্বিকভাবে দেশের সকল পাঠক-দর্শকের বোধগম্যতা স্পর্শ করতে সক্ষম হবেন না। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক কুশলী শব্দচয়ন দক্ষতায়, আঞ্চলিক আবহ অতিক্রম করে নাটকটিকে করে তুলেছেন সর্বজনগ্রাহ্য। নাট্যকার মফিদুল হক এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন – 'আমাদের কোন ক্ষমতাবান কবি কিংবা কথাসাহিত্যিক নাটকের ফর্মের প্রতি আগ্রহ দেখালেন এই প্রথম।'[৩] বস্তুত সৈয়দ শামসুল হক নাটকের দর্শন ও শ্রাব্য উভয় গুণের কথা বিবেচনা করেই নাটকের সংলাপ উপযুক্ত অলঙ্কারময় কাব্যভাষায় রচনা করেছেন। মঞ্চনির্দেশক আতাউর রহমান নাট্যকারের ভাষাবৈশিষ্ট্য নিয়ে চমৎকার একটি বিশ্লেষণমূলক মন্তব্য করেছেন :

> সৈয়দ শামসুল হক আদি ও অকৃত্রিম কাব্য ভাষাকেই প্রধানত তাঁর নাট্যভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কাব্যে যেমন রূপালঙ্কার, সঙ্কেত, প্রতীক ও বিমূর্ততা ব্যবহার করার সুযোগ আছে, তেমনটি গদ্যভাষায় নেই। [...] সৈয়দ শামসুল হক প্রথমত একজন কবি বলেই যথার্থভাবে তিনি কাব্যভাষাকেই তাঁর নাট্যভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।[৪]

---

১ যেমন, নাট্যসমালোচক মফিদুল হক অভিনেতা হিসেবে আব্দুল্লাহ আল মামুনের ভূয়সী প্রশংসা করলেও নির্দেশক হিসেবে তাঁর সমালোচনা করে বলেন :

নাট্য নির্দেশনায় আব্দুল্লাহ আল মামুনের সাফল্যের বিশিষ্টতা ছোট ছোট দোহারের চাইতে অধিক নয়। [...] মূল পায়ের আওয়াজের সাথে গান নাচের দৃশ্য নির্দেশক সংযোজন করেছেন। [...] নাটকের ক্লাইম্যাক্সে মাতবর কন্যার হালকা চটকা গান বিষাদমাত্র অনুভূতির প্রতি ব্যঙ্গ বলে বোধ হয়। সবশেষে যে দীর্ঘ নৃত্যদৃশ্য পরিচালক সংযোজন করেছেন তা হয়তো কল্পনাতে মানানসই কিন্তু বাস্তবে হাস্যকর দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : মফিদুল হক, 'থিয়েটারের স্মরণীয় প্রযোজনা *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*', *সাপ্তাহিক চিত্রালী*, সম্পাদনা : সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ, ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭৭, পৃ. ১০)

২ আতাউর রহমান, 'সৃজনে ধ্রুবতারা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩ মফিদুল হক, 'বহির্বিশ্বে সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*', (দ্রষ্টব্য : সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ.২০)

৪ আতাউর রহমান, 'সৃজনের ধ্রুবতারা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

নাটকে নাট্যকার গ্রামবাসীর মুখের সংলাপে যোগ করেছেন লোকজ অনুষঙ্গযুক্ত আঞ্চলিক শব্দ। এতে করে গ্রামবাসী চরিত্রগুলি আরও বাস্তব হয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আবার, ধর্মের ধ্বজ্জাবাহী পীরসাহেবের সংলাপে যুক্ত করেছেন লোকজ বাংলাভাষার সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দবহুল মিশ্রভাষা, যার মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মানুষের মুখের ভাষার স্বরূপ অনুধাবন করা গেছে সহজেই। অর্থাৎ চরিত্রানুযায়ী মুখের ভাষা নির্মাণ তথা শব্দচয়নে নাট্যকার অত্যন্ত মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রামবাংলার পেশাজীবী মানুষের চালচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের সংলাপে, তাদেঁর মুখের ভাষায়। এক্ষেত্রে তাঁদের সংলাপে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ, অলঙ্কার-উপমার প্রয়োগ তাদের শ্রেণি-অবস্থান দর্শকের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়েছে। যেমন : বিপদে সাধারণ মানুষকে টিকে থাকার কৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে মাতবর বিভিন্ন পেশাজীবীর জীবিকার্জনের কৌশলকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতায় এই বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন :

খ্যাতে যে কিষাণ হাল দিয়া শস্য করে
– শস্য না দুঃখের দানা ওঠে তার ঘরে।
গহীন গাঙে যে মাঝি জালে মাছ ধরে
– মাছ না নিজের জান বড় জালে পড়ে।
ফলবৃক্ষ যে জননী বাচ্চা কোলে করে
– বাচ্চা না মাটির দিয়া নিভা যায় ঘরে।
যে জোলা রঙীন সুতা দিয়া নকশা ধরে
– নকশা না নিজের ভাইগ্য ভিজাচক্ষে পড়ে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩)

গ্রামবাসীদের মধ্যে আবার বিভিন্ন বয়সের মানুষ রয়েছে। সংলাপ রচনার সময়ে নাট্যকার চরিতের বয়স ও লৈঙ্গিক পরিচয় বিবেচনায় রেখেছেন। যেমন : পীরসাহেব ও মাতবরের সঙ্গে বয়স্কা নারীদের সংলাপে যেখানে রয়েছে সমীহ-ভাব, সেখানে যুবাদলের মুখে ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। বিরূপ পরিস্থিতিতে যুবকরা যেহেতু ক্রোধে টগবগ করে ফুটছে, সেহেতু তাদের সংলাপে যুক্ত হয়েছে দ্রোহাত্মক শব্দ। জনতার উদ্দেশে মাতবর প্রসঙ্গে তাদের সংলাপ উল্লেখ্য :

অতো কাকুতি-মিনতি ক্যান ?
তোতো-বোতো ক্যান ?
দ্যাখা যদি তিনি নাই দিতে চান
হাতে ধইরা না, পায়ে ধইরা না,

ঘাড়ে ধইরা না আন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯)

অন্যদিকে, সাধারণ গ্রামবাসী একই প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত নমনীয় ভাষায় সংলাপ উচ্চারণ করেছে :

দোহাই বাবা আসতে বলেন তারে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৮)

আবার, সমাজপতি মাতবরের মদদপুষ্ট অস্ত্রধারী পেয়াদার মুখের ভাষাও হয়ে উঠেছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ, অসংযমী। নিজে দরিদ্র সাধারণ গ্রামবাসীর অংশ, অথচ মালিকের ক্ষমতার প্রভাবে সাধারণ জনতার জমায়েতকে সে তুলনা করেছে ছাগলের পালের সঙ্গে :

ফাঁকে যাও সব, সইরা খাড়াও

মাতবর সাবে আসতে আছেন, জায়গা দাও

ছাগলের মতো ভিড় কইরো না। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০)

নাটকে পীরসাহেব চরিত্রটি আরবি-ফার্সি শব্দবহুল ভাষায় ধর্মীয় নানান কাহিনির দৃষ্টান্ত টেনে জনগণকে ধর্মনিষ্ঠ ও সংযমী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। বলাবাহুল্য, পীর চরিত্রের এই ভূমিকা আরও সার্থক ও বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে লেখকের ভাষানির্মাণ দক্ষতার অনন্যতায়। পীর যখন জনগণের উদ্দেশে কারবালার মর্মান্তিক কাহিনি বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি ইসলামের সত্যঘটনাকে পাশ কাটিয়ে প্রচলিত গ্রামীণ পুঁথিসাহিত্য ও মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) রচিত *বিষাদ-সিন্ধু : উদ্ধারপর্ব* (১৮৯১)-র কাল্পনিক কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা, সত্য- ইতিহাস ছাপিয়ে গ্রামীণ জনগণ এরকম আবেগাত্মক শোধ-প্রতিশোধের গল্পে অধিক আকর্ষণ বোধ করে। জনতার উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য উল্লেখ্য :

একে একে খুন হইল নবীর দুলাল

প্রতিশোধ নিতে আবু হানিফা ভয়াল

তরোয়াল হাতে নিয়া সোয়ার ঘোড়ায়

মহাতেজে দুষমনের দিকে ধায়া যায়।

হানিফার ঘোড়া ছোটে আওয়াজ ঠাঠার

হানিফার ডরে সূর্য হইল আন্ধার

এই প্রতিশোধে হবে সৃষ্টি ছারখার

জরুরি হুকুমে নামে তখন পাহাড়

পাহাড় ঘেরিয়া ধরে আবু হানিফায়

হানিফা চলার বেগ তবু না থামায়

তবুও সোয়ার আবু হানিফা ঘোড়ায়

এখনো পাহাড়ে কান দিলে শোনা যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২-৩৩)

এখানে নৈপুণ্যের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের পাশাপাশি আঞ্চলিক শব্দ (তরোয়াল, ঠাঠার) ব্যবহার করেছেন তিনি। পীরের উচ্চারিত সংলাপে প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ যুক্ত করেছেন তিনি; এমন কি কুরআনের আয়াতও হুবহু সংলাপে জুড়ে দিয়েছেন। যেমন পবিত্র 'সুরা ফিল' প্রসঙ্গে যখন আবরার বাদশাহ ও আবাবিল পাখির কাহিনি বর্ণনা করেছেন, তখন তার সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে মিশ্র ভাষারূপ :

আলামতারা কাইফা ফা'লা রাব্বুকা বিয়াস হা বিল ফিল।

তোমাদের মনে নাই আইসাছিল হাতির মিছিল ?

জগৎ-পালক তার পরিণাম করেন ওসিল ?

পাঠান কি নাই তিনি পাখি আবাবিল?

হাতির উপরে তারা মারে লাখো ঢিল।

চক্ষের নিমিষে শেষ, নিড়া দেওয়া খ্যাতের সামিল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৫)

আলোচ্য সংলাপে পবিত্র কুরআন-এর আয়াত সংযুক্ত হলেও যেহেতু এটি সাধারণ গ্রামবাসীকে বোঝাবার জন্যে বলা হচ্ছে, তাই বাদশাহের হাতির পাল ধ্বংস হবার সঙ্গে কৃষকের নিড়ানি দেওয়া ফসলের খেতের তুলনা করা হয়েছে। এভাবেই সংলাপে উপযুক্ত শব্দ, উপমা, অলঙ্কার প্রয়োগের আশ্চর্য দক্ষতায় নাট্যকার বাংলাদেশের ধর্মপ্রবণ সাধারণ এক গ্রাম ও গ্রামবাসীর বাস্তব চিত্র অংকন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া* যায়-এর ভাষাশৈলী অধিক শিল্পসার্থক ও বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে নাট্যকারের অলংকার নির্মাণ ও প্রবাদ-প্রবচন চয়নের দক্ষতায়। অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার নাট্যকারের উপমা চয়নের নান্দনিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিষিক্ত করেছেন 'উপমার রাজা' অভিধায়। স্মৃতিচারণমূলক এক লেখনীতে তিনি বলেন :

> আমার সৌভাগ্য আমি তাঁর বিখ্যাত কাব্যনাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'তে মুখ্য নারী চরিত্র মাতবরের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছি, যেটা এখন আমার মেয়ে ত্রপা করছে। চরিত্রটা বুঝতেই আমার অনেক সময় লেগেছিল। কী অসাধারণ উপমা : 'হঠাৎ আছাড় দিয়া আসমানে দেখা দিল চান, এক ফালি কদুর লাহান।' লাউর ফালির মত চাঁদ হতে পারে একমাত্র তাঁরই উপলব্ধি। [...] আমি বেশি অভিভূত ও আবেগতাড়িত হই,

সংলাপে তাঁর উপমার ব্যবহার দেখে। মাতবরের মেয়ে যখন বলে, – 'আমার কী আছে / গ্যাছে সুখ / য্যান কেউ / নিয়ে গ্যাছে গাভীনের বাটে যতটুকু / দুধ আছে নিষ্ঠুর দোহন দিয়া।'

উপমার রাজা তিনি। এই একটা সংলাপেই, মেয়েটির বুক খালি করা আর্তনাদ, যেন দর্শকশ্রোতার মনেও সমবেদনার সৃষ্টি করে, চোখকে সিক্ত করে দেয়। এ সংলাপ এমন করে, গভীর ভাবে উপলব্ধি করে লেখা সম্ভব হয়েছে এ অসাধারণ কবি প্রতিভা সৈয়দ শামসুল হকের পক্ষেই। বোঝা যায় তাঁর গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ ছিল, যেমন ছিল গভীর এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি।[১]

বস্তুত লেখকের প্রতিটি উপমা প্রয়োগ এমনি শিল্পিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও ইঙ্গিতপূর্ণ। এ-নাটকে উপমার প্রয়োগ ঘটেছে চরিত্র ও ঘটনানুযায়ী। গ্রামবাসীর অসহায়ত্ব নাট্যকার বুঝিয়েছেন 'মহররমের ধূলা,' 'যমুনার বান' প্রভৃতি উপমান ব্যবহার করে; অন্যদিকে পীরসাহেবের সংলাপে মাতবর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে ক্ষমতাধর, শোষক, 'বড়গাছের ডাল', 'যমুনার বোয়াল', 'শকুনের বাপ', 'আজদাহা সাপ' প্রভৃতি উপমানের মাধ্যমে। যেমন :

পীর। ঝড়ের খবর আগে পায় বড়গাছের ডাল
বানের খবর আগে পায় যমুনার বোয়াল
খরার খবর পয়লা জানে ছিলা-শকুনের বাপ
আর, জারের খবর পয়লা জানে আজদাহা সাপ
সে না আইসা কি পারে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৮)

আবার, মাতবর সম্পর্কে অন্যত্র পীরের উচ্চারণ :

সে তো কয় নাই
খোড়লে সানধাই
শিয়ালের মতো পলাইয়া যাই
নিজের গেরাম থিকা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯)

---

[১] ফেরদৌসী মজুমদার, 'উপমার রাজা', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৮-৭১৯

এখানে যুদ্ধের শেষদিকের প্রেক্ষাপটে অন্যায়কারী মাতবরের অর্ন্তধানকে ভীত ও ধূর্ত শিয়ালের গর্তে আত্মগোপনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার, বন্যাপ্রধান বাংলাদেশের সমাজচিত্র ও কুসংসকারাচ্ছন্নতার চিত্র স্পষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত উপমা দ্বারা :

যখন উঠছে খলখলাইয়া যমুনা
জ্বিনে ধরা যুবতীর লম্বা কালা ক্যাশর লাহান
চৈত্রের ঝড়ের ঝুটি ধইরা দিছে টান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২)

যুদ্ধের বাজারে সাধারণ মানুষের অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন দারুণ একটি উপমা, যেটির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে সেকালের মোল্লা-নির্ভর সমাজব্যবস্থা :

আকাট মোল্লার হাতে আধাজবেহ গরুর মতন
মানুষের হালৎ এখন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৩)

যুদ্ধের শেষপর্যায়ে হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের ভয়বোধকে লেখক নিম্নোক্ত উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন :

মাতবর। (স্বগত) আসলে, ডর লাগছে, ডর পাইছে,
ডর ধরছে, ডর
চিকন সাপের মতো ডর ঢুকছে বেহুলার লোহার বাসর। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৩)

এখানে মধ্যযুগের মঙ্গলসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লোকপুরাণ বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে। চাঁদ সওদাগর যেমন সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সতর্কতা অবলম্বন করেও তার প্রাণপ্রিয় সন্তান লখিন্দরের লৌহনির্মিত বাসরঘরে ঘাতক সর্পের প্রবেশ বন্ধ করতে পারেনি, তেমনি স্বাধীনতাবিরোধী অপরাধী শ্রেণির অজান্তেই মনের মাঝে ঢুকে গেছে ভয়। এরকম আরও কিছু সার্থক ও শিল্পিত উপমার উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো :

ক) কুলনষ্ট মেয়েছেলে কুত্তাচাটা থালার সমান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬)
খ) সে ক্যান ফালায়া গেল আমার জীবন
হঠাৎ খাটাশে খাওয়া হাসের মতন। (কাব্যনাট্যসমগ্র :৪৫)

আলোচ্য নাটকে একাধিক স্থানে উৎপ্রেক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। যেমন :

সেই ফুল সেই ফল মানুষের মেলা

সন্ধ্যার আগেই য্যান ভরা সন্ধ্যাবেলা। (কাব্যনাট্যসমগ্র :১৭)

যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাতির বুকে আকস্মিক নেমে এসেছে অকাল সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার, এটি উপস্থাপনের প্রয়োজনে তিনি উপর্যুক্ত উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করেছেন। এরকম আরও কিছু শিল্পসার্থক, নান্দনিক উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো :

ক) কবর খোঁড়ার আওয়াজ উঠাইছে য্যান কামানের তোপ। (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ২৪)

খ) য্যান একটা ছোঁ মারলো আচাভুয়া পাখি
সোনার দালান খইসা ঝরে কাদামাটি। (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ২২)

গ) ডরাইন্যার দিল
দেখতে না দেখতেই য্যান ঝুরঝুরা পুরাণ দলিল। (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ২৫)

ঘ) গ্যাছে সুখ
য্যান কেউ নিয়া গ্যাছে গাভীনের বাঁটে যতটুকু
দুধ আছে নিষ্ঠুর দোহন দিয়া। (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ৫৫)

ঙ) গরীব গেরস্ত ঘরে য্যান এক নতুন পোয়াতি
বিরাট আন্ধারে শোয়া, নিভা গেছে বাতি। (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ২১)

সমাসোক্তি :

ক) মরা খ্যাতের লু-হাওয়া কয়, কোথায় হানিফা ?
খরা যমুনার পানি কয়, কোথায় হানিফা ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩)

খ) যখন আসল সত্য ওঠে লাফ দিয়া
তখন দুনিয়া
আচানক মনে হয় সোনার শিকল কাটা পাখির লাহান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৫)

রূপক/প্রতীক :

মিলিটারির অনৈতিক উদ্ধত আক্রমণে বিধ্বস্ত বাঙালির করুণ ছবি প্রকাশিত হয়েছে নিম্নোক্ত লোকায়ত প্রতীকের মাধ্যমে। বসন্তে ধরা কচি আমের মুকুল যেমন বৈশাখের আকস্মিক শিলাবৃষ্টির আক্রমণে ঝরে পরে, তেমনি করুণ দশা ১৯৭১ সালের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাঙালি জাতির। যেনো সুশোভিত পুষ্পবৃক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়েছে গোটাসমেত ফুল : আমগাছে আম নাই শিলে পড়ছে সব

ফুল গাছে ফুল নাই গোটা ঝরছে সব। (কাব্যনাট্যসমগ্র :১৭)

আলোচ্য নাটকে ব্যবহৃত আরও কিছু রূপক প্রতীকের দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক) রাগ হইল একখান আর্শীর উপর
এক পরদা ধূলার আস্তর
না মুছলে জিলকি তার অবিলম্বে লয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৩)

খ) বুদ্ধিমান নাড়ায় না ডাল যে ডালে নিজেই বসা,
পয়সার দাম নাই যে পয়সা ঘষা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪)

প্রবাদ / প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১৯৭১ সালে সম্পূর্ণ স্রোতের বিপরীতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর জয় ছিলো আকস্মিক, অবিশ্বাস্য। প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর সমরাস্ত্রের সামনে সাধারণ জনগণের যুদ্ধ ছিলো বিস্ময়কর। তেমনি রাজাকারদের ঘৃণ্য পরিণতি ছিল তাদের কুকর্মের ফল। লেখক এইবিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন পীরের মুখের কিছু দার্শনিক সংলাপের মাধ্যমে। গ্রাম্য পীরের দর্শনতত্ত্বে লোকজ প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক :

পীর। আম পুতলে চিরকাল আম
হইয়াছে, জাম পুতলে জাম।
পানির উপর দিয়া
খালি পায়ে মানুষ না গিয়া
চিরকাল খোঁজ করছে নাও।
ভিতরে ভেদের কথা যদি শুনতে চাও
সময়ে দুই একজন পার হয়া যায় খালি পায়।
সময়ে ফলের গাছে অতি মিষ্টফল
না ধইরা ধরে কর্মফল । (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৩)

সংলাপে ব্যবহৃত আরও কিছু প্রবাদ-প্রবচন, প্রবাদপ্রতীম বাক্যের দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক) ডর হইল ডংকার লাহান
একবার বাড়ি দিলে যায় না থামান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৫)

ঘ) যেমন জাইলার জালে পড়ে চিতবোয়াল

মানুষ ধরতে চায় গুজবের জাল।(কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮)

ঙ) ঝড়ের খবর আগে পায় বড় গাছের ডাল

বানের খবর আগে পায় যমুনার বোয়াল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৮)

ছ) অন্যে করে ঠুকঠাক, কামারের একখান বাড়ি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক তাঁর অসাধারণ সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে নান্দনিক সব অলঙ্কার, প্রতীক, প্রবচনের ব্যঞ্জনায় *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকটিকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। 'গ্রামীণ ও দেশজ চিত্রকল্প, উপমা, রূপক ও আঞ্চলিক ভাষার সুনিপুণ ব্যবহারে এবং সমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের বন্ধনে এ কাব্যনাটক অনবদ্য। অসাধারণ সংলাপ, ভাষার গীতময়তা ও নাটকীয় পরিবেশ সব মিলিয়ে এ নাটক আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে এবং স্বাধীনতা বিরোধী ঘৃণ্য দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা সঞ্চারে এ কাব্যনাটক প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে।'[১] এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সমগ্র বাংলাসাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* একটি শিল্পঋদ্ধ কাব্যনাটক হিসেবে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

নূরলদীনের সারাজীবন

সৈয়দ শামসুল হক ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে উপজীব্য করে লিখেছেন *নূরলদীনের সারাজীবন*। ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে কল্পনার সহযোগ সন্নিপাতে এটি হয়ে উঠেছে অসাধারণ শিল্পগুণান্বিত নাটক। বস্তুত, 'কাহিনিকেন্দ্রিকতা কাব্যনাটকের মূল অভিষ্ট নয়, কাহিনির চেয়ে ব্যক্তি চরিত্রের অন্তর্গত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ অধিকতর প্রয়োজনীয়। এ কারণে সৈয়দ হক কাহিনির চেয়ে বেশি মনোযোগী হয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্চেতনা আবিষ্কারে।'[২] ফলে *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাট্যের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, মানসিক সংকট, হৃদয়ের ক্ষরণ চোখে পড়ে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে আলোচ্য নাটকে নূরলদীনের অন্তর্জাগতিক দাহ ও দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার মন্তব্য করেছেন নিম্নরূপ :

---

[১] মো: জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা (১৯৪৩-১৯৯০)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৪৯

[২] অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

> নূরলদীনের আত্মা ও প্রেরণা আমি ইতিহাসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক সংকট আমি সম্ভবপরতার ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছি। (সবিনয় নিবেদন, কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬৩)

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকে নাট্যকার নূরলদীনের ছবি এঁকে দেখিয়েছেন – মিছিলের সম্মুখ সারিতে যারা স্থান করে নেয়, তারা আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই অতিসাধারণ। অর্থাৎ নায়ক হবার যোগ্যতা কেন্দ্র থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবারই থাকে, কিন্তু প্রয়োজন কেবল বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গের প্রস্তুতি ও অঙ্গীকার। সৈয়দ শামসুল হক চেয়েছেন প্রত্যেক সাধারণের অভ্যন্তরে যে অমিত সম্ভাবনা সেটিকে আবিষ্কার করতে। তিনি জানতেন প্রত্যেকের ভেতরেই বাস করে একজন দেশপ্রেমিক নূরলদীন। প্রয়োজন শুধু তাকে চিনে নেওয়া। নূরলদীন কেবল অতীতের পাতা থেকে উঠে আসা এক ইতিহাস নয়, নূরলদীন আজকের অসম ও বিভক্ত মানুষের অনিঃশেষ সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি, বাংলার নিরন্ন কৃষকের পূর্বপ্রজন্ম।

আলোচ্য নাটকে নূরলদীন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নাট্যকার এমনভাবে নির্মাণ করেছেন, যা সত্যিকার অর্থেই একজন গণমানুষের নেতার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। গণমানুষের নেতা হবেন সত্যবাদী, দেশপ্রেমিক, নির্ভীক, যুক্তিবাদী, কুশলী, সর্বোপরি ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত এক চরিত্র। নূরলদীন চরিত্রের মধ্যে এই প্রত্যেকটি চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। নূরলদীনের পিতৃবিয়োগের শোক, দারিদ্র্য, হতাশা যেমন তাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তেমনিভাবে জনগণের সার্বিক দুঃখ-কষ্ট তাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। ফলে বারবারই সে জনগণের হয়ে জনগণের জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তায় জেগে উঠেছে। নূরলদীন পরিপূর্ণ এক দেশপ্রেমিক সত্তা। দেশকে সে বরাবরই নিজ জননীর সঙ্গে তুলনা করেছে। জনগণকে সে বুঝিয়েছে, ব্রিটিশের এই অযাচিতভাবে সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন যেন নিজ জননীরই বুকের ওপর চেপে বসা। ফলে দেশমাতৃকার একজন সন্তান হিসেবে সে জনগণকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জেগে ওঠার আহবান জানিয়ে বলেছে :

> তোমরা ক্যানে ও ঠাঁই বাহে ? মায়ের দুগ্ধ খান,
> শোনেন শোনেন, মা জননী মাও কান্দিয়া কয়, [...]
> এমন কালা ব্যাটা উয়ার না শুনিবার পায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৯)

নূরলদীন সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার। শোষিত ও শোষণকারীর ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত তার কাছে বড়ো হয়ে ওঠেনি। তার দেশের জনগণ – কে হিন্দু কে মুসলিম এটি যেমন তার কাছে বিবেচ্য নয়, তেমনিভাবে অত্যাচারী স্বদেশি নাকি বিদেশি তাও তার ভাবনায় নেই। সে জনগণের উদ্দেশে বলেছে – যে

শোষণ করছে সে-ই শোষক। তার কোনো জাত-পাত নেই। তাই এই আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যেকের উচিত সম্মিলিত প্রতিবাদ গড়ে তোলা। সে যখনই সাধারণ জনগণকে উদ্দেশ্য করে সম্বোধন করেছে, কিংবা ব্রিটিশদের কাছে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করেছে, তখনই সে ধর্ম-বর্ণ ও গোত্রের বাইরে কেবল 'মানুষ' পরিচয়কে বড়ো করে দেখেছে :

মানুষ হো–ও।

মাঠের মানুষ, দেশের মানুষ, হামার মানুষ হো–ও। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১০০)

একজন সত্যিকার নেতার মতোই নূরলদীনের রয়েছে অসীম সাহস। সে ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নিয়ে যেমন ভাবেনি, তেমনি অসীম সাহস নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে নিজেই এক অসম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মৃত্যুভয় তাকে সামান্য পরিমাণ টলাতে পারেনি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, শোষকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রতিবাদে এতটুকু বুক কাঁপেনি তার। অস্ত্রধারী ব্রিটিশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দৃপ্তস্বরে তাদের এদেশে অন্যায়ভাবে জেঁকে বসার ও, দেশ দখলের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের প্রকৃত অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে :

একদিন কালাপানি পার হয়া সওদাগরি করিবার জন্যে জাহাজ

ধরিয়া আসিলেন হামার মুলুকে।

[...] একদিন সওদাগরি করিতে করিতে তোমরা করিলেন বড় এক সওদাগরি।

একদিন অবাক হয়া দেখিলোম, কোন তালে কখন হামাক

গুষ্টি সমেত নিছেন খরিদ করি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১০১)

নূরলদীন যুক্তিবাদী, কুশলী এক নেতা। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার, আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিহত করার তার নানান কৌশলমূলক প্রস্তুতি নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কেবল অসীম সাহস আর দেশপ্রেমকে অবলম্বন করেই একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা শত্রুর বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে নামতে পারেন না; তাকে যুক্তিবাদী ও কুশলী হতে হয়। নূরলদীনের মধ্যে আমরা এই গুণের উপস্থিতি লক্ষ করি। বিভ্রান্ত, ভীত, বিচ্ছিন্ন, শোষিত জনগোষ্ঠীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এক কাতারে সামিল করতে তার কুশলতা অনায়াসেই পাঠকমাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রিটিশ কর্মচারীর বন্দুকের ভয়ে যখন জনগণ ভীত হয়, তখন বাস্তবতার আলোকে নূরলদীন তাদের যুক্তি দিয়ে ব্রিটিশের লড়াই সম্পর্কে বুঝিয়েছে :

গোরার এ রীতি এই, অকস্মাতে জমিন ফুঁড়িয়া তাঁই উঠিবে তখন

মারি ধরি লাশ করি, অগ্নি দিয়া গ্রাম গঞ্জ করিবে উচ্ছন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৯)

নূরলদীন নির্লোভ এক নেতা। সাধারণ জনগণ তাকে নবাবের আসনে বসালেও নবাব হবার কোনো ইচ্ছেই তার ছিল না। এমনকি স্ত্রী আম্বিয়া যখন নূরলদীনের নবাব হবার সম্ভাবনা দেখে নিজে রাজ-রানী হবার স্বপ্নে বিভোর হয়েছে, নূরলদীন তখন তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে। বন্ধু আব্বাসের আশংকার জবাবে বলেছে : 'নবাবের সিংহাসনে বসিবার কোনো লোভ নাই যে হামার'। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর জবানেও আমরা এমন কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, গণমানুষের মুক্তি চাই। ঠিক তেমনিভাবে নূরলদীনও চেয়েছে রাজসিংহাসনে নয়, বরং জনগণের হৃদয় সিংহাসনে নিজেকে বসাতে। কেননা, সে বিশ্বাস করেছে :

> শিকল আনিয়া দিবে পুনরায় রাজায়, নবাবে।
>
> অন্তরে আসন দিও, নয় কোনো রাজসিংহাসন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১১৬)

নাট্যকার এই নিঃস্বার্থ, পরোপকারী গণমানুষের নেতার হৃদয়ের একান্ত শূন্যতা, হাহাকার সমান দক্ষতার সঙ্গে নাটকে উপস্থাপন করেছেন। নূরলদীন গণমানুষের নেতা; জনগণের কল্যাণে, জনগণের জন্যই যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু সেও রক্ত-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ। তার ভেতরেও আছে ভালোবাসাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। সৈয়দ শামসুল হক একজন দক্ষ নেতাকে আঁকতে গিয়ে তার এই একান্ত ব্যক্তিগত মানবিক সত্তাকে চিত্রিত করতে ভোলেননি। এমনিতে দেখা গেছে, স্ত্রী আম্বিয়া ও নূরলদীনের স্বভাব-চরিত্র বিপরীতমুখী। যে কারণে আম্বিয়ার নামে নূরলদীন তার বন্ধু আব্বাসের কাছে অভিযোগ পর্যন্ত করেছে। অথচ, জ্যোৎস্নাস্নাত নির্জন রাতে ব্যক্তিহৃদয়ের শূন্যতা পূরণে সে আশা করেছে স্ত্রী আম্বিয়ার সান্নিধ্য, প্রেম-ভালোবাসা, আশ্রয়। নূরলদীনের এই আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ নাট্যকার চিত্রিত করেছেন নিম্নরূপে :

> আম্বিয়া, তুইও সঙ্গে থাকিস হামার। [...]
>
> আম্বিয়া, জাগিবি নিশি সঙ্গেতে হামার ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১২১)

অন্যদিকে, আব্বাস চরিত্রটি যুক্তিবাদী চরিত্র। সে হুজুকে মেতে, আবেগে ভেসে কোনো হঠকারী পদক্ষেপ নেবার পক্ষপাতী নয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধীরে-সুস্থে সে লড়াইয়ে নামতে চেয়েছে। তার চরিত্রের দার্শনিকতা, বিচক্ষণতা, দায়িত্বশীলতা অনন্য। বন্ধু নূরলদীনের সমুদ্রসম উত্তালতার বিপরীতে দিঘির মতো শান্ত, নিবিড় ও স্নিগ্ধ তার চরিত্র। ফলে যখনি নূরলদীন এই অসম লড়াইয়ে ক্লান্তি অনুভব করেছে, শূন্যতা তাকে গ্রাস করেছে, তখনই সে আব্বাসের সঙ্গে আলাপ করে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছে। আবার, নূরলদীনের মৃত্যুর পর যথার্থ উত্তরসূরি হয়ে আব্বাসই লড়াইয়ের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। মূলত, আব্বাস চরিত্রটি

ঐতিহাসিক নয়, লেখকের কল্পনাপ্রসূত। একজন আবেগদীপ্ত নেতার ছায়ারূপে এমনই একজন যুক্তিবাদী, হিসেবি ও বিচক্ষণ বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন নাট্যকার। আব্বাস পদে পদে দামাল নূরলদীনকে সাবধান ও সতর্ক করে গেছে একজন প্রকৃত বন্ধুর মতোই :

গোরার বন্দুক আছে, পিস্তল কামান আছে, কিবা তার নাই ?

গোলার আঘাতে সব করি দিবে ধুলা।

হুঁশ নাই? বুদ্ধি নাই? লাঠি হাতে তবে তাঁই নাচের পুতুলা ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৭)

নূরলদীন চরিত্রে যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর ছায়া পাই, তবে আব্বাস চরিত্রটির গতি-প্রকৃতি-অবস্থান দেখে আমাদের বার বার বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের (১৯২৫-১৯৭৫) কথাই স্মরণে আসে। ইতিহাসের তথ্যানুসারে বঙ্গবন্ধু যতটা আবেগী ও উদ্যমী ছিলেন, তাজউদ্দীন আহমেদ ততটাই ছিলেন শান্ত ও সুস্থির। নূরলদীনের মৃত্যুর পর আব্বাস যেমন সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে লড়াই অব্যাহত রেখেছে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসক কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পর তাজউদ্দীন আহমেদ নেতৃত্বগুণ ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আলোচ্য নাটকে আব্বাস চরিত্রটিও তেমন প্রাজ্ঞ ও দুরদর্শী। সে জানে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে হুজুকে লড়াইয়ে নেমে প্রকৃত বিজয় সম্ভব নয়। তার আগে দেশের মানুষকে উপযুক্ত দেশপ্রেমিকরূপে গড়ে তুলতে হবে। কেননা, এ জাতির বড়ো শত্রু – এ জাতির মধ্যেই বেড়ে ওঠা কতিপয় বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থান্ধগোষ্ঠী। এদের সবার মধ্যে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম উন্মেষিত হলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন সম্ভব। এই বিজয় অর্জনের জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রতীক্ষাও করতে হতে পারে :

লাগে না লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিম্বা কয়েক জীবন ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১১৬)

অন্যদিকে, দয়াশীল চরিত্রটি নাট্যকার ইতিহাসের পাতা থেকে নিয়েছেন। তবে নাটকে তার অবস্থান আব্বাসের মতো অতটা গুরুত্ববহ নয়। কিন্তু একজন জননেতার প্রকৃত সহযোদ্ধা হিসেবে তাকে অবশ্যই বিশেষ মর্যাদা দেয়া যায়। নাটকে দয়াশীল দেওয়ান অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ একটি চরিত্র; যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তার গভীর ধারণা এ কথাই প্রমাণ করে। নূরলদীনের পাশে থেকে প্রবীণ এ চরিত্রটি যুদ্ধকুশলতা সম্পর্কে তাকে বিজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করেছে। যেমন – সশস্ত্র ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সে নিজের সাদামাটা বাহিনীকে কৌশলের সঙ্গে মোকাবেলার আহবান জানিয়েছে নিম্নরূপে :

যার যার লাঠি পলো কান্ধে করি, ছোট ছোট দল।
কাঁইও না সন্দেহ করে, সব আশেপাশে।
য্যান মাছ ধরিবার যান,
হয় হয়, নদীতে নিশীথে মাছ মারিবার যান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৬)

আলোচ্য নাটকে নূরলদীনের স্ত্রী আম্বিয়া ও কুঠিয়াল টমসনের স্ত্রী লিসবেথ দুই বিপরীতধর্মী নারী চরিত্র। আম্বিয়া মনে-প্রাণে একেবারেই বাংলার গ্রামীণ কৃষকবধূর প্রতিচ্ছবি। লিসবেথ ইয়োরোপীয় সমাজে বেড়ে ওঠা ভারত- প্রবাসী গৃহবধূ। দুজনেরই ভরসা তাদের স্বামী। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তুলনামূলক আধুনিক সমাজে বেড়ে ওঠা লিসবেথের স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ মানসিকতার সঙ্গে এদেশের মাটিগন্ধা, গ্রামীণ কৃষকবধূ আম্বিয়ার নমনীয়তা ও কোমলতার পার্থক্য নজর এড়ায় না। লিসবেথ স্বামীকে ভরসা করে সুদূর বিলেত থেকে জাহাজে চেপে এদেশে এসে সংসার সাজিয়েছে। অন্যদিকে আম্বিয়ার একমাত্র অন্বেষণ নূরলদীনের সান্নিধ্য ও ভালোবাসা। দেশপ্রেমে, মানবপ্রেমের ঊর্ধ্বে তার পতিপ্রেম। সাধারণ বাঙালি নারীর মতোই সে চেয়েছে রানির মতো জীবনযাপন করে 'আসিলে মরণ– অন্তত সধবা নারী / সধবায় থাকি, ফিরি / যায় ভাগ্যবতী মাটির কবরে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১২৯)

নাটকে লিসবেথ শক্তিময়ী, বাস্তববাদী; গুডল্যাডের ভাষায় 'মহিলার করোটিতে পুরুষের মস্তিষ্ক' কিংবা 'ইস্পাতের পাখি'। আম্বিয়ার তুলনায় লিসবেথ সাহসী, প্রতিবাদী চরিত্র। গুডল্যাডের অন্যায় দেখে সে চুপ থাকেনি, বরং প্রতিবাদ করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বদেশী পুরুষ কর্মকর্তার বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে কটাক্ষ করতেও সে ছাড়েনি। ব্রিটিশদের এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যে সমান ভূমিকা পালন করছে, তাদের আত্মত্যাগও যে পুরুষের তুলনায় কম নয়, নারীবাদী লিসবেথ তা স্পষ্টাকারে জানিয়ে দিয়ে বলেছে :

এ আমরাই আসলে
সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে,
আমাদেরই দেহ ও আত্মার পরে নির্মিত এ রাজ্যপাট
আপনাদের খ্যাতির আড়ালে।
আমরা না এলে ইন্ডিয়ায়
ইংরেজ মোগল হতো,

হুঁকো টেনে, পালকি চড়ে, গোধূলি বর্ণের পুত্র জন্ম দিয়ে দিয়ে

ইন্ডিয়ান হতো, তাই ইন্ডিয়ান এম্পায়ার হতো না। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৪০)

আম্বিয়ার চিন্তা একান্তই ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাকেন্দ্রিক। নূরলদীনের ব্যক্তিগত দুঃখ-সুখ, স্বপ্ন, দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই। অর্থাৎ নূরলদীনের যথার্থ সহধর্মিণী হয়ে উঠতে সে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, লিসবেথ তার স্বজাতি, স্বদেশ সম্পর্কে সচেতন। পুরুষ চরিত্রগুলোর সমান্তরালে সেও দেশের মঙ্গল, কোম্পানির উন্নতি নিয়ে সমানভাবে ভাবিত। লিসবেথ ইতিহাস হতে চেয়েছে। কোম্পানির শাসনের বাইরে সে স্বপ্ন দেখেছে সেদিনের, 'যেদিন এ ইন্ডিয়ায় দিকে দিকে বৃটেনের পতাকা উড়বে, [...] ইতিহাস লিখবে এ কথা – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৩৯-৪০)। বস্তুত সৈয়দ শামসুল হক নূরলদীনের প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে বিদেশে বসে গবেষণার সময় ইয়োরোপীয় প্রাচ্য-প্রবাসী এক নারীর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে লিসবেথ চরিত্র নির্মাণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[১]

আবার, নাটকে নেতিবাচক চরিত্রগুলোর মানস-বিশ্লেষণেও নাট্যকারের আগ্রহ লক্ষণীয়। সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে দেখিয়েছেন – নেতিবাচক প্রত্যেকটি চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপের পশ্চাতেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট কারণ। তিনি দেখিয়েছেন, আপাত অত্যাচারী চরিত্রের অভ্যন্তরেও রয়ে গেছে মনুষ্যত্বের কোমল দিক। যেমন, কোম্পানির তরুণ অফিসার মরিস চরিত্রটি যখন অন্যদের সম্মুখে তার কল্পনার রঙে রাঙানো সুখ-স্বপ্নের কথা জানান দেয়, বলে – দীর্ঘসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই দূরদেশে যুবক বয়সে পরিবারহীন একা পড়ে আছে, তখন তার হৃদয়জুড়ে বিদ্যমান বিশাল এক শূন্যতা, দারিদ্র্য, অতৃপ্তি, স্বদেশে লাঞ্ছিত ও বঞ্চনাময় জীবনকথাই প্রকাশ পায়। বস্তুত, গুডল্যাড, টমসন, মরিসসহ অন্যান্য চরিত্রের পারস্পরিক কথপোকথনে সুস্পষ্ট হয়েছে কোম্পানি শাসনামলের অন্য এক অন্ধকারময় দিক। উপনিবেশগুলোতে ব্রিটিশ অত্যাচারের কাহিনি লেখার সময় ইতিহাসবেত্তারা যা বরাবরই এড়িয়ে গেছেন। সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত দরদ দিয়ে দেখিয়েছেন, ইংলিশ ক্লাবের আভিজাত্য আস্বাদনের স্বপ্নসাধ কীভাবে ইংরেজ যুবকদের পরিণত করেছে উৎপীড়ক, অত্যাচারী আর লুটেরাশ্রেণিতে। নেতিচরিত্রের প্রতি লেখকের এই সহমর্মিতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন :

---

[১] লিসবেথ চরিত্রটি নাট্যকার কিছুটা বাস্তব ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রচনা করেছেন। নাট্যকার এ সম্পর্কে বলেন : লিসবেথ চরিত্রটি আমি গড়ে তুলেছি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে লেখা এক ইংরেজ মহিলার চিঠির ভিত্তিতে। সৈয়দ শামসুল হক, নাট্যকারের কথা, অভিনয় স্মারক(ব্রোশিওর), নূরলদীনের সারাজীবন, নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত। দ্রষ্টব্য : সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১)

একজন যখন পাপ করে এবং পাপের শাস্তি হিসেবে সে যখন দোযখে যাবে, ভাবার কোন কারণ নেই যে ঈশ্বর তাকে হেসে হেসে দোযখে পাঠাবে। ঈশ্বরের অবশ্যই মায়া হবে কারণ তার সৃষ্টির তো এমন হওয়ার কথা ছিল না। যেহেতু হয়ে গেছে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাজা দিতে হলো। তো আমি যখন লিখি তখনতো আমি ঈশ্বর।[১]

বস্তুত, ইয়োরোপীয় বাস্তবতায়ও ছিল শ্রেণি-বিভাজন, বংশীয় ভেদ, ধন-বৈষম্য। অভিজ্ঞ কর্মকতা গুডল্যাড নবাগত তরুণ মরিসকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের এই বৈষম্যের কথা : 'দেহে নীল রক্ত নেই, পিতার সম্পদ নেই, / শীতের আগুন নেই, বর্তমান ভিন্ন কোনো বাস্তবতা নেই' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯২)। ফলে এই সম্পদশালী দেশে তারা কেবল এসেছে নিজেদের ভাগ্যপরিবর্তনের জন্য। এ কারণে তারা কোম্পানির ধার্যবেতনের বাইরে দ্রুত সম্পদ অর্জনের জন্য অপশাসন, অত্যাচার, অবিচারের স্টিম রোলার চালাতে দ্বিধা করেনি। নিজেদের উন্নতির স্বার্থে দেবীসিংয়ের আচরণ অন্যায় জেনেও তাকে অবৈধ সমর্থন দিয়ে গেছে। নাট্যকার তরুণ কর্মচারী মরিসের জবানিতে প্রবাসী বেতনভুক ইংরেজ কর্মচারীর স্বপ্ন সম্পর্কে জানিয়েছেন নিম্নরূপে :

আমিও তো কল্পনায় দেখি, আমি ফিরে গেছি স্বদেশে আবার।
পল্লীতে আমার আছে সুরম্য ভবন।
আকাশে চিমনির ধোঁয়া, সবুজ বিস্তৃত মাঠ,
সোনার পাতের মতো পড়ে আছে রোদ,
হেঁটে যাচ্ছি, আমার বাহুতে পত্নী ভর দিয়ে পাশে।
[...] আমার তো সাধ হয়, মাঝে মাঝে রাজধানী যাই,
লণ্ডনের ক্লাবে গিয়ে বসি –
সুরা, তাস, অবসর, বঙ্গদেশ স্মৃতিমাত্র, বাটলার বাহিত ডিনার।
আমিও তো চাই, পত্নীর সোহাগ চাই,
পুত্রের দু'হাত ভরে দিতে চাই নিশ্চিন্ত জীবন,
প্রাসাদে কন্যার চাই নাচে নিমন্ত্রণ, [...]
আমার এ দেহে নীল রক্ত আমি চাই,

[১] দ্রষ্টব্য : ইনামুল হক, 'হকভাই এবং আমার কিছু কথা', সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ ,প্রাগুক্ত, পৃ ৭১৭

আমিও ব্যারন হতে চাই,

আমি চাই ব্যারনের জীবনযাপন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৩)

নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটকের সংগঠনশৈলী লক্ষ করলে দেখা যাবে কাব্যনাট্যটি দুটি পর্ব সহযোগে গড়ে উঠেছে। এখানে 'প্রথম পর্ব – কালের মানচিত্র, দ্বিতীয় পর্ব – মনের মানচিত্র। নাট্যকারের অভিপ্রায় ছিল, কালের পটভূমি রচনা করে মানুষগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তস্তল তার প্রেক্ষিতে স্থাপন করা। নাটকে চৌদ্দটি দৃশ্যের ভেতর দিয়ে ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার। সূত্রধরের চরিত্র দিয়ে তিনি একালকে সেকালের সঙ্গে মিশিয়েছেন নাটকের ফ্ল্যাশব্যাক আঙ্গিকে।'[১] তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও স্বদেশীয় আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে গণমানুষের সামূহিক প্রতিবাদ অবলম্বনে রচিত নাটকটি যেন আদ্যোপান্ত গণমানুষের নাটক হয়ে ওঠে। ফলত, আধুনিক রঙ্গমঞ্চের বদ্ধকামরা থেকে এ নাটকটিকে তিনি খোলা ময়দানে মঞ্চস্থ করতে অধিক আগ্রহী ছিলেন। পূর্বের কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ে* নাট্যপরিচালক যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন, সে বিষয়টি তিনি সুস্পষ্ট করেছিলেন। কিন্তু, *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটরেক মঞ্চায়ন কৌশল নিয়ে তাঁর বিশেষ দাবি ছিল। নাটকের 'সবিনয় নিবেদন'-এ তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :

> মনোযোগী পাঠক ও নাট্য নির্দেশক লক্ষ্য করবেন যে, এই কাব্যনাট্য লেখা হয়েছে খোলা আকাশের নিচে যে কোনো সাদামাটা চত্বরে অভিনীত হবার উপযুক্ত করে। নাট্যশালা বা মিলনায়তনে অভিনয় যদি করতে হয়, মঞ্চ অন্ততপক্ষে দর্শকের ভেতর পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া জরুরি। প্রতিভাবান নির্দেশক যে কোনো ধরনের মঞ্চ এই কাব্যনাট্যের জন্যে ব্যবহার করতে পারেন। তিনি আর যাই করুন, আমার পরামর্শ, ছবির ফ্রেমের মতো মঞ্চ যেন কল্পনা না করেন। [২]

'সবিনয় নিবেদন' ছাড়াও নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাট্যকারের তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্চনির্দেশ চোখে পড়ার মতো ; ফলে নাট্যপরিচালক যখন পরবর্তীকালে মঞ্চে নাটকটি উপস্থাপন করতে গেছেন তখন পরিচালকের দক্ষতা ও নাট্যকারের কল্পনা মিলেমিশে নাটকটি অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। নাট্যকার মঞ্চসজ্জা, সংগীতের সার্থক প্রয়োগ, আলোক প্রক্ষেপণ, চরিত্রের সাজসজ্জা, কোরিওগ্রাফি প্রতিটি বিষয়েই পরিচালকের উদ্দেশে কিছু কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যেমন, নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে নূরলদীনের জেগে ওঠার মুহূর্তটিতে নাট্যকার যেভাবে

---

[১] সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[২] সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্য সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩

দৃশ্যায়িত করতে চেয়েছেন, তাতে মঞ্চায়নরীতি সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি লিখেছেন :

> সংগীত উচ্চগ্রাম থেকে প্রবাহিত ধারার মতো নেমে আসে নিচে এবং ধীরে উঠে দাঁড়ায় নূরলদীন। রক্তাক্ত চাদর তার গায়ে। সবাই তরঙ্গের মতো পিছিয়ে যায়। নূরলদীন ধীরে চোখ খোলে। রক্তাক্ত চাদর সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রায় ফিসফিস করে সংলাপ শুরু করলেও কয়েক পংক্তি পরে তার স্বর উচ্চগ্রামে পৌঁছায়। [...] নূরলদীন সকলকে পরিক্রমণ করে এসে কেন্দ্রে দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্ত নাটকীয় নীরবতার পর হঠাৎ সে ঊর্ধমুখ হয়ে কাল্পনিক শিঙায় ফুঁ দেয়। শিঙা বেজে ওঠে। নৃত্যের ভঙ্গিতে সে লাফ দিয়ে উঠে কাল্পনিক ঢাকে কাঠি বাজায়। ঢাক বেজে ওঠে – টিট্রি ডিডিম ডিম, ট্রিট্রি ডিডিম ডিম। ঘুরে ঘুরে সে নেচে চলে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৭৫)

এছাড়াও, সংলাপ রচনায়ও নাট্যকারের চমৎকার মঞ্চায়ন কৌশল দৃষ্টি এড়ায় না। যেমন, নাটকের একপর্যায়ে আছে নূরলদীনের উদ্দীপ্ত কথার আহবানে প্রভাবিত হয়ে কোনো কোনো নীলকোরাস লালকোরাসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মঞ্চে এই পোশাক বদলের সময়টুকু যেন দৃষ্টিকটু না হয়ে স্বাভাবিক হয়; এবং নাটকের ধারাবাহিকতা যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সেজন্য নাট্যকার এই সময়টুকুতে নূরলদীনের মুখের সংলাপ ধারাবিবরণীর মতো করে সাজিয়েছেন :

> আরে, আরে, নীলের ফেটা এই খুলিয়া দেয়,
> এই খুলিয়া দেয় রে ফেটা, সাজ ফেলিয়া দেয়,
> সাজ ফেলিয়া লাঠি পলো কান্ধে তুলি নেয়।
> হারে – গোরার সাজে সাজ করিলেই গোরা তো আর নয়,
> নীল পিরানের তলে দ্যাখোঁ হামার মানুষ হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৮)

বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের ইতিহাসে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নাট্যদল 'নাগরিক' নাট্যসম্প্রদায় ১৯৮২ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রথম *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকটি মঞ্চায়ন করেছিল। দলের প্রত্যেক সদস্যের কর্মনিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর অধ্যাবসায়ের ফলে দীর্ঘ তিনমাস অনুশীলনের পর নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মঞ্চে। প্রথম প্রদর্শনীতে টিকিটের মূল্য ছিলো ৫০ ও ৩০ টাকা; এবং প্রথম শো-এর

দর্শকসংখ্যা ছিল তিনশতাধিক। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত নাটকটির প্রদর্শনী হয়েছিল ৭৫ বার।[১] *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাট্যের প্রথম প্রদর্শনীর কলাকুশলীদের একটি তালিকা প্রসঙ্গত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

নূরলদীন চরিত্রে আলী যাকের, আম্বিয়া চরিত্রে লাকী ইনাম, আব্বাস চরিত্রে আসাদুজ্জামন নুর, লিসবেথ চরিত্রে সারা যাকের। ইংরেজ চরিত্রগুলোতে রূপদান করেছিলেন আতাউর রহমান, ইনামুল হক, আল মামুন ও আলম খুরশীদ। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন মিজানুর রহমান মিনু, গোলাম সারোয়ার, ফারুক আহমেদ, মাসুদ ইকবাল, মিজানুর রহমান পিন্টু, আনোয়ারুল ইসলাম খোকন, আবুল কাশেম, মনসুর আহমেদ, এস এস আখতার, লুৎফর রহমান, খালেদ মাহমুদ, শৈবাল দেব শুভ্র।

এছাড়া মঞ্চের নেপথ্যে কাজ করেছেন – নির্দেশক : আলী যাকের, মঞ্চ পরিকল্পনা : মনসুর আহমেদ, আলোক পরিকল্পনা : সৈয়দ লুৎফর রহমান, আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা : কে. বি. আল–আজাদ, মঞ্চ ব্যবস্থাপনা : শায়লা নিমার, রূপসজ্জা : বঙ্গজিৎ দত্ত এবং দেবদাস, আলোক প্রক্ষেপণ : সিরাজ আহমেদ।[২]

এদের প্রত্যেকের অনন্য অভিনয় দক্ষতা ও কারিগরি কুশলতার কারণেই মূলত নাটকটি মঞ্চে এতটা সফল হয়েছিল। বিশেষ করে নূরলদীন চরিত্রে আলী যাকের, আব্বাস চরিত্রে আসাদুজ্জামান নূর ও লিসবেথ চরিত্রে সারা যাকেরের সুঅভিনয় দর্শক-সমালোচকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। নাটকটির নির্দেশক আলী যাকের এক লেখনীতে জানিয়েছিলেন এ নাটকটি মূলত তাঁর জন্যে এক ধরনের পরীক্ষা ছিল। তিনি লিখেছেন :

> বাংলা ভাষায় রচিত কোনো বীরগাঁথা এতখানি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত হয়েছে কি না আমার জানা নেই। [...] কী অসাধারণ মুন্সিয়ানা নিয়ে নাট্যকার ইতিহাসের পাতা থেকে বেছে নিয়েছেন একটি বিশেষ সময়, একটি বিশেষ স্থান এবং কিছু চরিত্রকে। তারপর প্রায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বিছিয়ে পরীক্ষা করেছেন ঘটনা প্রবাহের, মানুষের মন-মানসিকতার। প্রত্যেকটি চরিত্র তখন তার আচ্ছাদন ছুঁড়ে ফেলে একবারে অন্তরের কথাটি তুলে ধরেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার হৃদয়ের ছবি। বুঝিবা তার অন্তর্গত অস্তিত্বে লালিত স্ববিরোধিতাও। [...] *নূরলদীনের সারাজীবন* যদিও একটি সুগ্রথিত নাটক যাকে মঞ্চায়িত করা যায় 'ওয়েল মেড প্লে' হিসেবে, তবু এর নির্দেশনা ছিল আমার জন্যে একটি পরীক্ষা। কারণ-এর গ্রন্থনায় যে ব্যাপ্তি (ল্যাটিচ্যুড) তা নিয়ন্ত্রণে রাখা সত্যিই দুস্কর। এই নাটকের শুরু ক্লাইম্যাক্স দিয়ে। তারপর প্রায় প্রতি দৃশ্যেই

---

[১] সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

লোভ হয় ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছুতে অথচ নাট্যকার তা হতে দেন না। ঘটনার মধ্যে সম্পৃক্ত কোনো এলিয়েনেশন উত্তেজনাকে প্রশমিত করে। ঘটনার যখন হচ্ছে বিস্তার, চরিত্র তখন তার আত্মগত সংঘাতে পৌঁছে গেছে। একপক্ষ যখন ভাবাবেগ মথিত, তার প্রতিপক্ষ তখন ধীর, স্থির। যখন নূরলদীনের গণবাহিনী সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত, কেবল ইংগিতের অপেক্ষায়, তখন নূরলদীনের সখা আব্বাস একান্তে দাঁড়িয়ে যুক্তি খুঁজে চলেছে, নিন্দা করছে এই হঠকারী সিদ্ধান্তের, এইভাবে এগিয়ে গেছে নাটক।[১]

নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাট্যের ভাষাশৈলী বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। এ এমনই এক বাস্তবগন্ধী ভাষা, যার মূলকাঠামো রচিত হয়েছে উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিকতাকে ঘিরে, অথচ আঞ্চলিক শব্দের দুরূহতা কাটিয়ে তা হয়ে উঠেছে সর্বজনবোধগম্য ভাষা। সৈয়দ শামসুল হক একদিকে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় নাটকের সংলাপ রচনা করে বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছেন; অন্যদিকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের মুখে যে সাধু বাংলা ভাষা স্থাপন করেছেন, তাতে পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন হয় – এইসব চরিত্র এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, কিংবা এদের মুখের ভাষাও ঠিক এদেশের আপামর জনগণের মুখের ভাষা নয়; এরা বহিরাগত। বলাবাহুল্য, নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে ভাষার এমন সুষম প্রয়োগের মাধ্যমে বৈপরীত্য নির্মাণের রীতি বাংলা কাব্যনাট্যে কিছুটা অভিনবও বটে। কেননা বাংলাসাহিত্যে ইতঃপূর্বে যখনই কোনো লেখক ইংরেজ অথবা বিদেশি চরিত্র সংযোজন করেছেন, তখন তার মুখের সংলাপে হয় – হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত ভাষা দিয়েছেন; নয়তো তাদের দিয়ে ইংরেজি ধাচের উচ্চারণে বাংলা ভাষার সংলাপ বলিয়ে বুঝিয়েছেন এরা ভিনভাষী জনগোষ্ঠী। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) *একেই কি বলে সভ্যতার* (১৮৬০) পুলিশ সার্জেন্ট চরিত্রের সংলাপ কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) *নীলদর্পণ* (১৮৬০)[২] নাটকের ইংরেজ চরিত্রের সংলাপ লক্ষ করলে বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক পূর্বজনদের এ -ধারা থেকে বের হয়ে ব্রিটিশ চরিত্রের মুখে মান বাংলাভাষার সংলাপ সংযুক্ত করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের এই অভিনব চিন্তাধারার প্রশংসা করে নাট্যপরিচালক আতাউর রহমান এক লেখনীতে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছিলেন :

---

[১] আলী যাকের, 'নির্দেশকের কথা', অভিনয় স্মারক(ব্রোশিওর), *নূরলদীনের সারাজীবন*, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত, (দ্রষ্টব্য : সাবরিনা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১)

[২] মাইকেল মধুসূদন দত্তের *একেই কি বলে সভ্যতা* প্রহসনে ইংরেজ পুলিশ সার্জেন্ট চরিত্রের সংলাপ ছিল এমন : ' দেট্স রাইট। ইউ সুটী ডেভিল্ । কেস্কা চুরি কিয়া ? [...] ওয়েল দেন, হাম ডেক্টা ওস্কা কুচ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় দেও।'(দ্রষ্টব্য : ড. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৬৫)

> এই কাব্য নাটকে নাট্যকার প্রধানত রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা সংলাপ রচনায় ব্যবহার করেছেন। ব্রিটিশ সাহেবদের সংলাপ হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষা। তিনি শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' বা তৎকালীন অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকে ব্যবহৃত ব্রিটিশ চরিত্রের সংলাপ রচনায় 'হামি', 'টুমি', ইত্যাদি পরিহার করেছেন। [...] আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত করতে চাই যে, বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষদের কাছে এই নাটকটির জনপ্রিয়তা কোনোদিনই হ্রাস পাবে না।[১]

এই নাটকের একদিকে রয়েছে শোষক শ্রেণি, অন্যদিকে রয়েছে শোষিত শ্রেণি। এ দুটি শ্রেণির মধ্যে যেমন রয়েছে ভাষার পার্থক্য, তেমনি ভাবে চলনে-বলনে, আচারে-বিচারে তারা পরস্পর পরস্পরের দূরবর্তী। কিন্তু আশ্চর্যরকম শিল্পকুশলতায় নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক একই ফ্রেমে তাদের বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। একদিকে তিনি সাধারণ কৃষক চরিত্রের মুখের সংলাপে রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা সংযুক্ত করে কাহিনিটিকে একটি শক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন; অন্যদিকে ইংরেজ চরিত্রগুলোর মুখের সংলাপে ইংরেজি শব্দমিশ্রিত ধ্রুপদী ভাষা প্রয়োগ করে নিম্নবিত্ত শোষিত শ্রেণির সঙ্গে উচ্চবিত্ত শোষকশ্রেণির ভাষাগত দ্বন্দ্বাভাস নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আবার নাট্যকার নাটকের পাঁচজন ইংরেজ চরিত্রের মুখের সংলাপে যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন, আপাত বিচারে সেটি পরিশুদ্ধ বাংলাভাষার প্যাটার্ন মনে হলেও নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এই সংলাপের গাঁথুনি মূলত ইংরেজি ভাষার বাক্যগঠনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য এই বিষয়টি প্রথম অনুধাবন করেছিলেন নাট্যপরিচালক সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৯৯ সালে নিউইয়র্কের অফ-অফ-ব্রডওয়ের নিরীক্ষামূলক প্রেজেন্ট থিয়েটারের থিয়াটোরিয়াম মঞ্চে সুদীপ্ত চট্রোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের উপস্থিতিতে বিদেশের মাটিতে প্রথম *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সুদীপ্ত চট্রোপাধ্যায় তখন নাটকের ইংরেজ চরিত্রের সংলাপগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে দেখেন, নাট্যকার বাংলা ভাষায় সংলাপগুলো লিখলেও তার ভেতরে ইংরেজি বাক্যের প্যাটার্ন হুবহু রক্ষা করেছেন। এমনকি সংলাপে তিনি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত-প্রবাসী ইংরেজকর্তৃক ব্যবহৃত ঔপনিবেশিক শব্দ, উপমাগুলো-পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রেখেছেন। সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এ-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এক স্মৃতিচারণমূলক লেখায় লিখেছেন :

---

[১] আতাউর রহমান, 'সৃজনের ধ্রুবতারা', *পরানের গহীন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

নাটকটিতে ইংরেজদের দৃশ্যগুলো সৈয়দ শামসুল হক লিখেছিলেন এক ধরনের stylized বাংলায়, যেখানে ভাষা কাব্যিক, শব্দচয়ন সততই ধ্রুপদী, ছন্দোময়; ইংরেজি নাটকে যে ধরনের কাব্য ব্যবহার হয়ে থাকে, সেই কাব্যাধারে প্রোথিত। হক সাহেব হয়ত ভেবেছিলেন ইংরেজিতে, লিখেছিলেন বাংলায়। আমি একবার তাঁকে এই প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'কতকটা তাই'। [...] বুঝতে পারলাম, হক সাহেব যে 'মশালচি' শব্দটা ব্যবহার করেছেন, সেটা উনি জেনেই ব্যবহার করেছেন। ক্ষুরধার গবেষকের দৃষ্টি কিছুই এড়ায়নি। উনি নাটক লেখার সময়েই জেনে নিয়েছিলেন যে, অনুবাদের মাধ্যমে নয়, মশালচি শব্দটি ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ভাষার মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। ঠিক যেমন আমরা বাংলায় হজম করে নিয়েছি, টেবিল, গেলাসের মতো শব্দ।[১]

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকের ইংরেজ চরিত্রের মুখে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় অনূদিত ইংরেজি ভাষার সংলাপ এবং সৈয়দ শামসুল হক রচিত মূল বাংলা সংলাপ পাশাপাশি রাখলে বোঝা যাবে, নাট্যকার কতখানি গভীর মেধা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে আলোচ্য নাটকে ইংরেজ চরিত্রের সংলাপ নির্মাণ করেছিলেন। যেমন :

হো– হো– মশালচি।	Ho- ho- mussaulchee.
লণ্ঠন, লণ্ঠন, দেখাও।	Lantern, show the lantern.
অতিথিরা চত্বরে আসুন।	Guests, come out here.
চমৎকার পূর্ণিমা এখানে।	Wonderful moonlight here.
আপনারা এখানে আসুন।	All of you, come out here. (পঞ্চম দৃশ্য)[২]

আবার, ইংরেজ চরিত্রের মুখে তৎসমশব্দবহুল সংলাপের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে। কুঠিয়াল টমসনের স্ত্রী লিসবেথের আপ্যায়নের প্রশংসা করে কালেকটর গুডল্যাডের উক্তি :

আপনার পত্নীর আতিথ্য,
ঝলসানো বৃষমাংস লোহিত কোহল,
স্বদেশে না বংগদেশে আছি কোনো খেয়াল ছিল না। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৮৬)

---

[১] সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, 'নূরলদীনের গহীন ভিতরে', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলেল গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮- ৭৬৯

[২] প্রাগুক্ত

তৎসম শব্দের পাশাপাশি ইংরেজ চরিত্রের মুখের সংলাপে প্রয়োজনানুসারে ইংরেজি শব্দও বসিয়েছেন তিনি, এবং সেখানে বজায় রেখেছেন ব্রিটিশ কথ্য উচ্চারণের ঢং। গুডল্যাড ও মরিসের পারস্পরিক আলাপ উল্লেখ্য :

ডিয়ার মরিস, কোম্পানির রেভেনিউ সুপারভাইজার,
স্বার্থ আছে আমাদেরও। – নির্ধারিত রাজস্ব আদায়।
কোম্পানির কুঠির ফ্যাকটর, [...]
তাছাড়া, নিশ্চয় তুমি জানো,
অন'বল ওয়ারেন হেস্টিংস, তার বড় প্রিয়পাত্র এই
দেবী সিং – এবং আমারও। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯০)

আবার, ইংরেজ চরিত্রগুলোর সংলাপে যে আভিজাত্যপূর্ণ প্রমিতভাষা ব্যবহার করেছেন নাট্যকার, তাতে শাসকগোষ্ঠীর আত্ম-অহম, দম্ভ, গাম্ভীর্য বিশেষত, উপনিবেশবাদী আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গি, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি, আর স্বপ্নের নিবিড় পরিচয় মেলে। এদেশের ভূপ্রকৃতি, মানুষ ও তাদের সারল্যকে তারা তুলনা করেছে 'ঈশ্বরবর্জিত ভূমি', 'গোক্ষুর সর্প' কিংবা 'অলস কুকুরে'র সঙ্গে। কোনোরূপ তত্ত্বকথা, বর্ণনা-বিবৃতির আশ্রয়ে নাটককে ভারাক্রান্ত না করে সাধারণ সংলাপের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গির এমন উপস্থাপন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। যেমন কুঠিয়াল টমসন এদেশীয় কর্মচারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছে নিম্নরূপ ভাষায় :

এই কৃষ্ণ কুকুরেরা এতটাই অলস বধির,
ভূমিকম্প বিনা কিছু শোনে না, এবং
ভূমি থেকে – নিতম্ব তোলে না। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৮৮)

আলোচ্য নাটকে এদেশীয়দের মুখের সংলাপ নির্মাণে নাট্যকার *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেটি তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন।[১] তবে কেবল লোকায়ত সংলাপের ধাঁচ নয়; বরং *মৈয়মনসিংহ গীতিকায়* ব্যবহৃত প্রারম্ভিক বন্দনা, লোকজ সংগীতের ব্যবহার ও বাক্য কাঠামোর সঙ্গে এই কাব্যনাটকের অনেকাংশের সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, *মৈমনসিংহ গীতিকার* প্রারম্ভ বন্দনায় আছে :

দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বানিজ্জি করে চান্দ সদাগর ॥

[১] তিনি বলেন : 'ময়মনসিংহ গীতিকা, যা বহুদিন থেকেই আমি নাটকের পাণ্ডুলিপি বলে সনাক্ত করে এসেছি, আমাকে অনুপ্রাণিত করে ।' (দ্রষ্টব্য : কাব্যনাট্যসমগ্র : ভূমিকা, প্রাগুক্ত)

উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্‌বত।

যেখানে পড়িয়া আছে গো আলীর মালামের পাথ্‌থর ॥[১]

নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাট্যের চতুর্দশ দৃশ্যে নূরলদীনের একটি সংলাপ নাট্যকার এই বন্দনাগীতির ঢঙে নির্মাণ করেছেন :

এ দ্যাশে হামার বাড়ি উত্তরে না আছে হিমালয়,

উয়ার মতন খাড়া হয় য্যান মানুষেরা হয়।

এ দ্যাশে হামার বাড়ি দক্ষিণেতে বঙ্গপোসাগর,

উয়ার মতন গর্জি ওঠে য্যান মানুষের স্বর।

এ দ্যাশে হামার বাড়ি পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র আছে,

উয়ার মত ফির মানুষের রক্ত য্যান নাচে।

এ দ্যাশে হামার বাড়ি পশ্চিমেতে পাহাড়িয়া মাটি,

উয়ার মতন শক্ত হয় য্যান মানুষের ঘাঁটি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৪৯)

আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নাটকে নাট্যকার অত্যন্ত সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'রংপুরের স্থানীয় ভাষার নাসিক্য ধ্বনির প্রাধান্য এই নাটকে অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কাঁই, পাওঁ, মঁরো, কইছিঁলু, মুঁই, চাঁও, প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া হামার, বাহে, কোনঠে, এলাও – এইসব শব্দের ব্যবহারেও রংপুরের ওই আঞ্চলিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। আবার উচ্চারণের প্রলম্বনের মধ্য দিয়েও নাট্যকার এই নাটকে আঞ্চলিকতাকে ব্যবহার করেছেন। সে কারণে তেসরা হয়েছে তেসোরা, [...] শিব হয়েছে শিবো।'[২] 'শুতিয়া আছে নূরলদীন কব্বরেরও তলে' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৭২) এখানে শোয়া – শুতিয়া, কব্বরের – কবরের হয়েছে। আবার, চরিত্রমুখে স্থানের নাম ব্যবহার করেছেন আঞ্চলিক টানে : 'খেয়াল করি দ্যাখেন, বাহে, পাটোগ্রামের লড়াই।' (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ৭২) এখানে পাটগ্রাম হয়েছে পাটোগ্রাম।

নাটকের বিভিন্ন সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার বাস্তবতা আনয়নে গ্রামীণ মানুষের ব্যবহৃত অপভাষা ও কথ্যরূপও অবিকল রেখেছেন। যেমন, নীলকোরাস ও লালকোরসের মুখোমুখি অবস্থানকালে লালকোরাসের একটি সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

---

[১] শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন(সম্পা.), *মৈমনসিংহ গীতিকা*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৫

[২] শান্তনু কায়সার, *কাব্যনাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ.৬৭

হারে শালার শালা,

নীল ফেটাতে সাজ করিছো শালা। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৭১)

বাস্তবতার প্রয়োজনে নাটকে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করলেও তা যেন সার্বিক বাঙালির বোধগম্য ভাষা হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে যথেষ্ঠ মনোযোগী ছিলেন নাট্যকার। এ বিষয়টি তিনি নাটকের প্রারম্ভে 'সবিনয় নিবেদন' অংশে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন :

> ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় নামটি লিখেছেন – নূরলউদ্দিন, আমরা বলব ওটা হবে নূরুদ্দিন, কিন্তু আমি ব্যবহার করেছি – নূরলদীন, রংপুরের সাধারণ মানুষেরা যেমনটি উচ্চারণ করবে। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা এই কাব্যনাট্যে ব্যবহার করা হলেও, আমি চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব বাঙালী সবার বোধগম্যতার ভেতরে থাকতে – অনেক শব্দের বেলায় নিকটতর পরিচিত রূপটি প্রয়োগ করেছি, যেমন 'বলিল'-এর জায়গায় 'বলিলোম' কিংবা 'সেঠায়'-এর জায়গায় 'সে ঠাঁই'; একটি শব্দ 'ডিং খরচা'-ইতিহাসে আছে, নূরলদীন যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্যে এই নামে কৃষকদের কাছ থেকে চাঁদা নিতেন। [১]

রংপুর অঞ্চলে ব্যবসার প্রসারে, শাসনের প্রয়োজনে, এমনকি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে নানান জাতির আগমন ঘটেছে। ফলে এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে এসব জাতির ভাষা মিশ্রিত হয়ে এখানকার লোকজভাষা হয়ে পড়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন, এ অঞ্চলের ভাষায় ফার্সি ভাষার শব্দাবলি, ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রবেশ করেছে মূলত পারস্যের সুলতানি রাজন্যবর্গের শাসনামলের প্রভাবে। মুসলিম প্রধান এদেশের মানুষ অনায়াসেই তাদের ভাষার শব্দসম্ভারে ফার্সিভাষার শব্দ গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে কী ধর্মীয় কাজে, কী দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে, সবখানেই ফার্সি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সৈয়দ শামসুল হক রচিত *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকের সংলাপেও এই বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। লালকোরাসের মুখের সংলাপে দেবতা শিবের সঙ্গে মিলিয়ে হযরত আলীর বন্দনা করার বিষয়টি যেমন এদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিচয় দেয়, তেমনিভাবে এ অঞ্চলে পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবও[২] অস্বীকার করা যায় না। যেমন :

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্যসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[২] সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে শিয়া জ্ঞানী-গুণীজন বাংলায় আগমন করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে বিদ্বান, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ছিলেন। সাফাভী বংশের পতনের পর এই নবাগতদের সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মুর্শিদকুলী খানের সময়ে বাংলাদেশ শিয়াদের একটা নিরাপদ আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা সাহিত্যে এঁদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এঁদের প্রভাবে বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্যের উদ্ভব হয়। (দ্রষ্টব্য : কে.এম.করিম, 'নবাবি আমলে সমাজকাঠামো', *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (৩য় খণ্ড), সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫১)

আলী, মাথায় তুলি ধর,

শিবো, মাথায় তুলে ধরো

আলী শিবো স্মরণ করি আস্তে চলো ঘর। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৮১)

আলোচ্য নাটকে কোরাস চরিত্র সংলাপ প্রক্ষেপণে সবসময় একটি নির্দিষ্ট তাল ও ছন্দ মেনে চলেছে। এ কারণে তাদের যূথবদ্ধতা, দ্রোহ, সংগ্রাম অনুভূত হয়েছে ভাষার গতিময়তায়। একদল মানুষের চলার গতি, লাঠি ঠোকার গতি সংলাপের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যেমন, নীলকোরাস যখন নূরলদীন ও তার বিদ্রোহী কৃষকবাহিনীকে অনুসন্ধান করেছে তখন তাদের গতিময়তা ও যূথবদ্ধতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে স্বরবৃত্ত ছন্দ। শব্দের দ্বিত্ব উচ্চারণে, অনুপ্রাসের মাধুর্যে এ অংশের ভাষা হয়েছে গতিময় ও সংহত :

তালাশ করো তালাশ করো তালাশ করি দ্যাখো।

তালাশ করো তালাশ করো তালাশ করি দ্যাখোঁ।

দস্যু নূরলদীনে দ্যাখোঁ আশেপাশেই আছে –

আছে আছে আছে

কপ্পুর নয় উড়িয়া গেছে

মিছরিও নয় গলিয়া গেছে

আছে আছে আছে [...]

তালাশ তালাশ তালাশ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১২৩)

ভাষার এই গতিময়তা, সংলাপের তাল সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হক নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> 'নূরলদীনের সারাজীবন'-এ আমি পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক রক মিউজিক্যাল নাটকের গঠন-কৌশল আমাদের ময়মনসিংহ গীতিকার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি।[১]

দীর্ঘ প্রবাসযাপনে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি স্বভাবতই সৈয়দ শামসুল হকের একধরনের অনুরাগ জন্ম নিয়েছিল। এ নাটকে সে-অনুরাগের ছাপ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পরবর্তীকালে তাঁর রচিত আরেকটি কাব্যনাটক *অপেক্ষমান* (২০০৯)এ-ও কোরাস চরিত্রের (ব্রেক ডান্সারের দল) মুখে রক মিউজিকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বস্তুত, 'রক মিউজিক্যাল ড্রামার অনুসরণ করার জন্য সৈয়দ শামসুল হক এ নাটকে নূরলদীনের স্ত্রী

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, 'বাংলাদেশের নাটক', পৃ.৮১ (উদ্ধৃত : মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ.৭৩)

আম্বিয়ার মুখে গান ব্যবহার করেছেন। এ গানও আঞ্চলিক গানের মতো। নাটকের সঙ্গে এ গানের বক্তব্য ও আঙ্গিক মিলে গেছে, সহজে।'[১]

উল্লেখ্য যে, সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যে ব্যবহৃত রংপুর অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বহুর্পূবেই সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার পরিচয় ঘটেছে মূলত 'ভাওয়াইয়া' 'চটকা' প্রভৃতি জনপ্রিয় লোকগানের মাধ্যমে। আর্ন্তজাতিক ভাষাবিজ্ঞানী স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন কর্তৃক সংগৃহীত এবং প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে গীত এমনই একটি 'ভাওয়াইয়া' গানের সঙ্গে *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকের আম্বিয়া চরিত্রের মুখে গীত লোকগানের সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ১৯৪০ সালে আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে রেকর্ডকৃত ভাওয়াইয়া' গানটির কথা ছিলো নিম্নরূপ :

আবো (দাদিমা) নওদারিটা মরিয়া
মোর যে হইছে দানি (ক্ষতি)
আন্ধার ঘরে পড়ি থাকোঙ্
পড়ে চৌখেন পানি
আবো টাপ্‌পাস কি টুপ্‌পুস করিয়া।[২]

বস্তুত, বর্ণ তথা ধ্বনির এমন দ্বিত্বের প্রয়োগ 'চটকা' গানের আকর্ষণ বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। সৈয়দ শামসুল হক *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকে রংপুর অঞ্চলের সাধারণ কৃষিজীবনের সংস্কৃতি চিত্রিত করতে এমনই একটি 'চটকা' গানের প্রয়োগ করেছেন। নূরলদীন যখন কৃষকের ন্যায্য অধিকারের আন্দোলনে ব্রিটিশ বেনিয়াদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য গৃহত্যাগী হয়, তখন নূরলদীনের স্ত্রী আম্বিয়ার মনের সংশয় ও সম্ভাবনার মিশ্র অনুভূতি প্রকাশের নিমিত্তে প্রয়োগকৃত চটকা-শ্রেণির গানটি নিম্নরূপ :

মোর পতিধন জংগতে যায় ডিমলা শহরে,
মুঁই নারী হে এলায় একা নিশীথ পহরে।
কোন কালে সে আসিবে আর বিজয় করিয়া ?
চোখ ফাটিয়া পড়ে পানি টুপুস করিয়া –

---

১ মোস্তফা তারিকুল আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২ দ্রষ্টব্য : মফিদুল হক, ' সৈয়দ শামসুল হকের নাট্যত্রয়ী : তৃতীয় মাত্রার সন্ধানে', *থিয়েটার*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), ৪৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১০৬

ওকি টাপলাস কি টুপলুস করিয়া। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৩৩)

বস্তুত, ‘রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত পয়ার ছন্দে বিন্যস্ত ব্যতিক্রমী এই কাব্যনাট্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে সঞ্চার করেছে নতুন এক মাত্রা’।[১] তবে আলোচ্য কাব্যনাটকের সংলাপে অলংকার, উপমা, চিত্রকল্পের ব্যবহার সৈয়দ হকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। মূলত, অলংকারবহুল ভাষা নয়, আঞ্চলিক শব্দের সুষম প্রয়োগেই এ নাটকের ভাষায় বাস্তবতা এসেছে, এসেছে গীতময়তা। বক্তব্যকে আরও নান্দনিক ও বাস্তবসম্মত করে তুলতে নাট্যকার সংলাপে কিছু কিছু উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে। নিম্নে এমন কিছু উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অলঙ্কার দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হলো :

উপমা :

১. ধবলদুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬৭)

২. তাদের পিচ্ছিল দেহ কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুতের মতো
এই দ্যাখা যায়, এই নিমিষে মিলায়, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৮৭)

৩. আকাশে চিমনির ধোঁয়া, সবুজ বিস্তৃত মাঠ,
সোনার পাতের মতো পড়ে আছে রোদ, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯২)

৪. দ্যাখেন দ্যাখেন আরো কতক আছে উয়ার পরে,
গাং টিটির পংখী যেমন তোমাক লক্ষ্য করে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৮)

৫. বাপজান, বাপ মোর, ভাগাড়ে অন্তিমকালে পশুর মতন,
ডাক ভাংগি উঠিল হাম্বায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১২০)

৬. পুন্নিমার মতো হয় সন্তানের মুখ রোশনাই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১১২)

উৎপ্রেক্ষা :

১. নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
পাহাড়ী ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬৮)

---

[১] বিশ্বজিৎ ঘোষ, ‘বাংলাদেশের পঁচিশ বছরেরর নাট্যসাহিত্য’, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ, ৩৪১

২. দূরান্ত দূরান্ত হতে য্যান ঢল পাহাড়ী তিস্তার
হাজার হাজার জন লক্ষ লক্ষ সর্বহারা আসিছে ছুটিয়া (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৪৭)

চিত্রকল্প :

১. নিলক্ষা আকাশ নীল, পনে পন জ্বলি আছে তারা।
সুমার না করা যায়, হয়া যায় সবে দিশেহারা।
মোহরের ছালা য্যান পড়ি গেছে কোম্পানীর মাঠে,
উয়ার ভিতর দিয়া গারবুলি করি চান হাঁটে। [...]
দ্যাখো, চাঁন ভাসি যায় নীলে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১১১)

এখানে নূরলদীনের বন্ধু আব্বাসের পর্যবেক্ষণে মধ্যরাতের পূর্ণিমার আকাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাট্যকার অপার্থিব এক জগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত আব্বাসের চোখেদেখা আকাশে তারার মেলাকে মনে হয়েছে কোম্পানির ময়দানে ছড়িয়ে রাখা সোনার মোহর! আর তার ভেতর দিয়ে চাঁদ যেন হেঁটে যাচ্ছে গারবুলি করতে! সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) যেমন চাঁদকে ঝলসানো রুটির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তাঁর *ছাড়পত্র* (১৯৪৭) নামক কাব্যে, তেমনি সৈয়দ শামসুল হক অর্থকষ্টে নিপতিত আব্বাসের চোখের তারকারাজিকে স্বর্ণমোহরের সঙ্গে তুলনা করে অনন্য চিত্রকল্প নির্মাণ করছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকের ক্যানভাসজুড়ে উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে পড়ে জ্যোৎস্নার ব্যবহার। বস্তুত, জ্যোৎস্নার এই নান্দনিক ব্যবহার নাট্যকারের জীবনবাস্তবতা থেকে উৎসারিত; যেটি তিনি পরবর্তীকালে নিজের আত্মজীবনীমূলক রচনায় উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ হকের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, লেখকের বয়স যখন ১৮ বছর তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। মায়ের বয়স তখন মাত্র চৌত্রিশ। নাট্যকার প্রথম সন্তান হিসেবে সে সময়ে মায়ের খুব কাছাকাছি থেকে বিশাল পরিবারের দায়িত্ব সামলেছেন; এবং পরিবারের চিন্তায় অসংখ্য রজনী বিনিদ্র কেটেছে মায়ের পাশে বারান্দায় বসে জ্যোৎস্না দেখে। এই দিনগুলিতে দর্শনীয় প্রকৃতির রূপবিভা তাঁর মস্তিষ্ককোষে থেকে গেছে বহুকাল। লেখক এ প্রসঙ্গে বলেন :

> আমার তখন আঠার বছর বয়স; আমার মা মাত্রই চৌত্রিশ। [...] আমি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র থেকে হয়ে উঠেছি যেন তাঁরই সহোদর, পিতার সংসার পরিচালনা করেছি। মনে পড়ে সেসব মধ্যরাতের কথা – জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে কুড়িগ্রামের উঠোন, শব্দহীন পৃথিবী, আমরা দুটিতে বসে আছি বারান্দার হেলনা বেঞ্চিতে, তাকিয়ে আছি বিশ্বের ওই অপার সৌন্দর্যের দিকে, ভুলে গেছি আগামী কাল কী করে আহার জুটবে সেই দুর্ভাবনা। [...] আমি

আর মা, অনুভব করেছি, জীবন এখনো এখানেই আছে। ওই জ্যোৎস্না আমার মর্ম নিশ্চয় আলোকিত করে থাকবে; তাই দেখি জ্যোৎস্না বারবার ফিরে এসেছে আমার লেখায় – কবিতায়, নাটকে। ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ কাব্যনাট্যে যে জ্যোৎস্নার উল্লেখ, নিশীথে জ্যোৎস্না রাতেই যে কৃষকযোদ্ধাদের চলাচল, নাটকটির অধিকাংশ দৃশ্যই যে জ্যোৎস্নারাতেই ঘটে – শুরুতেই সূত্রাধার যে বলে : ‘ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ পূর্ণিমার।’ […] নাটকের প্রায় অন্তিমে নূরলদীন যখন আব্বাসকে বলে :

‘পুন্নিমার চান বড় হয় রে ধবল –
জননীর দুগ্ধের মতন তার দ্যাখোঁ রোশনাই।’

তখন কি সন্দেহ থাকে, এই জ্যোৎস্না সেই জ্যোৎস্না পৃথিবীর সকল জ্যোৎস্নার ভেতরে সদ্য কৈশোর পেরুনো যুবক আমি, আমার তরুণী বিধবা জননীর সাথে বাংলার গভীরে কোনো এক শহরের নিশীথে জ্যোৎস্নায় স্নান করে ওঠার সেই স্মৃতিটিকেই বপন করে উঠেছি?[১]

রূপক/ প্রতীক :

১. বৃক্ষ যদি বড় হয়, শিকড় তুলিতে তার সময় তো লাগে ?/ বোঝেন নিশ্চয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৩০)
ব্রিটিশ রাজশক্তি পুরোপুরি এদেশে গেড়ে বসার পূর্বে তাদের সমূলে বিনাশ করার ইচ্ছা আব্বাসের সংলাপে বৃক্ষের প্রতীকে ব্যবহৃত হয়েছে।

সমাসোক্তি :

১. স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি ? কোন শব্দ ? কিসের প্রপাত ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬৭)

২. আসুন তবে, আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে ;
যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে, (প্রাগুক্ত)

৩. নিলক্ষারে নীল বৃক্ষ করি দিলো গুম / অকস্মাতে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৮৪)

৪. পুন্নিমার চান হাঁটি যায় / মাথার উপর দিয়া, নিচে না তাকায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১১২)

প্রবাদ/ প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১. রাস্তায় নামিলে পরে রাস্তা নাই ফিরিয়া যাবার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৭)

২. এককালে সুঁই, / অন্যকালে তাই ফাল হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১১৪)

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, *প্রণীত জীবন*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৭-২৮

৩. না নাচিয়া লোকের কথায় / হঠাৎ ঝাঁপ না দেও পাহাড়ী সোঁতায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১১৫)

৪. নেটিভের চরিত্র লক্ষণ– / সংবাদে নড়ে না, কিন্তু গুজবে সে ওড়ে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯৪)

৫. মাঝির অন্তর যদি ভাংগি যায়, নৌকা তার টুকরা হয়া নদীজলে ভাসে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১১৩)

৬. স্বার্থটা উভয় পক্ষে এক হলে, মিত্র হয়ে যায় / পরম শত্রুও। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৯০)

এছাড়া, নাট্যকার চরিত্রের সংলাপে বিরামচিহ্নের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে সংলাপের ভাব ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত সফল ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, পরস্পর বিরোধী দুই পক্ষের দূরত্ববজায় রেখে সংলাপ বিনিময়কালে তিনি সংলাপের প্রতি শব্দের পর ড্যাশ চিহ্ন প্রয়োগ করে স্বরের প্রলম্বন বুঝিয়েছেন। আবার নূরলদীন যখন সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে আহবানমূলক বক্তব্য রেখেছে, সেখানেও স্বরের প্রলম্বিত অবস্থা বোঝাতে ড্যাশ চিহ্নের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ করেছেন নাট্যকার। ৬ষ্ঠ দৃশ্যে কুঠিয়ালসহ ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে নূরলদীন ও তার সঙ্গীদের সংলাপ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে নাট্যকার শুরুতেই মঞ্চনির্দেশক হিসেবে বলে দিয়েছেন দূর থেকেই পরস্পরের হাঁক শোনা যাবে। এবং এ বিষয়টি সংলাপেও ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহারে উপস্থাপন করেছেন নিম্নরূপে :

> লেফটেন্যান্ট। থামো – হো – থামো – ও। [...] আর অগ্রসর নয়। – কে তোমরা ? বলো হো – ও।
>
> নূরলদীন। মানুষ হো – ও।
>
> মাঠের মানুষ, দেশের মানুষ, হামরা মানুষ হো – ও।
>
> লেফটেন্যান্ট। কি চাও হো – ও ? কি উদ্দেশ্য – ও।
>
> নূরলদীন। দূর হতে কি বলা যায় হামার উদ্দেশ্য – ও। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১০০)

এভাবে কোনোরূপ তাত্ত্বিক গুরুগম্ভীর আলাপে না গিয়ে নাট্যকার সহজ বচনে বিভিন্ন চরিত্রের মানসলোক বিশ্লেষণ করেছেন। সংলাপের এমন সহজতর উপস্থাপনের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের স্বপ্ন-সাধ, আচার-উচ্চারণের স্বরূপ উপস্থাপনে বিস্ময়কর সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন সৈয়দ হক। মূলত ভাষা, সংলাপ ও অলংকারের মিলিত সমবায়ে 'অবহেলিত ব্রাত্য অথচ বিদ্রোহী নূরলদীন হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক।'[১] বাংলা নাট্যাঙ্গনে *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকের কালজয়ী অবস্থান এর বিষয়গুণে যেমন, তেমনি উপস্থাপনার অনন্যতায়।

---

[১] আবুল হাসনাত, *পরানের গহীন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

এখানে এখন

এখানে এখন কাব্যনাট্যে স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল, বিশেষত পঁচাত্তরের পরবর্তী পর্যায়ের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পট-পরিপ্রেক্ষিতের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। এ-নাটকের বিষয়বয়ন, চরিত্র নির্বাচন ও চরিত্রায়ণ কৌশলে যথেষ্ঠ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন নাট্যকার। নাগরিক মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্তের সমস্যা ও সংকটের চিত্রই নাটকে ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্য মিনতি চরিত্রের উপস্থিতির মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে হলেও নাট্যকার নিম্নবিত্তের জীবনসংকটের চিত্রাঙ্কন করেছেন।

বস্তুত সমকালীন অস্থির সময় ও সমাজের নিপীড়িত, অবহেলিত নারীসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হল মিনতি চরিত্রটি। 'ব্যবহার' যদি এ নাটকের প্রধান থিম হয়ে থাকে, তবে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে *এখানে এখন* নাটকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের শিকার হয়েছে মিনতি। নাটকের শেষদিকে রফিকের একটি সংলাপে মিনতিই হয়ে উঠেছে পঁচাত্তর-উত্তর বাংলাদেশের নষ্ট সময় ও সমাজের প্রতিরূপ। প্রেমিকা সুলতানাকে প্রদত্ত কানের দুলের সূত্র ধরে মিনতির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে রফিক মিনতির দুঃখজনক ঘটনার ইঙ্গিত টেনে বলেছে :

> বেশ্যাই বলতে পারতাম
> এখন সে বেশ্যা না আর।
> এখন আমরা কেউ বেশ্যা নাই আর।
> সবকিছু পুড়ে গেছে এসিডে কবেই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২৫)

মিনতি এ সমাজের চোখে পতিত চরিত্র, অথচ গোপনে সে অনেকের বাঞ্ছিত। সে উচ্চমধ্যবিত্ত চরিত্রের মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হয়েছে বারবার। সমাজের চোখে তার অবস্থান নিন্দনীয়। কিন্তু এ-পেশায় সে সানন্দচিত্তে নয় বরং নিরুপায় হয়েই এসেছে। এজন্য দায়ী বিদ্যমান অস্থির আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বোপরি উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব।

বাবার মৃত্যুর পর একমাত্র ভাই বিয়ে করে দুবাই চলে যায়। এরপর তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে ভাগ্যান্বেষণে মিনতি গ্রাম ছেড়ে রাজধানী ঢাকায় স্থিত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু মিনতি এ শহরে অভিভাবকহীন একলা নারী; তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লালসার শিকার হয়ে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন

হতে বাধ্য হয় সে। ভাগ্যান্বেষণে শহরে এসে সে টিকে থাকার প্রয়োজনে 'কলগার্লে'র জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। অথচ একদিন তার স্বপ্ন ছিল অন্যরকম :

> প্রায় প্রতি পূর্ণিমার রাতে
> নিজেকেই দেখতে পেতাম ঘন নীল কি সুন্দর শাড়ি পরে
> মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি সবুজ ঘাসের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

এখন তার রাত কাটে তীব্র ভয়ে, অজানা আশঙ্কায়। মানুষের অযাচিত ব্যবহারে সে ব্যথিত হয়; কিন্তু উপায়হীন বাস্তবতায় কিছু করার থাকে না। অবশ্য রফিকের সঙ্গে আলাপকালে সে নিজেকে কিছুটা মেলে ধরার সুযোগ পায়। মনে হয় রফিক তার স্বপ্নে দেখা প্রেমিক পুরুষের মতো। তাই রফিকের 'আপনি' সম্বোধনের উত্তরে সে বলে :

> আমাকে আপনি করে বলছেন কেন ?
> [...] অনেকে তুইও বলে। কত কিছু বলে, সব
> শুনে যেতে হয়। তবে আপনি আলাদা।
> [...] একটি মানুষ – আমি তাকে প্রায় প্রতিদিন টের পাই খুব কাছে আছে;
> যেমন গাছের গায়ে ঘ্রাণ পাওয়া যায়, [...]
> তার সাথে আমার সংসার, [...]
> মনে হচ্ছে, লোকটি যে আপনিই ছিলেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৭৪)

বাস্তবতার রূঢ় ধাক্কায় মিনতি প্রতিনিয়ত বাস করেছে স্বপ্নলোকে। জীবনের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোকে স্বপ্নের ঘোরেই ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছে সে। অথচ বিরুদ্ধ পরিবেশে সে নিয়ত যুদ্ধ করে চলেছে এক অজানা ভয়ের সঙ্গে। রফিকও বাস করেছে ভয়ের মধ্যে। কিন্তু রফিকের ভয় আর মিনতির ভয়ের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। রফিকের ভয় মূলত তার পাপবোধ থেকে জাত; কিন্তু মিনতির ভয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হওয়ার, ব্যবহৃত হওয়ার। বিরুদ্ধ পরিবেশে, বিনষ্ট সমাজের প্রেক্ষাপটে সে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত বোধ করেছে, শঙ্কাতাড়িত হয়েছে সমকালীন অন্যান্য নির্যাতিত নারীর মতো; যারা এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে :

> কখনো কখনো আমার কি ভয় করে,
> কখন কোথায় এসিড কে মুখে মারে ;
> যদি সত্যি হয়ে যায় কোনোদিন –

অন্তত তখন আর থাকবে না ভয়।

এসিড তো দ্রুত নষ্ট করে,

ভয় বড় ধীরে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৭৯-১৮০)

সমাজ এবং দেশের নির্মম বাস্তবতায় মিনতির এই দুঃস্বপ্নও একদিন সত্যি হয়ে ধরা দেয়। নাটকের সমাপ্তিতে দেখা যায় মিনতির এসিডে ঝলসানো মুখের বীভৎস ছবি। তাই এখন সে আর ব্যবহৃত হবার যোগ্য নয়। নাটকের শুরুর দিকে যে ভয় তাকে গ্রাস করেছিল, শেষপর্যন্ত সেই ভয়ই তার জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নাটকের শেষে 'উন্মত্তের মতো খল খল করে' হেসে ওঠা তার সেই পরিণতিকেই নির্দেশ করে। সে বলে :

এসিডে বিনষ্ট মুখ এখন আমার।

এখন কিসের ভয় ?

আর কোনো ভয় নেই এখন আমার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২৩)

বস্তুত, *এখানে এখন* কাব্যনাটকের মিনতি 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নিম্নবর্গের অসহায় নারী সমাজের প্রতিনিধি। [...] স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে মিনতির মতো অনেক নারীই ক্ষুধার যন্ত্রণায় পতিতায় পরিণত হয়েছে। মূলত মিনতি চরিত্রের মধ্যদিয়ে নাট্যকার মানবতার বিপর্যয়কে তুলে ধরেছেন।'[১]সে অর্থে মিনতি হয়ে উঠেছে সেই কালের সমাজবাস্তবতার প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র।

নাটকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র হল রফিকের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী – গাফফারের স্ত্রী সুলতানা। সুলতানা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া শিক্ষিত মেয়ে; বিবাহিত ও আর্থিকভাবে সচ্ছল। কিন্তু সেও পরিবার ও সমাজে মিনতির মতোই ভালোবাসার অধিকার থেকে বঞ্চিত। একসময় সে সহপাঠী রফিককে পছন্দ করলেও স্বভাবসুলভ আড়ষ্টতায় তাকে কখনো তা বলতে পারেনি। পরবর্তীকালে তার বিয়ে হয়ে যায় সরকারি চাকুরে, ধর্মপ্রাণ গাফফারের সঙ্গে। কিন্তু অন্তর্মুখী, পলায়নপর গাফফারের সঙ্গে তার দাম্পত্যজীবন কখনোই সুখের হয়ে ওঠেনি। গাফফার সুলতানাকে ব্যবহার করেছে সামাজিক মর্যাদা ধরে রাখতে এবং জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর প্রয়োজনে। সুলতানার চাওয়া-পাওয়া, ভালোলাগা-ভালোবাসাকে সে কখনো সেভাবে মূল্যায়ন করেনি। ফলে ক্রমাগত বঞ্চনা আর হতাশাই হয়ে উঠেছে তার দাম্পত্য জীবনের সম্বল; কাটাতে হয়েছে অসুখী জীবন। একই ফ্ল্যাটে বসবাসরত বন্ধু রফিকের সামনে সে খুলে দিয়েছে তার অপূর্ণ জীবনের অর্গল; রাগে-ক্ষোভে জানিয়েছে :

---

[১] অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

আজ বৃহস্পতিবার। [...]

আজ ফিরবে না গাফফার।

বিধবার এ রাত আমার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯২-১৯৩)

মেয়েদের 'স্বামীর মৃত্যুর কথা মুখে আনতে নেই' – রফিকের মুখে এমন সামাজিক ট্যাবুর কথা শুনে দ্রোহে ফেটে পড়ে সুলতানা। রফিককে কটাক্ষ করে সে জানায়, আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিক যেখানে কথা রাখে না, স্বামী যেখানে শপথ পালন করে না, সেখানে শুধুমাত্র তার মুখের উচ্চারণে কী এসে যায়। মুখের কথায় মিথ্যে সত্যি হয়ে যায় না, কারো অসুখী জীবন সুখী হয়ে যায় না। এ পর্যায়ে সে সম্পদের নেশায় উন্মত্ত রফিককেও কটাক্ষ করে বলে – 'তোমার মন বলে কিছু আছে নাকি ?' প্রকৃতপক্ষে সুলতানা জীবনের রসভোগ থেকে বঞ্চিত। অথচ মিনতির সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে তার সবকিছুই পাওয়ার যোগ্যতা ছিল কিংবা পাওয়ার কথা ছিল। কেননা, সে মিনতির মতো নিম্নবিত্ত অসহায় পরিবার থেকে উঠে আসা কোনো নারী নয়; সে শিক্ষিত ও উচ্চমধ্যবিত্ত নারীসমাজের প্রতিনিধি; অথচ সেও নির্মমভাবে ব্যবহৃত চরিত্র। দুজন পুরুষ তার জীবনে এসেছে; অথচ দুজনেই তাকে প্রচণ্ডভাবে ব্যবহার করে প্রত্যাখ্যান করেছে। একদিকে প্রথম জীবনে প্রেমিক-বন্ধু রফিক অর্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে সুলতানাকে উপেক্ষা করেছে; অন্যদিকে সামাজিকভাবে গাফফারকে বিয়ে করে সুলতানা আর দশজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতোই স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী হতে চেয়েছে, কিন্তু গাফফার তাকে না দিতে পেরেছে স্বামীসুখ, না দিতে পেরেছে সন্তান। সুলতানা অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে এ সংকটজনক অবস্থা বর্ণনা করে বলেছে :

থেকেও সে নেই যেন, ওজু নষ্ট হয়ে যাবে বলে

সারাক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকে; যখন সে কাছে টানে

নিতান্তই প্রয়োজনে তার – নির্মম, সংক্ষিপ্ত, দ্রুত –

তারপর ছুঁড়ে ফ্যালে, যেন নষ্ট জামা তার বউ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৬)

গাফফারের এই ক্রমাগত অবহেলা সুলতানাকে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। তবুও সুলতানা রফিকের সঙ্গে একই ছাদের নিচে থেকেও কখনো নিজস্ব পবিত্রতা বিসর্জন দেয়নি। এমনকি রফিকের সঙ্গে সারাজীবন কাটানোর অঙ্গীকার করেও তাৎক্ষণিক আবেগে ভেসে যায়নি সে; বরং রফিকের তীব্র জৈবিক আকর্ষণের মুখে দৃঢ় স্বরে বলেছে –

না রফিক, না এখন কিছুই না।

তুমি আমাকে ছোঁবে না। এখনো যে গাফফার –

এখনো যে আমি তার – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১২)

সুলতানা সমাজ-রাজনীতি সচেতন নারী। একসময়ে তার জীবনে ছিল অপার সম্ভাবনা; কিন্তু প্রতিকূল সমাজের স্রোতে তাকেও ভেসে যেতে হয়েছে নিরুপায় হয়ে। কিন্তু এত এত বিপর্যয়ের মুখেও সে তার নৈতিকতাবোধ অক্ষুণ্ন রেখেছে, রফিকের সঙ্গে দেশের ভালো-মন্দ নিয়ে আলাপ করেছে, সমাজের পঙ্কিলতার দিকে ইঙ্গিত করেছে। আলোচ্য নাটকে সুলতানার সংলাপেই লেখক সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাবলি উপস্থাপন করেছেন। এমনকি গাফফারের অতি ধার্মিকতাকেও সুলতানা ব্যাখ্যা করেছে নিজস্ব দার্শনিক বিচার-বুদ্ধি দিয়ে। তার মতে –

পালাতে চায় গাফফার, এটা তার পথ

পালাবার – এই অতি ভক্তি তার – এই বাড়াবাড়ি – এই অতি ধার্মিকতা।' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৮)

আবার, দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে গাফফারের এই পলায়নপর মানসিকতার কার্যকারণও নির্ণয় করেছে চমৎকার বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে। সুলতানার মতে, যে দেশে রাষ্ট্রপ্রধানকে ঘাতকের বুলেটে প্রাণ দিতে হয়, যে দেশে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে পর্যন্ত চুরি হয়, জিনিসপত্রের দামে যেখানে সাধারণ লোকের নাভিশ্বাস ওঠে, সেখানে মানুষ বাঁচতে পারে চোর-ছিনতাইকারী হয়ে, পঙ্কিলতায় গা ভাসিয়ে; যেমনটা রফিক-নাসিররা করছে। এই বাঁচার উপায় হলো সমাজকে দূরে ঠেলে, বাস্তবতাকে এড়িয়ে পরকালের আশার বুকে আশ্রয় খুঁজে, যেমনটা সুলতানার স্বামী গাফফার করেছে। সুলতানার পর্যবেক্ষণশক্তি এতটাই তীক্ষ্ণ যে, নাসিরের কন্ট্রাক্ট পেয়ে যাওয়ার সংবাদে লোভমত্ত রফিকের ঈর্ষাকাতরতাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি :

তুমিত আপিস থেকে ফিরে এসে

সোজা শুয়ে পড়বার লোক নও মোটে।

চোখ টাটাচ্ছে, তাই না ? [...]

কি যে দুঃখ, আহা, নামলো না মোহরের ঝর্ণা মরুভূমিতে তোমার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৫)

জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়কে সে নিজস্ব দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করেছে। রফিকের সঙ্গে শেষপর্যন্ত সংসার করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে সে ধীরেসুস্থে পুরো বিষয়টি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার বিশ্লেষণ করেছে; আবেগে ভেসে হুটহাট ভুল সিদ্ধান্ত নিতে চায়নি। রফিককেও সে ভাবার যথেষ্ট সময় দিয়েছে। এমনকি সামাজিক রীতি-নীতি তুলে ধরে রফিককে নিজস্ব বোঝাপড়ায় সাহায্য করেছে বন্ধুর মতো :

যখন বলবে লোকে, তারা বলবেই,

বলবে যে তুমি এক বন্ধুর বউকে

ছি-ছি ভাগিয়ে নিয়েছো; যখন বলবে,

তুমি বিশ্বাসঘাতক, তখন তোমার

খারাপ কি লাগবে না ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১২)

সুলতানার একাধিক উক্তিতে সমাজে মেয়েদের অবস্থান সুস্পষ্ট হয়েছে। সুলতানা ধর্ম সম্পর্কেও সমান অবগত। ধর্মের বিধিনিষেধ তুলে তাই তাকে ঠকানোর প্রশ্নই আসে না। স্বামীকে মেয়েদের তালাক দেবার অধিকার প্রশ্নে তাই সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ধর্মের প্রসঙ্গটি উদাহরণ দিয়ে বলেছে :

আমি জানি, অধিকাংশ লোকের ধারণা,

মেয়েরা তালাক দিতে পারে না, কেবল

পুরুষেরা পারে। যদি সেরকম কিছু

শুনে থাকো, তবে ভুল শুনেছো, জেনেছো

ইসলামে মেয়েরাও পারে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০৮)

এক্ষেত্রে সুলতানা যেন লেখকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ের* প্রধান নারী চরিত্র মাতবরের মেয়ের আধুনিক সংস্করণ। মাতবরের মেয়ে মুক্তিযুদ্ধকালে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্যাতিত হয়ে পুরুষতন্ত্র, এবং পুরুষতন্ত্রসৃষ্ট আচারস্বর্বস্ব ধর্মের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দ্রোহ জানিয়েছিল। কিন্তু সে সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নিজের মুক্তির পথ করে নিয়েছে আত্মহননের মাধ্যমে। কিন্তু সুলতানা পরিণত, আধুনিক, শহুরে শিক্ষিত নারী। আত্মহননেনর পথে না গিয়ে তাই সে গোটা পুরুষতন্ত্রকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পেরেছে। একদিকে স্বামী কর্তৃক অবহেলা মেনে না নিয়ে যেমন তাকে তালাক দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, তেমনি আবার মতিভ্রষ্ট, লম্পট প্রেমিককে ফিরিয়ে দিয়ে রক্ষা করতে পেরেছে আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রম। সমাজে তালাকপ্রাপ্ত একলা নারীদের অবস্থান, বিবাহিত নারীকে পুনরায় বিয়ে না করার সামাজিক ট্যাবু – সবকিছু সম্পর্কেই সে সচেতন। সুলতানা তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে :

তালাকের পর একা থাকা অসম্ভব নয়, তবে সেটা

অবাস্তব হতে পারে – একাকিনী মহিলাকে কে কবে ছেড়েছে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র: ২১১)

এভাবে রফিকের কাছে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সে। সমাজে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে সুলতানার একটি দীর্ঘ সংলাপ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে :

আমরা সকলে, গরীব কি মধ্যবিত্ত
লেখাপড়া করেছি কি করিনি, সকলে
যতই বলি না কেন, তবু শেষ কথা –
কাটাতে পারিনি এই নির্ভরশীলতা,
মন কিংবা মর্যাদার কোনো ক্ষেত্রে নয়।
যতই বড়াই করি – মেয়েরা স্বাধীন।
[...] আমিও নির্ভরশীল,
[...] তা আমি যতই হই এম.এ পাশ করা,
যতই যোগ্যতা থাক নিজেকে দেখার। (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ২১০)

মেয়েদের এই পরনির্ভরশীলতা কিংবা পুরুষনির্ভরতাকে সুলতানা অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছে চমৎকার একটি প্রবাদপ্রতিম বাক্য দিয়ে : 'বন্ধনে অভ্যস্ত হলে উদ্যমের ধার ক্ষয়ে যায়।'(কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ১৯৬) বিরূপ পরিস্থিতির মুখেও সুলতানা শেষপর্যন্ত নিজেকে ধরে রাখতে সক্ষম হয় মদ্যপ, লম্পট রফিককে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে। নাটকের শুরুতে রফিক চরিত্রটি ইতি-নেতির দোলায় দুলতে দুলতে শেষপর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে নেতির দিতে ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে, সুলতানা চরিত্রটি আপাতমুক্তির নেশায় ক্ষয়ে যেতে যেতে অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। সুলতানা চরিত্রটিই মূলত নাটকের একমাত্র ইতিবাচক চরিত্র, যার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আর শাণিত বুদ্ধির ঝলকে নাটকটি প্রাণময় হয়ে উঠেছে। বস্তুত '*এখানে এখন* কাব্যনাট্যে সুলতানা আমাদের অসহায় নারী সমাজের প্রতিনিধি, যাদেরকে একশ্রেণীর পুরুষ ব্যবহার করে। তার স্বাভাবিক, সুস্থ সুন্দর মানবিক বোধ, জীবনবোধের কারণে সে বিশিষ্ট নারী চরিত্র হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।'[১]

নাটকের আরেকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অনামা ব্যক্তি। নাট্যকার খুব সচেতনভাবেই এই চরিত্রটির নামকরণ করেননি। অনামা ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে রফিকের অন্তর্গত দ্বিতীয় সত্তা। নাট্যকার শাদাবেশধারীদের সংলাপে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নরূপে :

---

[১] মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.২১১

নিজের দ্বিতীয় সত্তা নির্বিবাদে থাকে
নিজেরই ভেতরে,
বস্তি ও দালানগুলো পাশাপাশি থাকে।
নিজের গলিত লাশ পাশে আছে পড়ে,
পচন, পচন
তবু সারাক্ষণ
নিজের ভেতর,
জানালা দরোজা
সমস্তই বোঁজা,
প্রয়োজনে ব্যবহৃত যখন যে ঘর। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ২০৪)

অনামা ব্যক্তি রফিকের সেই পচা গলিত লাশ কিংবা বস্তি-সত্তা। যেটি শেষপর্যন্ত রফিককে পুরোপুরি অন্ধকার জগতে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছে। অনামা ব্যক্তি আলাপকালে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে একটি কথাই উল্লেখ করেছে কেবল – 'কালো রঙ পছন্দ আমার।' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১৭) আর নাটকের শেষদৃশ্যে আমরা দেখি রফিককে তার স্বাভাবিক পোশাকের পরিবর্তে কালো থান পরানো হয়েছে। নাট্যকার মঞ্চনির্দেশে উল্লেখ করেছেন :

কালো বেশধারীরা আসে। তাদের হাতে দীর্ঘ একপ্রস্থ কালো থান। রফিককে তারা টেনে মাঝখানে এনে দাঁড় করায়। তারপর সেই কালো থান তার গায়ে জড়িয়ে দিতে থাকে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২৬)

নাটকের শুরু থেকেই রফিক অন্তর্গত ইতি-নেতির দ্বন্দ্বে দুলতে থাকে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে মসজিদ প্রাঙ্গণে উন্মোচিত হয়ে পড়ে তার নেতি-সত্তা। আর তখনই অনামা চরিত্রটি বাস্তবে আবির্ভূত হয়; এবং সে নানান অপকৌশলে মানিকগঞ্জের ট্রেনের কাজ নাসিরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে রফিককে উৎসাহিত করে। রফিক তখন সবিস্ময়ে লক্ষ করে এই সেই ব্যক্তি যাকে সে এতদিন স্বপ্নে দেখেছিল। যে তাকে তার মুসলমানিত্ব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন ছুঁড়েছিল :

এই সেই লোক স্বপ্নে,
মানিকগঞ্জের ট্রেনে, প্রশ্ন করেছিল। অবিকল সেই গলা,
উচ্চারণে অবিকল সেই লঘু দোলা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১৭)

অর্থাৎ, অন্তরের যাবতীয় পঙ্কিল ইচ্ছা, যা রফিক ধর্মের আবড়ালে এতদিন গোপন করে রেখেছিল, তা মানিকগঞ্জের কাজ হারানোর পর পুরোপুরি উন্মোচিত হয়ে যায়। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে সেই কন্ট্রাক্ট বাগিয়ে নেবার নানান পথ খুঁজতে থাকে, যা অনামা ব্যক্তির সংলাপের মাধ্যমে জানা যায়। রফিক মেনে নেয় – 'চেষ্টা করলেই – কেবল একটুখানি – ব্যাস,' কেননা 'ব্যবসায় শেষ কথা কিছু নেই ! / [...] পথ শুধু রাজপথ নয়, / অলিগলি শর্টকাট আছে,'(কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১৭)। তাই তার মন বলে – বিভিন্ন বড় বড় অফিসে উপযুক্ত উৎকোচ দিয়ে বন্ধুকে 'আন্ডারকাট' করা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে তার ইতি-সত্তা যখনই তাকে নীতির কথা সামান্যতম মনে করাতে গেছে, সে তখন বিদ্যমান দেশের বিপর্যস্ত রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি তুলে নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে এই বলে যে :

> নীতি-ফীতি রেখে দিন। বাংলাদেশে গুলি চলে গুলি।
>
> কথা যাকে মাথায় রাখা,
>
> অবলীলাক্রমে তাঁকে মারেনি কি মানুষ বাংলার ? (কাব্যনাট্যসমগ্র: ২১৯)

অতএব, অনামা ব্যাক্তির ছদ্মবেশে তাকে তার দ্বিতীয় সত্তা বোঝাতে সক্ষম হয়, উপরে উঠতে গেলে প্রকৃত ধার্মিক হয়ে লাভ নেই, বরং তাকে তার ভোল পাল্টিয়ে ধার্মিক হবার ভান করতে হবে। যেহেতু আরব দেশের টাকায় কাজ, তাই পোশাকে, চলনে-বলনে তাকেও আরব্য সংস্কৃতি লালন করতে হবে। ধর্মকে ব্যবহার করতে হবে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে। মূলত রফিকের অন্তরের এই দোলাচলের কারণেই নাটকের শুরুতে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল – রফিক কতখানি ধার্মিক। কেবল ধর্ম পালন নয় আরব বিশ্বের কাজ পেতে হজকেও ব্যবহার করা হয়েছে, ধর্মীয় পোশাককেও স্বীয় স্বার্থে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। অনামা ব্যক্তি রফিককে পরামর্শ দিয়েছে :

> এখন কি হজ্জেবর মৌসুম নয় ?
>
> হ্যাঁ, আপনি হজ্ব ,হজ্ব করতে যাবেন।
>
> এবং ফেরার পথে কাজ সেরে নিয়ে মাথায় রুমাল বেঁধে দেশে নামবেন।
>
> ওদের রুমালে কিন্তু আপনাকে জবর দেখাবে। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ২২১)

অর্থাৎ, রফিক নিজেই সর্বতোভাবে নিজেকে বদলে নিতে চেয়েছে। অনামা ব্যক্তি তাকে তার দ্বিধা ভুলিয়ে, পাপের প্রতিক্রিয়াজনিত ভয় থেকে মুক্ত করে শেষপর্যন্ত পরিণত করেছে পশুতে। বন্ধু নাসিরকে ঠকানো, এসিড

আক্রান্ত মিনতির প্রতি সংবেদনহীনতা, সুলতানাকে ভোগের চেষ্টা – ইত্যাদি এর প্রমাণ। জনৈক সমালোচক অনামা চরিত্রটির সঙ্গে এলিয়টের The Elder Statesman(1959) কাব্যনাটকের মিল খুঁজে পেয়েছেন :

> এ চরিত্রটি দেখে আমাদের T.S.Eliot এর The Elder Statesman(1959) নাটকের কথা মনে পড়ে। ওই নাটকের অন্যতম চরিত্র Lord Cleverton এর জীবনের অতীত সময়ের ভিন্ন অংশের প্রভাব নিয়ে Eliot, Ghost চরিত্রটি অংকন করেছেন। সেটা আসলে কোনো স্বতন্ত্র চরিত্র নয়। Lord Cleverton এর চারিত্রিক স্খলনের প্রতীকী রূপমাত্র।[১]

আমাদের বিচারে অনামা চরিত্রটির সঙ্গে স্কটিশ লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন (১৮৫০-১৮৯৪) রচিত রহস্য-উপন্যাস *স্ট্রেঞ্জ কেস অব ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড (১৮৮৬)*- এর চরিত্র – এডওয়ার্ড হাইডের সাযুজ্য রয়েছে। উপন্যাসে হাইড যেমন ডক্টর জেকিলের দ্বিতীয় ও অশুভ সত্তা, আলোচ্য নাটকে অনামা চরিত্রটিও তেমন।

নাটকের শাদাবেশধারী ও কালোবেশধারী চরিত্রগুলি মূলত দলীয় চরিত্র। তবে তাদের ভূমিকা ঠিক গ্রিক ক্লাসিক নাটকের দলীয় চরিত্র – কোরাসের মতো নয়। এরা মূলত ইতিবোধ-নেতিবোধের প্রতীক। যে কারণে এদের চরিত্রায়ণে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। শাদাবেশধারী ও কালোবেশধারী সম্পর্কে নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকার যে পরিচিতি দিয়েছেন, তা থেকে এদের আলোচ্য নাটকে ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা জানা যায় :

> শাদাবেশধারী । দু'জন পুরুষ। মধ্যবয়সী। এদের পরনে দীর্ঘ শাদা থান, কাফনের মতো শরীরে জড়ানো। মুখে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি শাদা রঙ, যেন মুখোশ পরে আছে। এদের দু'জন আয়নায় প্রতিফলিত একই ব্যক্তির মতো হাঁটে, দাঁড়ায়, তাকায়, বসে। নাটকে এদের সংলাপ আলাদা করে দেখানো নেই, পরিচালক দু'জনের ভেতর ভাগ করে নেবেন।
>
> কালোবেশধারী। দু'জন পুরুষ। মধ্যবয়সী। এদের পরনে দীর্ঘ কালো থান, কাফনের মতো শরীরে জড়ানো। এদের মুখেও অতিরিক্ত শাদা রঙ। তবে শাদাবেশধারীদের মতো এদের আচরণ আয়নায় প্রতিফলিত ব্যক্তির মতো নয়। এদের সংলাপ একটানা আছে, পরিচালক ভাগ করে নেবেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫৫)

---

[১] মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

বস্তুত, আলোচ্য নাটকে এরা দ্বৈত-ভূমিকা পালন করেছে। কখনো তারা দর্শকের সামনে কাহিনি বর্ণনা করেছে, আবার, কখনো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে চরিত্রের মনোভাবনা প্রকাশে সাহায্য করেছে। এরা নাটকের চরিত্রগুলির নেপথ্যে থেকে যেমন কাজ করেছে, তেমনিভাবে নাটকের নানান ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ায় সরব চরিত্র হিসেবে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। যেমন : প্রথম অঙ্কে রফিকের টেলিফোনে আলাপকালে পাশ থেকে তাকে রাতের স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দেয়া, নাসিরকে টেনে পঙ্কময় পুকুরে গোসল করানোর সময় সরাসরি রফিকের সঙ্গে সংলাপ বিনিময়, দ্বিতীয় অঙ্কে রফিকের পোশাক বদলানো-সহ অনেক ক্ষেত্রেই নাটকে প্রত্যক্ষ চরিত্রের মতো অংশগ্রহণ করেছে তারা। আবার, কখনো কখনো নাটকের মূলবক্তব্য বা নাট্যকারের দার্শনিক বোধ-বুদ্ধি এদের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে শাদাবেশধারী চরিত্র মানব-চরিত্র ও মানব-মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে দার্শনিক উক্তি করেছে, তা যেন নাটকের মূলভাব সম্পর্কে ভূমিকায় বলা নাট্যকারের বক্তব্যেরই অনুরণন। নাট্যকার নাটকের মূলভাব সম্পর্কে ভূমিকায় বলেছেন :

> এই নাটকের চাবি হচ্ছে একটি অতি পরিচিত শব্দ, চার অক্ষরের [...] বড় ভয়াবহ, নির্মম ও সর্বগ্রাসী সেই শব্দ – 'ব্যবহার' [...] এখানে এখন ? বস্তুত কি বাংলাদেশ এখন বিভক্ত নয় দুটি শ্রেণীতে ? ব্যবহর্তা আর ব্যবহৃত। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫৩)

অন্যদিকে, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে শাদাবেশধারী সুলতানা ও রফিকের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে সমগ্র মানবজাতির স্বভাব নিয়ে মন্তব্য করেছে নিম্নরূপ :

> মানুষেরা অবিরাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে কতিপয় মানুষেরই
> হাতে। [...]
> চক্রাকারে সকলেই সকলের কশেরুতে দিয়ে আছি রস-টানা সুঁচ। বস্তুত [...]
> মানুষেরা ব্যবহার ব্যবহার করে আর ব্যবহৃত হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯১)

এমনকি নাটকের শেষ সংলাপও উচ্চারিত হয়েছে শাদাবেশধারী চরিত্রের সংলাপে :

> এইভাবে অভিনীত হয়
> [...] এইভাবে অবিরাম অভিনীত হয়।
> এবং নির্ণয় করে নিতে হয়, বাস্তব ? না – অভিনয় ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২৬)

অর্থাৎ *এখানে এখন* নাটকে শাদা-কালোবেশধারী চরিত্রগুলি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত চরিত্র, যারা নাটকের অভ্যন্তরে নাট্যকারের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেছে। বস্তুত, 'আধুনিক কাব্যনাটকে এ ধরনের চরিত্রের মাধ্যমে

মূল চরিত্রের অন্তর্রহস্য উন্মোচন করার একটি অভিনব মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কাব্যনাটকে এরা নাট্যকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য তথা চরিত্রের অন্তর্গত রহস্য উদ্ঘাটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। [...] শাদা ও কালো বেশধারীরা *এখানে এখন* কাব্যনাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করে অন্তরস্থ ভণ্ডামির স্বরূপ উপলব্ধিতে নাট্যদর্শককে সহযোগিতা করেছে।'[১]

নাটকের উল্লেখযোগ্য আরেকটি চরিত্র সুলতানার স্বামী গাফফার। মূলত, গাফফার চরিত্রটি নেপথ্য বা পরোক্ষ চরিত্র। তাকে কখনো মঞ্চে সরাসরি দেখা যায়নি। অন্য সক্রিয় চরিত্রগুলোর বক্তব্যে আমরা এ চরিত্রটি সম্পর্কে ধারণা পাই। গাফফার সরকারি চাকুরিজীবী, অর্ন্তমুখী এবং ধর্মভীরু চরিত্র। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিপর্যস্ত রাজনীতি-অর্থনীতি, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর নব্যপাকিস্তানবাদের উত্থানের প্রেক্ষাপটে আচার-স্বর্বস্ব ধর্মাচারী গোষ্ঠির উপযুক্ত প্রতিনিধি এই গাফফার চরিত্র। সুলতানা-গাফফার দম্পতির সন্তান না হওয়ার কারণ হিসেবে গাফফারকেই দায়ী করে নাসির, এবং সে গাফফারকে নপুংসক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে সে সত্যিকার অর্থে নপুংসক কি না সেটি স্পষ্ট না হলেও, সে যে দাম্পত্যজীবনে সুলতানাকে সুখী করতে পারেনি, সেটি সুলতানার একাধিক বক্তব্যে সুস্পষ্ট। রফিক ও নাসির যেমন সম্পদের নেশায় নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে উন্মাদপ্রায় হয়ে গেছে, তেমনি গাফফার জাগতিক দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পরকালের পুণ্যের আশায় উন্মত্ত হয়ে হারিয়েছে কর্তব্যবোধ, ঔচিত্যজ্ঞান। সংসারে তার মন নেই, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ভুলে গিয়ে তাকে নিতান্তই নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। আবার সন্তান না হওয়াতে উপযুক্ত ডাক্তারের শরণাপন্ন না হয়ে তাকে নিয়ে গেছে মাজারে ধন্না দিতে। গাফফার নিজস্ব অক্ষমতাকে আড়াল করতে আশ্রয় নিয়েছে ধর্মীয় আচারের কাছে। সামাজিক হুজুকে আক্রান্ত হয়ে সে পরিবারকে উপেক্ষা করে সারারাত পড়ে থাকে এবাদতখানায়। সুলতানার আক্ষেপ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য :

> আমার স্বামীটি
> আল্লাহর খাতায় তার সোয়াবের সেভিংস খুলেছে। [...]
> পাশের মানুষটিকে যে-মানুষ অবহেলা করে,
> ভালোবাসে আল্লা সে কি করে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৬)

---

[১] অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

গাফফারের এই পলায়নবাদী, নির্লিপ্ত মানসিকতা ক্রমশ বিষিয়ে তুলেছে সুলতানার জীবন। বস্তুত, সুলতানার প্রতি গাফফারের এই অবহেলাপূর্ণ আচরণ আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানবচৈতন্যকেই মনে করিয়ে দেয়। তবে গাফফারের এহেন আচরণের পেছনের কারণ সুলতানার জবানিতে নাট্যকার চমৎকার করে ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুত, জাগতিক পঙ্কিলতায় অতিষ্ঠ হয়েই গাফফার নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। বিদ্যমান সমাজে ধর্মীয় আচার পালনের হুজুকও এক্ষেত্রে কিছুটা দায়ী। মানুষ আল্লাহকে পাবার জন্য নয়, আত্মশুদ্ধির জন্য নয়, আত্মতৃপ্তি কিংবা স্বীয় স্বার্থেই ধর্মকে প্রধান ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। গাফফারের এই অতিরিক্ত ধর্মপালন সম্পর্কে সুলতানা বলেছে :

> আমি তো নিশ্চিত এটা তার পালাবার পথ মাত্র,
> আর কিছু নয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ১৯৯)

অপরদিকে, নাটকের অন্যতম মীমাংসিত চরিত্র নাসির। তার কোনো আত্মদ্বন্দ্ব নেই, বিবেকের দহন নেই, অনুশোচনা নেই। আগাগোড়া পুরোটাই পাপে মোড়ানো সে। এ কারণে নাটকে তার চরিত্রের খুব বেশি উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয় না। নাটকের প্রারম্ভ পর্যায়ে তাকে যেমন দেখা যায় মদ্যপ অবস্থায় বারবনিতার সান্নিধ্যে, ঠিক তেমনি শেষদৃশ্যেও তাকে দেখা যায় আগাগোড়া কালো পোশাকে মুড়ে সদ্য কালোবেশধারী রফিককে নিজের কালোজগতে স্বাগত জানাতে। নাট্যকার 'কুশীলব' অংশে এই চরিত্রটির পরিচয় দিয়েছে নিম্নরূপ :

> বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। বিবাহিত। রফিকুল ইসলামের মতোই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী, তবে আরো প্রতিষ্ঠিত এবং ধনবান। পরনে সাফারি সুট। গলায় সোনার চেন, মিনিয়েচার কোরানের লকেটসহ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫৫)

লেখকের এই বর্ণনা নাসিরের প্রতারণার দুটি দিক সুস্পষ্ট করেছে। এক. সে বিবাহিত হয়েও বারবনিতার সান্নিধ্যে গিয়ে নিজের হীনচরিত্র প্রমাণ করেছে; দুই. মদ্যপ, লম্পট ও দুর্নীতিবাজ হয়েও পবিত্র কোরানের লকেট পরে বক-ধার্মিক সেজে ধর্মকে নিজস্বার্থে ব্যবহার করেছে। নাসিরের জীবনে কোনো আলো নেই, পুরোটাই অন্ধকার। যে-কোনো উপায়ে অর্থোপার্জন এবং উদ্দাম জীবনোপভোগই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বানুসারে তার বিবেকবুদ্ধি পুরোটাই ইদম (Id) দ্বারা চালিত। দৈহিক ক্ষুধা আর জৈবিক ক্ষুধার বাইরে তার মধ্যে আর কোনো সুকুমার বোধ কাজ করে না। নাটকের শুরু থেকেই সে নেতিচেতনায় আক্রান্ত। প্রত্যেকটি ইতির মধ্যে সে নেতি খুঁজে বের করেছে। যে কারণে রফিকের ফোন কেটে দেয়া ব্যক্তিকে সাধারণ কেউ না ভেবে, ভেবে বসেছে সুলতানার প্রেমিক। অর্থাৎ নিজের মন্দ চরিত্রের মতো সে

সুলতানার চরিত্রে কালিমা দিতে একমুহূর্তও দ্বিধা করেনি। আবার, বন্ধু রফিকের মুখে সামান্য স্বপ্নের বর্ণনা শুনে ধূর্ত শেয়ালের মতো নেশা কাটিয়ে, সজাগ হয়ে তার মধ্যে অন্য অর্থ বের করার চেষ্টা করেছে। নাট্যকার চমৎকার একটি প্রতীকের মাধ্যমে তার এই হীন ও ধূর্ত স্বভাবকে প্রকাশ করেছেন নিম্নরূপে :

যদিও সে আজ রাতে চেয়েছিল খুব
সুরার তুষার নদী, যুবতীর অশ্লীল আগুন,
[...] এখন সে ভুলে গেছে শরীরের ব্যবহারগুলো
অজস্র মুনিয়া পাখি অকস্মাৎ দেখে;
কুটিল দু'চোখে
পাখি-ধরা জাল সে দেখতে পায় রফিকের হাতে।
ক্রমে তার জেদ, ঈর্ষা কৌতূহল হয় –
তবে কি মানিকগঞ্জে সরকার বসাবেন রেল? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৪)

নাসিরের এই স্বভাবের সঙ্গে মানানসই করে নাট্যকার তার সংলাপও নির্মাণ করেছেন। একদিকে নাসির যেমন উচ্চবিত্ত, সম্পদশালী ব্যক্তির মতো ইংরেজির ফোয়ারা ছোটায়, তেমনি তার অন্তরের হীন ও কদর্যদিকের পরিচয় পাওয়া যায় সংলাপ বিনিময়কালে নানান অপভাষিক শব্দচয়নে। যেমন বন্ধু রফিককে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত সংলাপের ভাষায় সে ব্যবহার করেছে 'সেয়ানা পোলা', 'বাপধন', 'মাইরি দোস্ত', 'ধানাই পানাই', 'শালা', প্রভৃতি শব্দ। এমনকি উপমা চয়নেও রয়েছে অশ্লীলতার ইঙ্গিত। অল্প নেশাতেই রফিক মাতাল হলে সে বলেছে :

আজ কি নতুন আমি
দুলামিয়া, উঠতে না উঠতেই সব সয়লাব ?
লুংগি খারাব। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৬)

নাসিরের চোখে নারী শুধুই ভোগ্যবস্তু। যে কারণে সুলতানার চরিত্র নিয়ে সে অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে। মিনতি তার চোখে নারী নয়, 'নতুন মাল'। গাফফারকে বলেছে নপুংসক। মূলত, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যারা দুর্নীতি করে, কালোবাজারি করে সম্পদের পাহাড় গড়েছে, এবং ধর্মকে যারা নিজস্বার্থে ব্যবহার করেছে, সেই লম্পট, ভণ্ড কপটশ্রেণির সার্থক প্রতিনিধি নাসির চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে, 'কাব্যনাট্যে নাসিরের অবস্থান সংক্ষিপ্ত। কারণ, সে নিরেট চরিত্র। গোড়া থেকে সে স্থির। তার কোনো চিত্তবৈকল্য নেই। যা করে তার জন্য কোনো অনুতাপ

নেই। বরং রফিককে নাসির-এ পরিণত করার জন্য নাট্যকার নাসিরের উপস্থিতি যতটুকু প্রযোজন, ততটুকু রেখেছেন।'[১]

এখানে এখন নাটকের প্রধান চরিত্র রফিক। রফিকের অন্তর্গত ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব, টানপড়েন, ব্যবসায়িক উত্থান-পতন, তার প্রেম-ভালোবাসার রূপ-রূপান্তরই এ নাটকের মূল আখ্যান। সে-অর্থে নাট্যঘটনার বিভিন্ন বাঁকে রফিকের সম্পৃক্ততাই অধিক। রফিক চরিত্রের দুটি দিক রয়েছে : সে নাসির চরিত্রটির মতো আদ্যন্ত অন্ধকারের বাসিন্দা নয়। তার হৃদয়ের অলিগলিতে বরাবরই রয়ে গেছে কিছু আলো-আঁধারি খেলা। যে কারণে মিনতিকে সে কিছুটা মানবতা দেখাতে পেরেছে, ছাত্রজীবনের কাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদ সুলতানাকে একান্তে কাছে পেয়েও ভোগের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি। যদিও জীবনে উন্নতি আর অর্থ-খ্যাতির অদম্য লিপ্সা তাকে শেষপর্যন্ত বিবেকহীন করে দিয়েছে । নাটকের শুরুতে রফিক দ্বৈতসত্তা দ্বারা পরিচালিত। রফিকের এই দ্বিমুখী চরিত্রের আভাস নাট্যকার তার পোশাক বর্ণনার মাধ্যমেই দিয়েছেন। তার বাইরেটা সাফারি স্যুটের আড়ালে ঢাকা থাকলেও সে কুর্তা-শেলোয়ারেই সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নাট্যকার এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> রফিকুল ইসলাম। বয়স পঁয়ত্রিশ। অবিবাহিত। ঠিকাদার মুৎসুদ্দি গোত্রীয় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী। ঘরে সে কুর্তা শেলোয়ার পরে, বাইরে সাফারি সুট। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫৫)

রফিকের অন্তর্জাগতিক দ্বিধা নাটকের শুরু থেকেই সুস্পষ্ট। নাটকের প্রথম অঙ্কে শাদাবেশধারী তার পরিচয় জানিয়ে বলেছে – রফিকের ব্যবসার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নেই। একদা-সহপাঠী সুলতানা-গাফফার দম্পতির ফ্ল্যাটে সে সাবলেট থাকে। তার মরহুম পিতার ইচ্ছানুযায়ী দুপুরে ভাতঘুমের ইচ্ছে ছিলনা তার, কেননা 'দুপুরে ঘুমায় শুধু শয়তান –' তবু কোনো অসাবধান মুহূর্তে সে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল। শাদাবেশধারীদের এ সংলাপে বোঝা যায় রফিক কখনো শয়তান হতে চায়নি। কিন্তু ইতিচেতনায় সে জেগে থাকলেও নেতির প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ শুভবোধকে লালন করতে চাইলেও বিদ্যমান অস্থির সমাজব্যবস্থা, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো তাকে মোহান্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এই অশুভ পরিস্থিতি তার মন তখনো পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না। ফলে এবসার্ড এই পরিস্থিতিতে সে অন্ধকার নয় আলোকেই আকাঙ্ক্ষা করছে :

> আজ শুক্রবার।

[১] মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, পৃ. ৮৭-৮৯

অন্ধকার, তবু ঘরে আলো নেই কেন ?

এভাবে এখন কেন তার কাছে মনে হয় সব কিছু ভীষণ ভঙ্গুর –

টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন, দরোজা, দেয়াল,

এমনকি ক্যালেন্ডারের দিনের তারিখ ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫৯)

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে রফিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা মুখে বললেও তার সহপাঠী সুলতানা সে-কথা মেনে নিতে পারেনি। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেশে যখন বিপ্লবের জোয়ার বইছে তখন রফিক সময়ের সাথে, পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বিপ্লবের বড় বড় বুলি আওড়ালেও সুলতানার কাছে 'ষোলো বছরের জানাশোনা' রফিকের রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতার প্রলাপ কপটতা মনে হয়েছে। রফিক যখনি তাকে বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে ছাত্রজীবনে রাজনীতি করার কথা বলেছে, তখনি সুলতানা সন্দেহ নিয়ে তাকে স্পষ্ট জানিয়েছে :

না, ছাত্রজীবনে তুমি রাজনীতি করেছো বলে তো

মনে পড়ছে না, আজকাল গোপনে করছো নাকি ?

টপ করে উচ্চারণ করলে 'বিপ্লব'। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০০)

সুলতানার এ-মন্তব্যে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, রাজনীতির এই ব্যবহার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপকৌশলমাত্র; যার সূচনা হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে, বিশেষত পঁচাত্তরের পরবর্তী পর্যায়ে। সেই স্রোতের জোয়ারেই ছাত্রজীবনে গা বাঁচিয়ে চলা রফিক হঠাৎ করেই রাজনীতি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এবং সে-প্রসঙ্গ টেনে নানান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছে সুলতানার সঙ্গে একান্ত আলাপেও। অথচ এই রফিক দেশের ক্রান্তিলগ্নে দেশের জন্য যুদ্ধ না করে পার্শ্ববর্তী দেশে সময় পার করেছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর ভোল পাল্টে বনে গেছে দেশপ্রেমিক। নেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে ব্যবসায়ী বন্ধু নাসিরের সহায়তায় হয়ে উঠেছে পাকা-পোক্ত আর্ন্তজাতিক ব্যবসায়ী।

নাটকার এর আগে তাঁর *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ের* পাইক চরিত্রটির মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন কীভাবে রাজাকার চরিত্রগুলি সময় ও পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলেমিশে দেশপ্রেমিক সেজেছে। তেমনি *এখানে এখন* নাটকের রফিক চরিত্রটির মাধ্যমেও তিনি দেখিয়েছেন, একসময়ের রাজনীতিবিমুখ মানুষও কীভাবে স্বার্থের তাড়নায় রাজনীতিতে সরব হয় ; একটা সময় স্বপ্ন দেখে বড় নেতা হয়ে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দেবার :

আমি দেখলাম
মানিকগঞ্জের কাছে কোনো এক মফঃস্বলে গেছি,
কিসের বক্তৃতা আছে, কোনো এক সম্মেলনে,
আমি যেন প্রধান অতিথি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬২-১৬৩)

রফিক চরিত্রটির আত্মিক দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে মূলত তার স্বপ্নদৃশ্যগুলোতে, কখনো কখনো পরাবাস্তবতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বেশধারী চরিত্রগুলির সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে। কিন্তু রফিক চরিত্রের অন্তর্গত স্বভাব সবথেকে বেশি প্রকাশিত হয়েছে 'কলগার্ল' মিনতির কাছে, যা সুলতানা কিংবা ব্যবসায়িক বন্ধু নাসিরের সঙ্গে হয়নি। প্রেমিকার সঙ্গে নয়, বন্ধুর সঙ্গে নয়, রফিককে তার হৃদয়ের অর্গল খুলে দিতে হচ্ছে এক সামান্য বারবনিতার কাছে। মানুষের নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে! নিজের দেখা অদ্ভুত স্বপ্নের মানে রফিক মিনতির কাছে জানতে চেয়েছে। তার অজানা ভীতি, নিদ্রাহীন ভয়ার্ত রজনীর রহস্য কেবল সে মিনতির কাছেই প্রকাশ করেছে :

বাস্তবের ভেতরে স্বপ্ন কতখানি প্রসারিত,
আর এই যে বাস্তব – কতটুকু স্বপ্নে তা প্রোথিত।
আসলে সমস্যা এই, স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে
কোনো স্পষ্ট সীমারেখা আছে কিনা ?
যদি তা থাকেই,
তাহলে ভয়ের কি আছে ? কেন চোখ দেখবে ঘাতক ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৭৬)

দ্বিতীয় অঙ্কে অনামা ব্যাক্তির সঙ্গে আলাপের পর চরম উদ্ভ্রান্ত মুহূর্তেও সে আশ্রয় খুঁজতে গেছে মিনতির কাছে। কোনোরকম ভোগের আগ্রহ প্রকাশ না করে বরং বন্ধুর মতো, আপনজনের মতো নিজের স্বপ্ন আর বাস্তবের সেই পুরোনো আলাপ তুলেছে তার সঙ্গে। আকুল কণ্ঠে আহবান জানিয়েছে : 'মিনতি মিনতি তুমি বাড়ি আছো? বাড়িতেই আছো ?' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২২) মিনতির কাছেই সে জানিয়েছে – মন তার দরকার নেই, দরকার নেই ভালবাসারও; বরং মনকে মাটিচাপা দিয়ে সে পোশাকি উন্নতি চায়। এই খ্যাতির পেছনে ছুটতে ছুটতে যাবতীয় ন্যায়বোধ যে সে ভাগাড়ে বিসর্জন দিয়েছে তা মিনতির কাছেই অবলীলায় প্রকাশ করেছে :

মন আমি গলা টিপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি ভাগাড়ে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২৩)

অবশ্য ততদিনে মিনতির অন্তরলালিত ভয় সত্যি হয়ে গেছে। সে তখন এসিড আক্রান্ত। রফিকের এই রূপান্তরসূত্রে সহজেই অনুমান করা যায়, গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতি কীভাবে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধ হরণ করে ধীরে ধীরে তাকে পশুতে পরিণত করে। *এখানে এখন* নাটক মূলত মূল্যবোধ হারানো সেই মানুষগুলোর বাস্তবচিত্র – যারা মানুষকে ব্যবহার করে নানা ভাবে, আর যাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় অন্যমানুষ। সমকালীন এই জীবনবাস্তবতা ধারণ করেই রফিক হয়ে উঠেছে এ নাটকের সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ উজ্জ্বল চরিত্র।

আধুনিক নাগরিক মানুষের একাকীত্ব, হতাশা, আত্মদ্বন্দ্ব কাব্যনাট্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়বস্ত। ব্যক্তিহৃদয়ের আত্মদ্বন্দ্ব সার্থক কাব্যরসে জারিত করে উপস্থাপন করাই কাব্যনাট্য রচনার প্রকৃষ্টতম কৌশল। *এখানে এখন* কাব্যনাটক সে বিবেচনায় চমৎকার ভাবে উৎরে গেছে। এখানে রফিকের মনোজগতে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ইতি-নেতিবোধের দ্বন্দ্ব চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে যেতে থাকা রফিক, দুর্নীতিতে তলিয়ে যেতে থাকা রফিক, মুসলিম হয়েও ইসলামের মূলনীতি থেকে সরে আসা রফিক, অর্থসম্পদের মোহে কাতর রফিক, প্রেমাস্পদকে ভালবেসে, তার পাশে থেকেও না পাওয়ার দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে রফিকের হৃদয়। আর এই দ্বন্দ্বই ধরা পড়েছে স্বপ্নে দেখা নানান দৃশ্যে, শাদা-কালো বেশধারী কিংবা অনামা ব্যক্তির সংলাপে। রফিক প্রতিনিয়ত এক অজানা আতঙ্কে জীবন কাটিয়েছে। তার হৃদয়ে আত্মদ্বন্দ্ব ছিল দেখেই সে শুরু থেকে ভয়ের সঙ্গে বাস করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যে সুলতানা ছিল তার আরাধ্য, তাকে কাছে পেয়েও সম্ভোগের চিন্তা করেনি সে, পতিতা মিনতির সঙ্গে যথেষ্ঠ সংবেদনশীলতার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করেছে। নাসির চরিত্র এই দ্বন্দ্বে ভোগেনি। তার কাঁটা প্রথম থেকেই নেতির দিকে হেলানো ছিল। শেষপর্যন্ত রফিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় নিজের অন্তর্গত পশুসত্তাকে পরাজিত করতে পারেনি। যার ফলে সে বন্ধু নাসিরকে টেক্কা দিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে আরবের প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে দিয়েছে, সুলতানার সঙ্গেও অসংযম আচরণ করেছে। তবুও পুরো নাটক জুড়ে তার আত্মদ্বন্দ্বই ক্রিয়াশীল থেকেছে।

সুলতানার আত্মদ্বন্দ্ব ও ক্ষরণ এ নাটকের অন্যতম আরেকটি দিক। প্রতিনিয়ত স্বামী গাফফারের অবহেলা তাকে কাঁটার মতো বিদ্ধ করেছে, তার নারীত্বের অহমকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সামাজিক চাপে পড়ে তাকে ছেড়ে যেতে না পারার কষ্ট, কিংবা সুলতানার ভাষায় 'বন্ধনে অভ্যস্ত হলে মুক্তির উদ্যম কমে যায়' তত্ত্বে স্বামীকে সহ্য করার দহনে ও মানসিক পীড়নে আলোচ্য কাব্যনাটকটি হয়ে উঠেছে রসঘন ।

সৈয়দ শামসুল হকের এ-কাব্যনাট্যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন, প্রথম অঙ্কে শাদাবেশধারীর একটি সংলাপে মানবচরিত্র সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে :

কে হায়, সভায় এসে নগ্ন হতে চায় ? (কাব্যনাট্যসমগ্র:১৫৯)

আলোচ্য সংলাপের সঙ্গে স্পষ্টতই সাযুজ্য লক্ষ করা যায় জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন কাব্যের 'হায় চিল' নামক কবিতার 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে !'[১] পঙ্‌ক্তির সঙ্গে। আবার, যুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলাদেশের বেহাল অবস্থা বোঝাতে তিনি জীবনানন্দের প্রিয় বেহুলা ও লখিন্দরের ভেলায় করে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যাত্রার (বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে/কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়–)[২] প্রত্নপ্রতিমা ব্যবহার করে লিখেছেন :

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের মতো এ বিশাল
মানচিত্রে নদীগুলো লাল রঙে এঁকে দিয়ে গেছে,
অথচ কোমল নীলে একদিন বোঝা যেত নদী;
উজ্জ্বল সবুজ রঙে সমতল পরিচিত ছিল,
এখন সেখানে কেউ ধূসরতা লেপে দিয়ে গেছে
এত মৃত্যু তারপর ভিন্নতর আরো মৃত্যু আছে ; [...]
জননী ও জন্মভূমি মরা গাঙে ভেলা ভাসিয়েছে,
অবেলায় সে ভেলায় তার কোটি ছেলে শুয়ে আছে।
শিয়রে জননী জাগে, লাশ ভেসে যায় ইতিহাসে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০০-২০১)

তবে কাব্যনাটকের মূলসুরে সৈয়দ শামসুল হক যেন অবচেতন সত্তায় ব্যবহার করেছেন জীবনান্দ দাশের *মহাপৃথিবী (১৯৪৪)* নামক কাব্যের 'আদিম দেবতারা' নামক কবিতার কয়েকটি পঙক্তিমালা। জীবনানন্দ দাশ বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় আধুনিক নাগরিক মানসের হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সংকটের চিত্রায়ণে অত্যন্ত

---

১ জীবনানন্দ দাশ, *বনলতাসেন*, 'হায় চিল', *কবিতাসমগ্র*, টুম্পা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১৩

২ জীবনানন্দ দাশ, *রূপসী বাংলা*, 'বাংলার মুখ আমি', *কবিতাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'ব্যবহার' শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন আলোচ্য কবিতায়। কবিতাটির কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ :

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিলো রূপ –
[...] স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছো;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।
[...] অবাক হ'য়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না –
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে – ব্যবহৃত – ব্যবহৃত – ব্যবহৃত – ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত – ব্যবহৃত–
[...] ব্যবহৃত – ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায় ?[১]

জীবনানন্দ দাশ এখানে ভালবাসার গাঢ়তার পরিবর্তে স্থূলহাতের পরিহাসমূলক পৌনঃপুনিক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন, যা নগরমানসের একধরনের বিকৃতিমাত্র। জীবনানন্দের এই বোধের সঙ্গে সৈয়দ শামুসুল হকের নাটকের মূল সুরের সাজুয্য পরিলক্ষিত হলেও আমাদের বিচারে সৈয়দ হকের ব্যবহার আরও বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত। সৈয়দ হক কেবল ব্যবহৃত যে হয় তার ছবি আঁকেননি, বরং ব্যবহর্তার ছবিও এঁকেছেন সমান দক্ষতায়। এবং বলাবাহুল্য *এখানে এখন* নাটকের ব্যবহার কেবল নারী আর তার ভালোবাসা প্রসঙ্গে আটকে থাকেনি, এই ব্যবহার সর্বত্র : নারী পুরুষের ওপর, পুরুষ নারীর ওপর, দুর্বল সবলের ওপর, জনগণ রাষ্ট্রের ওপর, রাষ্ট্র জনগণের ওপর। যে কারণে সৈয়দ শামসুল হক সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন :

এ কাহিনী আতংক অথবা প্রেমের ?
স্বাস্থ্যের ? অসুস্থতার ? এমনকি বলা যায়
তখনই তো বাধা থাকবে না বুঝে নিতে
যে কেবল রফিকের নয়

---

১ জীবনানন্দ দাশ, *মহাপৃথিবী*, 'আদিম দেবতারা', *কবিতাসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

অথবা এ কাহিনীটা আমাদের অনেকেরই কিনা ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫৯)

বস্তুত, 'সামাজিক জীবনের পটভূমিতে স্বার্থান্ধ, অধঃপতিত হাজারো মানুষের দু' একজনকে উপলক্ষ করে এ কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রতিদিনের জীবনের সংঘাত, জ্বালা যন্ত্রণা, এবং সামাজিক মানুষের ব্যাক্তি উপলব্ধি নিয়ে এ কাব্যনাট্য। [...] *এখানে এখন* কাব্যনাটক সমাজ সমস্যার আলোকে ব্যাক্তি মানুষের আত্মিক ব্যবচ্ছেদের নাটক। [...] স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে ক্রমশ ধনলিপ্সুতার কারণে যে শ্রেণি বেড়ে উঠেছে তারা, এবং তাদের দ্বারা ব্যবহৃত নর-নারীকে নিয়েই এ নাটক।'[১]

এখানে এখন নাটকটি দুটি বৃহৎ অঙ্কে বিভক্ত; এবং প্রচলিত গ্রিক নাটকের ফর্মের মতো কোনো দৃশ্যবিভাজন নেই। তবে নাটকের কাহিনির সূচনা- বিকাশ-পরিণতি রয়েছে ; যদিও এরিস্টটলের নাটকের রীতি অনুসারে নাটকের পঞ্চসূত্র এখানে অনুসরণ করা হয়নি। আবার, *এখানে এখন* নাটকে অসাধারণ কিছু নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন নাট্যকার। যেমন : মুখোশধারীদের আগমনমুহূর্ত, নাসিরকে প্রতীকী গোসল করানোর সময়, অনামা ব্যক্তির আগমনকাল, সুলতানার প্রতি রফিকের আকস্মিক মনোভাব বদল, রহস্যজনকভাবে মিনতির মুখ এসিডে ঝলসে যাওয়া প্রভৃতি। এগুলোর প্রত্যেকটি ঘটনাই দর্শককে টানটান উত্তেজনার মধ্যে ধরে রেখেছে। তবে নাটকের ফর্মে অভিনবত্ব থাকার কারণে এবং নাট্যঘটনা বর্ণনাধর্মী না হয়ে ইঙ্গিতপ্রধান হওয়ায় এ নাটকটি সর্বসাধারণের জন্য কিছুটা দুরূহ মনে হতে পারে। আমাদের বিবেচনায় বিদগ্ধজনের জন্য নির্মিত উচ্চমাগীর্য় নাটক বলা যেতে পারে একে। তবে *এখানে এখন* নাটকটির পুরো প্রেক্ষাপটই বর্তমান বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে। তাই *এখানে এখন* নামকরণটিও অত্যন্ত সার্থক, শিল্পসফল ও বাস্তবসম্মত হয়েছে।

এখানে এখন নাটকে নাট্যকার তাঁর পূর্বতন কাব্যনাটকদুটির তুলনায় বেশি মঞ্চনির্দেশ ব্যবহার করেছেন। *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*, কিংবা *নূরলদীনের সারাজীবনে* যেখানে তিনি খোলা মঞ্চ ব্যবহারের কথা বলে একান্তই টুকটাক কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলি প্রদান করে নাট্য-উপস্থাপনের জন্য পুরোটাই ছেড়ে দিয়েছেন নাট্য পরিচালকের উপর, সেখানে *এখানে এখন* নাটকে সুস্পষ্ট করে প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই মঞ্চনির্দেশনা সংযোজন করেছেন। এ নাটকটি তিনি খোলা মঞ্চ নয় বরং প্রচলিত তিনদিকে আবৃত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার কথা বলেছেন। নাটকের প্রারম্ভে নাটকের সেট কেমন হবে তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা তিনি 'মঞ্চনির্দেশ' অংশে

---

[১] মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০-৮১

সংযোজন করেছে। *এখানে এখন* নাটকটির ফরমেট পাশ্চাত্য-নাটকঘেষা। লেখক তাঁর প্রবাসজীবনকালে লন্ডন থিয়েটোরে নানান আঙ্গিকের নাটক দেখার অভিজ্ঞতা হয়ত এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছেন। সদ্য স্বাধীন দেশে নবগঠিত মঞ্চ ও মঞ্চকর্তারা কিছুটা পাশ্চত্যধাতের এ নাটকটির ফর্ম যেন ঠিকঠাক ধরতে পারে, সে কারণেই হয়তো লেখক এত গভীরে গিয়ে আলোচ্য নাটকের মঞ্চ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি নাটকে আলোর নান্দনিক ব্যবহার, শব্দের সুষম ব্যবহারের উপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি চরিত্রের প্রতিমুহূর্তের ক্রিয়াবলি, চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি পর্যন্ত নিখুঁতভাবে মঞ্চ নির্দেশনায় সংযোজন করেছেন। যেমন : প্রথম অংকে রফিকুল ইসলামের অভিব্যক্তি কেমন হবে তা জানিয়ে লিখেছেন :

> দূরে, বিছানায় রফিকুল ইসলাম হঠাৎ আর্তনাদ করে ঘুম ভেঙে উঠে বসে। খাটেই সে বসে থাকে। ভীত, সন্ত্রস্ত। মূর্তির মতো স্থির। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫৮)

এখানে এখন নাটকটির মঞ্চ-নির্দেশ দিয়েছেন কুশলী নাট্যপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন। প্রযোজনা সংস্থা ছিল *থিয়েটার* নাট্যগোষ্ঠী। মূলত সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* মঞ্চে এনে *থিয়েটার* নাট্যগোষ্ঠী সর্বমহলে দারুণ জনপ্রিয় এবং প্রশংসিত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহী হয়ে সৈয়দ শামসুল হকের আলোচ্য কাব্যনাটকটি মঞ্চে আনতে সচেষ্ট হয়। নাটকটির মূল ভাবনা প্রসঙ্গে নাটকটির প্রযোজক ও *থিয়েটার* নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার *থিয়েটার* পত্রিকার স্মরণিকায় নিম্নরূপ মন্তব্য করেছিলেন :

> বাংলাদেশ আজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী ব্যবহার করে আর অপর শ্রেণী ব্যবহৃত হয়। বস্তুত ব্যবহৃত মানুষরাই প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠী। কিন্তু আমরা কি এ কারণেই স্বাধীনতা এনেছিলাম ভিন্নদেশী ভিন্নভাষী ব্যবহর্তাকে সরিয়ে নিজেরাই তা হতে ? এ প্রশ্নকে দর্শক মনে আন্দোলিত করার জন্যেই এ নাটক।[১]

দীর্ঘ অনুশীলনের পর **১৯৮২** সালের ৩০ ডিস্মেবর বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মঞ্চে নাটকটির প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল। এ প্রদর্শনীতে দর্শকসংখ্যা ছিল প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো। এবং নাটকের টিকেটমূল্য ছিল আসনভেদে ত্রিশ ও পঞ্চাশ টাকা। তবে অনেক নাট্যবোদ্ধারা মনে করেন নাটকটির সময়ের চেয়ে অগ্রসর থিম এবং নাট্য পরিকল্পনার কারণে এ নাটকটি মঞ্চে ততটা সফল হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম মঞ্চায়নের পর **১৯৯৭**

---

১ রামেন্দু মজুমদার, 'থিয়েটার : পঁচিশ বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে', *থিয়েটার স্মরণিকা (১৯৭২-১৯৯৭)*, থিয়েটার প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ৪ (দ্রষ্টব্য : সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩)

সাল অব্দি নাটকটির মাত্র ২৮ টি উপস্থাপনা ঘটেছিল।[১] ফলে নাটকটিকে *থিয়েটার* নাট্যগোষ্ঠীর মতো জনপ্রিয় নাট্যগোষ্ঠীর এক প্রকার ব্যর্থতাই বলা যেতে পারে। যেটি পরবর্তীকালে নাটকটির প্রযোজক রামেন্দু মজুমদার এক সাক্ষাৎকারে স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :

> *এখানে এখন* ভিন্ন ধরনের কাব্যনাটক যা নাগরিক জীবনের নতুন দিক উন্মোচন করে। এ নাটকটি পড়ে আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। নাটকটির মধ্য দিয়ে আমরা ঠিক দর্শকদের সাধে কম্যুনিকেট করতে পারিনি। এটা হয়তো থিমের কারণে দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে গেছে বা আমাদেরও ব্যর্থতা হতে পারে যে, প্রযোজনায় দর্শকের কাছে সেটাকে আরো সহজ করে তুলতে পারিনি। কোনো-না- কোনো কারণে কম্যুনিকেশন হয়নি। যার ফলে যত বেশি অভিনয় হওয়া উচিত ছিল ততোটা হয়নি।[২]

তবে নাট্যজন আতাউর রহমান সৈয়দ শামসুল হকের *এখানে এখন* নাটকটিকে একটি সুলিখিত কাব্যনাটক বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে *এখানে এখন* নাটকটি আশানুরূপ মঞ্চসফল না হবার পশ্চাতে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের কোনো ব্যর্থতা নেই; বরং ব্যর্থতা যদি থেকে থাকে, তবে সেটি *থিয়েটার* নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায়, হতে পারে সেটি নির্দেশকের সীমাবদ্ধতা, কিংবা নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সু-অভিনয়ের ব্যর্থতা। এ প্রসঙ্গে এক আলোচনায় তিনি বলেন :

> *এখানে এখন* খুব সুলিখিত একটি নাটক; কিন্তু থিয়েটার-এ নাটকটি নির্দেশনায় হোক, অভিনয়ে হোক যে কোনোভাবে হয়তো অবহেলা, অবজ্ঞার কারণে ঠিকমতো হ্যাণ্ডেল করতে না পারার কারণে কোনো জায়গায় দাঁড়ায় নি কিন্তু নাটকটি রচনার মধ্যে একটি গুণ ছিল।[৩]

থিয়েটার প্রযোজিত এখানে এখন নাটকের প্রথমদিকে মঞ্চপরিবেশনায় দেশের বিশিষ্টজন অভিনেতা-অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন – মোহাম্মদ জাকারিয়া, তারিক আনাম খান, ফেরদৌসী মজুমদার, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রামেন্দু মজুমদার, খায়রুল আলম সবুজ, শাওন ইমতিয়াজ, সমর দেব, ঝুনা চৌধুরী, তোফা হাসান, আবরার মহম্মদ শাহীন, আসাদুজ্জামান নূর, ভাস্কর চক্রবর্তী, আবদুর রহিম দুলাল, জোবয়ের জার্সিস, হাফিজুর রহমান সুরুজ। এবং মঞ্চের পেছনে কলাকুশলী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন – নির্দেশনা : আবদুল্লাহ আল মামুন, মঞ্চ পরিকল্পনা, আলোক সম্পাত ও পোশাক পরিকল্পনা :

---

[১] সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

[২] দ্রষ্টব্য : সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

[৩] আতাউর রহমান, একান্ত সাক্ষাৎকার, (সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩)

তারিক আনাম খান, প্রযোজনা : রামেন্দু মজুমদার।[১] *থিয়েটার* প্রযোজিত *এখানে এখন* নাটক বাস্তবে মঞ্চে দেখার অভিজ্ঞতা নাট্যজন শফি আহমেদ এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এ নাটকটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন :

> *এখানে এখন* বেশ সাহসী প্রযোজনা। এতে নাটকীয়তা ছিল না, দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা ছিল না। তবে সংলাপ খুব ভালো ছিল। এ নাটকে আবদুল কাদের ভালো অভিনয় করেছিলেন। নাটকটি *থিয়েটার* হ্যাণ্ডেল করতে পারেনি। যেভাবে সংলাপগুলো একর পর এক এসেছে তাতে সম্ভাবনাও ছিলন না।[২]

এখানে এখন কাব্যনাটকটি মূলত লেখকের আশির দশকের বিখ্যাত উপন্যাস *কালধর্ম* (১৯৮৯)-এর কাব্যনাট্যরূপ। আর, যেকারণে উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের চরিত্রের নাম, মূলকাহিনি এমনকি লেখনীপ্যার্টান অনেক কিছুতেই সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উপন্যাসের আঙ্গিক অনেক বেশি বিস্তৃত হবার কারণে সেখানে ডিটেইলসে সবকিছু বর্ণনা কারর সুযোগ পেয়েছেন লেখক। অপরদিকে, কাব্যনাট্যকে অনেককিছুই ইঙ্গিত, সংকেত কিংবা রূপকী অর্থে প্রকাশিত হয়েছে । যারা লেখকের উভয় রচনার মনোযোগী পাঠক তারা লেখকের এই প্রচেষ্টা সহজেই ধরতে পারবেন। কিন্তু উভয় রচনার ঘটনায় খুব বেশি পার্থক্য না থাকায় পাঠকের কাছে এক রচনাশৈলীর চমক অনুধাবন ভিন্ন একঘেয়ে অনুভূত হবার যথেষ্ট সুযোগ থেকে যায়। অবশ্য নাটকে যে কথা প রিষ্কার উল্লেখ নেই সেটির বিস্তারিত জানার জন্য, চরিত্রের মনোকথন, উত্থান, পতন, কার্যকারণের প্রাক-ইতিহাস বিস্তারিত জানতে উপন্যাসটি প্রভুত সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *এখানে এখন* নাটকের অন্তে আরবের কাজের কন্ট্রাক শেষপর্যন্ত কে পেল তা পরিস্কার করে বলা নেই। অনামা ব্যাক্তির সঙ্গে রফিকের আলাপে কেবল উল্লেখ আছে নানান অপকৌশল প্রয়োগ করলে রফিক কাজটি পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু উপন্যাসে সুস্পষ্ট করে লেখক বর্ননা করেছেন কাজটি রফিক পেয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উপন্যাসের কিছু এলাকা উপস্থাপন করা হল :

> আহ, রফিকুল ইসলাম, [...] তুমি কি মনে করেছ ব্যবসা তোমার হাতে ইতোমধ্যেই এসে গেছে, আর সেই জয়ের আনন্দে সুলতানাকে এখন তোমার অংশীদার করে নেওয়া দরকার ?[৩]

---

১ দ্রষ্টব্যঃ সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫

২ শফি আহমেদ, একান্ত সাক্ষাৎকার, (দ্রষ্টব্য : সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪)

৩ সৈয়দ শামসুল হক, *কালধর্ম*, *উপন্যাসসমগ্র*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ.২৯২

আবার, গাফফারের সঙ্গে সুলতানার তালাক হতে পারে নাটকে এমন একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার। এবং দেখিয়েছেন সে তালাক হবার আগেই মদ্যপ রফিক সুলতানাকে ভোগ করার চেষ্ঠা করেছে। কিন্তু উপন্যাসে বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন গাফফারকে সুলতানা তালাক দেয়ায় সে ফ্লাট ছেড়ে গেছে। রফিককে সুলতানা চলে যেতে বলায় সেও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ফলে ফ্লাটে সুলতানা একা। এমনসময়ে মদ্যপ অবস্থায় রফিক তাকে ভোগ করতে চায়। কিন্তু তালাকের নিয়মানুসারে ইদ্দতপালনের আগে একনিষ্ঠ পবিত্র সুলতানা কোনোক্রমেই রফিক কতৃর্ক ব্যবহৃত হতে চায় না। উপন্যাসে নাট্যকার এ বিষয়গুলি পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন :

> তালাক হয়ে যাবার পর গাফফার এ ফ্লাট ছেড়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে রফিকুল ইসলামও। সুলতানা বলেছে, তার ইদ্দত পুরো না হওয়া পর্যন্ত রফিকুল ইসলাম যেন এ ফ্ল্যাটে বাস না করে।[১]

কাব্যনাটক *এখানে এখন* এবং উপন্যাস *কালধর্মের* কাহিনি, চরিত্র ও উপস্থাপনের পাশাপাশি এ দুটি রচনার ভাষাগত মিলও উল্লেখযোগ্য। যেমন কাব্যনাটকের শুরুতে শাদাবেশধারীদের সংলাপে লেখক গল্প এগিয়ে নিয়ে গেছেন নিম্নোক্তভাবে :

> আমরা এখন এই কাহিনীর অত্যন্ত গভীরে
> যেতে চাই। কাহিনী খোলশ মাত্র, সে খোলশ ছিঁড়ে
> ভেতরের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। যদি
> তা সম্ভব হয় – আমাদের শংকা হয়, প্রবল চেষ্টাও
> হয়ত বা ব্যর্থ হবে – (কাব্যনাট্যসমগ্রঃ ১৫৯)

অন্যদিকে, *কালধর্ম* উপন্যাসের সূচনাতে লেখক সৈয়দ শামসুল হক লেখকের সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন :

> আমরা এখন এই কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করতে চাই, কাহিনী বস্তুত একাট খোলশ মাত্র, আমরা সেই খোলশ ছিঁড়ে ভেতরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই ; যদি তা সম্ভব হয় – ব্যক্তিগতভাবে আমি আশংঙ্কা করি, আমাদের প্রবলতম চেষ্টাও ব্যর্থ হবে –[২]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

আবার, উপন্যাসটি শেষ করেছেন লেখক কিছু জিজ্ঞাসার মাধ্যমে। যে প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য তিনি পাঠককে উপন্যাসের সঙ্গে একইসূত্রে গেঁথে ফেলেছেন। পাঠক এই প্রশ্নগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। যেমন :

> আমরাই কি শেষপর্যন্ত জানতে পারি যে এ কাহিনী প্রেমের অথবা আতঙ্কের, স্বাস্থ্যের অথবা অসুস্থতার ? ব্যক্তি বিশেষের অথবা সকলের ?[১]

কাব্যনাটকে আমরা শাদাবেশধারীদের সংলাপে নাটকের প্রারম্ভেই এই প্রশ্নগুলো জানতে পারি। এখানে লেখক নাটকের শুরুতেই এই প্রশ্নগুলো করে দর্শককে একধরণের কৌতূহলে বেঁধে রেখে নাটকে মনোনিবেশী করে তুলেছেন, উপন্যানের সমাপ্তিতে তিনি যেটি অন্যত্র করেছেন। শাদাবেশধারীদের সংলাপে এই প্রশ্নগুলো উপস্থাপিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

[...] এ কাহিনী আতংকের অথবা প্রেমের ?
স্বাস্থ্যের ? অসুস্থতার ? এমনকি বলা যায়
তখনই তো বাঁধা থাকবে না বুঝে নিতে
যে কেবল রফিকের নয়
এ কাহিনী আমাদের অনেকেরই কিনা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৫৯)

সৈয়দ হকের অন্যান্য নাটকের ভাষাশৈলীর মতো এ নাটকের সংলাপ ও ভাষাবিন্যাসে অসাধারণ কবিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য একজন সফল কবির রচিত নাটকের ভাষা যে এমন হবে, সেটিই স্বাভাবিক। আবার, এ নাটকের প্রেক্ষাপট যেহেতু শহুরে, সে-কারণে নাট্যসংলাপ রচিত হয়েছে প্রমিত উচ্চারণে, তবে চরিত্রের মুখের সংলাপ যেন কৃত্রিম না হয়ে পড়ে, সেদিকে লক্ষ রেখে সংলাপের মধ্যে কথ্য ঢং ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। নাসিরের বিভিন্ন সংলাপে সেটি সুস্পষ্ট। যেমন :

> তুমি তো সেয়ানা পোলা, কথাটা কি মিছামিছি কবে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৩)

আবার, বিভিন্ন স্থানের নাম কিংবা নির্দিষ্ট বিষয়কে সরাসরি না লিখে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য অথবা রূপকাধারে প্রকাশ করে তা আরও মাধুর্যমণ্ডিত ও রহস্যময় করে তুলেছেন। যেমন বারবনিতার সঙ্গে সঙ্গমকে বলেছেন

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

‘মহাদেশ বিজয়’, আরব্য টাকার টেন্ডার পাওয়াকে লিখেছেন ‘আরবি ঘোড়ার বাজিমাত’, আরব্যদেশের নাম সরাসরি না লিখে লিখেছেন ‘পেট্রো-ডিজেলের দেশ’, মতিঝিলকে লিখেছেন ‘বাণিজ্যিক এলাকা’ (বাণিজ্যিক এলাকার কোলে স্টেডিয়াম) ফুটবল খেলাকে লিখেছেন ‘ চামড়ার বল নিয়ে বাইশ জনের /মার-লাথি মার-ছুট ড্রিবল ফাউল পাস’ ইত্যাদি।

নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *এখানে এখন* কাব্যনাটকের চরিত্রগুলোর সংলাপে বিদেশি শব্দ বিশেষত, ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত সচেতনভাবে করেছেন, যাতে ভাষিক দিক দিয়েও তৎকালীন সমাজ-রাষ্ট্রের পরিস্থিতি অনায়াসেই বোঝা যায়; যেমন উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী নাসিরের একটি সংলাপে একদিকে যেমন সমাজে বিদ্যমান উচ্চবিত্তশ্রেণির ভোগ-বিলাসিতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি এই চিত্রের বাস্তবরূপ দিতে নাট্যকার মিশ্রভাষার সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। সংলাপে স্বাভাবিকতা আনয়নের প্রয়োজনে তিনি অনেক শব্দের কথ্য উচ্চারণ-রূপ বজায় রেখেছেন সচেতনভাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্লাসকে বলেছেন ‘গেলাশ’। আলোচ্য নাটকের প্রাসঙ্গিক এলাকা উল্লেখ করা যেতে পারে :

> জলদি গেলাশ নিয়ে এসো। সোডা আছে? নেই? থাক।
> পানিতেই চলে যাবে। বরফ তো আছে?
> চমৎকার বাড়িটি তোমার, দোস্ত; বিলকুল ফাঁকা;
> সারারাত জোর হল্লা হবে। যদি চাও
> মহাদেশে তুমি আগে যাবে, ইটস এ ফেয়ার ডিল,
> ব্যাচেলর আগে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৪)

অপরদিকে, অনামা ব্যক্তি রফিকের সঙ্গে আরবদেশের টাকায় পাওয়া কাজের টেন্ডার নিয়ে আলাপ করার সময় আরবি ভাষার শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে :

> আহলান, সাহলান – আরবিতে স্বাগতম। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২১)

কাব্যনাট্যের অনেক স্থানে নিম্নশ্রেণির মুখের ভাষা প্রয়োগ করে তিনি বুঝিয়েছেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে নবরাষ্ট্র বাংলাদেশে হঠাৎ করেই ফুলে-ফেঁপে ওঠা ধনিক শ্রেণি অর্থ অর্জন করেছে বটে, কিন্তু রুচিমান হয়নি। তারা নারীকে বলছে ‘মাল’, কন্ট্রাক্ট পাওয়াকে বলছে ‘দাঁও মারা’, আবার ইতর শব্দ ‘মাইরি’, ‘শালা’ প্রভৃতি বলতেও দ্বিধা করছে না। যেমন, রফিকের রেল বিষয়ক স্বপ্নের ভিন্ন অর্থ করে নাসির উতলা হয়ে তাকে বলছে :

বন্ধু হলে অবশ্যই তুমি

আমাকে বলতে, মিয়া, ব্যাবসাটা কত বড় ? কোন

দেশ মাল দিচ্ছে? ডলার না দিরহাম ? কবে রেল

বসবে সেখানে ? বড় দাঁও মেরেছো, মাইরি দোস্ত,

জিন্দাবাদ তুমি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬৫)

আলোচ্য কাব্যনাটকের প্রেক্ষাপট শহুরে হওয়ায় এর ভাষা যেমন আঞ্চলিকতার্বজিত, ঠিক তেমনি পূর্বতন নাটকগুলির মতো অজস্র উপমা অলংকার ব্যবহার করেননি লেখক। তবু গদ্যকবিতার ঢঙে লেখা সংলাপে যেটুকু অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন, নান্দনিকতার বিচারে তা শিল্পোত্তীর্ণ ও সফল। নিম্নে এমন কিছু উপমা, রূপক, অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হল :

উপমা :

১. সংজ্ঞাগুলো মানবিক ঘুঙুরের মতো

যার পায়ে থাকে তারই নর্তনের তালে তালে রুনু ঝুনু বাজে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২১৪)

২. একটি মানুষ – আমি তাকে প্রায় প্রতিদিন টের পাই খুব কাছে আছে ;

যেমন গাছের গায়ে ঘ্রাণ পাওয়া যায়, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৭৪)

উৎপ্রেক্ষা :

১. হঠাৎ বাতাসে নদী যেভাবে কুঁচকে যায়, স্তব্ধতাও যেন

ঠিক সেই ভাবে তখন কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৬০)

২. কণ্ঠে তার পরিহাস ছিল,

যেন পাতলা ছুরি দিয়ে বাজারে কসাই

মাংসের গোলাপি মেদ পরীক্ষা করছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৭৮)

৩. যখন সে কাছে টানে

নিতান্তই প্রয়োজনে তার – নির্মম, সংক্ষিপ্ত দ্রুত –

তারপর ছুঁড়ে ফ্যালে, যেন নষ্ট জামা তার বউ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৬)

রূপক :

নিজের দ্বিতীয় সত্তা নির্বিবাদে থাকে

নিজেরই ভেতরে,

বস্তি ও দালানগুলো পাশাপাশি থাকে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২০৪) [

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কিংবা *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকের গ্রামীণ প্রেক্ষাপট কাটিয়ে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক *এখানে এখন* নাটকে পুরোপুরি নাগরিক লেখক। যে-কারণে রূপক, উৎপ্রেক্ষা, উপমায় বাস্তবে দেখা নাগরিক অনুষঙ্গ কিংবা বাস্তবতা যুক্ত করেছেন তিনি। ঢাকা শহরের দালান ও বস্তির সমান্তরাল অবস্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং নির্মম বাস্তবতা। আমেরিকার প্রাক্তন ফার্স্টলেডি হিলারি বিল ক্লিনটনকেও যা বিস্মিত করেছিল । এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *লিভিং হিস্ট্রি* (২০০৩) গ্রন্থে লিখেছেন :

> বাংলাদেশ হলো এই ধরণীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সম্পদ ও দারিদ্র্যের উলঙ্গতম চিত্র আমি দেখেছি। ঢাকার হোটেল রুমের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, একটি বাঁশের বেড়া চলে গেছে, যার একদিকে রয়েছে ঝুপড়ি আর আবর্জনার স্তূপ, আর আরেকদিকে রয়েছে সুইমিংপুল ও ক্যাবানা যেখানে আমার মতো অতিথিরা – পানীয় উপভোগ করতে পারে ও সাঁতার কাটতে পারে। এটা যেনো পৃথিবীর অর্থনীতির ঠিক দুইপ্রান্তকে একসাথে দেখা যেখানে এসে তারা মিশে গেছে[১]

চিত্রকল্প :

১. প্রায় প্রতি পূর্ণিমার রাতে
নিজেকেই দেখতে পেতাম ঘন নীল কি সুন্দর শাড়ি পরে
মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি কতদূর দিগন্তের দিকে,
হাঁটছি না ভেসে যাচ্ছি সবুজ ঘাসের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৭২)

২. আমার এ আঙুলের ফাঁক দিয়ে বড় দ্রুতবেগে
দৃশ্যের অতীত আর দৃশ্যমান যাবতীয় অবিরল ঝরে যাচ্ছে, যায়,
কি শীতল হয়ে যাচ্ছে, নিভে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, যায়
পৃথিবীর সমস্ত আগুন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৮৩)

৩. বড় দীর্ঘ সেই সাঁকো দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমি তার পরে লম্বমান,
চারিদিকে নীল, তীব্র বিষ নীল

---

[১] হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন, *লিভিং হিস্ট্রি*, অনুবাদ : জাকারিয়া স্বপন, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৯৯

গলগল অবিরল গড়িয়ে পড়ছে,

পড়ছে,পড়ছে

শুধু পতন পতন। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ২০৪)

প্রবাদ/ প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১. বন্ধনে অভ্যস্ত হলে উদ্যমের ধার ক্ষয়ে যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ১৯৬

২. জানেন তো কাতলের হা ছোট হয় না কখনো। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ২১৯)

৩. পুণ্যবান ছোঁয়ালেই পা চন্দন হয়ে যায় কাদা ;

পবিত্রের স্পর্শে সব হয়ে যায় অমল উত্তল। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ১৮৬)

এখানে এখন কাব্যনাটকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের বিপযর্স্ত সমাজ আর বিপন্ন মানবিক মূল্যবোধের অবিকল ছবি এঁকেছেন নাট্যকার। নাটকের নামকরণ থেকেই অনুধাবন করা যায় – সমকালকে ধরার তীব্র ইচ্ছা তাঁর ছিল। আর তাকে বাস্তবিক করে উপস্থাপন করার নিমিত্তে আশ্রয় নিয়েছেন নিরীক্ষাধর্মী নাট্য-প্রকৌশলের। সবমিলিয়ে সৈয়দ হকের *এখানে এখন* কাব্যনাটকটি হয়ে উঠেছে যুদ্ধপরবর্তী সমাজব্যবস্থার শিল্পিত দলিল।

গণনায়ক

উইলিয়াম শেকস্‌পিয়রের *জুলিয়াস সিজার* নাটকের ছায়াবলম্বনে রচিত *গণনায়ক* নাটকটি শিল্পবিচারে সৈয়দ হকের অন্যতম নান্দনিক সৃষ্টিকর্ম। *জুলিয়াস সিজার* নাটকটি মূলত ট্রাজেডি নাটক; যেখানে বিপুল মানুষের সমর্থন, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সত্ত্বেও প্রশাসনের কতিপয় দুস্কৃতকারী, ক্ষমতালোভী সিনেটরদের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয় রাষ্ট্রপ্রধান জুলিয়াস সিজারকে। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক রচিত *গণনায়কে* উপস্থাপিত হয়েছে শেকসপিয়রের নাটকের অনুরূপ চরিত্র রাষ্ট্রপ্রধান ওসমানের করুণ মৃত্যু। একটি সার্থক এবং বহুল পরিচিত ট্রাজেডি নাটককে আধুনিক কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্যে রূপান্তর করতে স্বভাবতই নাট্যকারকে কিছু বিন্যাসগত পরিবর্তন, পরিমার্জন করতে হয়েছে। যেমন : শেকস্‌পিয়রের নাটকটি পঞ্চাঙ্কের; যেখানে প্রথম চারটি অঙ্কে তিনটি করে দৃশ্য রয়েছে, এবং শেষ অঙ্কে চারটি দৃশ্য বিদ্যমান। অপরদিকে *গণনায়ক* নাটকে নাট্যকার পঞ্চাঙ্কের মূল সংগঠন ঠিক রাখলেও দৃশ্যবিভাজনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন।

বস্তুত ভিনদেশি কাহিনিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ঢেলে সাজিয়ে, ট্রাজেডি নাটকের ফর্ম ভেঙে, চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে সৈয়দ হক একটি মৌলিক নাটকই রচনা করেছেন। নাট্যকার অবশ্য নাটকে শেকস্‌পিয়রের প্রভাব সবসময় স্বীকার করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> অনুবাদ কী রকম আমি তোমাকে বলি, একজন মেকানিক যখন একটি ঘড়ির সব যন্ত্রপাতি খুলে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখে, পরে আবার তা জোড়া দিয়ে একটি ঘড়ি তৈরি করে, অনুবাদ ঠিক তাই। একটা লেখার যন্ত্রাংশ সব খুলে সাজিয়ে রাখতে হয়, পরে আবার তা জোড়া দিয়ে একটি লেখা তৈরি করতে হয় অনুবাদের মাধ্যমে। এটা করতে গিয়ে আই লার্নট এ লট এবাউট টেকনিক, অব প্রেজেন্টিং [...] অল স্টেজ। তিনি তো চার শ’ বছর আগে গত হয়েছেন, মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন, কিন্তু আমার শিক্ষক হিসেবে আমার কাঁধের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। কাজেই সেটার প্রভাব পড়ল।[১]

জুলিয়াস সিজার এবং *গণনায়ক* নাটকের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সৈয়দ শামসুল হকের রচনার নতুনত্ব, অভিনবত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, নিম্নে উইলিয়াম শেকসপিয়রের *জুলিয়াস সিজার* এবং সৈয়দ শামসুল হকের *গণনায়ক* নাটকের তুলনামূলক একটি আলোচনা উপস্থাপনের মাধ্যমে উভয় রচনার মৌলপার্থক্য, চরিত্রায়ণ কৌশল, প্লট, আঙ্গিকগত পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো[২]:

জুলিয়াস সিজারের প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যটি আবর্তিত হয়েছে ফ্লোরিয়াস ও মেরুলাস নামক দুজন নগরপাল এবং বিভিন্ন পেশার কয়েকজন শ্রমজীবী নাগরিককে নিয়ে। অন্যদিকে *গণনায়কের* প্রথম দৃশ্যে পাত্রপাত্রী দুজন – স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দার ও তথ্যমন্ত্রী মির্জা। এখানে অবশ্য উল্লসিত জনতার উপস্থিতি আছে, কিন্তু সেটি জুলিয়াস সিজার নাটকের শ্রমী চরিত্রগুলোর মতো সক্রিয় অংশগ্রহণকারী নয়। অর্থাৎ *জুলিয়াস সিজারে* চরিত্রগুলো অন্যচরিত্রের সঙ্গে যেখানে সরাসরি কথোপকথনে অংশগ্রহণ করেছে, *গণনায়কে* সেখানে জনতার কর্মকাণ্ড উপস্থাপিত হয়েছে তথ্যমন্ত্রী মির্জা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দারের আক্ষেপ-মিশ্রিত কথোপকথনে। স্থানের ক্ষেত্রেও দুটি নাটকে পার্থক্য রয়েছে এখানে। *জুলিয়াস সিজারের* প্রথম দৃশ্যের ঘটনাস্থান রোম নগরীর একটি

---

১ সৈয়দ শামসুল হকের সাক্ষাৎকার : *আমাদের কবিতা বিশ্বমানসম্পন্ন*, সংবাদ সাময়িকী, *দৈনিক সংবাদ*, বৃহস্পতিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১৮

২ আলোচনার সুবিধার্থে শেকস্‌পিয়রের মূলনাটকের ইংরেজিভাষ্যের চেয়ে অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে বেশি। দু একটি স্থানে আবশ্যকীয় বিচারে ইংরেজি ভাষ্যের স্বরূপও উপস্থাপন করা হয়েছে গবেষণার সুবিধার্থে।

রাজপথ। অন্যদিকে *গণনায়ক* নাটকের প্রথম দৃশ্যের স্থান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দারের দপ্তর ও একটি জানালা যেখান দিয়ে জনতা দেখা যায়। তবে বিষয়বস্তুর বিবেচনায় দুটি দৃশ্যের বিষয় একই। লুপারক্যাস (রোমান নববর্ষ) উৎসবের দিনে শত শত জনতা ছুটে এসেছে সিজারকে এক নজর দেখার আশায়, আর *গণনায়কে* 'বাংলার মুক্তি দিবসে' হাজারো জনতা ছুটে এসেছে দেশবন্ধু ওসমানের গলায় মালা পরাতে। কিন্তু উভয় দৃশ্যেই রাজকর্মকর্তাদের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস সুস্পষ্ট।

জুলিয়াস সিজার নাটকে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনাস্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে রোমের একটি খেলার মাঠ বা আমোদ- প্রমোদের জন্য খোলা উন্মুক্ত স্থান, যেখানে একটি মঞ্চ রয়েছে। কিন্তু *গণনায়কে* নাট্যকার ঘটনাটি আরও রসঘন করে তুলতে স্থান হিসেবে ব্যবহার করেছেন সরাসরি রাষ্ট্রপতি ওসমানের বাসভবনের বিশ্রাম-কক্ষকে ; যেখানে আগে থেকেই বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহ। এ দৃশ্যের অনেকগুলো সংলাপেই লক্ষ করলে দেখা যায়, *গণনায়ক* এবং *জুলিয়স সিজারে*র হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন *জুলিয়াস সিজারে* ব্রুটাসকে দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান সিজারের বিরুদ্ধে উসকে দেয়ার চেষ্টা করছে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী কেসিয়াস। তেমনি *গণনায়ক* নাটকে প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনকে দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রসঙ্গ তুলে রাষ্ট্রপতি ওসমানের বিরুদ্ধে সুকৌশলে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহ। *জুলিয়াস সিজার* নাটকে ব্রুটাসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে কেসিয়াসের উচ্চারণ :

> কেসিয়াস। তাহলে, বন্ধু ব্রুটাস, শোনো –
> যেহেতু তুমি নিজেকে দেখতে পাও না।
> দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রতিচ্ছবির মতো স্পষ্ট করে,
> আমিই হব তোমার দর্পণ,
> দেখাব তোমাকে, যা তুমি দেখতে পাও না।
> কিন্তু, আমার প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ো না যেন।
> আমি যদি বোকার মতো হাসতাম,
> অথবা নতুন নতুন বন্ধুর কাছে প্রতিদিন
> প্রণয়-শপথ উচ্চারণ করতাম,
> অথবা, গাঢ় বন্ধুত্বের পরেও রটাতাম কুৎসা তাদের নামে
> অথবা, যাকে তাকে নেমন্তন্ন করে খানাপিনা

গালগল্প করতাম।

তাহলে ভাবতে পারতে, এ লোকটা কত না বিপজ্জনক ! (জুলিয়াস সীজার, পৃ. ১৫)[১]

অন্যদিকে *গণনায়ক* নাটকে প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহর আত্মপক্ষ সমর্থন করে দেয়া বক্তব্য :

সানাউল্লাহ : শুনুন তবে,
নিজেই যখন জানেন যে বিস্মিত না হলে নিজেকে
আপনি ঠিক দেখতে পান না, তাই আমি আপনার আয়না,
ফুটিয়ে তুলবো অবিকৃত আপনারই স্বরূপ, যা এখনো
আপনার অগোচরে। সন্দেহ করবেন না আমাকে।
হতাম যদি কোনো পত্রিকার ভাড়াটে লেখক, কিংবা
সংসদের এমন সদস্য যিনি নির্বাচনের আগে
যে দলের নৌকো উদ্দাম তাতেই গিয়ে চড়ে বসেছেন,
অথবা এমন কেউ যিনি বন্ধুত্বে মুখর, কিন্তু
পুলিশকে গোপনে তথ্য যোগাত সর্বাগ্রে, সংক্ষেপে
যদি আমাকে দেখে থাকেন এ সব ভণ্ডপীরের দঙ্গলে,
তাহলে, কেবল তাহলেই, বিষময় আমার সঙ্গ,
এই সিদ্ধান্ত করবেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৩৯)

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, উপর্যুক্ত দুটি সংলাপে বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও সৈয়দ শামসুল হক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। কেসিয়াস নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে যেসব দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন, তা নিছকই কেবল ব্যক্তি মানুষের অন্তর্গত দ্বিমুখী চরিত্রের প্রকাশক। অন্যদিকে, সৈয়দ হক *গণনায়ক* নাটকে সানাউল্লার সংলাপের মাধ্যমে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিনষ্টির চিত্র চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর লিখিত একটি মাত্র সংলাপে দলকানা সাংবাদিক, স্বার্থান্ধ, নীতিহীন সাংসদ, বন্ধুর ছদ্মবেশে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর

---

[১] এ আলোচনায় *জুলিয়াস সিজার* নাটকের সকল বঙ্গানুবাদ চয়ন করা হয়েয়ে ড. মফিজ চৌধুরী অনূদিত, *উইলিয়াম শেকস্ পীয়রের জুলিয়াস সীজার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৩, গ্রন্থ থেকে।

কিংবা ধর্মকে ব্যবসা বানিয়ে যে-সকল পির সমাজে পসার সাজিয়ে বসে – তারা সকলেই একই কাতারে চলে এসেছে। বলা যায় সৈয়দ শামসুল হক রাজনৈতিক-পরীক্ষামূলক কাব্যনাটকের মান বজায় রেখেছেন।

সৈয়দ শামসুল হক যেহেতু শেকস্‌পিয়রের ক্লাসিক ট্রাজেডির আদলে রাজনৈতিক কাব্যনাটক লিখেছেন, তাই চরিত্র ও সংক্ষিপ্ত সংলাপের সংক্ষেপের রচনাকে আরও বেশি বস্তুনিষ্ঠ ও সংহত করে তুলেছেন, এবং সঙ্গত কারণেই শেকস্‌পিয়রকর্তৃক ব্যবহৃত উপমা-অলঙ্কার কিংবা ইতিহাসের ঘটনা এদেশের প্রেক্ষাপটে ঢেলে সাজিয়েছেন। যেমন, সিজার ও ক্যাসিয়াসের শৈশব-কৈশোর বর্ণনা করতে গিয়ে শেকস্‌পিয়র ঝড়ের দিনে টাইবার নদীতে নিছকই দুই বন্ধুর কৌতূহলবশত ঝাঁপিয়ে পড়া, তীব্রস্রোতে ভেসে যাবার মুহূর্তে ক্যাসিয়াসকর্তৃক সিজারকে বাঁচানোর ঘটনায় হোমারের *ইলিয়ড*ের চরিত্র – ট্রয় নগরীর বৃদ্ধ এঙ্কিসেস ও রোম নগরীর পূর্বপুরুষ ইনিয়াসের তুলনা করেছেন। একই ঘটনা বর্ণনা করতে সৈয়দ শামসুল হক বেছে নিয়েছেন এদেশের মেঘনা নদী ও বৈশাখী- ঘূর্ণিঝড়কে। গ্রিক মিথোলজির উদাহরণের স্থানে তিনি ব্যবহার করেছেন ভারতীয় মুঘল ইতিহাসের রাজ্যহারা বাদশা হুমায়ুন এবং তাকে বিপদ থেকে রক্ষাকারী ভিস্তিওয়ালার ঐতিহাসিক ঘটনা। অর্থাৎ সবকিছুই তিনি এদেশীয় প্রেক্ষাপটে ঢেলে সাজিয়েছেন।

জুলিয়াস সিজার নাটকের সিনেটর সিসেরো হলেন *গণনায়ক* নাটকের প্রবীণ কৃষক-নেতা কাশেম আলী। এবং ক্যাস্কা চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছেন তথ্যমন্ত্রী মির্জা। ক্যাস্কার জবানিতে যেমন জানা যায় সিজার অতিরিক্ত জনস্রোতের চাপে অসুস্থ হয়ে মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়, ঠিক তেমনি তথ্যমন্ত্রী মির্জা এসে জানান, অতিরিক্ত গণজোয়ারে ওসমান তার পুরোনো পাকস্থলীর ক্ষতের ব্যথায় অস্থির হয়ে গেছেন। উল্লেখ যে, বঙ্গবন্ধুর ছায়া নির্মাণ করতেই হয়তো লেখক মৃগীরোগের স্থানে পেটের পীড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, বঙ্গবন্ধু দীর্ঘকাল পেটের অসুখে ভুগেছেন।

জুলিয়াস সিজারে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটি সংঘটিত হয়েছে রোমের রাজপথে। অন্যদিকে *গণনায়কে* এ দৃশ্য সংঘটনের স্থান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহর বাড়ি। তবে দুটি নাটকের মঞ্চনির্দেশে শব্দ ও আলোর ব্যবহার একই; রাত্রিকাল এবং বজ্রবিদ্যুতের শব্দসংবলিত ঝড়ের আবহ। এটি মূলত একটি প্রতীকী ব্যবহার। আসন্নবিপদ বা ট্রাজিক পরিণতি সম্পর্কে দর্শককে আগাম পূর্বাভাস দেওয়া এবং গভীর ষড়যন্ত্রের মুহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে সৈয়দ শামসুল হক শেকস্‌পিয়রের মতোই বজ্রনিনাদিত আলো ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহ প্রয়োগ করেছেন। তবে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া ও তার পেছনে দেবতাদের ভূমিকা নিয়ে কেসিয়াস-ক্যাস্কার পারস্পরিক আলাপ সৈয়দ

শামসুল হক বাহুল্য বিবেচনায় সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। বরং রাজনৈতিক নাটক লেখার সূত্র ধরে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনেছেন পচিঁশে মার্চ কালরাত্রির নির্মম ঘটনা ও পরবর্তী দিনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার। *জুলিয়াস সিজারে* কেসিয়াস যখন ক্যাঙ্কার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম নিয়ে দার্শনিক উক্তি করেছে :

যখন আকাশের বুকে এইসব তাণ্ডব নৃত্য দেখো,
তুমি ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাও।
[...] কিন্তু কখনো কি এসবের প্রকৃত তাৎপর্য খুঁজেছ ? [...]
মানুষকে সতর্ক করবার জন্য, ভয় দেখানোর জন্য
এ সবই দেবতাগণের অভিপ্রেত। (*জুলিয়াস সিজার*, পৃ. ২৩)

অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হক বর্তমান প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন ইতিহাসের আলোকে :

আমি অনেকবার দেখেছি, মীর্জা, বায়ু এবং বস্তুপুঞ্জ
নিরাসক্ত নয়, মানুষের উত্থান পতনে তারা
নিস্পৃহ দর্শক নয়। মনে পড়ে একাত্তর সালের কথা,
পঁচিশে মার্চ, রাত এগারোটা থেকে অতর্কিত আক্রমণ,
বাংলার বক্ষস্থল ঝাঁঝরা হলো একটানা গুলিবর্ষণে,
বিরামহীন বাহাত্তর ঘন্টা, গোলার আঘাতে,
ধসে পড়ল ছাত্রাবাস, মৃতের চিৎকারে বিদীর্ণ হলো আকাশ,
বাজারে জনপদে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড
যেন বিশাল সব মশাল এক আশাহীন অন্ধকারে,
তারপর অবিরল ধারায় নামল বৃষ্টি বারুদের গন্ধ ডুবিয়ে,
আগুন নিবিয়ে, রাজপথে লাশগুলোকে ধৌত করে
যেন প্রস্তুত করে শেষ সৎকারের জন্যে।
না মীর্জা, প্রকৃতি মানুষেরই একান্ত আত্মীয়। আনন্দে ঝলমল করে,
শোকে ক্রন্দন করে, বিক্ষোভে গর্জন করে, যেমন এখন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : পৃ.২৪৮)

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ঘটনাস্থান দুটি নাটকেই মোটামুটি কাছাকাছি। *জুলিয়াস সিজারে* এ দৃশ্যটি রচিত হয়েছে ব্রুটাস চরিত্রের বাড়ি সংলগ্ন বাগানে। আর *গণনায়কে* এর স্থান ব্রুটাসের ছায়া-চরিত্র প্রধানমন্ত্রী

হুমায়ুনের বসবার ঘর। উভয় নাটকেই দৃশ্যটি শুরু হয়েছে যথাক্রমে ব্রুটাস ও হুমায়ুনের সংলাপের মাধ্যমে। দুজনেই তাদের ব্যক্তিগত কর্মচারীকে সম্বোধন করে প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, *জুলিয়াস সিজার* নাটকে ব্রুটাসের কর্মচারী লুসিয়ায়ের ছায়া-চরিত্র বা প্রতিরূপ *গণনায়ক* নাটকে হুমায়ুনের কর্মচারী আকবর। এ দৃশ্যে ব্রুটাস ও হুমায়ুনের আত্মদ্বন্দ্ব প্রায় একই। ব্রুটাস যেমন সিজারকে ভালোবাসে, কিন্তু সিজারের চিরস্থায়ী ক্ষমতার অভিলাষ দেশের অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে এই চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হয়। *গণনায়ক* নাটকে রাষ্ট্রপতি ওসমানকেও হুমায়ুন অনুরূপ ভালোবাসে, কিন্তু তার একনায়কতান্ত্রিক আচরণে উদ্বিগ্ন। দুজনের এই আত্মদ্বন্দ্ব প্রকাশে ভাষাগত দিক দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক যেমন শেকস্‌পিয়রের হুবুহু অনুসরণ করেছেন আবার কিছুক্ষেত্রে শেকস্‌পিয়রের উপমার বাইরে গিয়ে মূলভাব ঠিক রেখে নিজস্ব সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে নতুন উপমা সৃষ্টি করেছেন। যেমন শেকস্‌পিয়র সিজার সম্পর্কে ব্রুটাসের ভাবনা প্রকাশে লিখেছেন :

> It must be by his death. And for my part
> I know no personal cause to spurn at him,
> But for the general. He would be crowned :
> How that might change his nature, there's the question.
> It is the bright day that brings forth the adder,
> And that craves wary walking.[১]

সৈয়দ শামসুল হক এ অংশটির হুবুহু অনুবাদ করে লিখেছেন :

> মৃত্যুই একমাত্র উত্তর। ব্যক্তিগত আমার কোনো বিবাদ নেই।
> কথা হচ্ছে দেশের কল্যাণ। তাঁকে করা হবে আজীবন
> রাষ্ট্রপতি। ফলে, কতটা তিনি বদলাবেন সেটাই প্রশ্ন।
> প্রখর উত্তাপেই গর্ত ছেড়ে বেরোয় গোক্ষুর। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৫০)

---

[১] *Julius Caesar*, William Shakespear, Edited by Barbara A. Mowat & Paul Werstine, Folger Shakespeare Library, www.folgerdigitaltexts.org)

কিন্তু এই স্বগতোক্তির শেষের দিকে শেকস্‌পিয়র সিজারকে হত্যা করার পক্ষে ব্রুটাসের মুখ দিয়ে যে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন, সৈয়দ শামসুল হক তা না করে এদেশের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন । শেকস্‌পিয়রের মূল রচনা :

And therefore think him as a serpent's egg,
Which, hatched, would, as his kind, grow
mischievous,
And kill him in the shell. (Act 2 / Scene 1)

সেখানে সৈয়দ শামসুল হক এই সর্পডিম্বের উদাহরণ বাদ দিয়ে নিজস্ব সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে লিখেছেন :

কে বলতে পারে ?
বীজ থেকেই বিরাট বটগাছ
শংকিত সম্ভাবনা থেকেই ভয়াবহ নৈরাজ্যের অবতারণা।
বুদ্ধিমান গৃহস্থ দেয়ালের সামান্য ফাটলে বটের চারা
কখনো বাড়তে দেয় না। ক্ষিপ্র হাতে উপড়ে ফ্যালে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৫০)

জুলিয়াস সিজার নাটকের অন্যতম চরিত্র – জনৈক দৈবজ্ঞ সিজারকে সচেতন করে তুলতে ১৫ মার্চ তারিখের কথা উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক এদেশের সাধারণ মানুষের জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসের সাথে মিল রেখে সেই দিনটিকে বানিয়েছেন *অঘ্রানের কৃষ্ণা দশমী*। *জুলিয়াস সিজারে* ব্রুটাস যখন কর্মচারী লুসিয়াসকে তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, সে তখন এককথায় জানিয়ে দিয়েছে – তার জানা নেই তারিখ। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক এদেশের মানুষের দ্বৈতস্বভাব নিয়ে চমৎকার এক স্যাটায়ার প্রয়োগ করেছেন হুমায়ুনের কর্মচারী আকবরের সংলাপের মাধ্যমে। যে জাতি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিজাতি-বিভাষীর সঙ্গে এত লড়াই করল, রক্ত দিল, তারাই তাদের প্রাত্যহিক দিন-ক্ষণ গণনায় এদেশীয় রীতি ভুলে ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে যাচ্ছে। আকবরের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে :

আকবর। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হলে হবে কি, সাহেব ?
সকলেই ইংরেজি মাস গোণে। আমিও তাই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৫১)

সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা এমন একটি চরিত্রের এমন নিবিড় পর্যবেক্ষণ, দর্শক-চেতনায় অদ্ভুত এক দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পেরেছে। এখানেই সৈয়দ শামসুল হকের অনন্যতা।

এ দৃশ্যে দুটি নাটকেই কেসিয়াস ও সানাউল্লাহ চরিত্রের মাধ্যমে যথাক্রমে ব্রুটাস ও হুমায়ুনকে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে জনতার চিঠি-প্রেরণের মিথ্যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা জানে, জনতার মধ্যে তাদের নিজেদের তেমন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এমনকি নেতার কাছাকাছি যেতে না পারলেও তাকে হত্যা করা দুরূহ হবে। সেকারণেই তারা এমন জনপ্রিয় চরিত্র বেছে নিয়েছে যারা নেতা এবং জনতা উভয়েরই আস্থাভাজন। দুটি নাটকেই দেখা যায় সিজার ও ওসমান প্রধান ষড়যন্ত্রকারী কেসিয়াস ও সানাউল্লাহ সম্পর্কে নেতিবচিক ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু ব্রুটাস ও হুমায়ুনে তাদের ভরসা ছিল প্রবল। দুটি চরিত্রই তাদের নেতা সম্পর্কে ভেতরে ভেতরে দ্যেদুল্যমান ছিল। সেটিকে আরও একটু উস্কে দিতেই জনগণের চিঠি পাঠানোর মিথ্যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। কেসিয়াস এবং তার সঙ্গীদের মুখ ঢেকে অন্ধকারে আসা প্রসঙ্গে আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ ব্রুটাস যেখানে অন্ধকার ও ষড়যন্ত্র নিয়ে দার্শনিক উক্তি করেছে, শামসুল হক সেখানে হুমায়ুনের মুখে জুড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। ব্রুটাস এবং হুমায়ুনের সংলাপ পর্যবেক্ষণ করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে :

> ব্রুটাস। এরা সেই ষড়যন্ত্রীর দল!
> এ ষড়যন্ত্র!
> রাত্রিকালই ত যতরকম দুষ্কর্ম অবাধে
> ঘটানোর প্রকৃষ্ট সময়!
> এ গভীর রাত্রেও যদি তোমার এত
> লজ্জা মুখ দেখাতে,
> দিনের আলোকে তবে কোথা পাবে অন্ধকার গুহা,
> যেখানে লুকোবে তোমার দানবীয় মুখটি ! [...] ঘোর নরকেও এত
> অন্ধকার নেই যে তোমার মুখ ঢাকা পড়বে। (*জুলিয়াস সিজার*, পৃ. ২৭-২৮)

অন্যদিকে *গণনায়ক* নাটকে একই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনের উক্তি :

> বাংলার ইতিহাসে ষড়যন্ত্রের তো অভাব নেই ;
> জনগণ যখন ঘুমে শিথিল, প্রান্তর যখন পূর্ণিমায় বিবশ,
> তখনি তো আঘাত, তখনি তো কলঙ্ক লেপন। তবে,
> এক শতাব্দীতে চট্টগ্রামে জ্বলন্ত বিদ্রোহ,

মার্চের একটি দিনে ঢাকার সেনানিবাসে যদি
গণহত্যার চক্রান্ত, সেই মার্চেরই অন্যদিনে
রাজারবাগে প্রতিরোধ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৫২)

হুমায়ুন যখনই রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নিয়ে আত্মদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন, তখনই এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছেন যে, ব্যক্তি করে ষড়যন্ত্র, সমষ্টি করে বিপ্লব। এ দৃশ্যে সৈয়দ শামসুল হক যেমন শেকস্‌পিয়রের মূল রচনার অনুসরণ করেছেন, তেমনি স্বাতন্ত্র্যও বজায় রেখেছেন নিজস্ব সংযমবোধ ও মেধার পরিচয় দিয়ে। এখানেও *জুলিয়াস সিজারের* বেশ কিছু দীর্ঘ সংলাপ নাট্যকার সংক্ষিপ্তাকারে ভাবানুবাদ করেছেন। আবার, বেশ কিছু সংলাপ অনুবাদ না করে বরং মূল নাটক থেকে সেগুলিকে বাদ দিয়েছেন। চরিত্র নির্বাচনেও সৈয়দ শামসুল হকের গ্রহণ-বর্জন, নতুন করে চরিত্র বিনির্মাণ ও সংযোজন লক্ষণীয়। যেমন, *গণনায়ক* নাটকে তিনি এ দৃশ্যে ফজলুল হক চরিত্রের সংলাপে সীমান্তরক্ষী ব্রিগেডিয়ার খান চরিত্রের উল্লেখ করেছেন, *জুলিয়াস সিজারে* এমন কোনো সামরিক চরিত্রের উপস্থিতি বা প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায় না। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করেই হয়ত নাট্যকার এই চরিত্রটি যুক্ত করেছেন।

শেকস্‌পিয়রের *জুলিয়াস সিজার* নাটকে ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্শিয়ার উল্লেখ আছে। এমন কি আলোচ্য দৃশ্যেও বেশ বড়ো একটি অংশ জুড়ে আছে ব্রুটাস-পোর্শিয়ার একান্ত ব্যক্তিগত দাম্পত্য সংলাপ। পঞ্চাঙ্কের ট্রাজিক নাটকে এরকম শাখাকাহিনি বাহুল্য মনে না হলেও সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাট্য রচনায় মূল ঘটনার বাইরে গিয়ে এমন দুই চরিত্রের সম্পর্ক ও সংলাপকে হয়তো অন্তরায় ভেবেছেন। সে কারণে হুমায়ুনের স্ত্রীর কোনো সংলাপ *গণনায়ক* নাটকে পাওয়া যায় না। নাটকের শেষদিকে শুধু জানা যায়, দুই সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষে হুমায়ুনের স্ত্রী-সন্তান একসাথে নিহত হয়েছে। আর এসব কারণেই *গণনায়কে জুলিয়াস সিজারের* অনুসৃতি সত্ত্বেও এটি অনুবাদ নাটক না হয়ে বরং সার্থক মৌলিক কাব্যনাটকের মর্যাদা পেয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনাস্থান উভয় নাটকেই এক। এ দৃশ্যটির চরিত্রাঙ্কন ও সংলাপ প্রায় সব কিছুই নাট্যকার শামসুল হক উইলিয়াম শেকস্‌পিয়রের অনুসরণে করেছেন। যেমন : *জুলিয়াস সিজারের* এ দৃশ্যে স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া গতরাতে তার দেখা দুঃস্বপ্ন ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকে অমঙ্গল মনে করে বারবার সিজারকে সিনেটের সভায় যেতে নিষেধ করেছেন, *গণনায়কেও* নাট্যকার রাষ্ট্রপতির স্ত্রীকে একই স্বপ্ন দেখিয়ে মোটামুটি একই ভাষায় অনুরোধ করিয়েছেন। তবে *জুলিয়াস সিজারে* শেকস্‌পিয়র এ দৃশ্যের জন্য যে ভৃত্য চরিত্রটি রেখেছেন, *গণনায়কে* শামসুল হক তেমন কোনো চরিত্র রাখেননি। তিনি এখানে *জুলিয়াস সিজারের* অন্যতম

সিনেটর চরিত্র দেসিয়াসের আদলে নির্মাণ করেছেন উত্তর বাংলার নেতা রংপুরের দাউদ চৌধুরীকে। দেসিয়াস এবং দাউদ চৌধুরী উভয়েই যথাক্রমে সিজার ও ওসমান হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত। এবং সেই ষড়যন্ত্রের কৌশল হিসেবে উভয়েই তার নেতাকে স্ত্রীর স্বপ্নদৃশ্য আমলে না নিয়ে আজীবন রাষ্ট্রপতির মুকুট পরার জন্য সিনেট বা সংসদ ভবনে যেতে প্রভাবিত করেছে। *জুলিয়াস সিজার* নাটকে সেকালের প্রথা অনুসারে সিনেটে যাবার আগে পশুবলিদানের উল্লেখ করা হয়েছে, যেটি বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগের বাস্তবতায় সৈয়দ শামসুল হক এড়িয়ে গেছেন। পশুবলি এবং ভূত-প্রেত-দৈত্য-দেবতা নিয়ে অলৌকিক সংলাপগুলো অনুবাদে তিনি বর্জন করেছেন।

উইলিয়াম শেকস্‌পিয়রের নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের পরিসর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এ-দৃশ্যে আর্তেমি নামক একটি চরিত্র পত্রমারফত সিজারকে ব্রুটাস, কেসিয়াসদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ফাঁস করে সিজারকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক এই দৃশ্যটি না রেখে সরাসরি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চলে গেছেন। এবং *জুলিয়াস সিজারের* দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের নতুন চরিত্র আর্তেমির এই সতর্কবার্তা প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের মতো বরিশালের সদস্য নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন।

এছাড়াও শেকস্‌পিয়র তাঁর নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য সংযোজন করেছেন, যেখানে ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্শিয়া ও তাদের ভৃত্য লুসিয়াসের সংলাপ রয়েছে। এছাড়াও তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে সিজারকে আগে থেকেই মার্চের পনেরো তারিখ সম্পর্কে সচেতন ও সাবধান করে দেয়া দৈবজ্ঞব্যক্তি। এরা প্রত্যেতেই আসন্ন বিপদ নিয়ে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। সৈয়দ শামসুল হক যেহেতু *গণনায়ক* নাটকে ব্রুটাসের স্ত্রী চরিত্রের পৃথক কোনো প্রতিরূপ নির্মাণ করেননি, তাই স্বভাবতই এই দৃশ্যটি এড়িয়ে গেছেন কাব্যনাট্য সংহত করার প্রয়োজনে। এই দৃশ্যের বক্তব্য তিনি তাঁর পরবর্তী দৃশ্যের ভাবের সঙ্গে একীভূত করে নাটকটিকে সুসংহত করে তুলেছেন।

উভয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ঘটনাস্থান প্রায় একই। দুটি নাটকেই যথাক্রমে দৈবজ্ঞ, আর্তেমি, এবং নরেন্দ্র তাদের প্রাণের নেতাকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করতে চেয়েছে, কিন্তু শত্রুপরিবেষ্টিত রাষ্ট্রনায়কগণ বন্ধুরূপী শত্রুর মধুবাক্যে বিভ্রান্ত হয়ে এদের কথা আমলে নেয়নি। যার কারণেই নেমে এসেছে এমন হৃদয়বিদারক ট্রাজিক পরিণতি। এখানে সিজারের মৃত্যুদৃশ্যের অনুরূপ করেই সৈয়দ শামসুল হক ওসমানের মৃত্যুদৃশ্য নির্মাণ করেছেন। *জুলিয়াস সিজারে* যেমন কারাগারে আটক এক সভাসদের ভাইয়ের মুক্তির দাবিতে সবাই সিজারের ঘনিষ্ঠ হতে চায় এবং তাঁকে উত্তেজিত করে অসর্তক করে ফেলে, *গণনায়ক* নাটকেও তেমনি সংসদ সদস্য ফজলুল হকের কারাগারে আটক দেশদ্রোহী সাংবাদিক ভাইয়ের মুক্তির দাবি

তোলা হয়। কিন্তু ওসমান কিছুতেই রাজি না হওয়ায় তথ্যমন্ত্রী মির্জা প্রথমে ওসমানের দেহে ছুরি বসিয়ে দেয়। *জুলিয়াস সিজারে* এ কাজ করেছিল সিনেটর ক্যাস্কা। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রেও তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর জড়িত ছিলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মোশতাকবাহিনীর সঙ্গে তার যুক্ত থাকা এর প্রমাণ বহন করে।

উল্লেখ্য যে, উভয় নাটকেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ছুরিকাঘাতে মারা গেছেন রাষ্ট্রনেতা। বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে ছুরির থেকে বন্দুকের গুলিই অধিক প্রাসঙ্গিক ও বাস্তব বলে আমাদের কাছে মনে হতে পারে। শামসুল হক যখন এ নাটকটি অবরুদ্ধ বাস্তবতায় রচনা করেছিলেন তখন অন্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি থাকলেও সামরিক শাসকের চোখ রাঙানির ভয়ে সরাসরি প্রকাশের সুযোগ ছিল না। একারণে মূল রচনার অনেক কিছু সময়ের বিচারে নতুন করে সৃষ্টি করলেও হত্যাদৃশ্য ও হত্যার উপকরণে পরিবর্তন ঘটাননি। কিন্তু একালের দর্শকের মনে এই বাস্তবতার বিষয়ে যাতে প্রশ্ন না জাগ্রত হয় সেকারণে হত্যা-পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনায় খুনি চরিত্রগুলোর মাধ্যমে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সংসদভবনে গুলির আওয়াজে সমস্যা হতে পারে। অতএব ছুরিকাঘাতই উত্তমপন্থা। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনের একটি সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

> আর এটাও স্থির হোক, কোন অস্ত্র ? না, পিস্তল নয়।
> ছুরিতে। কারণ, তা নিঃশব্দ। প্রথমত, জনতা থাকবে
> সংসদ ভবনের বাইরে, গুলির শব্দে ছড়িয়ে পড়বে আতঙ্ক,
> তৎক্ষণাৎ, কারণ, তারা বুঝবে না ভেতরে কি হচ্ছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৫৬)

সিজার ও ওসমান উভয়েই নির্ভীক, বীর চরিত্র। মৃত্যুর ভয় তাদের নেই। তাদের সবচেয়ে বড়ো কষ্ট ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা। যে কারণে তারা অন্যদের আঘাতে যতটা না কষ্ট পেয়েছেন, তার থেকে অধিক কষ্ট পেয়েছেন ব্রুটাস কিংবা হুমায়ুনের বিশ্বাসঘাতকতায়। তাই বিদায় বেলায় তাদের শেষ সংলাপ :

> সিজার : ব্রুটাস! তুমিও! যাক তবে সিজারের প্রাণ! (জুলিয়াস সিজার : ৪৩)
> ওসমান : তুমি? হুমায়ুন? – তাহলে, এভাবেই ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৬৫)

ওসমানের মৃত্যু-পরবর্তী দৃশ্যগুলোর ঘটনাপুঞ্জে সৈয়দ হক মোটামুটি শেকস্‌পিয়রকেই অনুসরণ করেছেন। তবে উইলিয়াম শেকস্‌পিয়র রচিত নাটকের বৃহৎ সংলাপগুলোতে তিনি মূলবক্তব্য ঠিক রেখে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত করে রচনা করেছেন। যেমন, সিজারের মৃত্যুর পর কেসিয়াস ও ব্রুটাসের সংলাপ ছিল নিম্নরূপ :

> কত কত ভবিষ্যৎ যুগে

কত নব-নব রাজ্যে, কত-কত অজ্ঞাত ভাষায়।
মোদের এ নাট্যরঙ্গ অভিনীত হবে পুনর্বার।
[...] পম্পির বেদীতলে,
পড়ে আছে মূল্যহীন ধুলোর মতোন,
সিজারের মৃতদেহ। কত রঙ্গমঞ্চে
এই দেহ হতে, ভবিষ্যতে
কতবার রক্তপাত হবে কে জানে ? [...]
যতবার হবে রক্তপাত, ততবার লোকেরা বলবে,
আমরা এই গুটিকয়জন স্বাধীনতা আনলাম দেশে।[১]

সেখানে সৈয়দ শামসুল হক সংক্ষিপ্ত ও সুসংহত করে লিখেছেন :

তবে তাই হোক। পৃথিবীতে আর কত কাল কত দেশে
আর কত বিচিত্র ভাষায় বারবার অভিনীত হবে এ নাটক ?
[...] ব্যক্তির বিলয় হবে নিতান্ত ধুলায়। [...]
ব্যক্তির পতন থেকে মহা-অভ্যুদয়।
যুগে যুগে মুক্তিদাতা, নির্ভীক, দুর্জয়
বলে চিহ্নিত আমাদেরই পরিচয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৬৬)

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সভাকক্ষে দাঁড়িয়ে ব্রুটাস যেমন জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার মাধ্যমে সিজারকে হত্যার উপযুক্ত যৌক্তিকতা বোঝাতে চেয়েছে, *গণনায়ক* নাটকে হুমায়ুনও একই কাজ করেছেন। উভয় নাটকেই জনতার চরিত্র একই। যারা একটা সময়ে ব্রুটাস বা হুমায়ুনের বক্তব্যে আশ্বস্ত হয়ে সিজার হত্যা-ন্যায়সিদ্ধ ও যৌক্তিক মনে করেছে, তারাই আবার পরক্ষণে এন্টনিও বা রশীদ আলীর যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। এখানেও অধিকাংশ সংলাপ সৈয়দ শামসুল হক *জুলিয়াস সিজারের* সংলাপের অনুসরণে রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর মধ্যেই দেখিয়েছেন নিজস্বতার চমক। যেমন শেকস্‌পিয়র জনতা চরিত্রের পৃথক পৃথক মত কিংবা মতবিরোধ তেমন একটা দেখাননি। জনতা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সবাই মিলে প্রায় একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে। কিন্তু *গণনায়ক* নাটকে জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন্দল

---

[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত *জুলিয়াস সিজার* , ৩/১ (দ্রষ্টব্য ড. মফিজ চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪)

দেখিয়েছেন সৈয়দ হক, যা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে বিভ্রান্ত জনগণের পৃথক পৃথক মতাদর্শের প্রমাণ বহন করে। প্রাসঙ্গিক সংলাপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম : সমগ্র উত্তর বাংলা হুমায়ুনের পেছনে আছে।

দ্বিতীয় : উত্তর বাংলা ওঁর একার সম্পত্তি নয়, আর

বর্তমান পরিস্থিতিতে আঞ্চলিকতার উস্কানি

বরদাশত করা হবে না। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৭৪)

সৈয়দ শামসুল হক রশীদ আলীর বক্তব্যের মাধ্যমে ওসমানের যে প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন তাতে বঙ্গবন্ধুর স্বরূপই অধিক সুস্পষ্ট হয়েছে। ঘাতক কর্তৃক বঙ্গবন্ধু হত্যার ফলে লেখকের অন্তর্গত শোক এ অংশে যেন অনুবাদের উর্ধ্বে উঠে নতুন এক মাত্রায় অভিষিক্ত হয়েছে। উইলিয়ম শেকস্পিয়র তাঁর নাটকে এ দৃশ্যে কেবল অক্টাভিয়াস সিজারের রাজধানীতে আসার খবর ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক বাস্তবতার নিরিখে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল চৌধুরী, এয়ার মার্শাল আমিন এবং পুলিশ প্রধানের সম্মিলিত উদ্যোগের কথা বলেছেন। এ দৃশ্যে তাঁর বর্ণনা যেন পঁচাত্তর-উত্তর কালের শত্রুপরিবেষ্টিত অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিই মনে করিয়ে দেয়।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের মাধ্যমে উইলিয়াম শেকস্পিয়র দেখিয়েছেন – রাজনৈতিক ডামাডোলে পড়ে, ক্ষমতার পালাবদলে বরাবরই কিছু হুজুকে গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এরাই নানান গুজবে কান দিয়ে তুচ্ছ কারণে কিছু নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। মূল *জুলিয়াস সিজারের* বেশ কিছু দৃশ্য যেখানে সৈয়দ শামসুল হক ভেবেচিন্তে এড়িয়ে গেছেন, সেখানে এই দৃশ্যটির গুরুত্ব অনুধাবন করে তা সংযোজন করেছেন *গণনায়ক* নাটকে। তবে দৃশ্যটিকে একালের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে কিছু কিছু পরিবর্তন এনেছেন তিনি। যেমন নাগরিকদের স্থানে এনেছেন তরুণ ছাত্রসমাজকে। এদেশের আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজের ভূমিকা স্মরণ করেই হয়তো লেখক ভেবেছেন জনগণের স্থানে ছাত্রসমাজ সংযোজিত করলে দৃশ্যটি দর্শক-পাঠক মহলে অধিকতর বাস্তব হয়ে ধরা দেবে। *জুলিয়াস সিজারে* যেমন জনগণ সিনার কবিসত্তার পরিচয় পেয়ে তার কবিতাকে রাবিশ বলে আরও উত্তেজিত হয়েছে, *গণনায়কে* সেখানে কবি যখন জানিয়েছেন, ছাত্রদের আন্দোলনের কিছু স্লোগান তার হাতে রচিত, এমনকি পাঠ্যপুস্তকের কিছু জনপ্রিয় কবিতার রচয়িতাও তিনি, তখন হুজুকে-ছাত্রসমাজ তাকে দুরূহ কবিতা লেখার অভিযোগ তুলে হত্যা করছে :

সিকান্দার :   না, না, আমি কবি, কবি সিকান্দার আলি।

তোমাদের কলেজে আমার কবিতা পড়ানো হয়। পড়োনি?

তৃতীয় (ছাত্র) : তবে তোর দুর্বোধ্য কবিতার জন্যই তোকে খতম করা চাই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৮১)

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকেই মূলত *গণনায়কের* কাহিনির সঙ্গে *জুলিয়াস সিজারের* ঘটনাবলির সুস্পষ্ট দূরত্ব লক্ষ করা যায়। সৈয়দ শামসুল হক এ পর্যায়ে খুব ক্ষীণ ভাবেই শেকস্‌পিয়রকে অনুসরণ করেছেন। তিনি বরং সংলাপ, চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি অঙ্কনে নতুনমাত্রা যোগ করেছেন। *জুলিয়াস সিজারের* এ দৃশ্যে এন্টনি, অক্টাভিয়াস ও লেপিডাস – তিনজন মিলে আলোচনার মাধ্যমে শত্রুদের তালিকা তৈরি করেছে ; কারা সিজারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল এবং পরিবর্তিত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কারা এখন তাদের শত্রু। এখানে অক্টাভিয়াস ও এন্টনির মধ্যে একটি চমৎকার বোঝাপড়া লক্ষ করা গেছে। কিন্তু *গণনায়ক* নাটকে এ পর্যায়ে মঞ্চে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন সামরিক একনায়ক জেনারেল চৌধুরী। তিনি যদিও প্রকাশ্যে ওসমানের পক্ষের লোক বলে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নানান কূট-কর্মকাণ্ডে সুস্পষ্ট করেছেন নতুন করে তাঁর দেশ দখলের ষড়যন্ত্র। জেনারেল চৌধুরী ওসমানের ব্যক্তিগত সহচর রশীদ আলীকে ছেড়ে কথা বলেননি। একে একে বহু রাজনৈতিক নেতাকে বন্দি করেছেন তিনি। কাউকে কাউকে ক্রসফায়ারের কথা বলে হত্যা করেছেন। স্বীয় স্বার্থ হাসিলের কারণে প্রবীণ নেতা কাশেম আলীকে পর্যন্ত সুকৌশলে বন্দি করে রেখেছেন। শেষপর্যন্ত তাঁকে দলে টানতে ব্যর্থ হয়ে জেলের অভ্যন্তরে হত্যা করেছেন।

জুলিয়াস সিজার নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সিজার হত্যার প্রধান দুই ষড়যন্ত্রকারী কেসিয়াস ও ব্রুটাসের মধ্যে তুমুল মতানৈক্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে যা তাদের অপরাধ-প্রবণ দুর্বল মানসিকতারই প্রমাণ। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর সৃষ্ট কাব্যনাটকে শেকস্‌পিয়র রচিত ছোট্ট এই দৃশ্যটির পৃথক অনুবাদ করেননি। তিনি *জুলিয়াস সিজার* নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য একীভূত করে *গণনায়কের* দৃশ্য রচনা করেছেন। এখানে তিনি ব্রিগেডিয়ার খান নামক একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যিনি ক্ষমতার এ দ্বন্দ্বে আর্মির বিরুদ্ধে গিয়ে সানাউল্লাহ-হুমায়ুনদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এ দৃশ্যে দেখা যায় সানাউল্লাহর আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে হুমায়ুন বেশ বিরক্ত। অপরদিকে সানাউল্লাহও হুমায়ুনের নির্লিপ্ত আচরণে ক্ষিপ্ত। কেননা হুমায়ুনকে নিয়ে সানাউল্লাহ যে দুর্বার নেতৃত্বের আশা করেছিল, হুমায়ুন তার কিছুই করতে পারছে না; ফলে আজ তাদের অপরাধীর মতো পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আর হুমায়ুন ভাবছে – সে সানাউল্লাহর প্রতারণার শিকার হয়েছে।

বস্তুত, বিশ্বাসঘাতক চরিত্রগুলি ইতিহাসে বারবার এভাবেই প্রতারিত হয়। পলাশির প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনমাসও ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। আবার পঁচাত্তরের বিশ্বাসঘাতক মোশতাক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বেইমানি করে অল্প কিছুদিন মাত্র ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে। বস্তুত, স্বীয় ঘৃণ্যকর্মের জন্য ভেতরে ভেতরে একসময় ক্ষয়ে যায়। প্রকৃতি এদের ক্ষমা করে না। এই বিষয়টি লেখক বেশ ভালোভাবেই উপস্থাপন করতে পেরেছেন আলোচ্য নাটকে।

গণনায়ক নাটকে সীমান্তরক্ষী ব্রিগেডিয়ার খান যখন এসে জানায় – সাভারে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার সেনাদের সম্মুখ যুদ্ধে হুমায়ুনের স্ত্রী-সন্তান নিহত হয়েছে, তখন হুমায়ুন একেবারেই ভেঙে পড়েন। একদিকে দীর্ঘদিনের সহকর্মী, নেতা ওসমানকে বিনাদোষে হত্যা করার অপরাধবোধ, অন্যদিকে সানাউল্লাহর প্রতারণা, তদুপরি পরিবার পরিজন হারানোর শোকে তিনি একেবারেই বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তার বিবেকই ছায়ারূপ ধারণ করে তার সামনে আবির্ভূত হয়ে জানায় যে, এখন একমাত্র স্বেচ্ছামৃত্যুই পারে হুমায়ুনকে এই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে। মূলত, কাব্যনাটকের সংজ্ঞানুসারে বাহ্যিক ঘটনাবলির তুলনায় ব্যক্তির অন্তরের দ্বন্দ্বই যদি প্রধান বিবেচ্য হয়ে থাকে, তবে এ নাটকে হুমায়ুনই সেই ট্রাজিক চরিত্র, যে পলে পলে আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছে। তিনি ন্যায়বান হয়েও অন্যায় করেছেন, আবার সেই অন্যায় করার কারণে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন। ভৃত্য আকবরের বাঁশির সুরেই ধ্বনিত হয়েছে তার বুকের করুণ আর্তনাদ, হাহাকার :

> বাঁশির ভেতরে চাপা একটা কান্না,
> সেই কান্নায় অবসন্ন হয়ে গেল সমস্ত পৃথিবী। [...]
> শুধু আমার চোখে ঘুম আসে না। বুকের ভেতর কান্নার একটা পাথর, তবু গলে না – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৯৩)

অবশেষে তার বিবেক ছায়ারূপে এসে তাকে তার মুক্তির পথ জানায় :

> তোমাকে জানাতে চাই যে মৃত্যুই তোমারও উদ্ধার,
> যেমন আমার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৯৪)

বস্তুত ছায়া চরিত্রটির আত্মপরিচয় শুনে আপাতবিচারে মনে হতে পারে – সে মৃত ওসমানের প্রেতাত্মা। কেননা হুমায়ুনকে সে নিজের পরিচয় দিয়েছে তোমার পূর্বগামী বলে, এবং ইঙ্গিত দিয়েছে তার অপমৃত্যুর। কিন্ত আমাদের বিবেচনায় এটি আসলে হুমায়ুনের বিবেক, যেটি প্রতিনিয়ত ওসমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। তাই স্ত্রী-স্বজন হারিয়ে হুমায়ুন যখন দুর্বলচিত্ত, তখন রাতের আলো-আঁধারিতে সে

ছায়ারূপে সামনে এসেছে। হুমায়ুনের নিজের অন্তরই এই বলে শান্তি খুঁজে নিতে চেয়েছে যে – স্বেচ্ছামৃত্যু ছাড়া এই দুঃসহ দহন থেকে, অপরাধপ্রবণ অন্তর থেকে তাঁর মুক্তি নেই। ছায়া চরিত্রের এমন উপস্থিতি মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) *কবর (১৯৬৬)* নাটকেও দেখা যায়, যেখানে কবরস্থানের অন্ধকারে, ভৌতিক পরিবেশে নেশাগ্রস্ত নেতা ও পুলিশ অফিসার হাফিজের বিবেক লাশরূপে একে একে উঠে এসে তাদের হিংস্র, স্বার্থান্ধ, কুৎসিত চেহারা তুলে ধরেছে। অ্যাবসার্ড নাটকের এই ফর্মটি এখানে স্বল্পপরিসরে হলেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন সৈয়দ শামসুল হক।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের প্রারম্ভে শেকস্‌পিয়র একটি যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়েছেন। ফিলিপি নামক প্রান্তরে একদিকে কেসিয়াস-ব্রুটাসের দল অন্যদিকে অক্টাভিয়াস-এন্টিনিওর সৈন্যরা সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। ক্লাসিক ট্রাজেডি নাটকের ক্ষেত্রে যুদ্ধদৃশ্য অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হলেও, আধুনিক কাব্যনাট্যে এমন দৃশ্য বেমানান মনে হয়। কেননা কাব্যনাট্যের বিষয় ব্যক্তির অন্তর্লোকের ঘাত-সংঘাতের উপস্থাপনা, বহির্লোকে সংঘটিত যুদ্ধ নয়। সে কারণে *গণনায়ক* নাটকে লেখক সরাসরি যুদ্ধদৃশ্য এড়িয়ে গেছেন। যুদ্ধের বর্ণনা তিনি জেনারেল ও রশীদের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

মূলত, শেকস্‌পিয়র তাঁর *জুলিয়াস সিজার* নাটকের পঞ্চমাঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যজুড়ে নতুন-পুরাতন কুশীলবদের যুক্ত করে বিশাল এক যুদ্ধদৃশ্য দেখিয়েছেন। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ সিনেটর কেসিয়াস মারা যান। সিনেটর ব্রুটাস পরাজিত হন, কিন্তু সেনাদের হাতে বন্দি হবার পূর্বে নিজেই নিজের তরবারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু *গণনায়ক* নাটকের পরিণতি সম্পূর্ণ আলাদা। এ অংশে নাট্যকার সৈয়দ হক শেকস্‌পিয়রের প্রদর্শিত পথে না হেঁটে, দেশের বিদ্যমান বাস্তব এবং ভবিষ্যৎ কল্পনার সমন্বয়ে পুরোটাই নিজের মতো করে রচনা করেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে – যুদ্ধ হয়েছে মূলত সীমান্তরক্ষী ব্রিগেডিয়ার খান ও দেশের সমর-প্রধান জেনারেল চৌধুরীর সেনাদের মধ্যে। রাজনীতিবিদগণ এখানে ক্রীড়নক মাত্র। *জুলিয়াস সিজারে* দেখা গেছে, অক্টাভিয়াসের নেতৃত্ব মেনে সিজারবন্ধু এন্টনিও তাকে সাহায্য করেছেন; যার রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতায় বসার কোনো অভিলাষ ছিল না। কিন্তু *গণনায়কে* রশীদ আলীর মনেও রয়েছে ক্ষমতারোহণের সুপ্ত বাসনা। তাই কিছু সিদ্ধান্ত অন্যায় জেনেও তিনি জেনারেল চৌধুরীর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু, চতুর জেনারেলের অন্তর্লোকে লালন করেছেন ভিন্ন বাসনা। যুদ্ধশেষে তিনি যখন রশীদ আলীকে বলেছেন :

অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন, কিভাবে সরকার হবে,

কি হবে কাঠামো, কর্ণধার কারা; অবিলম্বে জানানো দরকার
দেশের মানুষকে যারা উৎকর্ণ হয়ে আছে এইটুকু আশ্বাস পেতে
যে, ষড়যন্ত্র নির্মূল, নিশ্চিহ্ন ঘাতক, হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে
ভেসে যাওয়া নৌকোর হাল স্ব-স্থানে আবার বহাল, নেতৃত্ব
এখনো অটুট। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২৯৬)

প্রত্যুত্তরে রশীদ আলী যখন দেশ শাসনে সংসদ ডেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পরামর্শ দেন, তখনই বেরিয়ে আসে জেনারেলের আসল চেহারা। তিনি দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে আরও একবার চরম অপমান করে বলেন :

অর্থাৎ আবার সেই
যে কোনো বাতাসে যে কোনো দিকে অবনত ব্যক্তিদের ভিড়।
[...] যে কোনো প্রভুর কৃপাভিক্ষায় যারা উদগ্রীব, তাদের নিয়ে
সরকার তো দূরের কথা, ডাকাতের একটা দল পর্যন্ত
গঠন করা যায় না। (প্রাগুক্ত)

রশীদ আলী তবু নিজের অপমানের এমন স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েও নির্লজ্জের মতো ক্ষমতায় বসার শেষ আশা ছাড়েননি। তিনি বরং ক্ষমতাপ্রাপ্তির ক্ষীণ আশা নিয়ে জেনারেলের কথায় সুর মিলিয়ে গেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জেনারেল তাকে জানিয়েছেন – রশীদ আলী নয় রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব ওসমানের বিধবা স্ত্রী। রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব থাকলেও জনগণের আবেগকে পুঁজি করার জন্য ওসমানের বিধবা স্ত্রীর বিকল্প আর কেউ হতে পারেন না। অতঃপর রশীদ আলী বুঝতে পারেন, একজন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগদান করে সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল চৌধুরী নেপথ্য থেকে নিজেই সরকার ও দেশ পরিচালনা করতে চান।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার পলাতক সানাউল্লাহ এবং হুমায়ুনের শেষ পরিণতি দেখিয়েছেন। এ পর্বে দেখা যায়, পরাজিত দুই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী নিজেদের মধ্যেই আত্মকলহে লিপ্ত। হুমায়ুন এখন পুরোপুরিই হতাশায় নিমজ্জিত, কিন্তু যুদ্ধে হেরেও সানাউল্লাহ এখনো হাল ছেড়ে দিতে নারাজ। তিনি মনে করেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এই পলায়ন তার কাছে মূলত 'পশ্চাদপসরণ, নতুন করে ব্যুহ রচনা'র কৌশল। ফলে তিনি নানান কথার

ফুলঝুরিতে অনুশোচনায় দগ্ধ, আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত, হতাশায় নিমজ্জিত হুমায়ুনকে আবারও উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে গেছেন। হুমায়ুনকে হতাশা ভুলে জেগে ওঠার আহবান জানিয়ে তিনি বলেছেন :

ঘুমিয়ে আছেন নেতা। তাকিয়ে দেখুন একবার।
দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম –
একেবারে অন্তঃস্থল থেকে প্রবল একটা প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে,
অচিরেই সমস্ত কিছু ডুবিয়ে শোনা যাবে একটা বিস্ফোরণ,
ধসে যাবে অচলায়তন। বলা নিষ্প্রয়োজন,
মানুষের ভালবাসার চেয়ে তীক্ষ্ণ কোনো অস্ত্র নেই,
আর সেই অস্ত্রই আপনার হাতে ; (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩০১)

সানাউল্লাহ বিশ্বাস করেন, ওসমানের পর হুমায়ুনের ওপরই এদেশের সাধারণ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তাই তাকে জাগ্রত করে তুলতে পারলেই নিজের ক্ষমতা দখলের পথ মসৃণ হবে। কিন্তু হুমায়ুন ততক্ষণে ওসমানকে হত্যার অনুশোচনায় ধ্বস্ত; স্ত্রী-পরিজন হারিয়ে নিঃস্ব। এমনকি সানাউল্লার নানান অনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার ওপর থেকেও আস্থা উঠে গেছে তার। তিনি বুঝতে পেরেছেন সানাউল্লাহ যে দেশের মঙ্গলের কথা বলে বলে তাকে এই বিদ্রোহের পথে টেনে এনেছেন সে-পথ সঠিক নয়। কিন্তু এখন আর ফিরে যাবারও পথ নেই। এই যে দ্বন্দ্বাত্মক বাস্তবতা, হাহাকারদীর্ণ অনুশোচনা, এটিই তাকে কাব্যনাটকের অন্যতম সার্থক চরিত্রের মর্যাদা দান করেছে। হুমায়ুনের ভেতরে এই আত্মদ্বন্দ্ব চমৎকার একটি রূপকের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন লেখক :

সংশয়ের দীর্ঘ একটা করাতে অনবরত কেটে চলেছেন বন্ধন;
তরুণ কোনো প্রেমিকের মতো দাঁড়িয়ে আছেন
সত্যরক্ষার স্বরচিত গণ্ডীর ভেতরে। (প্রাগুক্ত)

হতাশার করাল গ্রাস থেকে হুমায়ুন কিছুতেই আর নিজেকে আশার আলোয় টেনে তুলতে পারেন নি। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি নিজে দেখে যেতে না পারলেও একদিন এই সাধারণ মানুষের হাতেই বাংলার প্রকৃত মুক্তি সম্ভব হবে। দার্শনিকের দৃষ্টিতে সানাউল্লাহকে তিনি বলেন – হয়তো তারা বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন করে প্রশাসনসন্ত্রের চালিকা শক্তি হবেন। কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য। তারা যেমন রাষ্ট্রপতি ওসমানের বিরুদ্ধে একদিন ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তেমনি ভাবে হয়তো একদিন তাদের বিরুদ্ধেও অন্য কেউ ষড়যন্ত্র

করবেন। অনুশোচনা-কাতর হুমায়ুনের নবজাগ্রত অভিজ্ঞানের মাধ্যমে নাট্যকার যেন ইতিহাস আর ভবিতব্যকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করে তাদের চেতনালোককে নাড়া দিতে চেয়েছেন :

> ধরা যাক যুদ্ধে জয় হবে।
> [...] তারপর বিজয়ীর বেশে ঢাকা যাবো, সরকার হবে,
> জনতার প্রতিনিধি নিয়ে আবার সংসদ হবে,
> ময়দানে বক্তৃতা হবে,
> দেয়ালে পোস্টার পড়বে,
> রাজপথে মিছিল বেরুবে, প্রতিপক্ষ মাথাচাড়া দেবে,
> অন্য কারো বিপ্লব, অন্য কারো অভ্যুত্থান হবে।
> আর আমি অন্য কোনো রশীদ আলিকে
> আবারও সুযোগ দেবো বক্তৃতার যে কোনো সময়ে,
> অন্য কোনো সানাউল্লাহকে বাধা দেবো বিচ্যুতি থেকে,
> অন্য কোনো, সশস্ত্র সংগ্রামে আবারো প্রকাশ পাবে সংশয় আমার।
> তখন তো মনে হবে আপনাদের নেতা–
> গুরুভার; সহজে বহনযোগ্য নয়, সহজেও ত্যাগ করা সম্ভব নয়। অতএব,
> এই ভালো, এখুনি বিদায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৩০৫)

হুমায়ুনের এই বাস্তবমুখী বক্তব্য মূলত লেখকের অন্তর্জাত দর্শন ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। কেননা বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস এমনই বিপ্লব আর সংগ্রামের নামে বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রতারণার পৌনঃপুনিক কাহিনি মাত্র। হুমায়ুনের সংলাপের মাধ্যমে রাজনীতির পুনরাবর্তিত ইতিহাসর প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমেত তিনি যেন বাংলাদেশের আগাম রাজনীতির সম্ভাব্য গতিপথ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এতেই বোঝা যায় নান্দনিক শিল্পবোধের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ইতিহাসজ্ঞান, সমাজতাত্ত্বিক চেতনা কতটা প্রখর ও তীব্র ছিল।

হুমায়ুনের ভগ্নহৃদয় আর নিঃসীম হতাশাবোধ প্রত্যক্ষ করে সানাউল্লাহ বুঝতে পারেন – রাজনীতির দাবাখেলা তাঁকে দিয়ে আর সম্ভব নয়। কেননা 'অর্ধেক হৃদয় নিয়ে বিপ্লব চলে না।' তাই হতাশহৃদয় সানাউল্লাহ নিজের পিস্তল দিয়ে হুমায়ুনকে গুলি করে হত্যা করেন, এবং নিজে এক প্রবল শোক আর শঙ্কা প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে

থাকেন। অতঃপর আকবরের ‘বাঁশিতে কোনো ছিদ্র নেই’ এই প্রতীকী সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকাপাত ঘটে।

শেকস্‌পিয়রের *জুলিয়াস সিজারে* সানাউল্লাহর প্রতিরূপ কেসিয়াসের মৃত্যু ঘটে যুদ্ধপ্রান্তরে। আর হুমায়ুনের ছায়াচরিত্র ব্রুটাস নিজেই নিজের তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু নাট্যকার সৈয়দ হক হুমায়ুন ও সানাউল্লাহর পরিণতি চিত্রাঙ্কনে নিজস্ব বোধ ও প্রতীতি প্রয়োগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন – যে-সানাউল্লার কথায় মোহাবিষ্ট হয়ে একদিন ওসমানকে হত্যা করেছিলেন হুমায়ুন, নিয়তির পরিহাসে সেই সানাউল্লাহর পিস্তলেই হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটলো। হতে পারে সানাউল্লাহর পতনও এভাবে ঘটবে অন্য কোনো বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতালিপ্সুর ষড়যন্ত্রে। এভাবেই চলতে থাকে রাজনীতির প্রবাহ। ইতিহাসের ঘটনাবলি এভাবেই পুনরাবৃত্ত হয়। সৈয়দ শামসুল হকের সার্থকতা এখানেই। একটি ক্লাসিক ট্রাজেডি নাটককে তিনি সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে সমীকৃত করে অসাধারণ প্রজ্ঞায় পুনর্নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। অনুবাদ হয়েও তাই এটি হয়ে উঠেছে মৌলিক কাব্যনাটক। জনৈক সমালোচক এ নাটকের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বলেন :

> বাঙালির অবিসংবাদী গণনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে কতিপয় স্বার্থবাজ, অপরিণামদর্শী, ক্ষমতালোভী ব্যক্তিকর্তৃক হত্যার ষড়যন্ত্র, হত্যা, অভ্যুত্থান, প্রতি-অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে পরিণামে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত – বিষয়ের দিক দিয়ে এ নাটকের বহিঃস্রোত। অর্ন্তবাস্তবতায় এ নাটক তৃতীয় বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক জীবনভাষ্য ।[১]

গণনায়ক নাটকের চরিত্রায়ণে লেখক মূলত তিন ধরনের চরিত্র নির্মাণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি ওসমানের শারীরিক উপস্থিতি এ নাটকে স্বল্পপরিসরে হলেও তিনিই এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁকে ঘিরেই বাকি চরিত্রগুলির ভাবনা-চিন্তা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আবর্তিত হয়েছে। ওসমান চরিত্রকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্রের গতিবিধি পরিচালিত হয়েছে প্রধানত তিনভাবে : প্রথমত যারা ওসমান চরিত্রের সরাসরি বিরোধিতা করে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে তাকে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। এ দলে আছে তথ্যমন্ত্রী মির্জা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সানাউল্লাহ, প্রধানমন্ত্রী হুমায়ুনসহ অনেকেই। আরেকটি দলে আছেন তাঁরাই, যাঁরা ওসমানকে সমর্থন করেছেন; যেমন, রশীদ আলি, কাশেম খাঁ চরিত্রগুলি। আরেকদলে আছেন তাঁরা, যাঁরা ওসমানকে সমর্থন করলেও তাঁর

---

১ সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.৭৫

অবর্তমানে চাতুর্যের সঙ্গে তাঁর ইমেজকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন। সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল চৌধুরী মূলত এমন একটি চরিত্র।

গণনায়ক যেহেতু শেকস্‌পিয়রের *জুলিয়াস সিজার* নাটক দ্বারা প্রভাবিত, সেহেতু মূল নাটকের কিছু চরিত্রের প্রভাব এ নাটকে থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ সৈয়দ শামসুল হক এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটে *জুলিয়াস সিজার* নাটকের নাট্যক্রিয়া ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন। তিনি নিজেই 'সবিনয় নিবেদন' অংশে বলেছেন :

> অনুবাদ আমি করিনি, রূপান্তরিত রচনাও একে বলা যাবে না ; আমি বরং বহু পূর্বে গত এক অগ্রজের সঙ্গে বসে সচেতনভাবে নতুন একটি রচনায় হাত দিয়েছি। শেকস্‌পিয়র রচিত কিছু চরিত্র, কিছু দৃশ্য বর্জন করেছি; আবার নতুন কিছু অংশ রচনা করেছি, কিছু চরিত্রের নতুন লক্ষণ ও পরিণতি দিয়েছি; এসবই করেছি আমার অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্তগুলো স্থাপিত করার জন্যে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ২২৯)

গণনায়ক নাটকে নাট্যকার সর্বমোট একুশটি চরিত্রের ক্রিয়াশীলতা প্রদর্শন করেছেন । এর মধ্যে সতেরোটি আছে একক চরিত্র, আর চারটি দলীয় চরিত্র। উল্লেখ্য যে, এ নাটকের দলীয় চরিত্রের ভূমিকা ঠিক গ্রিক নাট্যধারার কোরাসের মতো নয়; কিংবা *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ের* গ্রামবাসী, বা *নূরলদীনের সারাজীবনের* লালকোরাস, নীলকোরাসের মতো নয়। সেসব নাটকে দলীয় চরিত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে – দলীয় চরিত্রগুলি একক চরিত্রের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আলোচ্য নাটকে দলীয় চরিত্রগুলোর ভূমিকা পার্শ্বচরিত্রের অনুরূপ, এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্ব করায় নাটকে তাদের উপস্থিতি ও ভূমিকা স্বল্প পরিসরে ব্যাপ্ত। ফলে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ের* গ্রামবাসীর মতো নাটকে আদ্যোপান্ত প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ তাদের ছিল না। যেমন : ছাত্রদল চরিত্রটি একটি দৃশ্যে এসে একটি দৃশ্যেই হারিয়ে গেছে। সংসদ সদস্য, প্রহরীগণ, মুক্তিযোদ্ধা চরিত্রগুলির ভূমিকাও তেমনি খাপছাড়া দু একটি দৃশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

রাজনৈতিক নাটকের বৈশিষ্ট্যানুসারে এ নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব আবর্তিত হয়েছে একক চরিত্রগুলির নীতি ও আদর্শের ভিন্নতা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চক্রান্ত নিয়ে। একক চরিত্রগুলি তাই এখানে অধিক প্রভাব-বিস্তারক। দলীয় চরিত্রগুলি এদের সহায়ক শক্তি হিসেবে আবর্তিত। বস্তুত একক চরিত্রের ব্যবহারের শিকার দলীয় চরিত্র। যেমন, তথ্যমন্ত্রী মির্জার ধারণা – জনগণ রমণীর মতো। আবার জনগণ সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিকান্দার

বলেছেন, জনগণ ‘বেশ্যার মতো। যার হৃদয়ে একমুহূর্ত দাঁড়ায় না / কোনো অনুভূতি, স্থায়ী হয় না কোনো বেদনা, আচ্ছন্নতা।’

বস্তুত ‘কাব্যনাট্যে সাধারণত যন্ত্রণাবিদ্ধ আধুনিক মানুষের বেদনাবোধ ও সূক্ষ্ম মানসিকতার উপস্থাপন প্রক্রিয়া চলে। সৈয়দ শামসুল হক সচেতনভাবে *গণনায়ক* কাব্যনাটকে রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সার মর্মভেদী বেদনাবোধ বিকারগ্রস্ত মানসিকতার উন্মোচন করেছেন।’[১] এ-নাটকটি যে প্রতিকূল সময় ও পরিবেশে তিনি রচনা করেছিলেন, সেই সময়ে এটিকে মঞ্চে আনার মতো সাহস কোনো নাট্যদল করতে পারেনি। সৈয়দ হকের ইতঃপূর্বেকার দুটি কাব্যনাটক প্রযোজনা করেছিল দেশের স্বনামধন্য দুটি নাট্যদল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারাও এ-নাটক প্রযোজনা প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল নির্লিপ্ত থেকেছে। পরবর্তীকালে আতাউর রহমানের এক লেখনী মারফত জানা যায়, অধুনাবিলুপ্ত ‘চক্রবাক’ নামক একটি নাট্যদল এটিকে ঢাকার মঞ্চে এনেছিল। সম্ভবত পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত আর ক্ষমতার পালাবদলে রাজনীতি নির্ভর এ নাটকটিকে মঞ্চে এনে নতুন করে কেউই আর নিজেদের বিতর্কে জড়াতে চাননি।[২] কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পঁচাত্তরের ধাক্কা কাটিয়ে সাধারণ মানুষ অচিরেই সোচ্চার হতে শুরু করে। ফলে আশির দশকের শেষের দিকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে, এবং তৎসূত্রে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীশক্তি রাজাকার-আলবদরদের ঘৃণ্যভূমিকা বেশি করে আলোচনায় উঠে আসে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সৈয়দ হকের অন্যান্য নাটকের মতো এ নাটকটি মঞ্চে উপস্থাপিত হতে পারেনি। নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকী *গণনায়ক* নাটকে নাট্যকারের সাহসিকতা এবং আশির দশকে নাটকটি মঞ্চায়নের একটি প্রচেষ্টার কথা জানিয়ে লিখেছেন :

> ১৯৭৫-এর বর্বরোচিত ঘটনার পর আমরা শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা বা শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের অনুভূতি অনুসন্ধান করেছি। [...] নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক-সহ অনেকে

---

[১] অনুপম হাসান, বাংলাদেশের কাব্যনাটক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

[২] স্বাধীনতাপরবর্তী কালে বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্যনির্দেশক অপু শহীদের লেখা থেকে জানা যায় :

> মুক্তিযুদ্ধের পর পর মুক্তিযুদ্ধের গৌরব নিয়ে নাটক হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। ১৯৭৫ পর্যন্ত নাটকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথার বদলে দেখি হতাশা, কালোবাজারি, দুর্বৃত্তায়ন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী সময়ে পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং রাজনৈতিক উত্থান পতন এড়িয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ হয়। আশির দশকের শুরুতে নাটকের প্রধান সুর ছিল রাজাকার দালালদের প্রতি ঘৃণা। কিন্তু আশির শেষের দিকে স্বৈরাচারবিরোধী শ্লোগান উঠে আসে নাটকের বিষয়বস্তুতে। স্বৈরাচারবিরোধিতার পথ ধরে নতুন করে জাগ্রত হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।(দ্রষ্টব্য : অপু শহীদ,‘গত বিশ বছরে আমাদেও থিয়েটার : কিছু আলো অন্ধকার’, থিয়েটার বিষয়ক ছোটকাগজ *ক্যাপা*, ঢাকা, সংখ্যা : ৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, সূত্র : www.theatrewala.net)

প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে সাহসী পদচারণায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমরা সাহসী হয়ে শিল্প নিয়ে নেমে পড়েছিলাম পথে। [...] বঙ্গবন্ধুর জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়ে শেকস্‌পিয়রের *জুলিয়াস সিজার* অনূদিত নাটক *গণনায়ক* মঞ্চায়ন করার স্বপ্ন তৈরি হলো। সময় আশির দশকের মাঝামাঝি। জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলাম। তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী হলেন, পাঠ করলেন নাটকটি। যদিও বেশকিছুটা অগ্রসর হয়েও নাটকটি মঞ্চস্থ করা যায়নি।[১]

সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য নাটকে যেমন মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে নাট্যকারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা মেলে, আলোচ্য নাটকে সেভাবে মঞ্চনির্দেশনা প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাট্যকার দৃশ্য, সময় ও চরিত্রের অবস্থান সম্পর্কে ছোট ছোট বাক্যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তবে পূর্ববর্তী কাব্যনাটকগুলোর মতো নাট্যপরিচালকের জন্য কোনো নির্দেশনা তিনি রেখে যাননি। এর সম্ভাব্য দুটি কারণ হতে পারে : প্রথমত নাট্যকার ভেবেছেন এটি বহুল পরিচিত শেকস্‌পিয়রিয়ান নাটকের রূপান্তরিত নাটক যেহেতু, সেহেতু এটিকে মঞ্চে আনার জন্য নতুন করে নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। আবার হতে পারে, পঁচাত্তর-উত্তর অস্থির সময় ওঅবরুদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে এ নাটকটির মঞ্চায়ন নিয়ে তিনি নিজেই সন্দিহান ছিলেন। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক, তাঁর *গণনায়ক* নাটকটি সৃজনক্ষমতাগুণে অনুবাদ নাটকের খোলস কাটিয়ে বিষবস্তুর সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণ একটি মৌলিক রাজনৈতিক কাব্যনাটক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাটক রচনার পূর্বেই বাংলাসাহিত্যে একাধারে একজন সফল কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফলে তিনি যখন কাব্যনাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন নাটকের অভিনব প্লট সৃষ্টির পাশাপাশি নাটকের সংলাপগুলো অলঙ্কারবিন্যাসে নান্দনিক করে তোলেন। জনৈক সমালোচক *গণনায়ক*ের ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> কাব্যনাট্যে কাব্যিক সৌন্দর্য ধরে রাখা খুব জরুরি নয়, এ কথা টি.এস. এলিয়টের মন্তব্য থেকে বলা যায়। কারণ, কবিতার স্বাদকে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছানোর জন্য এখানে কবিকে বেশ খানিকটা নির্মোহ থাকতে হয়। কাব্যনাট্যে নাটকের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় কবিতার সৌন্দর্য যুক্ত হয়ে থাকে। *গণনায়ক* কাব্যনাট্যে কাব্যসৌন্দর্যকে ধরে রাখাও কষ্টকর। [...] লক্ষণীয় যে, এখানে কোনো গান বা কোরাস নেই। *নূরলদীনের*

---

[১] লিয়াকত আলী লাকী, ‘জয়তু সৈয়দ হক’, *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো..* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪১-৭৪২

সারাজীবন-এর মতো একে Musical Drama-র ফর্মে আনার চেষ্টা করেননি। শুদু গদ্যকে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের অন্বিষ্টতায় গদ্যকাব্য করে তোলার প্রয়াসী হয়েছেন।[১]

একজন কালোত্তীর্ণ শিল্পীর মতোই তিনি নাট্য-সংলাপের কাব্যগুণ সমুন্নত রাখার তুলনায় নাট্যগুণ বজায় রাখা ও নাট্যোৎকণ্ঠা নির্মাণে অধিকতর ব্রতী ছিলেন। এটি যেহেতু অনুবাদ নাটক, সেক্ষেত্রে মূল নাটকের সংলাপ ও ভাষার প্রভাব এখানে থাকবে সেটিই স্বাভাবিক। তবে সৈয়দ শামসুল হক 'শেকসপিয়রের অনুকরণে *গণনায়ক* এর সংলাপ রচনা করলেও নাট্যকার বাংলায় রূপান্তরিত করার সময় তা নিজের করে নিয়েছেন। বিশেষত তাঁর ভাষার গাঁথুনি প্রাতিস্বিকতায় অনন্য।'[২] আবার অনেকক্ষেত্রে শেকস্‌পিয়রকে অনুসরণ না করেও অলংকার, চিত্রকল্প নির্মাণে নিজস্ব ভাষাবোধ ও কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে চতুর্থ অঙ্ক থেকে ব্যবহৃত সংলাপের ভাষা, অলংকার-উপমা, চিত্রকল্প একান্তই তাঁর নিজস্ব রচনা। কেননা এখান থেকেই শেকস্‌পিয়রের কাহিনির তুলনায় তার কাহিনির ভিন্নতা শুরু হয়েছে। *গণনায়কের* সংলাপে ব্যবহৃত এমনই কিছু মাধুর্যমণ্ডিত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রবাদপ্রতিম বাক্যের দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

উপমা :

১. জনগণ [...] বেশ্যার মতো। যার হৃদয়ে একমুহূর্ত দাঁড়ায় না / কোনো অনুভূতি, স্থায়ী হয় না কোনো বেদনা, আচ্ছন্নতা। (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)
২. বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে / ওসমান তখন উল্কার মতো ধাবমান, দাবানলের মতো জ্বলন্ত। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)
৩. ভোরবেলায় পথের মোড়ে মস্তকবিহীন লাশের মতো / পড়ে থাকুন বঙ্গজননী । (পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)
৪. যার কাজ হাড়িঠেলা, / চালাবেন তিনি আর চালিত হবে দেশ, বিনা প্রতিবাদে,/ জোয়াল বাঁধা মহিষের মতো মাথা নিচু করে ? (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)
৫. যাদুকরের মুষ্টিবদ্ধ হাত যেমন ধীরে ধীরে খুলে যায় / বেরিয়ে পড়ে পায়রা, তেমনি ওর ভেতর থেকে হঠাৎ জন্ম নিয়েছে দেশের জন্য ভালবাসা। (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)
৬. নদী যেমন প্রবল বেগে দক্ষিণের দিকে ধাবমান,/ বাংলার জনগণও রাজধানী ঢাকার দিকে,(প্রথম অঙ্ক,প্রথম দৃশ্য)

---

[১] মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

[২] অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ.৩৩

উৎপ্রেক্ষা :

১. যেনো কোনো দেশপ্রেমিক নন, তিনি তস্কর। (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

২. লক্ষ লক্ষ হাত / উৎক্ষিপ্ত হলো আকাশে, যেন লক্ষ লক্ষ পতাকা এই একটি মানুষের জন্যে, ... (তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

৩. কাশেম খাঁ যেন সদরঘাটে কোনো বিক্রেতা/সালসার বোতল হাতে পথচারীকে চিৎকার করে ডাকছে। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

৪. রাষ্ট্রপতি ওসমানের চোখেমুখে একটা থমথমে ভাব, দলবল / যেন কঠোর কোনো শিক্ষকের পেছনে ছাত্রের পাল – / নীরব, নতমস্তক। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

৫. যে জিহ্বার ভাষণে / বাংলাদেশ ভাবাবেগে ভাসে, সেই জিহ্বা থেকে তখন আর্তির স্বর, যেন এক শীর্ণ বিড়াল। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

রূপক / প্রতীক :

১. বুদ্ধিমান গৃহস্থ দেয়ালের সামান্য ফাটলে বটের চারা / কখনো বাড়তে দেয় না। ক্ষিপ্র হাতে উপ্রে ফেলে।(দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

২. বাঁশিতে কোনো ছিদ্র নেই। আমার দুঃস্বপ্নে দেখা / রন্ধ্রহীন সেই বাঁশি পড়ে আছে দাবানলে দগ্ধ / এক ভয়াবহ প্রান্তরে একাকী। (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

৩. সুস্থির চিত্তেই হাতে নিয়েছিলাম ছুরি / উচ্চাকাঙ্ক্ষার রশি কেটে দিতে। (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

অতিশয়োক্তি :

১. সংগ্রামের জন্যে অর্থের যে প্রয়োজন, যদি সম্ভব হতো, / আমি আমার হৃদপিণ্ড গলিয়ে মুদ্রা বানাতাম, / দেহের প্রতি ফোঁটা রক্তকে রূপায় পরিণত করতাম,/ তবু দরিদ্র কৃষককে বঞ্চনা করে তার সঞ্চিত সামান্য অর্থ/ সংগ্রামের নামে, স্বাধীনতার নামে আত্মসাৎ করতাম না। (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

২. উন্মোচিত করে দেখাই এই দেহ, যার ক্ষত নিজেই মুখর। / রক্ত নয়, শব্দ ঝরে এই ক্ষত থেকে, শব্দহীন অথচ মুখর। (তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

প্রবাদ, প্রবচন / প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১. অর্ধেক হৃদয় নিয়ে বিপ্লব চলে না। (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

২. সময় আমাদের প্রতারিত করবে যদি / আমরা প্রতারণা করি সময়কে।(পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

৩. উচ্চারণ কখনো কখনো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। (চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

৪. সময়ের স্বভাব এই, সময় কাউকে সময় দেয় না। (চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

৫. ব্যক্তি করে ষড়যন্ত্র, / সমষ্টি বিপ্লব। (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

৬. সত্য সর্বদাই অনুক্ত। / মিথ্যাই প্রবলভাবে ঘোষিত। (প্রথম অঙ্ক,প্রথম দৃশ্য)

৭. বড় নদী মরে গেলে, শাখা নদী এমনিতেই বুঁজে যায়। (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

৮. গাছ যখন পড়ে যায় তার ডালে আর পাখি বাসা বাঁধে না। (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

একটি বিশ্বখ্যাত ক্লাসিক নাটককে দেশীয় প্রেক্ষাপটে ঢেলে, তাকে আধুনিক কাব্যনাটকে রূপ দিতে সৈয়দ শামসুল হকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষত, সমরশাসকের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে নিজস্ব ভাবনা-চিন্তনের নিঃশঙ্ক প্রকাশের অসীম সাহস, সৈয়দ হককে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। *গণনায়ক* নাটক সবদিক দিয়েই তাই নাট্যকারের একটি সফলতম শিল্পকর্ম ।

ঈর্ষা

সৈয়দ শামসুল হক মানুষের অন্তর্মুখী সত্তা ও হৃদয়জাত ঈর্ষার নান্দনিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন *ঈর্ষা* নাটকে। এ নাটকে মনুষ্য-স্বভাবের এমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট চিত্রায়িত হয়েছে, যা প্রাণিকুলের আর কারও মধ্যে নেই; এবং তা হচ্ছে মানবীয় ঈর্ষা। 'ঈর্ষা সব অর্থে সৈয়দ শামসুল হকের সর্বাধুনিক নাট্য রচনা। বক্তব্য বিন্যাস, আঙ্গিক, চরিত্র-চিত্রণ ও ভাষার ব্যবহারে এ নাটকটির সাথে আর দশটি নাটকের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি সৈয়দ হকের আগের নাট্য রচনার সাথেও এর অনৈক্য চোখে পড়ে। ধমনীর ভেতরে এক ভিন্নতর শোণিত প্রবাহ থেকে উৎসারিত এ রচনা।'[১]

ঈর্ষা নাটকের প্রধান চরিত্র তিনটি; এবং তিনটি চরিত্রই নামহীন। চরিত্রগুলো প্রৌঢ়, যুবতী ও যুবক নামে নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। মুখ্যচরিত্র তিনটি হলেও এই তিনটি চরিত্রের সাতটি সংলাপের মাঝে অসংখ্য ছোট ছোট চরিত্রের নেপথ্য উপস্থিতি নাটকটিকে করে তুলেছে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। এ সকল নেপথ্য চরিত্র মূলত

---

[১] আতাউর রহমান, অভিনয় স্মারক (ব্রোশিওর) *ঈর্ষা*, (দ্রষ্টব্য : সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪)

প্রধান তিনটি চরিত্রের স্মৃতির ক্যানভাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো উপস্থিত হয়েই মিলিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এই উপস্থিতি নাটকটিকে শৈল্পিক ও রসঘন করে তুলতে পালন করেছে অসামান্য ভূমিকা।

ঈর্ষা নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র প্রবীণ শিল্পী। প্রকৃতপক্ষে 'ঈর্ষা নামক প্রবৃত্তির নতুন মাত্রিকতা আবিষ্কার করতে গিয়ে নাট্যকার মূলত প্রৌঢ় শিল্পীর আপন জীবন-সত্তার জটিল ব্যূহ ভেদ করেছেন। [...] প্রথমদিকে তাকে নিছক কামাসক্ত পুরুষ বলে মনে হলেও শেষপর্যন্ত মানবিক দোষে-গুণে, দুর্বলতায় তাকে আমরা উজ্জ্বল চরিত্র হিসেবে দেখি।'[১]

সৈয়দ শামসুল হক নাটকে এই প্রৌঢ় ব্যক্তির সংলাপের মাধ্যমে দর্শকদের নাট্যঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন। এই প্রৌঢ় ব্যক্তি একজন প্রবীণ শিল্পী। তাঁর কাছে বিদায় নিতে এসেছে এক তন্বী তরুণী, যে এখন বিবাহিত, এবং যার সঙ্গে এই প্রবীণ শিল্পীর ছিল প্রণয়ঘন সম্পর্ক। কিন্তু প্রবীণ শিল্পী অনাকাঙ্ক্ষিত এই বিদায় মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বরং শিল্পানুরাগী এই মেয়েটিকে তাঁর জীবনের সঙ্গে লগ্ন করে রাখার প্রয়োজনে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া অতীতের আবেগায়িত মুহূর্তগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তার ন্যুড ছবি জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেবার হুমকি দিচ্ছেন। একপর্যায়ে তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের প্রেমিকার জন্য আকুতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুশয্যায় বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে স্মরণ প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মেয়েটিকে আবেগায়িত করে তার প্রতি দুর্বল করে দিতে চাইছেন। নিজেকে জয়নুল এবং মেয়েটিকে জয়নুলের আঁকা গ্রামীণ নারীর প্রতিরূপে উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন :

> জয়নুল আর নেই, জয়নুলের বদলে আমি, আর সেই নারীটির বদলে তুমি,
> বিশ্বে আর কেউ নেই, সকলেই চুপে সরে গেছে যেন আমাদের জন্যে সেই
> জয়নুলের নদীতীর থেকে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৫)

কিন্তু এসবেও যখন মেয়েটির হৃদয় বিগলিত হয় না, তখন প্রকটভাবে প্রকাশ পায় প্রৌঢ়ের কুৎসিত চেহারা। অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে তিনি জানান – মেয়েটির এই বিয়ে, এই স্বামী কিছুই তিনি মানেন না। কেননা যেহেতু তাঁর সাথে মেয়েটির দৈহিক সম্পর্ক ছিল, সেহেতু তিনিই একমাত্র তার অধিকারভোগী। এরপরেও যদি মেয়েটি তাকে ফেলে চলে যায়, তবে তিনি মেয়েটির গোপন ছবি জনসম্মুখে প্রকাশ করে শোধ নেবেন। যে যুবক ছেলেটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, তার কাছে পরাজিত হওয়ার প্রচণ্ড ক্ষোভ থেকে তিনি উচ্চারণ করেন :

> সে সব গোপন ছবি আছে স্টুডিওতে,

---

[১] মোস্তফা তারিকুল আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

কোনোদিন প্রদর্শনী করিনি সে চিত্রমালার; আজ আমি প্রতিশোধ নিতে পারি

আগামী সপ্তাহেই শিল্পকলা একাডেমি গ্যালারিতে চমকানো প্রদর্শনী করে – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৭)

এরপর যুবতী যখন যুক্তির পর যুক্তি তুলে ধরে প্রবীণ শিল্পীর ভোগী পুরুষ সত্তাটিকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসতে চায়, তখনি মঞ্চে প্রবেশ করে মেয়েটির সদ্যবিবাহিত স্বামী; প্রবীণ শিল্পীর যুবক ছাত্র। প্রবীণ শিল্পীর সঙ্গে তরুণীর গোপন সম্পর্কের তথ্য অবগত হয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধা এই তরুণটি শিল্পীর এই পতিত অবস্থাকে দেশ ও সমাজের পতিত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে নিজেই এই অন্ধকারের পথ থেকে সরে যাওয়ার সংকল্প করে।। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি এ পর্যায়ে কিছুটা মানবিক সত্তায় উন্নীত হয়ে যুবককে থামানোর চেষ্টা করে বলেন যে – মেয়েটির কোনো দোষ নেই। অতঃপর তাঁর বক্তব্যসূত্রে জানা যায়, মেয়েটির সঙ্গে তাঁর অতীত প্রেমের ইতিহাস। এ পর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন যে, নারীর প্রতি আসলে তার কোনো প্রেমজ আকর্ষণ কাজ করেনি, হৃদয়ের কোনো টানও তিনি অনুভব করেননি :

আমার ভেতরে কোনো প্রেম ছিল না, ছিল নারীর প্রতি ঘৃণা,

ছিল নারীর কাছে বারবার পরাজিত হয়ে নারীকেই নষ্ট করার ক্রোধ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৬)

প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রৌঢ়ের জীবনেও যৌবনের প্রারম্ভে ভালোবাসা ছিল। কিন্তু বিত্তগত অসমতার কারণে সে প্রেম-ভালোবাসা কখনো পূর্ণতা পায়নি। তিনি ছিলেন গরীব ঘরের মেধাবী সন্তান। কিন্তু সহপাঠী যে মেয়েটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন, সে ছিল সমাজে উচ্চবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা। ফলে দুজনের হৃদয়সৃষ্ট সেই ভালোবাসা আর পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারেনি। অচিরেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায় ‘সোনালি চশমা চোখে এক উঠতি সি-এস-পি’র সঙ্গে’। শিল্পীর মনে এই দুঃখবোধ অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী হয়েছিল। এ ‘যেন লুট হয়ে গেল গরীবের একমুঠো চাল।’ এই ঘটনার আঘাতেই শিল্পী প্রথম বিমূর্ত ছবির জগতে প্রবেশ করেন। এরপর তার জীবনে আরও নারী এসেছে। ছাত্রাবস্থায় বন্ধুর সঙ্গে পতিতালয়ে নারীর ন্যুড আকঁতে গিয়ে প্রথম তার শারীরিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আবার ধনী ঘর থেকে উঠে আসা এক আমলার স্ত্রী তার মধ্যেই খুঁজে নিতে চেয়েছে বঞ্চিত দাম্পত্য সুখ। শিল্পী যেটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

বেশি সুখে মানুষ অসুখী হয় – প্রথম দেখলাম।

আরো দেখলাম, আমার না যত প্রয়োজন – ভ্যানিটি ব্যাগের আরো একটি ফুল চাই তাঁর।

(কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৫)

এরপর, অচিরেই শিল্পী পেয়ে গেছেন তাঁর নতুন শিকার – শহীদ মুক্তিযোদ্ধার এক বিধবা স্ত্রী। এই নারীটির হৃদয়ে ছিল তাঁর প্রাক্তন স্বামীর প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু নিজের নিঃসঙ্গ সময়গুলো ভাগ করে নিতেই শিল্পীর সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন। ফলে এখানেও দেহজ সম্পর্কের উর্ধ্বে কোনো হৃদয়জাত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু হরিণের খাঁচার সম্মুখে প্রথম দেখা তরুণী ছাত্রীটি, তাঁর প্রৌঢ় জীবনে নতুন করে মোহের ঝড় তোলে। বিমূর্ত শিল্পের ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এই তরুণীকে নিয়ে তিনি চেয়েছেন মূর্ত শিল্পের ভুবনে ফিরে আসতে। এ পর্যায়ে তার অনুভূতি ছিল নিম্নরূপ :

তোমাকে দেখলাম। একজন মানুষকে দেখলাম। এক নারীকে দেখলাম।
মনে হলো, এই নারীটিকে ক্যানভাসে যদি ধরতে পারি।
তাহলে নারীকেই যে একদিন নষ্ট করেছি সজ্ঞানে, তার একটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৭)

কিন্তু নিজেকে শুদ্ধ করার নামে তিনি যে রঙের খেলা শুরু করেন, তা অচিরেই আবার তার ভোগী সত্তাকে উস্কে দেয়। শিল্পের উর্ধ্বে গিয়ে সে তখন হয়ে ওঠে কামনা-বাসনাপূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু যুবতী দেহমুখী প্রেম নয়, দেহাতীত প্রেমই আকাঙ্ক্ষা করে প্রবীণ শিল্পীর কাছে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত প্রেম অর্জনে ব্যর্থ হয়ে সে অতিদ্রুত বিয়ে করে ফেলে তারই প্রেমপ্রার্থী মূর্ত শিল্পের সন্ধানী মুক্তিযোদ্ধা যুবকটিকে। কিন্তু প্রবীণ শিল্পী তার এই চলে যাওয়া মানতে পারছেন না। শিল্পাঙ্গনে যদিও তিনি অনেক খ্যাতিমান, অর্থ, যশ, প্রতাপ কিছুই আর এখন তার জীবনে অধরা নয়, তবুও ভেতরে ভেতরে বড়ো বেশি নিঃসঙ্গ। মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ককালে যে ভালোবাসা তিনি বোধ করেননি, সে চলে যাবার পর সেই হৃদয়জাত ভালোবাসা তিনি অনুভব করছেন প্রবলভাবে। আবেগায়িত চিত্তে মেয়েটিকে স্মরণ করে তিনি তাই বলেছেন :

হ্যাঁ, আমি একদিন ভালোবেসেছিলাম তাকে –
যেন আদিম, অরণ্যচারী, সবুজভুক এক গোত্রের জননী সে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৬৪)

এ পর্যায়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন যুবক ছাত্রটি নয়, তার মুক্তির প্রতিবন্ধক তিনি নিজেই; নিজেই তিনি এখন নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবিষ্কার করতে পেরেছেন তিনি – তাঁর মধ্যে দুটি সত্তা একসঙ্গে বাস করে ক্রমাগত পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে :

আমিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, তোমাকে ভালবেসে আমি একই সঙ্গে
জয়ী এবং পরজিত, পূর্ণ এবং শূন্য, ধনী এবং নিঃস্ব। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৬৬)

অবশেষে প্রবীণ শিল্পী তাঁর শিল্পিসত্তাকে পাশে ফেলে মেয়েটিকে ফিরে পাবার জন্য যে মানবিক আকুতি প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যদিয়ে এ নাটকের সমাপ্তি হয়েছে। তবে এ চরিত্রটির যে বিকাশ ও পরিণতি নাট্যকার তার পরের কাব্যনাটক *অপেক্ষমাণে* দেখিয়েছেন, সেখানে দেখা যায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য রঙ-তুলির মাধ্যমে ক্যানভাসে ধরার আগ্রহের মধ্যদিয়ে প্রৌঢ় শিল্পী তাঁর শিল্পিসত্তাকেই বিজয়ী করে তুলেছেন।

ঈর্ষা নাটকের যুবতী চরিত্রটি উন্মুল ও অনিকেত একটি চরিত্র। শিল্পের প্রতি তীব্র ভালোবাসা নিয়ে শিল্পের জগতে এসে মেয়েটির ঘটেছে সর্বনাশা বিপর্যয়। একদিকে খ্যাতিমান শিল্পীর কাছে শিল্পের পাঠ নিতে এসে সে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যদিকে তার প্রেমপ্রার্থী সদ্য বিবাহিত যুবক-শিল্পী তাকে ত্যাগ করেছে প্রবীণ শিল্পীর সঙ্গে প্রেমের তথ্যগোপনের অপরাধে। কিন্তু নাট্যকার এই মেয়েটিকে বিপন্ন করে আঁকেননি। মেয়েটি চলার পথে বাধার শিকার হলেও, নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয় ছিল চোখে মুখে। প্রবীণ শিল্পীর শত আহবানে সে আর পেছন ফিরে তাকায়নি। নিজের মতো করে সে বাঁচতে চেয়েছে। বিদায় বেলার শেষ সংলাপে তার এই দৃঢ়চেতা মনের পরিচয় মেলে :

> আমি প্রেম চেয়েছি জীবনে, আমি প্রেম চেয়েছি শিল্পে;
> এতদিন মনে করতাম, প্রেম এসে যায় ; আজ আমি জানলাম
> যে কোনো প্রেমই কিন্তু আমাদের অর্জন করে নিতে হয়। [...]
> খুঁজলে কি আমিও পাবো না ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৬৩)

যুবতী ছাত্রী একদিন শিল্পী হওয়ার প্রত্যাশায় বাবার সঙ্গে ট্রেনে চেপে এই শহরে এসেছিল। তার শিশুমনে একদিন রঙের প্রভাব সঞ্চারিত করেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। শিল্পের ভুবনকে তখন রূপকথার মতোই মনে হয়েছিল। আর এই ভালোলাগা থেকেই সে এসেছিল খ্যাতিমান প্রবীণ শিল্পীর সংস্পর্শে। এরপর, বয়সের অনভিজ্ঞতায়, প্রবীণ শিল্পীর আকর্ষণকে হৃদয়জাত ভালোবাসা ভেবে তার সম্মুখে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতে সে দ্বিধা করেনি। কিন্তু একটা পর্যায়ে সে বুঝতে পেরেছে তার প্রতি শিল্পীর আকর্ষণ হৃদয়জাত নয়; শিল্পচর্চার মোড়কে কেবলই দেহসম্ভোগ। সে বুঝতে পারে :

> আমি বিষয় ছিলাম, ব্যক্তি নই, আপনার কাছে।
> আমাকে সন্ধান নয়, সন্ধান করেছেন আমার ভেতরে আপনি আঁকার বস্তুকে –
> [...] আমার হৃদয় নয়, আমার শরীরে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২৮)

এ অবস্থায় শিল্পীর প্রতি যুবতীর যাবতীয় মোহ কেটে যায়। কিন্তু অতঃপর যে যুবককে ভালোবেসে সে প্রৌঢ় শিল্পীকে ছেড়েছে, সেই পুরুষটিও কিছুতেই মেয়েটির প্রাক্তন প্রেমসম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি। মানবিক *ঈর্ষা* আর অহমবোধে তাড়িত হয়ে সে সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে। অতএব, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতারিত ও লাঞ্ছিত মেয়েটি পরিশেষে চিনে নিতে চেয়েছে নিজেই নিজের পথ। মেয়েটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে সেখানেই স্থাণুর মতো বসে থাকেনি। *ঈর্ষা* নাটকে নারী চরিত্রের দৃঢ়তা প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> এই যুবতী 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এর কোনো গ্রাম্য বালিকা নয়, মিনতির মতো দেহজীবী নয়, এমনকি একদা রাজনীতি করা বর্তমানে পবিত্রতার রক্ষী – গৃহিণী সুলতানা নয়। এই যুবতী অনেক বেশি আত্মশক্তিসম্পন্ন, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও আধুনিকা। তাই তার শিক্ষকের ব্ল্যাকমেইলের জবাবে বলতে পারেন 'যদি ইচ্ছে হয় করুন প্রদর্শনী আমার সিটিং থেকে আঁকা আপনার / নগ্নিকা সিরিজ দিয়ে। যাব আমি, আমার স্বামীটিও যাবে উদ্বোধনী দিনে। / এবং সে ছবিগুলো থেকে মানুষেরা নেবে, না আমাকে নয়, আপনাকে চিনে।'[১]

যুবক চরিত্রটি এ নাটকের অন্যতম চমক সৃষ্টিকারী একটি চরিত্র। যুবকের উপস্থিতিই এ নাটকে নাট্য-আকষর্ণ টানটান করে ধরে রেখেছে শেষপর্যন্ত। এছাড়া যুবক চরিত্রটির মধ্যদিয়ে কেবল ব্যক্তিক প্রেমের সম্পর্ক নয়, সমকালীন সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতির নিরেট বাস্তবতা অত্যন্ত নিপুণভাবে উঠে এসেছে; সামাজিক বিনষ্টি কী করে ব্যক্তি চরিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে, তা জানা গেছে এই যুবক চরিত্রটির সংলাপের মাধ্যমেই। দেখতে গেলে – যুবক চরিত্রটিও সর্বপ্রতারণার শিকার। দেশের মুক্তির জন্য যে একদা প্রাণপণ লড়াই করেছে, সেই দেশ আজ স্বৈরশাসকের কবলে অবরুদ্ধ, মত প্রকাশের স্বাধীনতাটুকু নেই সেখানে। এরপর সমাজ ভুলে সে যখন ব্যক্তিপ্রেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছে, তখনই ধরা পড়েছে পিতৃতুল্য শিক্ষকের লাম্পট্যের নগ্নচিত্র; আর সদ্যবিবাহিত স্ত্রীর তার অগোচরে অন্যপুরুষের সঙ্গে দেহজ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার মতো প্রতারণার ঘটনা। এই প্রতারণা, এই ছদ্মবেশ একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সে মেনে নিতে পারেনি। ফলে নীরবে সরে গেছে। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছে :

> আমি এই মুহূর্তে সরল হৃদয়ে অধিকার ত্যাগ করলাম।
> তুমি থাকো প্রেম নিয়ে, প্রেমহীন আমি চললাম। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩৮)

---

[১] শফি আহমেদ, 'উজান সময়ের আবর্তে সৈয়দ হকের কতিপয় নারী', পাক্ষিক *অন্যদিন* (সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা), মাজহারুল ইসলাম (সম্পা.), ঢাকা, বর্ষ ২১, সংখ্যা ২১, ১-১৫ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৮০

একজন প্রকৃত যোদ্ধার মতোই যুক্তি দাঁড় করিয়েছে সে, স্বৈরশ্বাসনের কালে আর কাদা ঘেঁটে লাভ নেই। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামরিক বুটের ভয়ে প্রত্যেকের পায়ে যখন অদৃশ্য শেকল, এই দেশ যখন অমাবস্যার ঘন দুর্যোগে আচ্ছন্ন, তখন ব্যক্তির চারিত্রিক পতন অনিবার্য। রাষ্ট্রের বিপদে পথে নামা যায়, মিছিল করা যায়, কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত প্রপঞ্চনার কষ্ট নীরবেই হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করে। যুবকের মতে :

> এই হচ্ছে দেশ, আর এই হচ্ছে মানুষ, আর এই হচ্ছে সময় ;
> তাই আমি অবাক বা দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ নই। [...]
> যদি নষ্ট হয়ে যায় নিজের ফসলের মাঠ, কি তবে কর্তব্য হয় ? –
> মিছিল কি নামানো যায় ? – শ্লোগান কি দেয়া যায় ? – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩০)

যুবকটি একটি পর্যায়ে প্রৌঢ় শিল্পীকে জানায় – সে যদি বুঝতে পারতো একটি মুহূর্তের জন্য হলেও প্রবীণ শিল্পী ভোগের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রীটির হৃদয়কে ভালবেসেছে, তবে হয়তো সে তাকে শ্রদ্ধা করতো ; কিন্তু যেখানে সুস্পষ্ট যে, এ মিলন কেবল দেহজ সংসর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, প্রাণের আকুতি নেই সেখানে, ফলত শিক্ষক ও ছাত্রী - উভয়ের প্রতিই তার কেবল ঘৃণা অবশিষ্ট আছে। একদিন রাজাকার-আলবদর যেমন তার মুক্তিকামী-সত্তার বিরোধিতা করেছিল, স্বৈরশাসকের অপশাসন যেমন তার স্বপ্ন লুট করেছে, তেমনি প্রবীণ শিক্ষকও আজ তার অগোচরে প্রেমকে লুট করে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে সে বুঝতে পেরেছে, এই নারীটির গোপন এই সম্পর্ক জানার পরও তার পক্ষে সম্ভব হবে না তার সাথে সংসার করা, কেননা সে গ্রাম থেকে উঠে আসা যুবক, 'গামছা ছেড়েছে কিন্তু রুমালে অভ্যস্ত নয়'। তাই সেও শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিতে চেয়েছে শিল্পের ছোঁয়ায়। সেটি একান্তই তার ব্যক্তিনির্মিত জগৎ ; সেখানে স্থান নেই কোনো ভ্রষ্ট প্রেমিকা কিংবা লুটেরা শিক্ষকের।

এছাড়া নাটকে নেপথ্য চরিত্র হিসেবে এসেছেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানের মতো মহৎশিল্পীরা। জয়নুল আবেদিন বর্ণিত হয়েছেন প্রৌঢ় শিল্পীর স্মৃতিকথায়। আর কামরুল হাসান উপস্থাপিত হয়েছেন যুবতীর জবানিতে। নাটকে এদের আলাদা কোনো উপস্থিতি না থাকলেও প্রধান চরিত্রগুলোর বিকাশে এঁরা নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছেন। অন্যদিকে প্রৌঢ় শিল্পীর প্রাক্তন প্রেমিকাদের স্বল্পমুহূর্তের উপস্থিতি ঘটেছে প্রৌঢ়ের জবানিতে। শিল্পীর সংলাপে জানা গেছে তাদের জীবনের ছোটো ছোটো গল্প। প্রথম প্রেমিকা শিল্পীর প্রতি অনুরক্ত হয়েও শুধুমাত্র সামাজিক বৈষম্যের কারণে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে সরকারি বড় অফিসারকে। দ্বিতীয় প্রেমিকা ছিল এক সরকারি আমলার স্ত্রী। অথচ দাম্পত্য জীবনে সে ছিল প্রচণ্ড অসুখী। যে কারণে সে শিল্পীর

সাহচর্যে এসে সুখ খুঁজে নিতে চেয়েছে। প্রথম প্রেমিকা শিল্পীকে ছেড়ে বিত্তবান আমলাকে বিয়ে করেছে। আর দ্বিতীয় প্রেমিকা অর্থ-বিত্তে থেকেও সুখী হতে পারেনি। সমাজের এ এক নিদারুণ চিত্র।

প্রাঙ্গণেমোর নাট্যদল প্রযোজিত *ঈর্ষা* নাটকে – নেপথ্যে একটি প্রজেক্টরের নান্দনিক ব্যবহারের কথা না বললেই নয়। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর নাটকে তিনটিমাত্র চরিত্রের সমাবেশে আলোচ্য নাটকের নাট্যক্রিয়া রচনা করেছেন, কিন্তু অনন্ত হিরা তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চে একটি প্রজেক্টর ব্যবহার করে তাকে চতুর্থ চরিত্র করে তুলেছেন। এই প্রজেক্টর ব্যবহৃত হয়েছে বহুমাত্রিকতায়। কখনো সেটি মঞ্চসজ্জার অঙ্গ হিসেবে স্টুডিও ও বসার ঘরের বিভাজক দেয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কখনো সেখানে চিত্রিত হয়েছে মঞ্চে উপবিষ্ট চরিত্রগুলোর মনোছবি। যেমন, নারী চরিত্রটি যখন তার গ্রামের তিস্তা নদীর কথা বর্ণনা করেছে, তখন পেছনের প্রজেক্টরে তিস্তা নদীর চমৎকার চিত্র ভেসে উঠে পুরো মঞ্চটিকে সংলাপের আবহ-উপযোগী করে তুলেছে। আবার বিমূর্ত চিত্রকলা, নারীর ন্যুড চিত্রাবলি ধারাবাহিকভাবে সংলাপানুসারে উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে। এমনকি যুবক চরিত্রটি যখন মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে তখন প্রজেক্টরে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ কিংবা উপর থেকে নিচে প্রবাহিত তরল লাল রক্তস্রোত চমৎকার এক বেদনামিশ্রিত অনুভূতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ প্রজেক্টরটিও পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্র হয়ে যেন কথা বলে উঠেছে। সফল নির্দেশকের হাতে একটি নিরীক্ষামূলক নাটক যে কতটা নান্দনিক ও বাস্তব হয়ে ওঠে তার প্রমাণ *প্রাঙ্গণেমোর* পরিবেশিত *ঈর্ষা* নাটক।

সৈয়দ শামসুল হক নাটকে সংলাপের শুরুতে ও শেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চনির্দেশনা যুক্ত করেছেন। এর ফলে পরবর্তীকালে নাটকটির সফল মঞ্চায়নে নাট্যপরিচালকের সুবিধা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান মন্তব্য করেন :

> *ঈর্ষা* নাটকের মঞ্চ সাফল্যের ব্যাপারে নাট্যকার নিজে এবং আমি নির্দেশক হিসেবে সন্দিহান ছিলাম। প্রায় ২০ মিনিটের দীর্ঘ সাতটি সংলাপের এই নাটক নিয়ে দুরুদুরু বক্ষে নাট্যকার ও নির্দেশক অপেক্ষা করছিলাম। নাটকটি বাংলাদেশের মঞ্চ জয় তো করলই, কলকাতায় প্রজ্ঞাবান ও সাধারণ দর্শকেরা নাটকটির প্রযোজনা দেখে মাথা অবনত করল। বাংলা থিয়েটারের প্রবাদপুরুষ শ্রী শম্ভু মিত্র নাটকটি দেখে সৈয়দ হককে বলেছিলেন, আপনার মাথায় কি শেকসপিয়ার ও রবীন্দ্রনাথের ছন্দের জোড় একসঙ্গে খেলা করে ?[১]

---

[১] আতাউর রহমান, শ্রদ্ধাঞ্জলি : ‘শিল্পের সংসারের এক মহাবীর’, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১১

প্রায় চার মাসব্যাপী দীর্ঘ অনুশীলনের পর ১৯৯১ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মঞ্চে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের ব্যানারে সৈয়দ শামসুল হকের *ঈর্ষা* নাটকটির শিল্পসফল মঞ্চায়ন সম্ভবপর হয়। নাটকটির প্রথম প্রদর্শনীতে দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশো জন। টিকিটের মূল্য ছিল বিশ, ত্রিশ ও পঞ্চাশ টাকা। নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জামালউদ্দিন হোসেন, তরুণ ছাত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নন্দিত অভিনেতা খালেদ খান। এবং তরুনী ছাত্রীটির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সারা যাকের। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের অভিনয়জগতের গুণী এই তিন শিল্পীর অনন্য অভিনয় দক্ষতাতেই নাটকটি বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসে মঞ্চে জীবন্ত হয়ে ধরা দিতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে নাট্যসমালোচক মফিদুল হক এক লেখনীতে উল্লেখ করেছিলেন :

> *ঈর্ষা* দুরূহ নাটক, কিন্তু উঁচুমানের অভিনয় ও পরিকল্পনা আমাদের এমন এক নাট্যাভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে যা দীর্ঘকাল মনে গেঁথে থাকবে। অভিনয়ে খালেদ খান অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন, তাঁর স্বর প্রক্ষেপণ ও বাচনিক দক্ষতা চরিত্রের গভীরতা ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। সারা যাকের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মানানসই করে নিতে পেরেছেন। কেবল দু'একটি ক্ষেত্রে তার স্বরের বিলম্বিত লয় ভুল জায়গায় প্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। জামালউদ্দিন হোসেন প্রৌঢ় শিল্পীর বেদনার ভাব প্রকাশে যতটা না সফল তার চেয়ে বেশি সার্থক হয়েছেন শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে। তবে দাপটের সঙ্গেই দীর্ঘ একক সংলাপের জটিল নাটক, তিন গুণী শিল্পী মূর্ত করে তুলেছেন মঞ্চে।[১]

অন্যদিকে প্রৌঢ় চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতা জামালউদ্দিন হোসেন এ-নাটকে তাঁর অভিনয়-অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এক লেখনীতে বলেছেন :

> একটি সংলাপের দৈর্ঘ্য দেখে আমরা, অভিনেতারা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ... একি মুখস্ত করা সম্ভব! হক ভাই বললেন যে, তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান যে আমাদের দেশে মঞ্চনাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদের stamina ও tenacity কতটুকু। এটা একটা challenge! তাঁর আশ্চর্য কাব্যময় সংলাপের গুণে চ্যালেঞ্জটা আমরা নিতে পেরেছিলাম।[২]

অন্যদিকে, সেময়কার প্রযোজনায় মঞ্চের নেপথ্যে যারা কারিগর হিসেবে ছিলেন তারা হলেন :

---

[১] মফিদুল হক, 'ঈর্ষা : নাগরিকের ঈর্ষণীয় প্রযোজনা', *দৈনিক সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৯২, পৃ. ৮

[২] জামালউদ্দিন হোসেন, 'হক ভাই ও তাঁর 'সব শেষের সংসার', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ: ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৮

নির্দেশনা : আতাউর রহমান, মঞ্চ পরিকল্পনা : মনসুর আহমদ, আলো পরিকল্পনা : দিলীপ ঘোষ, আলোক পরিকল্পনা সহকারী ও নিয়ন্ত্রণ : নাসিরুল হক, আলোক প্রক্ষেপণ : সিরাজ আহমদ, আবহ সঙ্গীত পরিকল্পনা : কে. বি. আল-আজাদ, পরিচ্ছদ পরিকল্পনা : টুটুল আহমেদ, রূপসজ্জা : বঙ্গজিৎ দত্ত, তপন দাস, মিলনায়তন অধিকর্তা : ফারুক আহমেদ।[১]

বর্তমানে *প্রাঙ্গণেমোর* নাট্যদলের প্রযোজনায় *ঈর্ষা* নাটকটি দেশে বিদেশে মঞ্চস্থ হচ্ছে। *প্রাঙ্গণেমোর* নাট্যদলের অষ্টম প্রযোজনা সৈয়দ শামসুল হকের ঈর্ষা কাব্যনাটক। এ-সময় প্রৌঢ় চরিত্রে অভিনয় করছেন তরুণ অভিনেতা রামিজ রাজু, যুবক ছাত্রের ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনন্ত হিরা এবং তরুণী ছাত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন নূনা আফরোজ। নাটকটির নির্দেশনা দিচ্ছেন অনন্ত হিরা, মঞ্চপরিকল্পনা : শাহীনুর রহমান, আলোক পরিকল্পনা : জিল্লুর রহমান, সঙ্গীত : রামিজ রাজু এবং পোশাক পরিকল্পনা করছেন নূনা আফরোজ।[২]

ঈর্ষা নাটকটিকে দীর্ঘদিন পর আবারো নতুন করে মঞ্চে আনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে *প্রাঙ্গণেমোরের* প্রতিষ্ঠাতা অনন্ত হীরা এ নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করে এ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

> *ঈর্ষা* নিঃসন্দেহে এ কালে তো বটেই আগামীকালেও নিরীক্ষাধর্মী কাব্যনাট্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। *নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের* প্রযোজনায় আতাউর রহমানের নির্দেশনায় ও দুঃসাহসিক নিরীক্ষার সঙ্গে খালেদ খান, সারা যাকের আর জামালউদ্দিন হোসেনের অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা ও সৈয়দ হকের কাব্যের জাদুতে হলভর্তি দর্শক বুঁদ হয়ে থেকেছে ওই নাটকের প্রতিটি প্রদর্শনীতে। ওই প্রযোজনা ২১ বছর পরেও আবার নতুন করে মঞ্চে যে এসেছে তা কেবল এ জন্যই ঈর্ষা নাটকটি যে-কোনো চ্যালেঞ্জ আর নিরীক্ষাপিয়াসী নির্দেশক, অভিনেত্রী আর অভিনেতাকে যেন প্রেমিকার মতো করে আহ্বান জানাতে থাকে আর বলতে থাকে – আমাকেও নাও, তোমার কর্মমুখর শিল্পজীবনে যুক্ত করো এবং নিজেকে নির্দেশক, অভিনেতা বা অভিনেত্রী হিসেবে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ করো, প্রমাণ করো নিজেকে মঞ্চতীর্থে।[৩]

সাতটি দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে *ঈর্ষা* নাটকের আখ্যান রচিত হয়েছে। এখানে প্রৌঢ় চরিত্রের তিনটি সংলাপ ও যুবতী ও যুবক চরিত্রের দুটি করে সংলাপ রয়েছে। প্রৌঢ় চরিত্রের তিনটি সংলাপের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা যথাক্রমে ২৫১, ২৪২ ও ১৭১। যুবতী চরিত্রের দুটি সংলাপের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ২৬৮ ও ২৮৪। অন্যদিকে যুবক চরিত্রের

---

[১] তথ্যসূত্র : সাবিরা মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

[২] তথ্যসূত্র : 'একবছর পর মঞ্চে প্রাঙ্গণেমোর এর *ঈর্ষা*,' বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম (অনলাইন), ৩ জানুয়ারি ২০১৯

[৩] অনন্ত হিরা, 'মোহন ঝরা, সোনার কলমওয়ালা একজন', পাক্ষিক *অন্যদিন* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

সংলাপে পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৩৪৮ ও ২৪৬। প্রচলিত নাটকের ফর্মকে অনুসরণ না করে মৌলিক চিন্তনে এরকম নতুন নাট্যফরমেটে নাট্যউপস্থাপন সমকালে নাট্যবোদ্ধা ও নাট্যদর্শকদের মধ্যে দারুণ চমকসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। সকলেই ভেবেছিলেন পাশ্চাত্ত্য নাটকের কোনো প্রভাবে হয়তো সৈয়দ শামসুল হক এদেশের প্রেক্ষাপটে নাটকের ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু নাট্যকার এই বিষয়টি উপলব্ধি করে নাটকের প্রারম্ভেই জানিয়েছেন, চমক সৃষ্টির জন্য নয় বরং বিষয়বস্তুর সঠিক উপস্থাপনাকে গুরুত্ব দিতেই তিনি সংক্ষিপ্ত চরিত্র এবং অঙ্ক-দৃশ্য বিভাজনবিহীন নাট্যকাঠামো গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন :

> তিনটি চরিত্র আর তাদের দীর্ঘ সাতটি সংলাপে বয়ন করা হয়েছে এই নাটকের বস্ত্র; প্রচল বহির্ভূত এই করণ, বিষয়টির তুলনায় বেশি কৌতূহলের বলে মনে হতে পারে, এমনকি এর পাণ্ডুলিপিকালে কারো কারো মনে হয়েছে; তাই এখানেই বলে রাখা দরকার যে, কোনো চমক সৃষ্টির জন্যে নাটকের এ হেন রূপ আমি নির্মাণ করিনি ; ঈর্ষার বিশুদ্ধ একটি মানবিক পরিস্থিতিই আমাকে ঠেলে দিয়েছে চরিত্র-সংখ্যা অন্তিম অবধি কমিয়ে রাখবার এবং অন্তর্মুখী দীর্ঘ সংলাপ বাঁধবার দিকে।[১]

তিনটি চরিত্রই যেহেতু শিক্ষিত আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি, নাট্যকার তাই এদের মুখের সংলাপে আধুনিক, মার্জিত চলিতভাষা প্রয়োগ করেছেন। তবে নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে তিনটি চরিত্রেরই বাক্যালাপে স্বতন্ত্র ঢং রয়েছে; উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প চয়নে কিংবা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দপ্রয়োগে তারা হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। প্রৌঢ় চরিত্রটি দেশের একজন নামকরা চিত্রশিল্পী। খ্যাতি, অর্থ, বিত্ত সবকিছুতেই তিনি অন্য দুটি চরিত্র থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু অবস্থানে। তাই তাঁর বলা সংলাপের ভাষা দাম্ভিকতাপূর্ণ, গাম্ভীর্যমণ্ডিত। অন্যদিকে মেয়ে চরিত্রটি গ্রাম থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ শিক্ষার্থী। যে-কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হয়তো তার কথায় শ্লেষের উপস্থিতি আছে, তির্যক ভঙ্গিমা আছে কিন্তু তার মধ্যেও রোপিত হয়েছে ফেলে আসা গ্রামীণ চিত্রপট, ফেলে আসা ভালোবাসার নদী তিস্তার জন্য হাহাকার। সে মূলত এ-কাব্যনাটকে ব্যবহৃত চরিত্র। তাই নিরুপায় অসহায়ত্ব তার সংলাপে অধিক স্পষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে যুবক চরিত্রটিও গ্রাম থেকে উঠে আসা আর্টের শিক্ষার্থী। কিন্তু সে একাধারে মুক্তিযোদ্ধা। দেশের ক্রান্তিলগ্নে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাই তার ভাষায় যেমন দ্রোহ আছে, তেমনি দেশকে নিয়ে স্বপ্নও রয়েছে। সে-ও প্রৌঢ় ব্যক্তির সরাসরি ছাত্র, কিন্তু তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিরোধিতা করতে গিয়ে সে ন প্রৌঢ় ব্যক্তিকেও ছেড়ে কথা বলেনি। বরং বিভিন্ন অনিয়ম ও বঞ্চনার কথা তুলে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবে তাঁদের সংলাপের

---

[১] সৈয়দ শামসুল হক, 'সবিনয় নিবেদন: ঈর্ষা', *কাব্যনাট্যসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

ভাষায় একটি সাধারণ মিল সহজেই চোখে পড়েছে। সেটি হলো রঙের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার। তাঁরা তিনজনই যেহেতু শিল্পের সঙ্গে জড়িত, তাই একজন নিপুণ দক্ষ শিল্পীর মতোই তাদের কথোপকথনে আর্টের নানান কৌশল ও রঙের উল্লেখ রয়েছে। যেমন :

ক. প্রৌঢ় শিল্পী :

আমি গাল থেকে রঙ মুছে, ঘষে তুলে, পানি দিয়ে ধুয়ে দিলাম, /ঐ, তোমার ওখানে সিঁদুরের লাল হয়ে গেল, অপরূপ ভারমিলিয়ন, / যেন সদ্য টিউব থেকে সরাসরি বাঁ গালে তোমার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২০)

খ. যুবতী :

বর্ষায় পাগল নদী, কালীগঙ্গা যদিও তিস্তার মতো খরস্রোতা নয়, / তিস্তার মতো তার ইয়োলো আকার নেই বর্ষার দু'কূল ভাসানো জলে, / সেই প্রথম দেখলাম, / স্যাপ গ্রীন কে যেন পানিতে বড় হালকা করে মিশিয়ে দিয়েছে – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২৩)

গ. যুবক :

আহ্ যদি পারতাম রঙ তুলে নিতে, সব রঙ। প্রেমের কেমন রঙ? / আগুনের অরেঞ্জ? – নাকি প্রুসিয়ান ব্লু– ক্যাডমিয়াম ইয়োলো অথবা? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩২)

অন্যদিকে, সৈয়দ শামসুল হক প্রমিত চলিত ভাষায় সংলাপগুলো সাজালেও প্রয়োজন অনুসারে সংলাপে ভাষার কথ্যরূপ সংযোজন করে ভাষাকে আরও নাট্যিক ও বাস্তব করে তুলেছেন। যেমন, প্রৌঢ় ব্যক্তির জবানিতে যখনই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের স্মৃতিচারণমূলক কোনো সংলাপ বলিয়েছেন, তখনই নাট্যকার প্রমিত ভাষা ছেড়ে সংযুক্ত করেছেন ভাষার কথ্যরূপ। ফলে প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রমিত ভাষার একটানা কাব্যিক সংলাপের মাঝে হঠাৎ করে এমন আঞ্চলিক সংলাপ যেমন নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তেমনিভাবে এই আঞ্চলিক সংলাপের মাধ্যমেই বিমূর্ত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন হঠাৎ করে আমাদের মাঝে মূর্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। এই সংলাপ ব্যবহারের অভিনবত্বের কারণেই পাঠক-দর্শক যেন ফিরে গেছেন অসুস্থ জয়নুলের শয়নকক্ষে। এখানেই মূলত সৈয়দ শামসুল হকের সংলাপ নির্মাণের সার্থকতা। এরকম একটি সংলাপ দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

তিনি বিদায়ের আগে, হাসপাতালের কেবিনে,
ক্যানসারে আক্রান্ত তাঁর কণ্ঠস্বর, কর্কশ ও ফিসফিস, শোনা যায় কি যায় না,
জীবনে দ্বিতীয়বার আবার আমার কাঁধ এবার খামচে ধরে বললেন,
'আমারে নি নিয়ে যাইতে পারো একবার সেই দুফর বেলায় ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে,

তারে আমি দ্যাখতাম।'– 'কারে, স্যার ?' – 'আহ, কিচ্ছু বোঝো না।' [...]

'তারে আমি আবার আকঁতাম,

আবার পাইলে তারে বিয়া করতাম।' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৫)

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত সংলাপে প্রমিত ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার নিপুণ প্রয়োগের পাশাপাশি চরিত্রের উচ্চারিত একটানা সংলাপের মাঝে অদৃশ্য চরিত্রের সঙ্গে সংলাপ বিনিময়ের দৃষ্টান্তও রয়েছে। জয়নুল আবেদীনের 'তারে আমি দ্যাখতাম' সংলাপের পর প্রৌঢ় চরিত্রের সংলাপ 'কারে স্যার?' এর উত্তরে আবার জয়নুলের সংলাপ 'আহ, কিচ্ছু বোঝোনা' এখানে চমৎকার নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পুরো কাব্যনাটকে চরিত্রের বহমান সংলাপের মাঝে মাঝে এরকম সংলাপ বিনিময়ে নাটকীয়তা নির্মাণের আরও বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে। যেমন – প্রৌঢ়শিল্পীর সঙ্গে যখন হরিণের খাঁচার সম্মুখে ছাত্রী মেয়েটির প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখনও এরকম পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ে নাটকের আখ্যানভাগ অগ্রসর হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে দৃশ্যটি উপস্থাপন করা যেতে পারে :

একদিন মনে আছে – ভাস্কর্য বিভাগের দিকে যাচ্ছি,

তুমি হরিণের খাঁচার সমুখে, কোমল ও ছোট্ট দাঁতে কুচ কুচ করে ঘাস

ছিঁড়ে খাচ্ছে সে, আর তুমি বড় ঝুঁকে হরিণ দেখছো,

আমাকে দেখেই হাত তুলে থতমত খেয়ে বললে, 'ভালো, স্যার?'

আমি বললাম, 'কোন ইয়ার ? 'প্রি-ডিগ্রি সেকেণ্ড, স্যার।'– স্যার?

অস্বীকার করবো না আজ, সেদিন প্রথম মনে হয়েছিল বুড়ো হয়ে গেছি, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৯)

এখানে হরিণের খাঁচায় হরিণের কুচকুচ করে ঘাস খাওয়ার দৃশ্যও প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে যেটি বাস্তবরূপ লাভ করেছিল প্রৌঢ়ের মোহের খাচাঁয় শিল্পচর্চার নামে হরিণীসম কুমারী ছাত্রীর অসহায় বন্দিদশা, এবং তাকে কুচ কুচ করে প্রৌঢ় শিক্ষককর্তৃক গ্রাস করার ঘটনাংশ। এরকম সংলাপ বিনিময় ছাড়াও একটি চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সূত্রে অন্য আরেকটি চরিত্রের উচ্চারিত সংলাপ নাটকটিকে একক চরিত্রের দীর্ঘসংলাপের ক্লান্তি থেকে মুক্ত করে নাটকীয় পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। যেমন, নাটকের প্রথম সংলাপে প্রৌঢ় যখন এককভাবে সংলাপ বলে যাচ্ছেন নির্দিষ্ট কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে, তখন হঠাৎ করেই তিনি একটি সংলাপ উচ্চারণ করেন, যা দ্বারা অপর নারীর চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুবতীকে যখন প্রৌঢ় তার সাবেক প্রেমের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ করেই বলে ওঠেন :

– বাহ্, তবে স্পর্শেরও অধিকার নেই আর ? আঙুল ফেরালে ?

এত ঘৃণা ? অসহ্য এতই ? এতই দূরত্ব আজ ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২০)

এই সংলাপে স্পষ্ট ভাবেই বোঝাগেছে সংলাপ বলার ফাঁকে প্রৌঢ় আবেগের আতিশয্যে যুবতীকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুবতী তীব্রভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তার আঙুল সরিয়ে দিয়েছে। নাটকের সাতটি সংলাপের মাঝে মাঝে এমন অসংখ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শিল্পিত উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। আলোচ্য কাব্যনাট্যে সৈয়দ হকের তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা ও ছন্দের গাঁথুনি সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

> *ঈর্ষা* কাব্যনাটকে সৈয়দ শামসুল হক দক্ষতার সাথে আধুনিক কবিতার ঢঙ ব্যবহার করেছেন। আধুনিক কালের কবিতায় ব্যবহৃত গদ্যছন্দের যে ব্যবহার দেখা যায়, তার যথাযথ ব্যবহার *ঈর্ষা* কাব্যনাটকে নাট্যকার দক্ষ হাতে করেছেন। শুধু গদ্যছন্দের দোলায় নাট্যসংলাপ দোলায়িত হয়নি, মাঝেমধ্যে নাট্যসংলাপে অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারও লক্ষণীয়। নাট্যসংলাপের আলংকারিক সৌন্দর্য রচনায় কবির ভাষা সংহত, মার্জিত। [...] তাঁর কাব্যনাটকের সংলাপে অনায়াসে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, চিত্রকল্প, অনুপ্রাস প্রভৃতির সন্ধান মেলে। যদিও অধিক পরিমাণে কাব্যিকতার ব্যবহারে কাব্যনাটকের নাট্যগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তথাপি সৈয়দ শামসুল হক দক্ষ হাতে তাঁর নাট্যসংলাপে কবিতার মাধুর্য মিশিয়ে দেন। শিল্প বিষয়ে কবির ব্যবহৃত শব্দসমূহ শিল্পের ব্যবহারিক তাৎপর্য চিত্রশিল্পের প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এ কাব্যনাটকের বিশিষ্টতা।'[১]

ঈর্ষা কাব্যনাটকের কয়েকটি নান্দনিক কাব্যালংকারের উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

উপমা :

১. সমুখেই নিজস্ব করে নিজের কুটির আছে / সোনার ডাঁটার মতো খড় দিয়ে ছাওয়া –(কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২৫)

২. আমি ফুলদানিটার মোড়ক খুলেছি কি খুলিনি তখনো, / ঠিক কালীগঙ্গার মতো আপনি চুমো হয়ে জড়িয়ে ধরলেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২৬)

৩. সিন্দাবাদের কাঁধে নাছোড় বৃদ্ধের মতো নিঃসঙ্গতার ভূত / কত দীর্ঘদিন আমি টেনে টেনে বয়ে বেড়িয়েছি, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৩)

৪. তারপর তাকে ঘিরে, নিবিষ্ট তাঁতীর মতো স্বপ্নের শাড়ি বুনলাম। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৪)

---

[১] অনুপম হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬

৫. আপনার নির্জন ঘরে গোলাপি চাদরে শোয়া এমন একটা শরীর; /সরোদের মতো মাজা গা থেকে পিছলে পড়ছে আলো; (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৯)

উৎপ্রেক্ষা :

১. তোমার সঙ্গে একটি জীবন গেছে, / যেন গেছে একটি মুহূর্তের মধ্যে শত শত শতাব্দীর কোটি কোটি দু'জনার প্রেম। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৩)

২. নীল, নীল নীল, কি ভীষণ নীল, যেন বিশাল চিলের ডানায় মোড়া পৃথিবীটা – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৩)

৩. জলের কি অবিরাম চাপড় নৌকোয়, যেন আমাদের যুগলকে দেখে / করতালি দিয়ে চলেছে আনন্দে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৪)

৪. কি আশ্চর্য আভা ছিল তোমার শরীরে, জগতের সমস্ত সিঁদুর যেন উপুড় / ঢেলেছে কেউ, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৬)

৫. কোমল বৃক্ষের যেন ছোট দু'টি ডাল, তোমার পা, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৬)

রূপক / প্রতীক :

১. ফেরে পাখি, পাখিরাই ফিরে আসে / সারাদিন পরে সন্ধ্যায় (৩১৩) [প্রবীণ শিল্পী তার বাঞ্ছিতা ছাত্রীকে প্রেমের বাঁধনে ফিরে আসার আহবান প্রসঙ্গে আলোচ্য পাখির নীড়ে ফিরে আসা প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন]

২. সেদিন প্রথম আমি এই মুখ, এই ফুল, জীবনের আশ্চর্য গোলাপটিকে / ক্যানভাসে আঁকতে চেয়েছি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৮) [প্রবীণ শিল্পী তাঁর বিমূর্ত চিত্রজগৎ ভুলে ইপ্সিত ছাত্রীর মোহে ভুলে তাঁর ন্যুড ছবি আকঁতে চেয়েছেন, আর এ প্রসঙ্গেই তিনি গোলাপ ফুলের রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন।]

৩. যেখানে আমার প্রেম শাড়ি–জামা খুলে শুয়ে আছে, বসে আছে, উজ্জ্বল তেল রঙে দুঃসহ শোক হয়ে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩১) [স্ত্রী এবং প্রেমিকার ন্যুড টিত্রকর্মকে যুবক দুঃসহ শোকের প্রতীকে বর্ণনা করেছে এখানে।]

৪. আমি গ্রাম থেকে উঠে আসা লোক, / কাঁধের গামছা ছেড়েছি, কিন্তু এখনো রূমালে অভ্যস্ত নই ; (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৯) [যুবকের মধ্যে এখনও গ্রামীণ মৌলিক সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রয়ে গেছে, যে কারনে সে শিল্পের দোহাই দিয়ে নিজ সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর অতীতে প্রৌঢ় শিল্পীর ন্যুড ছবির মডেল হবার বিষয়টি কেবল আধুনিক শিল্পের জন্য উদারতা হিসেবে মেনে নিতে পারছে না । এখানে গ্রাম্য সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে গামছা প্রতীকে, আর শহুরে সংস্কৃতির প্রতীক রূমাল ব্যবহার ।]

৫. কি দোষ আপনাকে দেবো ? তন্দুর নিভু নিভু হয়ে এলে / সকলেই নতুন কাঠের জন্য বাজারে বেরোয়। আর তুমি সেই কাঠ। তুমি সেই তন্দুরের নির্বাক খোরাক। / যাক তবে কবরের গর্ভে যাক ভালোবাসা, /কাবিনের কাগজে ঠোঙা অন্ধবুড়ি এখন বানাক। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৫৫) [এখানে প্রৌঢ় শিল্পীর নারী-লোলুপতার সঙ্গে অগ্নিগর্ভ তন্দুরের প্রতীকায়ন করা হয়েছে; এবং তার স্ত্রী বিনাবাক্যে সেখানে জ্বালাময়ী কাষ্ঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে কারণে প্রতারিত যুবকের কাছে এখন মেয়েটির সঙ্গে বিয়ের কাবিন গুরুত্বহীন। সেটি এখন অন্ধ বুড়ির ঠোঙা বানানোর কাগজের মতোই তুচ্ছ, গুরুত্বহীন মামুলি কাগজমাত্র।]

চিত্রকল্প :

দেখেছি তিস্তাকে; বর্ষায় বিপুল বিস্তার; অরণ্য উপড়ে নিয়ে / প্রবল ঘূর্ণিতে তিস্তা ইয়োলো আকার বুকে হা হা করে দক্ষিণের দিকে/ ধেয়ে যায় দুই পাড় অবিরাম ভেঙে। আবার শীতের দিনে, /স্বচ্ছ শীর্ণ তিস্তা তার গতিহীন বুকে নীল জলরঙ নিয়ে চুপ,/তীরে মাছরাঙাটির মতো যেন একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২১)

সমাসোক্তি :

১. সময়টা বিকেল ছিল, আকাশের নীল ছিঁড়ে মেঘেরা খাচ্ছিল, আমার ভেতরে /একটা ভীষণ ভীতু হরিণ খাচ্ছিল গোপন সবুজ ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে শব্দহীনভাবে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৯)

২. বাতাস নিঃশ্বাস হয়ে টের পাই সর্বাঙ্গে আমার কি যেন বলতে চায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২৪)

৩. চারিদিকে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে /শেষ অবধি আমাকেই প্রতিধ্বনি বরফের কম্বল হয়ে জড়িয়ে ধরেছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৩)

৪. শীতের মৌসুম ছিল। হিমালয় থেকে শীত উড়ে আসছে বিশাল পাখায়, ... (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৫৬)

প্রবাদ / প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১. মানুষ দুর্বল তার অভ্যাসের কাছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৩৪১)

২. খ্যাতি বলে বিশ্বে কিছু নেই, /আছে শুধু স্তুতি, আছে মিথ্যা প্রশংসার স্তূপ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪২)

৩. অটুট কিছুই নয়, সমস্তই হবে ক্ষয় ; /ক্ষয় থেকে পূর্ণিমার আবার উদয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৫৬)

৪. বাড়িতে ডাকাত যদি পড়ে, বেহালা যে বাজায় তাকেও বল্লম হাতে নিতে হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৩৫)

আলোচ্য নাটকে সৈয়দ শামসুল হকের সংলাপ শব্দমাধুর্যে, ছন্দের লালিত্যে, উপমা-চিত্রকল্প-অলঙ্কারের সুষমবিন্যাসে অনন্য হয়ে ধরা দিয়েছে। নাটকটি মঞ্চে প্রদর্শিত হবার পর সকলেই এর ভাষামাধুর্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তবে কোনো কোনো সমালোচকের কাছে কিছু সংলাপ বাহুল্যদোষে দুষ্ট ও আরোপিত মনে হয়েছে। যেমন নাটকটির *নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়* পরিবেশিত মঞ্চপ্রর্দশনী উপভোগের পর নাট্যবোদ্ধা মফিদুল হক এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছিলেন :

> নাটকে আরেক সাধুবাদ অভিনেতাদের প্রাপ্য। তারা কাব্যনাটকের সংলাপকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে এসছেন, ফলে সংলাপের ব্যঞ্জনা আরো তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে, এবং বাস্তবোচিত অভিনয় দীর্ঘ একক সংলাপের নাটকে যে একঘেয়েমি ও অভিনয়হীনতা, বিশেষত মঞ্চস্থিত অন্যান্য নীরব পাত্র পাত্রীর ক্ষেত্রে, তা অনেকটাই পরিহারে সক্ষম হয়েছে নাগরিকের প্রযোজনা। এ ক্ষেত্রে নাট্যকারের অবদানও অনস্বীকার্য, তার চমৎকার স্বাদু সংলাপ প্রায় সর্বক্ষণ, ঝংকার তুলে চলে মঞ্চে। যদিও মাঝে মাঝে একবারে নিরেট বক্তব্য সংলাপে মাথাচাড়া দিয়ে যে ওঠে না তা নয়, শুরুতেই যেমন আমরা শুনি 'একবার চৌকাঠ পেরুলে আমাদের সমস্ত চৌকাঠ পাহাড় হয়ে বাধা দেয়'। নাটকের শেষে প্রবীণ শিল্পীর শেষ সংলাপেও এসে যায় বাহুল্য বক্তব্য, অভিনেতা জামালউদ্দিন হোসেনও যেভাবে মঞ্চের অস্তিত্বের পার্থক্য বোঝাতে থাকেন সেখানে মূর্তিমান রসভঙ্গই ঘটে। রসভঙ্গের আরো কিছু বিক্ষিপ্ত উদাহরণও রয়েছে। একটি ক্ষেত্রে অন্তত নাট্যকারকে অভিযুক্ত করতে হয়। যুবক শিল্পীর মুক্তিযুদ্ধকালীন অতীত চরিত্রে মাত্রা যুক্ত করলেও পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিজীন ও সামাজিক জীবন তোলপাড় হয়ে যাওয়ার যেসব বয়ান তা অভিভাষণ এবং আরোপিতও বটে। অনেকটাই মেঠো রাজনৈতিক ডেমাগোগিরি মতো এইসব প্রক্ষিপ্ত সংলাপ কোনো যুক্তি পরম্পরা বহন করে না।'[১]

[

আলোচ্য নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) অপরিহার্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। নাট্যকার উপযুক্ত ভাবপ্রকাশে যেমন, তেমনি চরিত্রের অন্তর্গত বোধ প্রকাশেও রবীন্দ্র-সংগীত আবহ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাটকটির প্রারম্ভে লেখক যে মঞ্চনির্দেশনা দিয়েছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ গানের কথা আবহ হিসেবে ব্যবহারের জন্য বলেছেন :

> দর্শক সমাগমের শুরু থেকেই মঞ্চ উন্মুক্ত এবং আলোকিত। একটি গানের সুর – রবীন্দ্রনাথের 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখি জলে – কেবল একটি বা দু'টি যন্ত্রে বাদিত। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৩)

---

[১] মফিদুল হক, 'ঈর্ষা: নাগরিকের ঈর্ষণীয় প্রযোজনা', *দৈনিক সংবাদ*, ১০ মার্চ, ১৯৯২, পৃ. ৮

আবার প্রৌঢ় যখন তার অতীত জীবনের প্রেমিকাদের স্মৃতি স্মরণ করছিলেন, তখন তার তৃতীয় প্রেমিকা মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রীর সংগীতপ্রেম প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সংগীত। প্রৌঢ়ের উক্তিতে নাট্যকার লিখেছেন :

> আমাকে সান্ত্বনা দিতে একজন এলেন; নিঃসন্তান বিধবা মহিলা –
> বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল স্বামী; [...]
> কিছু কিছু গাইতেও পারতেন – গান শোনাতেন।
> সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুল না।' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৪৬)

এখানে রবীন্দ্রনাথের এই সংগীতটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ একারণে যে, মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বর্তমানে প্রবীণ শিল্পীর সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও এখনও যে তার শহীদ স্বামীর স্মৃতি ভুলতে পারেনি, তা স্পষ্ট করা। এর মাধ্যমে বর্তমান প্রেমিক শিল্পীর অন্তরে জন্ম নিয়েছে ঈর্ষাবোধ।

আবার, জীবনানন্দ দাশের মতো করে এ-নাটকে সৈয়দ হক রং ও প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে যখনই গাছ, পাখি, নদী আর গ্রামীণ প্রকৃতির চিত্র বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে জীবনানন্দ দাশ উঁকি ঝুকি দিয়েছেন। প্রেমে আবিষ্ট প্রৌঢ়ের চোখে যখন দুপুরের নিস্তব্ধতা ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার তখন 'চিল', 'চিলের ডানা'র চিত্রকল্প প্রয়োগ করে লিখেছেন :

> মনে পড়ে? একদিন দুপুর বেলায়, যে-রকম দুপুর বেলাকে আশ্চর্য নীল রঙ
> বলে মনে হয় ; নীল নীল কি ভীষণ নীল, যেন বিশাল চিলের ডানায় মোড়া
> পৃথিবীটা – স্বচ্ছ ডানা, ডানার ভেতর দিয়ে আলোর প্রবেশ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩১৪)

চিলের প্রতীক জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি তাঁর *বনলতা সেন* কাব্যেও 'হায় চিল' নামক একটি কবিতা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, মাত্র তিনটি চরিত্রের সাতটি সংলাপে রচিত সৈয়দ হকের *ঈর্ষা* কাব্যনাটক, বাংলাকাব্যনাটকের ইতিহাসে অভিনব সংযোজন। বিষয় বস্তুর অভিনবত্বে, সংলাপের লালিত্যে, চরিত্রের বলিষ্ঠ উপস্থাপনে নাটকটি শিল্পগুণে অনন্য হয়ে উঠেছে।

নারীগণ

সৈয়দ শামসুল হক পলাশীর বিয়োগবিধুর ইতিহাসকে আত্তীকৃত করে *নারীগণ* নাটকের বিষয়বস্তু সাজিয়েছেন। তবে নাটকটি ইতিহাসের উপাদানে রচিত হলেও পুরোপুরি ঐতিহাসিক নাটক না হয়ে হয়ে উঠেছে আধুনিক নারীবাদের প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক ইতিহাসের বাঁকবদলের বাস্তব উপস্থাপনায়, অবহেলিত নারীসমাজের মনোকথন বর্ণনায়, পরিবেশনরীতির নান্দনিকতায়, ভাষাপ্রয়োগের অনন্যতায় এ-নাটকটি হয়ে উঠেছে অসামান্য।

নারীগণ নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই নারী। প্রহরীগণ ও চার কুতুব হলো দৃশ্যমান পুরুষ চরিত্র। তবে নাটকে প্রহরীদের ভূমিকা একেবারেই গৌণ, চার কুতুব দলীয় চরিত্র হিসেবে কিছুটা গ্রিক নাটকের কোরাসের ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের প্রারম্ভে তারা যেমন পলাশীর ইতিহাস বর্ণনা করেছে, তেমনি নাটকের অন্তিমেও নাট্যঘটনার পরবর্তী কাহিনি ইতিহাসের আলোকে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেছে।

নাটকটিতে যেসব নারী চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে তারা হলো : নবাব আলিবর্দী খানের বিধবা স্ত্রী শরিফুন্নেসা, আলিবর্দীর কন্যা ও নবাব শিরাজদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগম, শিরাজদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা, শিরাজদ্দৌলার শিশুকন্যা মুন্না, মুন্নার আয়া পায়েলি, লুৎফুন্নেসার একান্ত সেবিকা ডালিম, জনৈক হিন্দু বাঈজি, এবং নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠকন্যা ঘসেটি বেগম। এছাড়া বৃন্দনারী চরিত্র হিসেবে রয়েছে – মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল প্রাসাদের অন্দরমহলের বাঁদিগণ। যেহেতু নাটকের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজমহলের নারীদের বিপর্যস্ত অবস্থার উপস্থাপন, তাই নাট্যকার অত্যন্ত কৌশলে পুরুষ চরিত্রগুলির ভূমিকা এড়িয়ে গেছেন।

নাটকের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বপ্রবীণা আলিবর্দীর স্ত্রী শরিফুন্নেসা। জীবনাভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ এ নারী নবাব-অন্তঃপুরের সর্বময় কর্ত্রী। তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দীর একমাত্র স্ত্রী। আলিবর্দীর শাসনকালে সংঘটিত নানান রাজনৈতিক সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ তিনি যেমন বাস্তবতার নিরিখে অবলোকন করেছেন, তেমনি দৌহিত্র শিরাজের মৃত্যুর পর বিগতদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে মহলের অন্য নারীদের পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন। যে কারণে তিনি কখনো কখনো শোকাহত শিরাজের মাতা ও বধূকে অতীতের গর্বিত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, আবার কখনো মহলের নারীদের কর্তব্য ও ভবিতব্য সম্পর্কে সচেতন করে

তুলেছেন। তিনি নবাবমহিষীই কেবল নন, একজন মা-ও। ফলে কন্যা আমিনা ও তার পুত্রবধূ লুৎফুন্নিসাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে একপর্যায়ে অপর কন্যা ঘসেটিকে মিথ্যে প্রলোভন দেখানোর কথাও ভেবেছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও তিনি সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিদ্যমান সমাজসম্পর্কিত তাঁর একটি উক্তি নাট্যকার অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন :

শরিফা। হস্তী পড়ে গেলে চুহা হস্তী হতে চায় ! [...]
বিধর্মী, কাফের, শেঠ, বানিয়া, গোমস্তা, গোরা,
দেশবেশ্যা, নীতিবেশ্যা, ধর্মবেশ্যা, চারিদিকে ওরাই এখন।
স্বর্ণলোভী ওরা। বিষ্ঠা থেকে খুঁটে যদি তুলতেও হয়,
তুলতে পিছপা নয়। ক্ষমতার লোভী ! [...]
অতএব রাষ্ট্রদস্যু সিংহাসন কাড়ে।
সিংহাসন পাওয়া মানে লুণ্ঠনের সুযোগ অপার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪২২)

মুর্শিদাবাদ রাজমহলের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, বাস্তবেও আলিবর্দী-পত্নী শরিফুন্নেসা এমনই বিচক্ষণ ও রাজনীতি-সচেতন নারী ছিলেন। এমনকি নবাব আলিবর্দী খাঁ যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে রাজধানীর বাইরে থাকতেন, তখন শরিফুন্নেসা প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। শরিফুন্নেসার এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ শ্রী নিখিলনাথ রায় তাঁর গবেষণাগ্রন্থে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

> পুরুষ চিরকাল রাজনীতির সেবক হইয়া থাকেন। রমণী সাধারণতঃ সেই কঠোর তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে চাহেন না। কিন্তু অনেক সম্রাট ও রাজনীতিবিদগণের জীবনে তাঁহাদিগের সহধর্মিণীরও প্রতিভার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব আলিবর্দী খাঁর ন্যায় রাজনীতিবিদ পুরুষ বাঙ্গলার সিংহাসনে অতি অল্পই উপবেশন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। [...] সেই কর্মবীর আলিবর্দী খাঁর রাজনৈতিক জীবন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সহায়তায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আলিবর্দীর উচ্ছৃঙ্খল সংসার যেমন এই মহিয়সী মহিলার তর্জনীতাড়নের অধীন চালিত হইত। জ্ঞান, ঔদার্য, পরহিতেচ্ছা ও অন্যান্য সদ্‌গুণে তিনি রমণীজাতির মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় হিতকর কার্য তাঁহারই পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। [...] নবাব-বেগমের এই অসাধারণ প্রতিভার জন্য আলিবর্দী খাঁ রাজধানী হইতে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে অনেক সময়

বেগমের প্রতি রাজকার্যের ভার প্রদান করিতেন, তজ্জন্য তিনি বাদশাহদরবার হইতে আদেশ লইয়াছিলেন। এই সময় হইতে মুর্শিদাবাদের গর্দিনসীন – বেগমপদের সৃষ্টি হয়।[১]

আলোচ্য নাটকে আমিনা ও ঘসেটি চরিত্রদুটি নির্মাণে নাট্যকার বিপ্রতীপ চরিত্রনির্মাণকৌশল ব্যবহার করেছেন। যেকারণে শিরাজ-মাতা আমিনা যতটাই সততা, মর্যাদা, বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, ঘসেটি বেগম চরিত্রটি ততটাই অসততা, কপটতা ও লোভীচরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার একদিকে দেখিয়েছেন – শিরাজমাতা আমিনা তার মৃতস্বামী জয়েনউদ্দিনের প্রতি নিষ্ঠায়, ভালোবাসায়, স্মৃতিচারণায় এখনো আবদ্ধ। অন্যদিকে ঘসেটি নিজ স্বামী রেখে তার কর্মচারী হোসেন কুলীর প্রতি কামাসক্ত। এমনকি তার রিপুর প্রাবল্য এত বেশি যে, সে ধর্মাধর্ম জ্ঞান, বয়সের বিভাজন ভুলে হিন্দু সভাসদ রাজবল্লভের প্রতিও অনুরক্ত। আবার, উচ্চপদস্থ ইংরেজ বেনিয়াদের আকৃষ্ট করতে উপযুক্ত সাজপোশাকেও নিজেকে প্রকাশ করতেও সে দ্বিধাহীন। ঘসেটি চরিত্রটি ইতিহাসে যেমন খলচরিত্র, নাট্যকারও *নারীগণ* নাটকে তাকে তেমনি উচ্ছৃংখল, লোভী, স্বার্থপর চরিত্রহিসেবে অঙ্কন করেছেন।

তবে ইতিহাসে ঘসেটি বেগমের রিপুর প্রাবল্যের কথা যেমন উল্লেখিত হয়েছে, ঠিক তেমনি হোসেন কুলীর প্রতি আমিনা বেগমেরও অনুরাগের প্রসঙ্গও বর্ণিত হয়েছে। হোসেন কুলীকে শিরাজদ্দৌলাকর্তৃক প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করার পেছনেও এটি ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক *নারীগণ* নাটকে ঘসেটিকে পরিপূর্ণ খল চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে তার বিপরীতে আমিনা বেগমকে ততটাই ইতিবাচক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এমনকি শরিফুন্নেসা যখন রাজবল্লভের বাড়িতে অবাধ যাতায়াতের লোভ দেখিয়ে ঘসেটির কাছে মুক্তিপ্রার্থনার কৌশল এঁটেছে, তখন আমিনা নিজ মাতাকে ধিক্কার দিতেও দ্বিধা করেনি। আমিনা নিজমাতাকে ঘৃণাভরে বলেছে :

> জঘন্য প্রস্তাব ! [...] নষ্ট যদি ঘসেটি তো আপনিও কিছু কম নন ! [...] ঘসেটি নষ্টই।
> কিন্তু কোথায় আপনি তাকে বাঁচাবেন,
> আর কিনা আপনিই তাকে আরো নষ্ট করছেন।
> [...] অপরকে পাপী করে নিজে পুণ্যে থাকা ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪০৯)

---

[১] নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৮৪-৮৮

আমিনা চরিত্রটি প্রচণ্ড যুক্তিবাদীও। শরিফা যখন একের পর এক অবরোধ-মুক্তির কৌশল চিন্তা করেছে, তখন বুদ্ধিমতী আমিনা যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে তার অসারতা প্রমাণ করেছে। তবে যুক্তি, বুদ্ধি, সততা, আত্মমর্যাদা, সবকিছু ছাপিয়ে আমিনার প্রবল মাতৃত্ববোধই নাটকে সবচেয়ে বেশি প্রকটিত হয়েছে। নাটকের শেষদৃশ্যে সিরাজকে যখন হস্তিপৃষ্ঠে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়েছে, তখন ভেঙে গেছে আমিনার সংযমের সকল বাঁধ; চ্যুত হয়েছে অভিজাত নারীর মার্জিত আচরণবোধ। সে-মুহূর্তে সন্তানহারা শিরাজমাতার যে আকুতি, তা যেন বীর-পুত্রহারা দেশমাতৃকার প্রতিচ্ছবি। কুতুব চরিত্রের বর্ণনায় নাট্যকার আবেগাত্মক পরিচর্যায় এ দৃশ্যটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

> শিরাজের মাতা ওই ছুটে বেরিয়েছে।
> এখনও কি নবাবের মাতা ? আলিবর্দীর কন্যা কি ?
> গর্ভধারী নারী এক জননীই আজ
> নিহত পুত্রের লাশ পথে শুনে দিগ্বিদিকহারা।
> পর্দা ভেঙে বেরিয়েছে – পর্দা ছিঁড়ে গেছে তার –
> আলুথালু বসন, উন্মত্ত মাতা, লুটাচ্ছে আঁচল।
> একবার আয় ওরে পুত্রধন আয়,
> সিংহাসন নয়, আয় ফিরে আয় তোর জননীর কোলে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৩১)

অন্যদিকে, নাট্যকার লুৎফুন্নিসা চরিত্রটিকে একদিকে যেমন উদার-কোমল করে গড়ে তুলেছেন, অন্যদিকে তেমনি স্বামীর প্রতি বিশ্বাসে-ভালোবাসায় একনিষ্ঠ করে এঁকেছেন। লুৎফুন্নিসার বাস্তবিক ইতিহাসও ঠিক এমনই। ফলে এ চরিত্রটিতে নাট্যকার নতুনত্ব কিছ প্রয়োগ করেননি। তবে এখানে লুৎফুন্নিসার বিপ্রতীপ চরিত্র হিসেবে নাটকে বাঈজি চরিত্র সংযোজন করেছেন নাট্যকার। এই বাঈজি চরিত্রটি আত্মমর্যাদাশীল, প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী একটি চরিত্র। নিজ পেশার কারণে সে চিরকাল নবাব মহলের নারীদের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে এলেও, এই ঘোর বিপদে সে নবাব মহলের নারীদের সম্মান বাঁচাতে ছুটে এসেছে। 'বেশ্যা'র চেয়েও তার কাছে অধিকতর ঘৃণ্য 'বিশ্বাসঘাতক' চরিত্র। বাঈজি চরিত্রটি দৃঢ়তা, বলিষ্টতা, যুক্তিবাদিতায় নবাবপত্নী লুৎফুন্নিসাকেও ছাপিয়ে গেছে। নাটকে বাঈজি চরিত্রটি নাট্যকারের কল্পিত চরিত্র হলেও নবাবদের হারেমে বাঈজি প্রতিপালন ঐতিহাসিক ঘটনা। বরং কখনো কখনো নবাবদের আমোদ-প্রমোদ, বাঈজি-বিলাস রাজ্যশাসনের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থের আলোচনা সংক্রান্ত এক লেখায় এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে লিখেছেন :

প্রমোদের মোহমত্ততায় এই প্রলয়নাট্যের আরম্ভ হইল। ভাগিরথীতটে হীরাঝিলের নিকুঞ্জবনে বিলাসিনীর কলকণ্ঠ এবং নর্তকীর নূপুরধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিল। লালসার লুব্ধহস্ত গৃহস্থের রুদ্ধগৃহের মধ্যেও প্রসারিত হইল।[১]

পলাশীর ইতিহাস সংবলিত নাটকে অনৈতিকহাসিক চরিত্রের সংযোজন এর আগেও করেছেন সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে প্রথম নাট্যপ্রণেতা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি তাঁর *সিরাজদ্দৌলা* (১৯৩৮) নাটকে ঘসেটি বেগম, লুৎফুন্নেসা প্রভৃতি ঐতিহাসিক নারীচরিত্রের সমান্তরালে আলেয়া নামক একটি কল্পিত নারী চরিত্র সংযোজন করেছিলেন। এছাড়া তাঁর নাটকে পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে গোলাম হোসেন নামেও একটি কাল্পনিক চরিত্র ছিল। *নারীগণ* নাটকে বাঈজি চরিত্রটি সেরকমই একটি কাল্পনিক চরিত্র; যে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত না হয়েও ভালবাসায় মমতায় আর দশজন সাধারণ গৃহস্থনারীর তুলনায় কম নয়। ডালিম, পায়েলি চরিত্রের মাধ্যমে দাসপ্রথার এক নির্মমরূপ সম্পর্কে নাট্যকার আমাদের অবগত করেছেন। যেমন : ডালিমের একটি সংলাপে দাসপ্রথার ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

কবে এই মহলে এসেছি মনে নাই – কিছু মনে নাই।
আমাদের পিতা কে জানি না।
আমাদের মাতা কে জানি না।
ভাই বোন ? ভাবলেও ভেবেছি এমন –
যদি ছিলো বোন – জানি না সে কবে কোন
গোলামের হাটে বুঝি বিক্রি হয়েছিলো।
মনে হতো, ভাই যদি থাকে, তবে তাকে
হাজামের কাছে ফেলে খোজা করা হয়েছে নিশ্চয়।
মহলের কোঠায় কোঠায় দরোজায় খোজার পাহারা –
নৌকরখানায় খোজা, রসুইখানায় খোজা,
হঠাৎ কখনো কোন জোয়ান খোজাকে দেখে চমকে উঠেছি
নিজের চেহারা যেন আচানক তার মুখে দেখতে পেয়েছি।
তবে কি এ আমারই হারানো ভাই!

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সিরাজদ্দৌলা*, পৃ. ৪৪ (দ্রষ্টব্য : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫)

হঠাৎ যখন কোন বাঁদীর চিৎকার –

মরদের কোঠা থেকে, শরাবের মাহফিল থেকে

বুক বরফ হয়েছে।

বুঝি সে আমারই মায়ের পেটের বোন –

সদ্য কেনা গোলামের হাটে –

ভাগ্যদোষে এই মহলেই!

ভাগ্যদোষে নাবালিকা আজ বুঝি ছিন্ন হলো ওই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪১৪)

কিন্তু এই নির্মম নির্যাতনের কোনো প্রতিকার ছিল না। শরিফাকে উদ্দেশ্য করে পায়েলির আরেকটি উক্তি উল্লেখ্য :

পায়েলি। ফরিয়াদ কিছু নাই। মূল্য দিয়ে খরিদান বাঁদীর জীবনে

ফরিয়াদ থাকলেও তার কোন মূল্য নাই।

ফরিয়াদ করবে কি বাঁদী ? তার জবান কোথায়?

জবানও খরিদ তার। হাত-পা, তার শরীরও খরিদ

গর্ভে যদি এসেছে সন্তান।

জন্মের আগেই সেই সন্তানও খরিদ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪১৫)

নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে এসকল নারী চরিত্রের মাধ্যমে নবাবের হারেমে নারীদের অবস্থা-অবস্থান, মনোবেদনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-হতাশার চিত্র অত্যন্ত নিপুনভাবে উপস্থাপন করেছেন এ-নাটকে।

নারীগণ নাটকটি ঢাকাকেন্দ্রিক নাট্যদল *পালাকার* ২০১২ সালে সর্বপ্রথম মঞ্চে উপস্থাপন করে। *পালাকার* নাট্যদলের পরিচালক ও সহকারী নির্দেশক আমিনুর রহমান মুকুল সৈয়দ হকের এ নাটকটি মঞ্চে আনার কারণ প্রসঙ্গে বলেন :

সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড বাংলার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইতোমধ্যে সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মঞ্চকে বারবার আলোড়িত করেছেন। সেই সুবাদে আমরা ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত চরিত্রকে চিনি-জানি। আমরা মীরজাফরকে যেমনভাবে চিনি, তেমনি জানি ঘসেটি বেগমকে; জানি সিরাজের নানি শরিফুন্নেছাকে, মা আমিনাকে ও স্ত্রী লুৎফাকে। কিন্তু সিরাজকে যখন হত্যা করা হয়, তখন সেই নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা খুব কম জানি। তারই নতুন দিক উন্মোচন করেছেন *নারীগণ* নাটকের নাট্যকার।

যেহেতু *পালাকার* একটি বৈচিত্র্যসন্ধানী নাট্যসংগঠন, তাই এই গল্প বলার সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে চাইনি। সে-কারণে আমাদের *নারীগণ* মঞ্চায়ন।[১]

তবে *পালাকার* এ-নাটকের প্রযোজক হলেও নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন *নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের* পরিচালক নাট্যজন আতাউর রহমান। এমনকি এ-নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্রে *নাগরিক নাট্যদলসহ* অন্যান্য নাট্যদলের বেশ কজন অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন। যেমন, *নারীগণ* নাটকে প্রধান চারটি নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন *নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের* ফারহানা মিঠু (শরিফা) ও তানিয়া হোসাইন (লুৎফুন্নিসা), চট্টগ্রামের নাট্যদল *নান্দীমুখের* অভিনেত্রী দীপ্তা রক্ষিত (আমিনা) এবং *প্রাচ্যনাট্যদলের* অভিনেত্রী জয়িতা মহলানবীশ (বাঈজি)।[২] সৈয়দ শামসুল হকের এ নাটকটির মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে নাটকের নির্দেশক নাট্য-সারথি আতাউর রহমান এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> তাঁর বেশ কয়েকটি নাটককে দেশের অন্য নাট্য নির্দেশকেরা যখন দুরূহ বলে পাশে সরিয়ে রেখেছেন; আমি তখন পরম যত্নে সেই নাটকগুলোকে বুকে তুলে নিয়েছি। [...] *পালাকার* নাট্যদল প্রযোজিত সৈয়দ হক রচিত এবং আমার নির্দেশিত *নারীগণ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি প্রযোজনা বলে আমি মনে করি। সৈয়দ শামসুল হক আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু। নাট্যভাবনা ও মননে আমরা পরস্পরের পরিপূরক। হক ভাইও তাই মনে করেন।[৩]

বলাবাহুল্য প্রথম প্রর্দশনীতেই নাটকটি তুমুল দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এরপর এ নাটকটি দেশ-বিদেশের মঞ্চে অসংখ্যবার সুনামের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এমনকি ২০১৭ সালে কলকাতার নাট্যপ্রতিষ্ঠান *নান্দীরঙ্গ* আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী 'এপার-ওপার পঞ্চম নাট্যোৎসবে' আমন্ত্রণ পায় ঢাকার নাট্যদল *পালাকার*। সেখানে নাট্যোৎসবের তৃতীয় দিনে (৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) কালীঘাটের *তপন থিয়েটার* মঞ্চে নাটকটির প্রর্দশনী হয় ; এবং তুমুল দর্শকপ্রিয়তা অর্জনের পাশাপাশি কলকাতার পত্রিকাতেও নাটকটি নিয়ে ইতিবাচক প্রতিবেদন ছাপা হয়। কলকাতার লেখক, ব্লগার রেজা ঘটক এক লেখনীতে সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লেখেন :

> *নারীগণ* নাটকটি কলকাতার দর্শকদের কাছে সেদিন হয়ে উঠেছিল ইতিহাস ফিরে দেখার এক দুর্লভ মুহূর্ত। উপস্থিত দর্শকরা ফিরে গিয়েছিলেন ইতিহাসের দুইশো ষাট বছর আগে সংঘটিত সেই ঐতিহাসিক ঘটনা

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] সূত্র : *শিল্পকলায় সৈয়দ হকের নারীগণ*, গ্লিটজ প্রতিবেদক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৯ জুলাই ২০১৭

[৩] শফি আহমেদ এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার : হ্যামলেট প্রসঙ্গে আলাপচারিতা, *পাক্ষিক অন্যদিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

পরম্পরায়। প্রায় দুই ঘন্টার নাটকে এক ঘোর লাগা নস্টালজিয়ায় ইতিহাস ভ্রমণে মেতেছিলেন *তপন থিয়েটার* মঞ্চের উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী। নাটক শেষে কলকাতার থিয়েটারের অনেক প্রতিথযশা নাট্যব্যক্তিত্ব মঞ্চে উঠে *পালাকার* নাট্যদলকে তাঁদের সেই ইতিহাস ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনান। পাশাপাশি সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিময় নস্টালজিক অভিজ্ঞতা শোনানোর ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা পালাকারের *নারীগণ* প্রযোজনার ব্যাপক প্রশংসা করেন।[১]

নারীগণ নাটকটিতে সহনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন আমিনুর রহমান মুকুল। এছাড়া শিরাজের খালা ঘসেটি বেগম চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফাহমিদা মল্লিক শিশির। ডালিম চরিত্রে মেরিনা অবনী, পায়েলী চরিত্রে তিথি দাশ সাথী, নবাব শিরাজের চরিত্রে শামীম সুফী, কুতুব-১ চরিত্রে শাহরিয়ার খান রিন্টু, কুতুব-২ চরিত্রে সানসি ফারুক, কুতুব-৩ চরিত্রে শামীম সাগর, কুতুব-৪ চরিত্রে সেলিম হায়দার, আলিবর্দী খাঁ চরিত্রে ফাইজুর মিল্টন, মাঝি চরিত্রে হিমালয় নিমগ্ন অরিত্র, প্রহরী-১ চরিত্রে আমিনুর রহমান মুকুল, প্রহরী-২ চরিত্রে ইমরান হোসেন, প্রহরী চরিত্রে মুরাদ, বাঁদি চরিত্রে নভেম্বর টুইসডে রোদ। *নারীগণ* নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা করেছেন অনিকেত পাল বাবু। আলোক পরিকল্পনা : ঠাণ্ডু রায়হান, সংগীত পরিকল্পনা : অজয় দাশ, পোশাক পরিকল্পনা : লুসী তৃপ্তি গোমেজ, নাটকটির পোস্টার পরিকল্পনা করেছেন দিলারা বেগম জলি এবং প্রযোজনা করেছেন আমিনুর রহমান মুকুল।[২]

অন্যদিকে ১৮ জুন ২০১৫ সালে নাট্যসারথী আতাউর রহমানের ৭৪তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে *নারীগণ* নাটকটির মঞ্চপ্রদর্শন হয়। উল্লেখ্য যে *নারীগণ* নাটকের এ প্রদর্শনীতে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক সস্ত্রীক দর্শক সারিতে বসে নাটকটি উপভোগ করেছিলেন। তিনি নির্দেশক আতাউর রহমানের নির্দেশনায় এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে নাটকের শেষে দর্শক আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল আবেগে নাট্যনির্দেশককে আলিঙ্গন করেছিলেন। এ নাটকটির কুশলী নির্দেশনা প্রসঙ্গে সে সময়ে *দৈনিক কালের কণ্ঠের* বিনোদন-সাংবাদিক যে পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছিলেন পত্রিকার পাতায়, প্রসঙ্গত সেটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

চারিদিকে যুদ্ধের দামামা মৃদু থেকে মৃদুতর হয়, হাহাকারের মাত্রা বাড়তে থাকে, স্পষ্ট থেকে আরো গভীর হয় নারীদের আর্তচিৎকারের করুণ রস। শুরু হয় *নারীগণ* নামক মঞ্চ আখ্যান। প্রযোজনার মূল অংশ শুরু হয় সিরাজের মাতামহ শরিফুন্নেসা চরিত্রের ফারহানা মিঠু, মা আমিনার ভূমিকায় থাকা দীপ্তা লাভলী, স্ত্রী লুৎফার

---

[১] রেজা ঘটক, ব্লগ: 'পালাকার এর ভারত জয়!!!', ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, দ্রষ্টব্য : somewhereinblog.net

[২] সূত্র : রেজা ঘটক, প্রাগুক্ত

চরিত্রে রূপদানকারী তানিয়া হোসাইন ও বাঈজিবেশে জয়িতা মহলানবিশের কথোপকথন। এই চার নারী অভিনয়শিল্পীর অভিনয়ই মূলত *নারীগণ*-এর আবেদন দর্শকের মধ্যে দীপ্ত শিখার মতো পৌঁছে দেয় অনায়াসে অবলীলায়। সেই সঙ্গে ভাগীরথী দিয়ে নবাবের পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকস্টেজে নদীর আবহ ফুটিয়ে তোলা, দ্বিতল মঞ্চের যথাযোগ্য ব্যবহার, প্রসেনিয়ামের স্বাদ দিতে যথার্থ চিত্র চিত্রণ, দর্শকের মাথার ওপরের দিকে পাত্র-পাত্রীর অনায়াস যাত্রা, একেবারেই নিরাভরন মঞ্চে সামান্য কিছু সিল্কের কাপড়ের পর্দা দিয়ে নবাবের সিংহাসন, জেনানামহলের চিত্রকে দারুণভাবে ফুটিয়ে তোলাসহ সামগ্রিকভাবে নাট্য-উপস্থাপনের মাধ্যমে আতাউর রহমান বরাবরের মতো তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাট্যকার একটি নারীবাদী সুরকে কখনো দর্শককে সরাসরি নারীবাদী হিসেবে ভাবতে না দিয়েই ঠিকই মূল কথাগুলো বলে গেছেন। এটাই হয়তো সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের কৃতিত্ব। লাইভ মিউজিক, আলোর পরিমিতিবোধ ও দৃশ্যের স্বাদ বুঝে কিছু ঠুমরির ব্যবহার গল্পকে আরো বেশি জীবন্ত করে তোলে। *নারীগণ* অন্যরকম এক সফল মঞ্চ প্রয়াস।[১]

নারীগণ নাটকে শরিফা বেগম চরিত্রে অভিনয় করা *নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ে*র নন্দিত অভিনেত্রী ফারহানা মিঠু এক লেখনীতে এই নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা এবং নাট্যকার সৈয়দ হক প্রসঙ্গে স্মৃতিকাতর হয়ে বলেছেন :

এখন ভাবতে বসলে নিজেকে অনেক বেশি সৌভাগ্যবান বলে মনে হয় কারণ আমি তাঁর সে নাটকে অভিনয় করি সেই কাব্যনাটক *নারীগণ* তিনি একবার নয়, অনেক অনেক বার দেখেছেন। দেশে থাকলে এবং যদি ব্যস্ত না থাকতেন অবশ্যই *নারীগণ* দেখতে আসতেন। প্রথমে *নারীগণ* করা হতো প্রসেনিয়াম ভেঙে। তিন দিকে গ্যালারির মতো করে দর্শকদের বসবার জায়গা আর মাঝখানের পুরো অংশ জুড়ে অভিনয়ের মঞ্চ। আমরা অভিনয় শিল্পীরা অনেক সময়ই অভিনয় করতে করতে দর্শকদের অনেক কাছে চলে যেতাম। অনেক অভিনয় শিল্পী দর্শকদের মধ্য দিয়েই হেঁটে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। যেমন নর্তকী আলেয়া। দর্শকদের মধ্য দিয়েই হেঁটে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। আবার ক্রন্দনরত অবস্থায় বেরিয়েও যেতেন দর্শকদের মধ্য দিয়ে। এই নর্তকী আলেয়া *নারীগণ* নাটকের শেষ অংশে যখন বলে 'নিহত নবাব নন, নিহত বিশ্বাস আর সরলতাই এখন'। তখন মঞ্চে অভিনয়রত আমি বহুবার খুব কাছে দর্শকসারিতে বসে থাকা হক ভাইকে দেখেছি তাঁর অশ্রুসজল চোখ রুমালে মুছতে। আবেগাপ্লুত হক ভাই– নরম কাদামাটির হৃদয়ের হক ভাই। *নারীগণ* নাটকের সংলাপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তো আবদ্ধ নয়। *নারীগণ* নাটকের প্রতিটি সংলাপ সত্যভাষণ। আজও সত্য আগামীতেও সত্য। [...] আমি একজন অভিনয়শিল্পী, তাই সৈয়দ শামসুল হকের লেখা মঞ্চনাটক সম্পর্কে বিশেষ করে বলতে চাই যে – সৈয়দ শামসুল হকের লেখা নাটকের সংলাপের মধ্যেই অভিনয়ের ইঙ্গিত নিহিত আছে। একজন

[১] মাসিদ রণ, 'নারীগণ : প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কাহিনী', *দৈনিক কালেরকণ্ঠ*, ৩ জুলাই ২০১৫

অভিনয়শিল্পী তাঁর লেখা সংলাপের মধ্যে থেকেই অভিনয় করার দিক নির্দেশনা পান। সৈয়দ শামসুল হকের লেখা নাটকের প্রতিটি দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, শব্দচয়ন – মূলত অভিনয়শিল্পীর জন্য দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। এই সব কিছু বলে দেয় অভিনয়শিল্পী কখন, কোন দিকে, কীভাবে নিয়ে যাবেন তার অভিনয় শৈলীতে। আজ বড় বিষণ্ন মনে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করি বাংলা সাহিত্যের এই শক্তিশালী নাট্যকারের অনুপস্থিতি।[১]

সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য কাব্যনাটকের মতো এ-নাটকেও ভাষার নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু নবাবি আমলের ইতিহাসকে প্রেক্ষাপট করে তিনি এ নাটকটি রচনা করেছেন, সেহেতু নাটকের ভাষায় তাঁর অন্যান্য কাব্যনাটকের ভাষার তুলনায় আরবি-ফার্সি শব্দের আধিক্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। তবে তিনি চরিত্র উপযোগী লোকায়ত ভাষা, তৎসম, তদ্ভব শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন সংলাপ ও ঘটনার প্রয়োজনানুসারে। নবাব মহলের নারীদের নিয়েই যেহেতু এ নাটক, সেহেতু উপমা, চিত্রকল্প, অলংকার নির্বাচনে তিনি মুসলিম উচ্চবিত্তের জীবনাচারকে বিবেচনায় রেখেছেন। এমনকি নবাব মহলের রাজদরবারের সংস্কৃতি, ভাষা, আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। তাঁর নাট্যভাষায় একই সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে নবাবি আমেজ, লোকজ সংস্কৃতি ও সংস্কৃতবহুল মিলিত ঐশ্বর্য।

এই নাটকে আমিনা চরিত্রটি প্রগতিশীল ও বিপ্লবী। তিনিই নাটকে একমাত্র বাস্তবতার ভিত্তিতে কথা বলে গেছেন; প্রতিবাদ করেছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনিয়মের বিরুদ্ধে; সমাজ কিংবা রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে আমিনার দ্রোহ সুস্পষ্ট। নাট্যকার এই প্রতিবাদী নারীর সংলাপ রচনায় তাই সংস্কৃতশব্দবহুল শুদ্ধ, রুচিশীল বা পরিশীলিত বাংলাভাষা প্রয়োগ করেছেন। শরিফা বেগম যখন আমিনার এই দ্রোহমিশ্রিত ভাষাকে অশিষ্ট আখ্যা দিয়ে তিরস্কার করে বলেন – যার মুখে এতদিন লক্ষ্ণৌ, দিল্লির শীলিত শব্দা ছাড়া অন্য শব্দ ছিল না, সে কেন আজ এমন অশিষ্ট বচন বলছে। তখন আমিনা বলেছেন – কাল যখন দুঃশীল হয়, সুশীল কৃত্রিম ভাষা তখন ঠোঁটে ফোটে না। সমাজে নারীর বৈষম্যপূর্ণ অবস্থান নিয়ে সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষায় সে জানিয়েছে :

পুরুষের চোখে
নারী শুধু রূপবতী অথবা সে কুৎসিত কুরূপা –
মেধাবী বা বুদ্ধিমতী নয়।

---

[১] ফারহানা মিঠু, 'আর কি কখনো কবে....' *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো...*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৭-৭৫৮

শরীর চিক্কণ মেদে, বুদ্ধিতে নিরেট!

যৌবনে নারীর মূল্য শয্যায় সে পরী –

বৃদ্ধকালে দাসীর অধম!

নারীরত্ন বলা হয়, রত্নের মতোই

নারীকে সিন্দুকে বন্দী করে রাখা হয় –

মানে অন্দর মহলে, প্রাচীরের ঘেরা টোপে সুরক্ষিত করে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৪)

অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল চরিত্র শরিফা বেগমের মুখের সংলাপে আরবি-ফার্সিশব্দবহুল সংলাপ যুক্ত করেছেন নাট্যকার :

ভাষা! ভাষা! ভাষা ঠিক রাখ। পুত্রবধূ সমুখেই –

তমিজ লেহাজ নেই! এই তোর ভাষা! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৩)

আবার তিনি চরম উত্তেজনার মুহূর্তে আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে নবাবি সংস্কৃতি ছেড়ে মেয়েকে সম্বোধন করেছেন একবারে বাঙালি ঘরের নিত্যব্যবহার্য শব্দসহযোগে :

নির্লজ্জ! মুখরা! ধর্, ওকে ধর্, পোড়ামুখী। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৩)

অপরদিকে, নাট্যকার প্রহরীদের মুখের ভাষা তাদের শ্রেণি-পেশা অনুযায়ী প্রয়োগ করেছেন, যেখানে ইতর ও অশ্লীল ইঙ্গিতসমৃদ্ধ শব্দও রয়েছে :

প্রহরী ১। আই বাপ্, গোরার বজরা! লাল কুর্তি। লাল মুখ!

বিলাতি বন্দুক হাতে গিটমিট হুটহাট ভাষা!

[…[কল্লা যাবে! গোরার মুখের খানা!

রাজ্য ওরা গিলে খায়! আমাদের গিলতে কতক্ষণ!

প্রহরী ২। গিলুক ! গিলুক ! গিলে গিলে ওলাওঠা হোক! […]

লাড্ডু কি বলিস ভাই, ডালিম, ডালিম!

আহা, এই পাকা পাকা ডালিম কামড়ে খাবে ?

গোরালোগ খাবে ! মেরালোগ তাকিয়ে দেখবে! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪০৫)

কোনো কোনো চরিত্রের সংলাপে নাট্যকার নবাব মহলের রুচি ও সংস্কৃতি অনুসরণে উর্দু, ফার্সি, আরবি শব্দবহুল ভাষার পাশাপশি ফার্সি কবিদের লেখা শের বা কবিতার অংশবিশেষ হুবহু তুলে ধরেছেন । যেমন

শিরাজের মাতা আমিনা যখন শিরাজের মাতামহী শরিফা বেগমের সঙ্গে নারীদের অবস্থান নিয়ে কথোপকথন করছে, তখন তাদের পারস্পরিক আলাপে চমৎকারভাবে এই সংস্কৃতি স্পষ্ট হয়েছে :

আমিনা। [...] আম্মা, বয়েত ঝাড়ুন
ফার্সি কোন কবির – হাফিজ রুমি ভুলে গিয়েছেন ?
আপনারই কাছে সব শেখা। দাস্তা- গোলেস্তা-মসনবী।
যদি ইজাজৎ হয় তবে আমিই শোনাই ?
শরিফা। ইরশাদ !
আমিনা। গাজি কে পায়ে শাহাদাৎ আন্দার তাগো পোস্ত।
গাফেল কে শহীদে এস্‌ক্ ফাজেল্‌তার আজ্ দাস্ত।
ফায়দায় কেয়ামাৎ ই বা আঁ কোস্তায়ে দোস্‌ত্।
ই কোস্তা দুশমানাস্‌ত্ ওঁয়া কোস্তায়ে দোস্‌ত্। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪০০)

তবে সৈয়দ শামসুল হক নাটকে ফার্সি কবিতার লাইন হুবহু তুলে দিলেও বাঙালি পাঠক ও দর্শকদের জন্য পরক্ষণে শরিফা চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে তার চমৎকার বঙ্গানুবাদ করে দিয়েছেন; যেটি এই কবিতা প্রয়োগের যথার্থতা প্রমাণ করেছে :

শরিফা। শুনে চোখ ভিজে আসে, ওরে। মনে পড়ে
তোর আব্বা আলিবর্দী খান একদিন
শিরাজকে লেখা এক পত্রে ওই বয়েৎ লেখেন –
ধর্মের রক্ষায় যারা সম্মুখ সমরে
প্রাণ দিতে এতটুকু ডর নাহি করে
যাদের স্মরণ পথে হয় না উদয়
সংসার সংগ্রামে যারা, তারাই নিশ্চয়
গাজীর চেয়েও বড়, কারণ সংসারে
স্বজনের শত্রুতা যে প্রীতির আকারে!
ধর্মবীর শত্রুহস্তে হত যদি হন,
সংসার-বীরের মৃত্যু ঘটায় স্বজন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪০০)

পলাশির ট্রাজিক পরিণতি যেহেতু এ নাটকের নেপথ্য প্লট, তাই নাটকের ভাষায় নাট্যকার আবেগাত্মক পরিচর্যারও (Emotional Treatment) শরণ নিয়েছেন। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে যেখানে দর্শকের মনে আবেগের সঞ্চার করতে চেয়েছেন, সেখানে ছোট ছোট বাক্যে, ঘন ঘন বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে ভাষাকে ঝরনার মতো বহমান করে তুলেছেন। যেমন, নিজ দেহরক্ষী মোহাম্মদী বেগের হাতে শিরাজের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা-সংলাপে আবেগাত্মক ব্যবহার উল্লেখ্য :

রক্তাক্ত শরীর ছেড়ে আত্মা তাঁর গেলো উর্ধ্বলোকে –
যেখানে নবাবী নেই, দরবার নেই, পাত্রমিত্র কেউ নেই
মাথার মুকুট নেই, তোরণে নকিব নেই, খেলাৎ খেতাব নেই,
বানিজ্যের সনদ দস্তক নেই, বিদেশী বণিক নেই,
স্বদেশীয় শেঠ নেই, সৈন্য নেই, সেনাপতি নেই,
শত্রু নেই, যুদ্ধ নেই, সন্ধি নেই, জয় কিম্বা পরাজয় নেই,
ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নেই, সিংহাসন নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র নেই,
বিশ্বাসঘাতক নেই, কৃতঘ্ন ঘাতক নেই – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৭৮)

এছাড়াও *নারীগণ* নাটকের ভাষার নান্দনিকতা সৃষ্টিতে সৈয়দ শামসুল হকের উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, প্রতীক প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের কৃতিত্ব দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হলো :

উপমা :

১. জেনানা বন্টন করে নেবে ওরা দুম্বার মাংসের মতো। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৩)

২. নারীরত্ন বলা হয়, রত্নের মতোই
নারীকে সিন্দুকে বন্দী করে রাখা হয় – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৪)

উৎপ্রেক্ষা :

১. হৃদয় কম্পিত হলো, যেন অকস্মাৎ
ফাঁদের গহবরে পড়ে বিমূঢ় শার্দুল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৭৭)

২. তবে কেন এমন চেহারা আজ যেন ঈগলের ডানা
ভেঙে গেছে ঝড়ে, বজ্রপাতে নবাবী নিশান

পড়ে গেছে প্রাসাদের শীর্ষ চূড়া থেকে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯১)

৩. কেন আজ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে
যেন ভাগিরথী তীরে বাজপড়া বৃক্ষ এক
লোকশূন্য গ্রামের কিনারে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯২)

৪. রাজ্যলোভ, অর্থলোভ, একসঙ্গে চলে –
এ দুটি এমন লোভ যেন দুই চাকি যাঁতাকলে!
এর চাপে চূর্ণ হয় নীতি আর সততারও সফেদ পাথর ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪০১)

৫. প্রজার জীবন যেন বৃক্ষ এক শেকড়ে সুস্থির। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪০৬)

রূপক /প্রতীক :

১. সবগুলো দরোজার পাল্লা ভেঙে গেছে, আম্মা,
বিশ্বাসের সমস্ত দরোজা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮৩)

২. রাজনীতি শতরঞ্জ খেলায়
নারী তো আসলে এক সামান্যই বড়ে –
তাকেও না খেলে বুঝি কিস্তিমাৎ হয় ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮৫)

৩. বাজারে দিনের শেষে পড়ে থাকা সবজি সে কুড়োবার নয় –
তার চোখ আস্ত গোটা বাজারের দিকে! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৫)

৪. কণ্ঠ থেকে ছিড়ে নিয়ে গেছে তোর কণ্ঠহার।
কালের থাবা কি তবে এতই নির্মম!
শাশুড়ি ও পুত্রবধূ হয় একই ব্যাধের শিকার! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৮)

চিত্রকল্প :

১. যখন দিনের আলো রক্তলাল হয়, সন্ধ্যা নামে,
দিবসের লাশের পঞ্জরে
যখন দাঁড়ায় এসে ঘোর অন্ধকার
তখন আকাশে – ওই ঈশ্বরের অসীম কপোলে

অশ্রুদল ফুটে ওঠে, ঝরে, ঝরে পড়ে,

যত দীর্ঘ হয় রাত, তত অশ্রু ঝরে ইতিহাসে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৭৯)

সমাসোক্তি :

১. কখন হয়েছে রাত্রি, সূর্যঘড়ি বিকল, অথচ
   প্রাসাদের বারুকা-ঘড়িতে কাল ঝরেই চলেছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮০)
২. ভাগীরথী, কোরো না ক্রন্দন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮২)
৩. আজ নারী বিনা আর কেউ কাঁদবার নেই,
   তাই মুর্শিদাবাদ কাঁদছে, প্রাসাদের পাথর কাঁদছে –
   উদ্যানের তরুবীথি ঝাউবৃক্ষ ফুঁপিয়ে কাঁদছে –
   ছলছল কেঁদে যাচ্ছে ভাগীরথী হীরাঝিল ছুঁয়ে।
   মানুষ কৃতঘ্ন তাই নদী, পাথরেও কাঁদে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৩)
৪. গর্ভপাত ঘটেছে মাটির।
   তার চৌচির জরায়ু থেকে
   কিমাকার অন্ধকার দলা দলা গড়িয়ে পড়ছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৯)
৫. ভাগ্যে ছিলো, ভাগ্যের পতন।
   স্বজনের ছুরিতে নিধন।
   নিহত নবাব নন, নিহত বিশ্বাস আর সরলতাই এখন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪২৪)

বাগধারা / প্রবাদ / প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১. বিপন্ন সময়ে কেউ আত্ম ছাড়া চেনে না অপর ! –(কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৭৫)
২. ইতিহাস একচক্ষু নয়,
   কাল একপক্ষ নয় তিনপক্ষ তার –
   অতীত, ভবিষ্য আর মধ্যভাগে এই বর্তমান।
   খনন যে করে কাল সেই খালে নিজেই সে পড়ে।
   বর্তমান ঘটনাই ভবিষ্যৎ গড়ে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮১)
৩. যুদ্ধের প্রান্তরে নয়, জয়-পরাজয়
   নারীর শরীরে হয় নির্ধারিত-ইতিহাসের রয়েছে প্রমাণ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৮৫)

৪. জগতের রীতি এই।

উপকার ভুলে যায় উপকার করা হয় যার।

সিঁড়ি বেয়ে উঠবার পর

যখন ওপর থেকে দেখা যায় – দুনিয়া কী মনোহর,

তখনই তো মনে হয় একমাত্র ক্ষুণ্ন যা করছে

সে ওই সিঁড়িটা ।

আর তখন সিঁড়িটা লাথি মেরে ফেলে দেয়া হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৫)

৫. নারী যদি বিষময়ী হয় –

তার কাছে পুরুষেও হার মানে, জানেন নিশ্চয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৬)

৬. বীরের বীরত্ব শুধু তরবারি চালনার দক্ষতায় নয়

তার সঙ্গে থাকা চাই ভাগ্য আর সদয় সময়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৯৮)

অতএব বলা যায়, বিষয়বস্তুর অনন্যতায়, বোধের গভীরতায়, চরিত্র নির্মাণের দক্ষতায়, সর্বোপরি সংলাপের নান্দনিকতায় সৈয়দ শামসুল হকের *নারীগণ* কাব্যনাটকটি বাংলাসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ।

চম্পাবতী

সৈয়দ শামসুল হক পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের লোকনাট্য *বেদের মেয়ে* অবলম্বনে তাঁর *চম্পাবতী* কাব্যনাটক রচনা করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন জসীমউদ্‌দীন বাংলাসাহিত্যে প্রায় অনালোচিত এক লোকায়ত বেদেসমাজকে পাঠক-দর্শকের সম্মুখে বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর রচনার নাট্যগুণ ক্ষুণ্ন করেছেন। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি জসীমউদ্‌দীনকে এ রচনার সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কবি নিজেই তখন স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে *বেদের মেয়ের* লোকায়ত সুর অক্ষুণ্ন রেখে আধুনিক কাব্যনাটক রচনার উপদেশ দিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকের সৌন্দর্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে নাট্যকার সেলিম আল দীন এক লেখনীতে মন্তব্য করেছিলেন :

> এতে মোড়ল কর্তৃক গয়া বেদের স্ত্রী সুন্দরী চম্পাকে হরণ, বিবাহ ও পরিত্যাগের করুণ কাহিনি বিবৃত হয়েছে। *বেদের মেয়ে* অঙ্ক বিভাজিত হলেও যে যাত্রাপালারূপে অভিনীত হবার যোগ্য তা এতে লভ্য গানের সংখ্যা থেকে ধারণা করা যায়। কিন্তু প্রসেনিয়াম থিয়েটারের লক্ষণ এতে প্রকট। [...] তথাপি এর মধ্যে গীতিকা-র

গন্ধ আছে। [...] উপরন্তু *বেদের মেয়ে*র নাট্যকৌশলও অতিশয় সরল। এবং এর গদ্য সংলাপ সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষার মনোহারীত্বকে প্রকাশ করে।[১]

সেলিম আল দীন *বেদের মেয়ে*র মধ্যে নাট্যগুণ ও ভাষার মনোহারিত্ব অনুভব করলেও সৈয়দ শামসুল হক এটিকে সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করে নবাঙ্গিকে *চম্পাবতী* কাব্যনাটক সাজিয়েছেন। একদিকে তিনি যেমন ভাষাগত পরিবর্তন এনেছেন, কাহিনির ভাব বজায় রেখে নাট্যপ্লটের বদল করেছেন, তেমনি অঙ্ক-দৃশ্য বিভাজনেও জসীম উদ্‌দীনকে অনুসরণ না করে নতুনত্ব প্রদর্শন করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে*র মূল নাট্যকাহিনি তিন অঙ্কে বিভাজিত হলেও সৈয়দ শামসুল হক কোনো রকম অঙ্ক বিভাজনে না গিয়ে সমগ্র নাট্যকাহিনিকে কেবল দশটি দৃশ্যে বিভাজিত করে উপস্থাপন করেছেন। ফলে *চম্পাবতী*র নাট্যকাহিনি আরও সুসংহত ও বাহুল্যবর্জিত হয়েছে।

কবি জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজন প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে নাটকটির ১ম অঙ্কে ২টি দৃশ্য রয়েছে; যেখানে বেদেদের নৌকার বহর গ্রামে আসার ঘটনা থেকে শুরু করে প্রতাপশালী গ্রাম্য মোড়লকর্তৃক বেদে নারী চম্পাকে নিজগৃহে জোরপূর্বক নিয়ে আসা পর্যন্ত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নাটকটির ২য় অঙ্কে রয়েছে মোট ৪টি দৃশ্য। এ অঙ্কের ১ম দৃশ্যে 'কৃষকের গান' নামক একটি গীত রচনা করেছেন জসীম উদ্‌দীন; কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *চম্পাবতী* কাব্যনাটকে বেদেজাতির কাহিনির ভেতর হঠাৎ করে কৃষকদের নিয়ে গান সংযোজন প্রক্ষিপ্ত বিবেচনায় ছেঁটে ফেলেছেন। অন্যদিকে, ২য় দৃশ্যে মোড়লের স্ত্রী মালেকার সঙ্গে তাঁর দুই পরিচারিকার স্বামী-বশীকরণ বিষয়ক দীর্ঘ আলাপচারিতা ছেঁটে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *চম্পাবতী* কাব্যনাটকে সে আলাপের মূলসার গ্রহণ করে সুসংহত সংলাপ বিন্যাস করেছেন। একইভাবে, *বেদের মেয়ে* নাটক থেকে ৩য় দৃশ্যে বৈষ্ণবীর সাথে চম্পার আলাপ, ৪র্থ দৃশ্যে গয়া বেদে ও তার নতুন স্ত্রী আসমানির দাম্পত্যকলহ সংক্রান্ত দীর্ঘ সংলাপের মূলসার গ্রহণ করে সৈয়দ হক *চম্পাবতী* কাব্যনাটকটিকে জমাট করে তুলেছেন। এসব ক্ষেত্রে চরিত্রের মুখের কিছু কিছু সংলাপ কখনো হুবুহু রেখেছেন, আবার কিছু কিছু সংলাপ বদলে নিজস্ব চিন্তন ও ভাষার বাক্য জুড়েছেন। যেমন *বেদের মেয়ে* ৩য় দৃশ্যের প্রারম্ভে চম্পার মুখের 'ও নিঠুর কথারে' গানটি কিছুটা কেটে ছেঁটে নতুন আঙ্গিকে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *চম্পাবতী* কাব্যনাটকে

---

[১] সেলিম আল দীন, 'জসীম উদ্‌দীনের লোকনাট্য', *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য*, সৈকত আসগর (সম্পা.), বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩২২

ব্যবহার করেছেন। আবার, *বেদের মেয়ে* নাটকে এ দৃশ্যের শেষে দেখা গেছে গয়া বেদের আবার নতুন করে বিয়ে করার সংবাদে চম্পা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সুহৃদ বৈষ্ণবীর পরামর্শে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মাতবরের কাছে সমর্পণ করেছে; এবং মোড়লের সোহাগপূর্ণ কথার জবাবে বলেছে :

> কও – মোড়ল ! কও ! [...] যত সোন্দর কথা আছে আল্লার দুনিয়ায় – সগল তুমি আমারে কও, তাই হুইনা আমি আইজ নিজেরে ডুবাইয়া রাখুম। (বেদের মেয়ে : ৪৯)[১]

কিন্তু *চম্পাবতী* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক চম্পাকে আধুনিক কাব্যনাট্যের নায়িকা চরিত্র করে তোলার প্রয়োজনে এ কাহিনিটুকু পুরোপুরি বদলে দিয়েছেন। ফলত, *চম্পাবতী* নাটকে দেখা গেছে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন চম্পা ভোগী মোড়লের ভালোবাসা, মিষ্ট আলাপ, দামি উপহারগ্রহণ দূরের কথা, মোড়লের শত অত্যাচারের চাপেও আত্মসমর্পণ করেনি, সতীত্ব বিনষ্ট হতে দেয়নি। বরং স্বামী গয়া বেদের তাকে ভুলে নতুন করে বিবাহ সংবাদে সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

বেদের মেয়ে নাটকের ৪র্থ দৃশ্যে গয়া বেদে ও আসমানির দাম্পত্যকলহ, ভালোবাসার আবেগ ঠিক রেখে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে নাট্যকার *চম্পাবতী* কাব্যনাটকে দৃশ্য সাজিয়েছেন। কবি জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকে দেখা যায়, গয়া চম্পাকে অতীতে ভালবাসলেও বর্তমানে আসমানিকে নিয়ে সে সুখী। এ পর্যায়ে প্রাক্তন স্ত্রী চম্পার অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য স্মৃতিকাতরতা নয়, বরং বর্তমান স্ত্রী আসমানির গ্রামে গ্রামে লোক ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে আসার নানা কাহিনি শুনে গয়া আহ্লাদিত। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *চম্পাবতী* কাব্যনাটকে গয়াকে একজন সনিষ্ঠ আধুনিক প্রেমিক পুরুষের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর নাটকে তিনি বেদে নারীর লোক ঠকানোর কাহিনিতে গয়ার আনন্দ অংশটুকু বাহুল্য বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছেন। এবং নাটকে এ দৃশ্যটি শেষ করেছেন চম্পার প্রতি গয়ার গোপন ভালোবাসা, এবং নতুন করে তাকে ফিরে পাবার প্রত্যাশামিশ্রিত গান দিয়ে :

> ক্লান্তি কি জীবনে আছে ? মানবের জন্ম একবার!
> তারে যে হারাই আমি, পাইতাম যদি আরেকবার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৬)

---

[১] আলোচ্য প্রবন্ধে জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকের যাবতীয় উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত *বেদের মেয়ে*, ২০১৯ গ্রন্থ থেকে।

জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকের ৩য় অঙ্কে ৪টি দৃশ্য রয়েছে। এ-অঙ্কের ২য় দৃশ্যে দেখা যায়, মোড়লস্ত্রী মালেকা স্বামীর কল্যাণ কামনায় স্থানীয় ফকিরের সহায়তা নিচ্ছে এবং বেদেদের মন্ত্রসিদ্ধ উপকরণ গ্রহণ করছে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *চম্পাবতী* নাটকে বাহুল্য বিবেচনায় এটি গ্রহণ করেননি। আবার, এ দৃশ্যে *বেদের মেয়ে* নাটকে দেখা গেছে মোমিন ও আরমান নামক দুই ভণ্ডফকিরের চ্যালা কীভাবে মিথ্যে ভয় দেখিয়ে গ্রামীণ নারীদের ঠকিয়ে অর্থ আদায় করেছে। তারা বেদের সর্দার মোড়লের ওপর মন্ত্র করেছে – এই ভয় দেখিয়ে মোড়লের পতিব্রতা স্ত্রী মালেকার নিকট থেকে অর্থ ও পোশাক সংগ্রহ করেছে। বস্তুত, এ দৃশ্যটি জসীম উদ্‌দীন দুটি কারণে তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, তিনি সে সময়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ও গ্রামীণ বাস্তবতার চিত্র দেখাতে চেয়েছেন, দ্বিতীয়ত এ দৃশ্যের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর স্বামীনিষ্ঠা তথা মালেকার পাতিব্রত্য দেখিয়েছেন। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক নাটকের মূলঘটনার গতি ও আকর্ষণ ধরে রাখার প্রয়োজনে এ দৃশ্যটি বাহুল্যবিবেচনায় ছেঁটে ফেলেছেন। তিনি তাঁর নাটকে যে মালেকা চরিত্র নির্মাণ করেছেন সে সাহসী, সত্যবাদী, নির্ভীক এক নারী; লম্পট স্বামীর কল্যাণে ফকির ডেকে তন্ত্র মন্ত্র করা তার ধাতে নেই; সে কিছুতেই অন্যায়কে নীরবে নিয়তির বিধান ভেবে মেনে নিতে রাজি নয়। ফলে লম্পট স্বামীর কল্যাণের জন্য ফকিরদের ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেবার প্রয়োজনও তার নেই।

৩য় ও ৪র্থ দৃশ্যে *বেদের মেয়ে* নাটকে দেখা যায়, চম্পা মোড়লগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে পুনরায় ফিরে এসেছে বেদেবহরের নৌকায়; এবং এসে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা বিবেচনায় স্বামী গয়া বেদের কাছে স্ত্রীর পরিপূর্ণ মর্যাদা নয়, বরং সামান্য ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা পেতে ও দাসির অধিকারে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু গয়ার বর্তমান স্ত্রী আসমানি তাতেও রাজি না হওয়ায় গয়া বেদে আসমানির গৃহকর্মের সুবিধার্থে চম্পাবতীকে বাড়তি কাজের মেয়ে পরিচয় দিয়ে লোভ দেখিয়ে রাজি করিয়েছে। এ দৃশ্যে দেখা গেছে চম্পাবতী দীর্ঘকাল মোড়লগৃহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অভ্যস্ততায় বেদেদের জীবনের সাথে আর আগের মতো একাত্ম হতে পারছে না। মূলত এটি তার দীর্ঘকাল বেদে-জীবনাচার থেকে বিচ্ছিন্নতার ফল। ফলত, এখন তার নৌকা বেয়ে পথ চলতে হাত ব্যথা করে, বেদেদের দারিদ্র্যের সঙ্গে মানিয়ে বাসি-পঁচা খাবার খেতে তার অস্বস্তিবোধ হয়, এমনকি বেদেদের প্রধান জীবিকানির্বাহের উপায় হিসেবে সাপ নিয়ে গ্রামে গ্রামে খেলা দেখাতেও তার গা ঘিন ঘিন করে। তবে সৈয়দ হক *চম্পাবতী* নাটকে চম্পাকে আধুনিক কাব্যনাটকের নায়িকা করে তুলবার প্রয়োজনে গয়া-আসমানির দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করাননি। বরং গয়া তীব্রবিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে ত্রাতা হিসেবে সেখানে সরাসরি চম্পাকে উপস্থিত করেছেন। অর্থাৎ সৈয়দ শামসুল হক কাহিনির প্রক্ষিপ্ততা এড়িয়ে ঘটনার একমুখী

গতি বাড়িয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন যেখানে কাহিনি ও সংলাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে নাট্যমুহূর্ত ক্ষুণ্ন করেছেন, সেখানে সৈয়দ শামসুল হক বর্ণনা সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে নাট্যমূহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। *চম্পাবতী* নাটকে চম্পার বিরহে স্মৃতিকাতর গয়ার চরম বিপদের মুহূর্তে আকস্মিকভাবে চম্পার ঘটনাস্থলে আগমন এবং নিজের জীবন তুচ্ছ করে গয়াকে বাঁচিয়ে তোলার নাটকীয় দৃশ্য নাটকের নাট্যরস যেমন বজায় রেখেছে, তেমনি আধুনিক কাব্যনাটকের নায়ক-নায়িকা হিসেবে গয়া-চম্পাকে মহত্তম সত্তায় উন্নীত করেছে। এখানে নাট্যকার সৈয়দ হক তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করেছেন।

চম্পাবতী নাটকে প্রধান পুরুষ চরিত্র তিনটি – দশ গ্রামের মোড়ল, সাপুড়েদের নেতা গয়া বেদে ও মাতবরের চ্যালা মাইনক্যা। এছাড়া দলগত আরও কিছু চরিত্র রয়েছে। যেমন সাপুড়ের দল, লাঠিয়াল বাহিনী প্রভৃতি। অন্যদিকে প্রধান নারী চরিত্রও তিনটি। মোড়লের স্ত্রী মালেকা, গয়ার প্রথম স্ত্রী চম্পাবতী ও গয়ার দ্বিতীয় স্ত্রী আসমানি। এছাড়া পার্শ্বচরিত্র হিসেবে রয়েছে মোড়ল পরিবারের দাসি, অন্যান্য বেদে নারী, বিশেষ চরিত্রে বৈষ্ণবী। জসীমউদ্‌দীন তাঁর *বেদের মেয়ে* নাটকে যেভাবে চরিত্রের গতি-প্রকৃতি, বিকাশ-পরিণতি নির্মাণ করেছেন, *চম্পাবতী* নাটক রচনার সময় সৈয়দ হক তার অনেক কিছুই বদলে দিয়েছেন। আধুনিক কাব্যনাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নায়ক-নায়িকা বাহ্যত চারিত্রশক্তিতে দৃঢ় ও অটল থাকলেও হৃদয়িক রক্তক্ষরণে সিক্ত হবে। *বেদের মেয়ে* নাটকে জসীমউদ্‌দীন এই ক্ষরণের ইঙ্গিত প্রদান করলেও, পুরোপুরি তা চিত্রিত করতে পারেননি; তিনি সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নায়ক-নায়িকাকে নিম্নবিত্তশ্রেণির মানসিকতা অনুসারে চিত্রিত করেছেন। গয়া বেদে ও চম্পাবতী মোড়লের অত্যাচারের শিকার হয়ে আলাদা হয়ে গেলেও অচিরেই গয়া আসমানিকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে সংসার পেতে জীবনবাদিতার পরিচয় দিয়েছে। সেখানে আধুনিক নর-নারীর বিরহকাতরতা, রোমান্টিসিজম অনুপস্থিত ছিল। পেটের দায় বা অস্তিত্বরক্ষাই সেখানে বড় কথা। আসমানির পতিসেবায় গয়া পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে না পারলেও জীবনধর্ম মেনে জীবিকার তাগিদে আসমানির গ্রামে গ্রামে, হাটে-বাজারে লোকঠকিয়ে পয়সা আনাকে সাধুবাদ দিয়েছে। আবার, চম্পাবতী যখন মোড়লগৃহ থেকে ফিরে বেদেবহরে পূর্বের মতো কর্মনিষ্ঠা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন গয়া তাকে ভৎর্সনা করে বলেছে :

> গয়া ॥ দেখ্ চাপাই। তুই যদি আমাগো কুনু কাম না করবি, ক্যাবল লবাবের মতন হয়া থাকপি, তয় তোরে কেমন কইরা রাখপ ? কে তোরে গরে বসায়া খাওন দিবে। (বেদের মেয়ে : ৮৫)

কিন্তু *চম্পাবতী* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক গয়া বেদের এই অতিনিরেট অস্তিত্ববাদী মানসিকতাকে এড়িয়ে গিয়ে তাকে পরিপূর্ণভাবে আধুনিক কাব্যনাটকের রোমান্টিক নায়ক তথা প্রেমিকপুরুষ করে তুলেছেন, এবং দেখিয়েছেন, যেখানে গয়া মোড়লের অত্যাচারের শিকার হয়েও নিজ স্ত্রীকে অনায়াসে ছেড়ে যায়নি। একজন আত্মমর্যাদাবান প্রেমিকের মতো, দায়িত্ববান স্বামীর মতো প্রতিবাদ করে বলেছে :

ল্যাজে টান দিয়া আমরা গোক্ষুর গর্ত থিকা বাইর কইরা আনি,

তাই নিবেদন –

বাইদ্যার নারীর দিকে দৃষ্টি দিবার আগে সাবধান! সাবধান হন! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৫)

কিন্তু এরপর মোড়লের অত্যাচার থেকে নিজ জাতিকে রক্ষার স্বার্থে যখন চম্পাবতী মোড়লের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, তখন একজন প্রেমিক স্বামীর মতোই চম্পার প্রতি গয়া ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছে। কেননা গয়া গরিব হলেও সে জানে – টাকা দিয়ে সব কেনা যায় না, এবং ‘ইজ্জত অমূল্য মণি সাপের মাথায়’। চম্পার সিদ্ধান্তের সূত্রে অভিমানী প্রেমিকের মতোই সে বলেছে :

কী কস? কী কইলি রে! নটি হারমাজাদী!

তোর সাথে আর যদি আমি ঘরে থাকি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৬)

এবং এই অভিমানের জেরেই সে অন্য বেদে-নারী আসমানিকে বিয়ে করে ঘরে তুলেছে; এবং চম্পাকে ভুলে সে আসমানিকে নিয়ে সুখে ঘরকরার যারপরনাই অভিনয় করে গেছে। কিন্তু দর্শক সহজেই অনুমান করতে পেরেছে যে, আসমানিকে নিয়ে গয়া যাপিত জীবনে সুখে থাকার চেষ্টা করে গেলেও, তার হৃদয় পুরোপুরি এখনো চম্পার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন ও অমলিন। ৮ম পরিচ্ছেদে গয়ার সঙ্গে আসমানির আলাপে ও অনুযোগেই তা স্পষ্ট। আসমানি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছে – গয়া এখনো চম্পার স্মৃতি বুকে ধারণ করে আছে বলেই আসমানির ভালোবাসা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে না। তাদের কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে :

গয়া । মন কেন গো পাইনা নূতন বাইদ্যানিগো, বউ।

পদ্মা নদীর বুক ভরিয়া ক্যান বা কালা ঢেউ ?

আসমানি। চম্পারে কি ভুলছো তুমি ? সেই ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৩)

আসমানির এই কটাক্ষে গয়ার জীবনসত্যে আঘাত লাগলেও ভালোবাসার স্ত্রী চম্পার প্রতি গভীর অভিমান বুকে নিয়ে সে আসমানির সঙ্গে দাম্পত্যজীবনে সুখী হবার চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু আসমানী গ্রামে কাজে চলে যাবার পর বারে বারে নিভৃতে গয়া চম্পাকে স্মরণ করেছে। একজন আধুনিক প্রেমিক পুরুষের মতোই তার হৃদয়

দ্বন্দ্বে-দোটানায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। একদিকে চম্পার সঙ্গে যাপিত জীবনের স্মৃতি, চম্পার সনিষ্ঠ ভালোবাসা, অকৃত্রিম সেবা, স্বামীর প্রতি আত্মনিবেদনের স্মৃতি তাকে কুরে কুরে খেয়েছে, অন্যদিকে যখনি মনে পড়েছে চম্পা তাকে ছেড়ে অন্য ধনী গৃহস্থের ঘর বেছে নিয়েছে, তখনই প্রচণ্ড অভিমানে সে তাকে ভুলতে চেয়েছে। কিন্তু মনে-প্রাণে সে তার বঞ্চিত জীবনে আবার চম্পাকে পেতে চেয়েছে। এ পর্যায়ে গয়ার বক্তব্য উল্লেখ্য :

মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, ঝড়।
খলখল করে পদ্মা বুকের ভিতর, গাছ ভাঙে মড়মড়,
গর্তে ভিতরে সাপ মাথা তোলে। চম্পা মনে পড়ে! [...]
তারপর যেই চিন্তা ছোঁ দিয়া নাইমা আসে, চিল তীক্ষ্ণ ঠোঁটে –
অতীতের সোহাগের লাশ ছিঁড়া খায় – আর শান্তি নাই মোটে।
শান্তি কি জীবনে আছে ? মানবের জন্ম একবার!
তারে যে হারাই আমি, পাইতাম যদি আরেকবার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৬)

এরপর গয়ার এই ইচ্ছেপূরণ হয়েছে একেবারে তাঁর জীবন সায়াহ্নে। সৈয়দ শামসুল হক গয়া ও চম্পার আপাত বিচ্ছেদ ঘটালেও পরস্পরের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও হৃদয়জাত পবিত্রতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। গয়া আসমানির সঙ্গে সংসার সাজালেও তার হৃদয় চম্পার ভালোবাসায় স্মৃতিকাতর হয়েছে। আর চম্পা মোড়লগৃহে শত অত্যাচার সহ্য করেও তার দেহমনের পবিত্রতা ধরে রেখেছে। শেষপর্যন্ত গয়ার প্রতি সে তার ভালোবাসার একনিষ্ঠতা দেখিয়ে গেছে নিজজীবন উৎসর্গ করে। অন্যদিকে গয়া বেঁচে উঠলেও তাঁর হৃদয় আজীবন বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় রক্তাক্ত হয়েছে। চম্পার মৃত্যুর পর যা প্রকাশিত হয়েছে সমবেত বিলাপের সুরে :

মাটির দেহ শুইয়া আছে মাটির বিছানায়।
পঙ্খী উইড়া গেলে পঙ্খী পালক থুয়া যায়।
নারীর জীবন জলের লিখন জলে মুইছা যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৭৮)

গয়া ছিল নিজপেশায় অত্যন্ত সৎ ও দক্ষ। বেদেবহর নিয়ে তার সফর, সাপধরার কৌশল ও দক্ষতা তার প্রমাণ। এমনকি নিজের আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষার্থেই গ্রামবাসীর কথায় সে বিষাক্ত সাপ নিয়ে সাহসের সঙ্গে খেলা দেখাতে গেছে। গ্রামবাসী যখন তাঁর অহমবোধে আঘাত দিয়ে বলেছে :

গ্রামবাসী। বোঝা গেছে কেরামতি! বাহাদুরি করো!
কালনাগ ধরো! [...]

বুঝতাম, বুঝতাম যদি এই সাপ লয়া

খেলাটা দেখাইতে পারো আইজ তুমি গয়া –

তবে বুঝি তুমি বাইদ্যা

গয়া বাইদ্যা বড় বাইদ্যা

দ্যাশের ভিতরে।

কইলা না গুণ আছে তোমার শিকড়ে!

বিষে করো ভয় ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৭২)

তখনই গয়াবেদে একদিকে আত্মঅহমবোধের তাড়নায়, অন্যদিকে বেদেসম্প্রদায়ের অস্তিত্বরক্ষা ও সম্মানরক্ষায় নিজের জীবনসংশয় জেনেও বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলার সাহস করেছে। *বেদের মেয়ে* নাটকেও চাষির কথায় উত্তেজিত হয়ে গয়া বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করতে চেয়েছে। তবে সে কারণ ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। সে আসমানিকে জানিয়েছিল বেদে সর্দার হিসেবে তার বেদেসমাজে মান থাকবে না যদি না সে বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা দেখাতে না পারে। সে বলেছিল :

গয়া ॥ হাসাইলি তুই আমারে চাপাই। আমি বাইদ্যার সর্দার। এই সাপ দেইখা যদি ডরাই তয় কি বাইদ্যার দলে আমার মান থাকপি ? (বেদের মেয়ে : ৮৯)

কিন্তু *চম্পাবতী* নাটকে গয়ার বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলার কারণ নাট্যকার একান্তই ব্যক্তিগত করে দেখাননি। গয়াকে একজন পরিপূর্ণ নায়ক করে তুলবার প্রয়োজনে সাপধরার প্রয়োজনটিও করে তুলেছেন সর্বজনীন। নিতান্ত ব্যক্তিগত মানমর্যাদা বৃদ্ধি নয়, বরং গয়া সমগ্র বেদেবহরের অস্তিত্বের প্রয়োজনে, অভাব মেটানোর তাগিদেই সাপ ধরতে চেয়েছে। নাট্যকার এখানেই গয়াকে জীবনবাদী করে তুলেছেন। *বেদের মেয়ে* নাটকে গয়ার বর্তমান স্ত্রী আসমানির লোকঠকিয়ে অর্থোপার্জনকে খুশিমনে গ্রহণ করেছে। প্রতারণার খেলায় আসমানির দক্ষতাকে প্রশংসা করে বলেছে : ‘বেশ বাইদ্যানী – বেশ। [...] বাইদ্যানী! তোর এতগুণ আছে আগে জানতাম না।’(বেদের মেয়ে: ৬২) কিন্তু *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যের গয়া অসৎ পথে নয়, লোক ঠকিয়ে নয় বরং সবার সম্মুখে বীরত্বের সঙ্গে সদুপায়ে অর্থোপার্জন করতে চেয়েছে। এখানেও নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক গয়া চরিত্রটিকে মহত্তম সত্তায় উত্তরণ ঘটিয়েছেন। *চম্পাবতীর* গয়া বেদের এতৎসংক্রান্ত সংলাপ নিম্নে উল্লেখ করা যেতে পারে :

যদি না দেখাই খেলা পেট ভরবো কীসে ?

অভাবের যত বিষ, তত বিষ নাই সর্প বিষে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৭৩)

একজন স্বামী হিসেবে গয়া কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল। প্রথম স্ত্রী চম্পার প্রতি সে যেমন দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিল; তেমনি চম্পাকে হারিয়ে সে যখন আসমানিকে বিয়ে করেছে, তখনও হৃদয়জাত আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও সে আসমানিকে ঠকাতে চায়নি। বরং আসমানির নানান আবদার মিটিয়ে তার সঙ্গে মানিয়ে-গুছিয়ে সংসার করতে চেয়েছে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের একজন নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ হয়েও সে নারীর প্রতি নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধাশীল পুরুষসত্তা। চম্পা যখন তার জীবনে ছিল তখন চম্পার সতীত্ব রক্ষায় সে মোড়লের সঙ্গে লড়াই করেছে। আবার আসমানি যখন রেগে অভিমানে বাপের বাড়ি চলে যেতে চেয়েছে, তখন সে গ্রামীণ সাধারণ প্রেমিক পুরুষের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তাকে নানান কথায় ভুলিয়ে মান ভাঙিয়েছে :

আসমানি। বাড়ির কাঞ্চি বাঁশের ঝাড়ে বাঁশ মড়মড় করে,
সেই না বাঁশের মারবো লাঠি বাইদ্যারে আজ ধরে।
গয়া। সেই না বাঁশ বাজায়ে বাঁশী শুনাবো তোরে গান,
আসমানি তুই আসমানিরে আমার আসমান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৬)

অর্থাৎ, সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *চম্পাবতী* নাটকে গয়া বেদেকে পুরোপুরি আধুনিক কাব্যনাটকের নায়ক চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

চম্পাবতী কাব্যনাট্যের নামচরিত্র গয়া বেদের স্ত্রী চম্পাবতী। বস্তুত, সে-ই আলোচ্য কাব্যনাট্যের প্রধান নারী চরিত্র; তাকে ঘিরেই নাটকের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নাটকের সমগ্র কাহিনিই তার জীবনব্যাপী আত্মত্যাগের কাহিনি। প্রথমত, মোড়লের লালসার শিকার সে। নিজ জাতি, সম্প্রদায়কে মোড়লের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে সে নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়েছে। আবার শেষদিকে স্বামীর জীবন বাঁচাতে নিজের জীবনটাই উৎসর্গ করে দিয়েছে। তাঁর মতো এমন উদার, এমন প্রেমসিক্ত, এমন কোমল, মহৎ চরিত্র আলোচ্য নাটকে আর একটিও নেই। তবে এখানেও সৈয়দ শামসুল হক *বেদের মেয়ের* প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে নিজস্ব সৃজনশীলতাগুণে চম্পাবতীর চরিত্র নির্মাণে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকের চম্পাবতী বা চাপাইয়ের সাথে সৈয়দ শামসুল হক নির্মিত *চম্পাবতী* কাব্যনাটকের চম্পাবতী চরিত্রটির সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি তাদের বৈশাদৃশ্যও অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর *বেদের মেয়ে* নাটকে চাপাই চরিত্রটিকে নিতান্ত বেদে সমাজের এক ত্যাগী নায়িকারূপে চিত্রিত করেছেন। তার অপার দৈহিক সৌন্দর্যই জীবনের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চম্পা যেমন রূপের আধার, তেমনি বেদেনি হিসেবে

সাপের খেলা দেখাতে, নৃত্য গীত পরিবেশনেও অত্যন্ত দক্ষ। আর এটিই লোভী, লম্পট মোড়লকে তার দিকে আকৃষ্ট করেছে। এ যেন সেই চর্যাপদের 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' নামক প্রবাদপ্রতিম কথার-ই প্রতিফলন। যেটিকে সৈয়দ শামসুল হক বর্ণনা করেছেন 'নারীর রূপ যে সর্বনাশী, নারীকেই সে খায়' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪১) নামক চরণাংশের মাধ্যমে।

মোড়লের অত্যাচার থেকে নিজ জাতিকে বিনাশ থেকে রক্ষাকল্পে চম্পার আত্মত্যাগ, তার পতিভক্তি – চরিত্রের এসব বৈশিষ্ট সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *চম্পাবতী* নাটকে বজায় রেখেছেন। তবে চম্পা চরিত্রটিকে তিনি পতিভক্ত সাপুড়ে নারী থেকে আধুনিক নারীতে উত্তীর্ণ করেছেন। ফলে আলোচ্য কাব্যনাটকে চম্পাবতী চরিত্রটি সামান্য বেদে নারী থেকে আরও স্নিগ্ধশ্রী,আরও তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাপূর্ণ নারী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে মেয়েদের বর্ণনা থেকেই চম্পাবতীর ভুবনভোলানো রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর গ্রামীণ কিশোর-কিশোরী, বিশেষ করে মাইনক্যার সাথে সাপখেলা দেখানো নিয়ে তার দরাদরি – তাকে একজন দক্ষ বেদে নারী হিসেবে আমাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়। তবে এর মধ্যেই আমরা তার আরেকটি কোমল, উদার, সচেতন দিকের সঙ্গে পরিচিত হই, যা দলের অন্য বেদে নারীদের মধ্যে নেই, এবং তা হলো নিজ দলের কল্যাণভাবনা। মাইনক্যা যখন সাপখেলার পারিশ্রমিক নিয়ে দর-কষাকষি করছে, তখন তার প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে অন্য বেদে মেয়েরা অন্যত্র চলে যেতে চেয়েছে, তখন চম্পা অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো তাদের থামিয়ে দিয়ে বলেছে :

> থামলো তোরা থাম!
> এই গেরামে নৌকা যদি ঘাটেই বাঁধলাম –
> খালি হাতেই ফিরা যাবো! সাপ না খেলায়া?
> আমরা তবে বাইদ্যার দল বাঁচবো কী খায়া? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৫)

তবে, জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকের চম্পা চরিত্রটি বেশি চটুল, বেশি চপল। তার মুখের ভাষা জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ প্রবাদের ছড়াছড়ি। যথার্থ বেদে নারীদের মতোই খিস্তিখেউড় মিশ্রিত সংলাপে অভ্যস্ত সে। সাপের খেলা নিয়ে মাইনক্যা চরিত্রটির দরদামের বিপরীতে তার উত্তর প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে :

> চম্পা ॥ দূর মুখপোড়ার বেটা মুখপোড়া! – যা পাঁচ টেহা অ্যানগ্যা।
> মাইনক্যা ॥ বাইদানি ! আরো কিছু রিয়াইত মুরিত কর।

চম্পা ॥ ওরে আমার আবা জাবা

ওই মুখে বাতাসা খাবা ! [...]

আরে আটকুড়ার নাতি। তোর সাথে আর পারা গেল না। যা এক পয়সা আ্যানগ্যা। তোরে আমি খেলা দেখাইমু। (*বেদের মেয়ে*: ৪-৫)

বস্তুত, *বেদের মেয়ে*র চম্পা বেদেসম্প্রদায়ের উত্তম প্রতিনিধি; আর সৈয়দ শামসুল হকের *চম্পাবতী* নাটকের চম্পাবতী যতটা না বেদে নারী, তার চেয়ে বেশি আধুনিক কাব্যনাট্যের রোমান্টিক প্রেমিকা চরিত্র। এখানেই দুই লেখকের চরিত্র নির্মাণের মূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় নাটকের চম্পাবতীই অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের অধিকারী; অপরের কল্যাণ কামনায় যে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে। *চম্পাবতী* নাটকের চম্পা মোড়লের লাঠিয়ালের অত্যাচারের ভয়াবহতা দেখে শিউরে উঠেছে; নিজেকে দায়ী করেছে এই অত্যাচারের নেপথ্য কারণ হিসেবে। কেননা তাকে দখলে নিতেই বেদেজাতির ওপর মোড়লের এই নির্মম অত্যাচার। ফলে তার মানবিক হৃদয় ভেবেছে – তার সম্মান যদি বিনষ্ট হয়ও, যদি সমাজে তার অসতী হিসেবে পরিচিতিও হয়, এমনকি এহেন কর্ম ধর্মে যদিবা নিষিদ্ধ থাকে, তবু তার একটি সিদ্ধান্তে তার গোটাসম্প্রদায় রক্ষা পাবে। তার আত্মগ্লানি ও স্বজাতির কল্যাণভাবনার এই দ্বন্দ্ব চমৎকার একটি সংলাপে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন :

আমারই কারণে যদি এত অত্যাচার –

তবে এ যৈবন রাইখা কি হবে আমার ?

নিজের ইজ্জত দিয়া বাঁচে যদি বাইদ্যা বংশ তবে –

অসতী আমারে লোকে কয় যদি কবে,

তবু জাতি রক্ষা পাবে, আমি রাজি হই –

মাথার উপরে আল্লা, মাফ করবেন নিশ্চই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৬)

এরপরের ঘটনায় মোড়লের ভালোবাসা ও উপহার সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। সদর্পে জানিয়েছে – তারা বেদে নারী। গৃহস্থ নারীর মতো প্রচলিত সাজ, পোশাক, অলঙ্কারে তাদের মন নেই। বরং সাপ-ই তাদের ভূষণ। বিষাক্ত সর্প নিয়েই তাদের খেলা। উভয় নাটকেই দেখা গেছে চম্পাবতী বৈষ্টমী চরিত্রের মাধ্যমে তাদের প্রাক্তন স্বামী ও বেদে বহরের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। দুজনেরই অপরিসীম কৌতূহল ছিল যে, তাদের স্বামীরা তাদের মনে রেখেছে কি না! কিংবা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য তাদের এই আত্মত্যাগ

বেদেসমাজ কতটা গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেছে। জসীমউদ্‌দীন বিরচিত *বেদের মেয়ে* নাটকে চম্পা বৈষ্ণবীকে উদ্দেশ্য করে অতি আগ্রহভরে বলেছে :

> চম্পা। খবর পাইছ? তারা সগলে ভাল আছে? আমার গয়া বাইদ্যা ভাল আছে? [...] তার চেহারা বুঝি আমার জন্যি ভাইবা ভাইবা কাহিল হয়া গ্যাছে? [...] আমি অভাগিনী জীবনের সর্বস্ব ধন সপ্যা দিয়া তাগো বাঁচাইলাম। এ কথা লয়া সে কোন গান বানায় নাই ? আর সেই দুক্কের গান দ্যাশে দ্যাশে সগল মানুষগো শিখায়া দ্যায় নাই? (বেদের মেয়ে : ৪৫)

অর্থাৎ *বেদের মেয়ে* নাটকের চম্পা চরিত্রটি স্বামী গয়ার ভালোবাসা আশা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বিখ্যাত হবার আশা পোষণ করেছে। ভেবেছে তার এই আত্মত্যাগ একেবারেই ফেলনা নয়। বরং এ কার্যে বেদে সমাজে তার খ্যাতি, সম্মান আরও উঁচু হবে। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক বিরচিত *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যের চম্পার বিখ্যাত হবার কোনো আশা নেই; সে কেবলই নিতান্ত বিরহী প্রেমিকা। সেও ব্যাকুল হয়ে বৈষ্ণবীর নিকট নিজ সম্প্রদায়ের খোঁজখবর জানতে উদগ্রীব হয়েছে; এবং সেখানেও তার তাবৎ জিজ্ঞাসা কেবল ব্যক্তি গয়া বেদে আর তার ভালোবাসাকেন্দ্রিক। তাকে নিয়ে কেউ গান বেধে সমাজে প্রচার করল কি না, তার আত্মত্যাগ বিখ্যাত গীত বা গল্প হয়ে দেশে দেশে শ্রুত হল কি না, তা নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই। এখানেই কবি জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে*র চাপাই চরিত্র থেকে সৈয়দ শামসুল হক রচিত *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যের চম্পা চরিত্রটি পৃথক হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কাব্যনাট্যে সে সামান্য বেদেনারী উত্তীর্ণ হয়েছে আধুনিক রোমান্টিক নারীসত্তায়। বৈষ্ণবীর নিকট তার প্রশ্নকাতর আকুতি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে :

> চম্পা। কোন্ দ্যাশে যে বাইদ্যা আছে আমি কি তার জানি?
> পাইছে বুঝি খুঁইজ্যা কোনো নূতন বাইদ্যানি।
> তার খবর আইনা দেও।
> জাতিধরম দিয়া জাতি বাঁচাইলাম বাইদ্যার।
> ভুইলা গেছে? ভাইঙ্গা পড়ে নদীর দুইপাড়।
> তার খবর আইনা দেও। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৩)

আবার, বৈষ্ণবীর মুখে গয়া বাইদ্যার পুনরায় বিয়ে করে সংসারী হবার খবর শুনে চম্পাবতীর প্রতিক্রিয়া দুই নাটকে দুজন নাট্যকার পৃথকরূপে উপস্থাপন করেছেন। জসীমউদ্‌দীন যেহেতু তাঁর নাটকে বেদে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে চম্পাবতীর চরিত্র রূপায়ণ করেছেন, ফলে

চম্পাবতী গয়া বেদের নতুন বিয়ে করার সংবাদে এবং নিজ জাতিকর্তৃক তার আত্মত্যাগের ইতিহাস ভুলে যাওয়ার কথা শুনে প্রচণ্ড অভিমানী ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তার আত্মগ্লানি হয়, সে কেন অহেতুক তাদের কথা স্মরণ করে জীবন অতিবাহিত করেছে, মোড়ল গৃহের সুখ সমৃদ্ধি উপেক্ষা করেছে! এ পর্যায়ে প্রচণ্ড হতাশা, রাগ ও অভিমান থেকে বৈষ্ণবীর পরামর্শে সে মোড়লের মধ্যেই নতুন করে গয়া বেদের ভালোবাসা খুঁজে নিতে উদ্যোগী হয়েছে। বৈষ্ণবী যখন বলে – কৃষ্ণের লীলায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে, মোড়লের মধ্যে গয়াকে খুঁজে নিতে, তখন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মোড়লের ভালোবাসা সাদরে গ্রহণ করে মোড়লকে জানিয়েছে :

> কও – মোড়ল! কও! – এমনি কইরা তোমার যত আদর যত্তনের কথা আছে আমারে কও – আমার দুই কানে যদি না ধরে, আমি সমস্ত বুক পাইতা দিব তা হুননের লাইগ্যা। যত সোন্দর কথা আছে আল্লার দুনিয়ায় – সগল তুমি আমারে কও, তাই হুইনা আমি আইজ নিজেরে ডুবাইয়া রাখুম। [...] তুমি আমার সামনে বয়া বয়া খালি সোন্দর সোন্দর কথা কও। [...] না – না মোড়ল তুমি আমারে ছাইড়া যাইও না। (বেদের মেয়ে: ৫০)

এবং এরপর থেকে সে তার যথাসর্বস্ব দিয়েই মোড়লের সংসারে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে সুখী জীবনযাপনের চেষ্টা করে গেছে; যা একজন নিম্নবিত্ত অভাবী নারীর জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর চম্পাবতীকে ভালোবাসার একনিষ্ঠতা ও ত্যাগের মাহাত্ম্যে অনন্যতা দান করেছেন। তিনি মোড়লের প্রতি চম্পার নিঃর্শত আত্মনিবেদনের তথ্য উপস্থাপন করে তার ঔদার্য্য ক্ষুণ্ন করতে চাননি। ফলে তিনি গয়ার নতুন করে বিবাহ করার সংবাদে চম্পাবতীর প্রতিক্রিয়া অঙ্কন করেছেন নাট্যনির্দেশে – একটি বাক্যে :

> বৈষ্ণবীর এ কথায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে চম্পা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৩)

এই একটি প্রতিক্রিয়াতেই দর্শক চম্পার বক্ষপিঞ্জরে জমে থাকা ক্ষোভ, অভিমান, কষ্ট এবং স্বামীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রমাণ পেয়ে যায়। ফলে নাট্যকার সৈয়দ হক আর এ পরিচ্ছেদ সংলাপের মাধ্যমে দীর্ঘ না করে সরাসরি বেদেবহরে গয়া-আসমানির দাম্পত্যদৃশ্যে চলে গেছেন অত্যন্ত নাট্যসংযমের পরিচয় দিয়ে।

এরপর উভয় নাট্যকারের নাটকে আবার চম্পাবতী চরিত্রটির উপস্থিতি ঘটেছে বৈষ্ণবীর সঙ্গে আলাপরত অবস্থায়। এ-পর্যায়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্বের দুজন চম্পাবতীর উপস্থিতি পাওয়া যায়। উভয় নাটকেই দেখা যায়, চম্পাবতীর প্রতি মোড়লের প্রাথমিক মোহ ও ভালোবাসা উবে গেছে; বিনিময়ে তাদের ওপর নেমে এসেছে অত্যাচার, নির্যাতন। তবে জসীম উদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে* নাটকের চরিত্র চম্পাবতীর জীবনে নেমে

আসা দুঃখের কারণ এবং সৈয়দ হকের *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যের চম্পার জীবনে নেমে আসা দুঃখের কারণ ভিন্ন। প্রথম চম্পাবতী বৈষ্ণবীকে জানিয়েছে যে, মোড়লের কাছে সে নিজের শরীর মন সঁপে দিয়ে সুখী হবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, কিন্তু মোড়ল আর এখন তাতে তৃপ্ত নয়, এমনকি তার প্রতি আর আসক্তও নয়। বরং তার প্রতি মোড়লের মোহ কেটে গেছে। সংসারে তার অবস্থান এখন দাসির মতোই। এ পর্যায়ে সে অতি দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছে যে, মোড়ল একদিন তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার পেছনে ভ্রমরের মতো গুনগুন করতো নানান উপহারের থালি সাজিয়ে, তার আজ এমন দশা হয়েছে যে, সংসারে কাজ করলে পেটে আহার জোটে, আর কাজে একটু ভুল হলেই নেমে আসে মোড়লের নির্যাতনের খড়্গ। মোড়লের এই আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কে সে সমাজে বিদ্যমান ভোগবাদী পুরুষতন্ত্রের এক চিরন্তন সত্য উপস্থাপন করে বৈষ্ণবীকে জানিয়েছে :

> পুরুষের মন ত জান তুমি; ফুলটারে গাছের থনে ছিড়্যা গন্ধ শুইকা ফেলায়া দেয়। [...] আমার নছিবের কথা আর কি কইমু তোমারে? মোড়ল আমার দিকে আর ফির‍্যাও চায়া দেখে না। (বেদের মেয়ে : ৬৫)

সৈয়দ শামসুল হক *বেদের মেয়ের* নায়িকা চম্পাবতীর এমন করুণ পরিণতি দেখেই হয়তো এ চরিত্রটির মূলভাব বজায় রেখে নবনির্মাণের কথা ভেবেছেন। যে চম্পাবতী নিজ জাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণের কথা ভেবে নিজেকে উৎসর্গ করে মহত্ত্ব দেখিয়েছে; সে-ই আবার অভিমানবশত স্বামীকে ভুলে মোড়লের সংসারে থিতু হবার চেষ্টা করছে – এটি সৈয়দ শামসুল হকের আধুনিক যুক্তিবাদী মনন ও রোমান্টিক সৃষ্টিশীল সত্তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। ফলে তিনি এ পর্যায়ে চম্পাবতীর ওপর মোড়লের নির্যাতনের চিত্র অক্ষুণ্ন রেখে তার কারণ হিসেবে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেছেন। *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যে চম্পাবতী মোড়লের অনুকম্পা ও অনুগ্রহপ্রার্থী নয়; সে বরং গয়ার স্মৃতি বুকে নিয়ে মোড়লের সঙ্গে লড়াই করে গেছে নিজ সম্ভ্রম রক্ষার। শত অত্যাচার নিপীড়নেও সে তার ভালোবাসা থেকে বিচ্যুত হয়ে মোড়লের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেনি; আত্মসম্মানবোধ ও নারীত্ব বিসর্জন দেয়নি। সে গানে গানে জানিয়েছে যে, দুঃখের সায়রে সে স্বেচ্ছায় জীবন ভাসিয়েছে, শত অত্যাচার ও অনাহারে থাকলেও নিজ সম্মান, একনিষ্ঠতা বজায় রেখে তার মধ্যেই সে প্রকৃত সুখ খুঁজে নেবে। এই অজেয় সঙ্কল্পের কারণে তার প্রতি মোড়লের জেদ ও অত্যাচার আরও বেড়ে গেছে। চম্পা বৈষ্ণবীকে জানিয়েছে :

> দুঃখের কথা কবো কি আর, বোষ্টুমি ঠাকরুন।
> মোড়ল সাবে পারলে আমায় কইরা ফালায় খুন।
> তার পালংকে যাই নাই বইলা কেশ কাইট্টা দিছে।

পুরা বাড়ির রান্ধনের কাম আমার হাতে দিছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৪৬৭)

ফলে উভয় নাটকেই চম্পাবতী তাদের প্রাক্তন আবাসস্থল বেদে বহরে ফিরে যাবার প্রত্যাশা করেছে। কিন্তু দুজনের মধ্যে এখানেও রয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্য। *বেদের মেয়ের* চম্পাবতী মোড়লের অত্যাচার থেকে বাঁচতে মূলত বেদের দলে ফিরতে চেয়েছে । সে প্রত্যাশা করেছে – 'আবার যদি ছাড়া পাইতাম, আবার যদি সেই বাইদ্যার দলে যাইবার পারতাম,'(বেদের মেয়ে : ৬৫)। অন্যদিকে *চম্পাবতীর* চম্পা মোড়লের অত্যাচার থেকে হতে রক্ষা পেতে বেদে বহরে ফেরত যাবার প্রত্যাশা কেবল নয়, স্বামী গয়াকেও ফিরে পেতে চেয়েছে অদম্য ব্যাকুলতায়। পাতিব্রত্য নারীর নিষ্ঠা নিয়েই সে বলেছে :

মনের সকল নালিশ আমি উঠায়া লইতাম।

আমার বাইদ্যার দেখা যদি আবার পাইতাম! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৭)

এরপর, উভয় নাটকের চম্পাবতীই মোড়লের গৃহ ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে মোড়লের স্ত্রী মালেকার প্রতিবাদ এবং প্রত্যক্ষ সহায়তায়। তবে এখানেও রয়েছে পার্থক্য। *বেদের মেয়ের* চম্পাবতীকে মোড়ল নিজেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে গৃহকাজে, বিশেষত রান্নার সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির অজুহাতে। অন্যদিকে *চম্পাবতীর* চম্পা নিজেই প্রতিনিয়ত মোড়লগৃহ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, এবং পরিশেষে মোড়লের স্ত্রী মালেকার সহায়তায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

এ পর্যায়ে *বেদের মেয়ে* নাটকে পৃথক একটি দৃশ্য যুক্ত করে জসীমউদ্‌দীন দেখিয়েছেন, দীর্ঘকাল গৃহস্থঘরে থেকে বেদে নারীর অভ্যাস ও স্বভাব বিস্মৃত হয়ে চাপাই বেদে বহরে ফিরে আর আগের মতো স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হতে পারেনি। অন্যদিকে তার স্বামীও তার জন্য অপেক্ষা করেনি । ফলে প্রাক্তন স্বামীর ঘরে তার শুরু হয় দাসিবাস। এবং সেইসূত্রে গ্রামে সাপ ধরার কাজে গেলে, সে সেখানেই গয়াকে জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে মূলত নিজের ইহজীবনের যন্ত্রণা, গ্লানিও অপ্রাপ্তি দূর করেছে।

কিন্তু *চম্পাবতী* নাটকে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক চম্পার ব্যক্তিত্বময় সত্তা ধরে রাখার প্রয়োজনে এখানে আর বাড়তি কোনো দৃশ্য যুক্ত করেননি। মোড়লের গৃহ থেকে ফিরে গয়ার সংসারে দাসি হিসেবে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জীবন তাকে কাটাতে হয়নি। শুনতে হয়নি গয়ার নতুন স্ত্রী আসমানীর ব্যঙ্গাত্মক বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য। বরং নাট্যকার চেয়েছেন চম্পার আত্মত্যাগের মহিমা, ভালোবাসার নিষ্ঠা ও সম্মান অক্ষুণ্ন থাকুক। কাব্যনাট্যের বৈশিষ্ট্যানুসারে নায়ক-নায়িকা উভয়ের জীবনেই আপাত সুখের আড়ালে থাকে হৃদয়ের ক্ষরণ। ফলে চম্পাকে নাট্যকার একেবারে গয়ার তীব্র বিপদের মুহূর্তে উপস্থিত করিয়েছেন। বিষাক্ত সাপ যখন

গয়াকে দংশন করেছে, তখন স্ত্রী হিসেবে আসমানী যারপরনাই তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু, তাতেও যখন কাজ হয়নি, তখন গয়ার মুখ থেকে যাবতীয় আড়াল ও সংযমের বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে প্রথমা স্ত্রী চম্পার প্রতি অনিঃশেষ প্রেম। স্ত্রী আসমানীর সম্মুখেই সে চম্পার ভালোবাসাকে স্মরণ করে বলেছে :

বিষহরী মন্তর সেই জানতো একজন।

আইজ সে থাকিলে বিষ করিত শোষণ।

আইজ সে থাকিলে গয়া উঠতো খাড়া হয়া।

তারে ত্যাগ করছিলাম কত মন্দ কয়া।

জাতি রক্ষা করছিলো। সেইদিন বুঝি নাই তারে।

মাফ চাই। মাফ চাই। আল্লারে –

সেই মহাদোষে আমি আইজ চলিলাম।

অন্তিম কালেতে লয়া মুখে চম্পা নাম।

চম্পা! চম্পাবতী! পঙ্খী আমার! (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৪৭৫)

গয়ার এই অনুশোচনার মুহূর্তে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করে চম্পাবতী গয়ার সম্মুখে হাজির হয়েছে। সে সাধ্যমতো মন্ত্র পড়ে চেষ্টা করেছে গয়াকে সুস্থ করে তোলার; এবং জানিয়ে দিয়েছে – মোড়লের সংসারে এতদিন বন্দি জীবন যাপন করলেও তার সতীত্ব অক্ষুণ্ন রয়েছে; গয়ার প্রতি প্রেম-ভালোবাসায় সে থেকেছে একনিষ্ঠ। মুমূর্ষু স্বামী গয়াকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছে :

পঙ্খী যে কইতা তুমি সেই পঙ্খী নাম,

সোহাগের সেই নাম –

যদি আইজ কানে শুনলাম – বুঝলাম

তুমি ভোলো নাই বাইদ্যা, আমি ভুলি নাই। [...]

মোড়ল আমার কিছু করতে পারে নাই।

আইজও সে চম্পাই আছে – চম্পা মরে নাই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৭৫)

আবার, *বেদের মেয়ে* নাটকে জসীমউদ্‌দীন নিম্নবিত্ত সমাজের সামাজিক আচরণসূত্র মেনে চম্পাবতী আর আসমানির সতীন-সুলভ বিবাদ দেখিয়েছেন। সেখানে চম্পাবতী স্বামীর অধিকার নিয়ে চতুরা আসমানির কাছে বারবার পরাস্ত হয়েছে। তাদের সে সম্পর্কের মধ্যে শত্রুতা ছিল; সম্মান ছিল না। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় স্ত্রী আসমানি গয়া বেদের সংসারে থিতু হবার চেষ্টা করলেও, সে ভালো করেই জানতো

স্বামী গয়া মুখে স্বীকার না করলেও তার মন পড়ে আছে প্রথমা স্ত্রী চম্পাবতীর কাছে। ফলত, লোকমুখে চম্পার আত্মত্যাগের গল্প শুনে চম্পাবতীর প্রতি আসমানিরও শ্রদ্ধা, ভক্তি ছিল। যে কারণে গয়ার অন্তিম মুহূর্তে প্রথমা স্ত্রী চম্পাকে স্মরণ করা এবং গয়াকে বাঁচাতে চম্পার ছুটে আসা তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি। বরং চম্পাকে এ-পর্যায়ে সে বোন ডেকে অনুরোধ করেছে – যেন তার সিঁথির সিদুর রক্ষা পায়। চম্পা ও আসমানির মধ্যে এই সৌহার্দ্য, প্রীতি, আসমানির চম্পার প্রতি শ্রদ্ধা, চম্পাবতীর মাহাত্ম্য বাড়িয়ে তাকে যথার্থই কাব্যনাটকের নায়িকা করে তুলেছে। ফলে, চম্পা যখন সর্বপ্রকার মন্ত্রপ্রয়োগে গয়াকে বাঁচাতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখনই নিরুপায় হয়ে বিষ শুষে নিয়ে গয়াকে বাঁচিয়েছে, এবং নিজে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।। তার এই মৃত্যু নিঃসন্দেহে গৌরবের।

নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক গয়া ও চম্পাবতী ছাড়াও মোড়লের স্ত্রী মালেকা চরিত্রটিতে অধিক রূপান্তর ঘটিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ের* মালেকা সৈয়দ শামসুল হকের *চম্পাবতী* নাটকের মালেকার তুলনায় চিন্তা-চেতনায় পুরোপুরি আলাদা। এক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, জসীমউদ্‌দীন তাঁর নাটকের মালেকা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলার গ্রামীণ মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপটে। আর সৈয়দ শামসুল হক তাঁর নাটকের মালেকা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন একুশ শতকের প্রথম দশকের সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে। ফলে জসীম উদ্‌দীনের মালেকার তুলনায় সৈয়দ শামসুল হকের মালেকার ভাবনা-চিন্তাগত ব্যবধান অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বেদের মেয়ের মালেকা অত্যন্ত পতিব্রতা, সংসারী এবং কর্মনিপুণ নারী। স্বামী ও সংসারের যত্ন ও কল্যাণভাবনাতেই অতিবহিত হয় তার জীবন। নিজের প্রতি সামান্য খেয়াল রাখার প্রয়োজনও সে মনে করে না। এমনকি তার সামাজিক মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে দাসিরা যখন তাকে একটু সংসারের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়ে বেশভূষা করতে অনুরোধ জানায় তখন সে গর্বভরে বলে :

> বড়লোক কী? আমার থইনে কোন মোড়লের বউ বড়লোকী করবার পারছে ক'ত দেহি ? ঢেঁকির চুরুণের মাথায় সোনার আংটি লাগাইছি। সুন্দরী কাষ্ঠের ঢেঁকি বানাইছি। রান্দনের চৌকোর ঝিকে রূপা লাগাইছি। (বেদের মেয়ে : ১৭)

অর্থাৎ তার কাছে নিজের শারীরিক সাজসজ্জা নয়, বরং সংসারে সমৃদ্ধি, জৌলুশই বেশভূষা হিসেবে বিবেচিত। সে গ্রামীণ সামাজিক প্রথা অনুসারে জেনে এসেছে – সংসারের পুরুষকর্তা ইশ্বরসম পূজিত; তার যেকোনো

স্বেচ্ছাচার নারীকর্তৃক অবনতমস্তকে গ্রহণযোগ্য। ফলত, স্বামীর লাম্পট্যে সে স্বামীকে অপরাধী না ভেবে নিজেকেই অপরাধী ভেবেছে। এমনকি বেদেনারীর প্রেমে মজে মোড়ল যখন তাকে ত্যাগ করেছে, তখন তার দাসিরা লম্পট মোড়লের সামান্য নিন্দা করলেও সে মেনে নিতে পারেনি। বরং বলেছে :

> দেখ টুনার মা, তোর ত সাহসডা কম না যে তুই আমার সোয়ামীর নিন্দা করতি লাগছস্ [...] তুই আমারে একটু বাতায়া দিবি, কেমন কইর‍্যা আমার স্বামীডারে বশ করবার পারি। তা না, তোরা আমার স্বামীর নিন্দা করবার লাগলি। (বেদের মেয়ে : ৩৪-৩৬)

কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কাব্যনাটক *চম্পাবতী*তে মোড়ল গিন্নি মালেকার যে ছবি এঁকেছেন সে নারী সংসারকর্মে যেমন নিপুণা, তেমনি আত্মসচেতন। স্বামীর অন্যায় সে দৈবনির্ধারিত ভেবে নীরবে মেনে নেয়নি। বরং স্বামীর লাম্পট্যকে সাধ্যমতো প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। যে কারণে দেখা গেছে তৃতীয় দৃশ্যে মোড়ল যখন ঢেঁকিতে ধানভানারত দাসিদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, তখন সচেতন মালেকা সেটি লক্ষ করে ঢেঁকি থেকে দাসিদের নামিয়ে নিজেই ধানভানা শুরু করেছে। কিন্তু গ্রামীণ নারী যেহেতু আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নয়, সেহেতু পুরুষের ক্ষমতা আর দম্ভের কাছে তাকে হার মানতে হয়েছে। স্বামীর কটুবাক্য, পরনারী-আসক্তি দেখে চোখের জল ফেলেছে, কিন্তু প্রতিবাদ করেছে সাধ্যমতো; জসীমউদদীনের মালেকার মধ্যে যা ছিল না। সৈয়দ শামসুল হকের *চম্পাবতী* কাব্যনাট্য থেকে মালেকা ও মোড়লের মধ্যকার প্রাসঙ্গিক সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

> মোড়ল। বয়স গেছে তোর সাথে আর আমার দরকার কী ?
> মোড়ল বউ। নজর বুঝি দিছেন তাই জুয়ান বান্দী ঝি ?
> মোড়ল। চোপ, হারামজাদী।
> স্বামীর সুখে বাধা দেয় যে বউ সে দোজখে যায়।
> মোড়ল বউ। আর, আকাম কুকাম কইরাও বুঝি স্বামী বেহেস্তে যায় ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৮)

তবে *চম্পাবতী* নাটকেও একজন নারীর স্বভাবধর্ম মেনে মোড়ল বউ উপযুক্ত সাজসজ্জা করে তার স্বামীকে ভোলাতে চেষ্টা করেছে। দাসিদের কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজে নানান বাহারি শাড়ি পরেছে। কিন্তু এরপরেও সে স্বামীর অন্যায় আব্দার কিছুতেই মেনে নেয়নি। মোড়ল যখন তাকে অনুরোধ করেছে – বেদেনারী চম্পাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বশে এনে তার বিছানায় পাঠাতে, তখন মোড়ল বউ এই অন্যায় আব্দার স্বামী-আদেশ ভেবে নীরবে মেনে নেয়নি। বরং চম্পার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে স্বামীর প্রতি ক্রোধে ফেটে পড়েছে। বলেছে :

আমি শুনছি, তুমি কোন্ অত্যাচার কইরা
অবলা যুবতী নারী আইনাছো ধইরা।
বাইদ্যানির দোষ তো দেখি না! বুঝি – সেও এক নারী !
মোড়ল, তোমার কিন্তু নাই ছাড়াছাড়ি ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬১)

বেদের মেয়ের মালেকা একেবারেই গ্রামীণ বধূ, সরলা নারী। গৃহকর্ম, পতিসেবা নিয়েই যার দিন অতিবাহিত হয়। লম্পট স্বামীর আচরণের প্রতিবাদ তো দূরের কথা, সে মোড়লের কল্যাণ কামনায়, বেদের জাদুমন্ত্রের ভয়ে ফকির ডেকে তাবিজ কবজ করায়। আত্মোন্নতি ও মর্যাদাবোধের ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে নেই। ফলে দাসিদের সঙ্গে শহুরে নারীদের নিয়ে নিন্দামন্দ করতেও তার অপার আনন্দ হয়। তবে নাটকের শেষ দিকে যখন মোড়ল সামান্য কারণে চম্পাবতীর গায়ে হাত তুলেছে, তাকে প্রহারের পর প্রহার করতে উদ্যত হয়েছে, তখন সরলা মালেকা তার প্রতিবাদ করেছে। এ প্রতিবাদের পেছনে ছিল কেবল মালেকার মানবিকবোধ। একজন অসহায় নারীর ওপর মোড়ল যে অন্যায় করছে, তা সে মেনে নিতে পারেনি। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দম্ভ সে ভালো করেই জানে। ফলে তার প্রতিবাদের ভাষা অতটা উচ্চকিত ছিল না। বরং সে প্রতিবাদের ভাষায় নিজের অসহায়ত্ব, অপরাধবোধ ও মোড়লের প্রতি কিছুটা আনুগত্যও মিশে ছিল। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কাব্যনাটকে মোড়লবউ চরিত্রটি একেবারেই অন্যরকম ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলেছেন। এখানে মোড়লগিন্নির আচার, বিচার, সংলাপে একটি অহমবোধ, আত্মবিশ্বাস সবসময়ই পরিলক্ষিত হয়েছে। মোড়লের লাম্পট্য তাকে ব্যথিত করেছে বটে কিন্তু সে কখনোই হাল ছেড়ে দেয়নি কিংবা নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিত্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। মোড়লের পরনারী আসক্তিতে নিজেকে অপরাধী ভাবেনি, বরং মোড়লের কুস্বভাবকে তিরস্কার করেছে। *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যে যখন মোড়ল চম্পাকে প্রহার করেছে, তখনই মোড়লগিন্নি প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। এখানে একদিকে যেমন তার মনুষ্যত্ববোধের প্রমাণ মিলেছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে নারী হয়ে নারীর প্রতি মমতা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। মোড়লের প্রতি তীব্র ক্রোধে সে বলেছে :

নারীর গায়ে হাত তুইলাছো, টান দিছো তার কেশ?
বনের পঙ্খী ধইরা আইনা বন্দী করছো খাঁচায়?
লাথি মারি এমন স্বামীর মাজায় !
ছাইড়া দিলাম পঙ্খী। – উইড়া যাবে বইন। [...]
তারপরে এই কাঁঠাল আমি পাকামু কিলাইয়া। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৯)

অর্থাৎ সৈয়দ শামসুল হক *বেদের মেয়ে*র মালেকা চরিত্রটির মূলভাব ঠিক রেখে পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে আধুনিক নারী হিসেবে তাঁর নাটকে উপস্থাপন করেছেন। তবে আলোচ্য নাটকে অপর চরিত্রগুলি যেমন মোড়ল, মাইনক্যা, আসমানি বা দলগতচরিত্রগুলি নির্মাণে তিনি জসীমউদ্‌দীনের মূল রচনাকেই অনুসরণ করেছেন। ফলে নাটকে এ চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে গতানুগতিক।

জসীমউদ্‌দীন *বেদের মেয়ে* নামক লোকনাটক রচনা করে প্রত্যাশা করেছিলেন – এটি গ্রামীণ যাত্রাপালার মতোই দিকে দিকে অভিনীত হোক, এবং এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক। ফলে তাঁর নাটকের মঞ্চনির্দেশ ও কলাকৌশলে, গীতের আধিক্য রয়েছে। অপরদিকে সৈয়দ শামসুল হক *বেদের মেয়ে* লোকনাটকটিকে সম্পূর্ণ আধুনিক কাব্যনাটকের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন । নৃত্যশিল্পী লুবনা মরিয়ম যে *বেদের মেয়ে*কে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের বিশেষ অনুরোধ তাঁকে করেছিলেন, তা স্মরণে রেখে *চম্পাবতী*তে আধুনিক কাব্যনাটকের কলাকৌশল ও নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছেন তিনি। নাটকটি রচিত হবার পর সর্বপ্রথম এটিকে ঢাকার মঞ্চে নিয়ে আসেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী লুবনা মরিয়মের সংগঠন ‘সাধনা’। ২০১৩ সালের ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে এ নাটকটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয়। এর নাট্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন শামিম হাসান। নৃত্য নির্দেশনায় ছিলেন সাব্বির আহমেদ খান। অপরদিকে সংগীত পরিচালনায় ছিলেন জাহিদুল কবির লিটন এবং সংগীতায়োজনে থেকেছেন দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায় ও নির্ঝর চৌধুরী। বলাবাহুল্য ‘সাধনা’ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য নাটকটি মঞ্চে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ফলত, সে সময়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এটি নিয়ে ইতিবাচক প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়। যেমন দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকা *প্রথম আলো* নিম্নরূপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে :

> বেদে সম্প্রদায়ের জীবনের নানা টানপোড়েনকে উপজীব্য করে আবর্তিত হয়েছে নৃত্য-নাট্য *চম্পাবতীর* কাহিনি। উঠে আসে তাদের জীবনাচারণ, পেশা ও জীবনদর্শন। জীবনের তাগিদে নদীর এক তীর থেকে অন্য নদীর তীরে প্রতিনিয়ত নোঙর করে বেদে সম্প্রদায়। নদীর পানির মতোই যেন ভেসে বেড়ায় তাদের জীবন প্রবাহ। বেদে সম্প্রদায়ের কাহিনি নিয়ে পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন লিখেছিলেন নাটক *বেদের মেয়ে*। এই নাটকটি অবলম্বনে *চম্পাবতী* নামে নৃত্যনাট্য লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক। গতকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনাতয়নে নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করে *সাধনা*। নৃত্যনাট্যটিতে দেখা যায়, জীবিকার তাগিদে এক বেদে দল নাচ ও সাপের খেলা দেখাতে এসেছে কোনো এক গ্রামে। ঘটনাক্রমে বেদে দলের নেতা গয়ার স্ত্রী চম্পাবতীর ওপর কুদৃষ্টি পড়ে ওই গ্রামের মোড়লের। মোড়লের মন্দ প্রস্তাব ফিরিয়ে

দেয় চম্পাবতী। বেদেদের ওপর চলতে থাকে নির্যাতন। এগিয়ে যায় ঘটনাপ্রবাহ। প্রযোজনাটির নৃত্য পরিচালনা করেছেন সাব্বির আহমদ খান। নাট্যপরিচালনায় ছিলেন শামীম হাসান। সার্বিক শৈল্পিক নির্দেশনা দিয়েছেন লুবনা মারিয়াম।[১]

এছাড়াও একটি অনলাইন সংস্করণে এ নাটকটির মঞ্চ অভিজ্ঞতা নিয়ে নিম্নরূপ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় :

> কবি জসিমউদ্‌দীনের লেখা জনপ্রিয় তিন চরিত্রকে নিয়ে সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন নাটক *চম্পাবতী*। নাটকটি মঞ্চে পরিবেশনার জন্য প্রযোজনা করছে দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র 'সাধনা'। নাটকটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হতে যাচ্ছে শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে শুক্রবার, ২৫ অক্টোবর। নারী প্রধান নাটকটি বেদেকন্যা চম্পা, নির্যাতিত গৃহবধূ মালেকা ও কিশোরী আসমানিকে নিয়ে সাজানো হয়েছে। এর নাট্য নির্দেশনা দিয়েছেন শামিম হাসান। নৃত্য নির্দেশনায় সাব্বির আহমেদ খান, সংগীত পরিচালনায় জাহিদুল কবির লিটন এবং সংগীতায়োজনে দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায় ও নির্ঝর চৌধুরী। জীবনের দুর্দশার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি এবং সাহসের গল্প *চম্পাবতী*। গল্পের মাধ্যমে আরও তুলে ধরা হয়েছে বাংলার গ্রামীণ জীবন ও নারীর প্রতি বঞ্চনার কথা।[২]

দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র 'সাধনা' ছাড়াও এ নাটকটি পরবর্তীকালে মঞ্চে এনেছে 'শব্দ নাট্যচর্চা কেন্দ্র'; যার নির্দেশনা দিয়েছেন খোরশেদুল আলম। ২১ নভেম্বর ২০১৯ বৃহস্পতিবার আই ডি এল সি নাট্যউৎসব ২০১৯- এ এটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালার মূল হলে প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীকালে তারা চট্টগ্রামেও এ নাটকটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। এ সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে বলা হয় :

> পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের নাট্যগ্রন্থ *বেদের মেয়ে* অবলম্বনে সব্যসাচী কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক রচিত নাটক *চম্পাবতী* মঞ্চে এনছে থিয়েটার দল *শব্দ নাট্যচর্চা কেন্দ্র*। এরই মধ্যে নাটকটি দর্শক-সমালোচকদের মূল্যায়নে প্রশংসিত হয়েছে। বেদে সমাজের জীবনকাহিনি নির্ভর এ নৃত্যনাট্যটি নির্দেশনা দিয়েছেন দলপ্রধান খোরশেদুল আলম। নিয়মিত প্রদর্শনীর ধারাবাহিকতায় সাড়া জাগানো এ নাটকটি এবার আলো জ্বালাবে চট্টগ্রামের মঞ্চে। [...] আগামী ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় থিয়েটার ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে আলোচিত এ নাটকটি। [...] নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাহিন, মোস্তাক, চন্দনা, আলী নূর, হৃদি, নাছরিন, আনোয়ার, নাদিয়া, লিন্ডা, তাহা, শুভ, আলিফ, রুশনী, নাইসা,

[১] নৃত্যনাট্য *চম্পাবতী*র প্রদর্শনী, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, বিনোদন পাতা, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৪

[২] চিন্তামন তুষার, 'সৈয়দ হকের *চম্পাবতী*', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, অনলাইন সংস্করণ, ২৪ অক্টোবর ২০১৩

জামান প্রমুখ। চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে প্রদর্শনীর মধ্যদিয়ে মঞ্চে যাত্রা করে নাটকটি। আইরিন পারভীর লোপার পোশাক পরিকল্পনায় *চম্পাবতী* নাটকের আলোক নির্দেশনা দিয়েছেন ঠান্ডু রায়হান। সামিউন নাহার দোলার কোরিওগ্রাফিতে নাটকের আবহ সংগীতসহ সবগুলো গানের সুর সম্পাদনা করেছেন শিশির রহমান।[১]

আলোচ্য কাব্যনাট্যের ভাষাগত সৌন্দর্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তদুপরি '*চম্পাবতী* কাব্যনাট্যে কিছু গান সংযোজন করেছেন তিনি যা আমাদের আঞ্চলিক টানকেও অতিক্রম করে অন্য অঞ্চলে প্রেরণযোগ্য।'[২] কবি জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ের* সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের *চম্পাবতীর* ভাষাগত পার্থক্য হলো – জসীমউদ্‌দীন নাটকের গানগুলো ছাড়া সমস্ত সংলাপ গদ্যভাষায় রচনা করেছেন। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর রচিত নাটক *চম্পাবতী*কে আধুনিক কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্য দিতে সংলাপগুলোর মধ্যেও অসাধারণ কাব্যিক দ্যোতনা, অন্ত্যানুপ্রাস, মধ্যানুপ্রাস আদ্যানুপ্রাসের সার্থক ব্যাবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় *বেদের মেয়ে* নাটকে বেদের বহর যখন গ্রামে এসে উপস্থিত হয় তখন তাদের প্রদর্শিত সাপখেলা দেখতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উতলা হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই বেদেদের নিজেদের আঙিনায় নিতে চায় সাপখেলা দেখার জন্য। এসময়ের সংলাপ উল্লেখ্য :

প্রথম ॥ ও বাইদানি ! আমাগো বাড়ি আইস, আমাগো বাড়ি আইস।

দ্বিতীয় ॥ আরে' আমাগো বাড়ি চল বাইদানি !

তৃতীয় ॥ আরে বাইদানি, আমাগো বাড়ি চল। (বেদের মেয়ে : ৩)

একই মুহূর্তের সংলাপ সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *চম্পাবতী* নাটকে কাব্যভাষায় রচনা করেছেন নিম্নোক্তভাবে :

কিশোরী ১।   বাইদানি গো বাইদানি,
              আমাগো বাড়ি যাইবানি ?
কিশোরী ২।   না, না, আমাগো বাড়ি,
              বাইদানি গো, তাড়াতাড়ি।
কিশোরী ৩।   আমাগো বাড়ি, বাইদানি।

---

[১] চট্টগ্রামের মঞ্চে *শব্দ নাট্যচর্চা কেন্দ্রের চম্পাবতী*, *নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম*, অনলাইন সংস্করণ, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৯

[২] স.ম. শামসুল আলম, *কাব্যনাট্যের কারিগর সৈয়দ শামসুল হক*, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বার, ২০১৭

অনেক টাকা দেবানি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৩)

আবার, সৈয়দ শামসুল হক জসীমউদ্‌দীনের মূল *বেদের মেয়ে* নাটক থেকে কখনো কখনো হুবহু গানের কথা গ্রহণ করেছেন। যেমন : *বেদের মেয়ে* নাটকের গয়ার মুখের একটি গানের কথা হলো :

চম্পাবতী মোদের নারী চাঁপাই বলে ডাকে,
হেল্‌তে দুল্‌তে চল্‌তে পথে বিজলী যেন মাখে।
চেকন- চোকন গঠনখানি লম্বা মাথার ক্যাশ,
রাঙা মুখের হাসি দিয়া পাগল করল দ্যাশ রে
পাগল করল দ্যাশ। (বেদের মেয়ে : ২)

সৈয়দ শামসুল হক এ গানটির কথা তাঁর *চম্পাবতী* নাটকে হুবহু গ্রহণ করেছেন নাটকের প্রারম্ভে, পুরুষ বেদে নামক চরিত্রের সংলাপে। আবার অন্যত্র দেখা গেছে, সৈয়দ হক জসীমউদ্‌দীনের সংলাপ বা গীত আংশিক পরিবর্তন করে নিজের পছন্দমতো শব্দালংকার যুক্ত করে নাটকের চরিত্রের মুখে দিয়েছেন। যেমন : *বেদের মেয়ে* নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গয়া বেদের একটি সংলাপ রয়েছে এমন :

গয়া বেদে। দুই হাতে তার কালো অজগর ফোঁস ফোঁসায়ে চায়,
গলার সাথে কাল কেউটে দুল্‌ছে শাড়ীর বায়।
মাজা ঘুরি জড়িয়ে আছে হলুদ বরণ সাপ,
সোনা মুখের রূপ দেখে তার ভুলছে বিষের তাপ
কে দেখবে সাপের সাপের ফণার পরে,
নাচবে নারী চম্পাবতী বেদের বাঁশীর স্বরে।
নাচবে সাথে কাল-কেউটে, নাচবে সূতানলী,
মামা-ভাগ্নে সাপ দুইটি নাচবে গলাগলি।
বঙ্করাজ আজ আসবে নেচে, নাচবে যে দুধরাজ,
মেঘনালী মেঘের মত আসবে করি সাজ।
মহাদেবের আসন ছেড়ে আসবে আলি কালি।
কালিয়া নাগ আসবে তাহার কালিয়া বিষ ঢালি। (বেদের মেয়ে : ৩)

সৈয়দ শামসুল হক এই সংলাপটি তাঁর *চম্পাবতী* কাব্য নাটকে সমবেত বেদে মেয়েদের মুখের গীত হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এবং জসীমউদ্‌দীনের মূল সংলাপ থেকে আংশিক গ্রহণ করেছেন। কখনো প্রয়োজনীয় শব্দ

পাল্টেছেন, আবার কখনো নতুন বাক্য সংযোজন করেছেন সংলাপের মূলভাব ঠিক রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :

মেয়েরা।		কে দেখবে সাপের খেলা, সাপের ফণার পরে
নাচবে নারী চম্পাবতী বেদের বাঁশীর স্বরে।
আয় রে আয়।
নাচবে সাথে কালকেউটে নাচবে সুতানলী।
নারী পুরুষ সাপ দুইটি নাচবে গলাগলি।
আয় রে আয়।
বঙ্করাজ আসবে নেচে, নাচবে রে দুধরাজ,
মেঘনালী সে মেঘের মতো আসবে করি সাজ।
আয় রে আয়।
নীলকণ্ঠের জটায় আছে সর্প আলি কালি,
রূপের পাগল নষ্ট বুকে দিবে রে বিষ ঢালি।
আয় আয় আয় রে আয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৪৪২)

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, জসীমউদ্‌দীনের মূল সংলাপ থেকে প্রথম চারটি লাইন বাদ দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক সংলাপ শুরু করেছেন। এবং তিনি সংলাপে ধুয়োর মতো একটি বাক্য সংযোজন করেছেন ‘আয় রে আয়’। সৈয়দ শামসুল হক নিজেও একজন বড় মাপের কবি ও গীতিকার। বাংলা অনেকগুলো জনপ্রিয় আধুনিক গানের স্রষ্টা তিনি। বস্তুত সৈয়দ শামসুল হকের সেই অসাধারণ সুর, লয় ও তালবোধ তিনি এখানে কাজে লাগিয়েছেন। যেহেতু তিনি সমবেত মেয়েদের মুখে গান হিসেবে এটি ব্যবহার করেছেন, তাই কোরাস সংগীতের তাল, সুর বজায় রেখে ধুয়োর মতো পঙক্তি ‘আয় রে আয়’ সংযোজন করেছেন।

আবার জসীমউদ্‌দীন যেখানে ব্যবহার করেছেন ‘মামা-ভাগ্নে সাপ’, সেখানে সৈয়দ শামসুল হকের আধুনিক মনন যুক্ত করেছে ‘নারী পুরুষ সাপ’। অন্যদিকে, শিবের উদাহরণ দিতে গিয়ে জসীমউদ্‌দীন সরাসরি মহাদেবের নাম নিয়েছেন। সৈয়দ শামসুল হক রূপকী অর্থে ব্যবহার করেছেন ‘নীলকণ্ঠের জটা’। অর্থাৎ সৈয়দ শামসুল হক অগ্রজ কবি জসীমউদ্‌দীনের গ্রামীণ নাটকটিকে আধুনিক কাব্যনাটকের মর্যাদা দিতে যথেষ্ঠ পরিমার্জন, পরিশোধনে সচেষ্ট থেকেছেন।

এছাড়াও *চম্পাবতী* কাব্যনাট্যে প্রতিফলিত সৈয়দ শামসুল হকের অসাধারণ ভাষাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নির্মিত কিছু উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, প্রতীক অলঙ্কারে :

উপমা :

১. সাজিয়া পরিয়া কন্যা বসলো বড় ঠাটে।
পুন্নিমার রাইতে যেমন চন্দ্র বসলো পাটে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬০)

২. ধৈরয ধরো গো কন্যা, ধৈরয তো ধরো।
সত্য যে ছুরির মতো – সত্য খরতর। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৩)

৩. গয়া বাইদ্যার কথা যেমন মধুর মাছির ঝাঁক।
দলে দলে আইসা বুকে হুল ফুটায়া যাক। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৪)

উৎপ্রেক্ষা :

১. চম্পাবতী মোদের নারী চাঁপাই বলে ডাকে।
হেলতে দুলতে চলতে পথে বিজলি যেন মাখে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪১)

২. সোনার বরণী কন্যা সাজে নানা রঙ্গে –
কালো মেঘ যেন সাজিল রে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬০)

রূপক/প্রতীক :

১. বনের পঙ্খী ধইরা আইনা বন্দী করছো খাঁচায়?
লাথি মারি এমন স্বামীর মাজায় ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৯)

২. দুঃখের সায়রে আমি ভাসাইছি যে নাও। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৬)

৩. অভাগীরে ধইরা খাইছে কালীদহের সাপেরে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৬)

৪. নারীর রূপ যে বিজলি ঠাঠা, যাইবা ছারেখারে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪২)

৫. আমার বিলাস হইছে তোমার এই নাওখান রাখি।
বড়ই চঞ্চল হইছে অন্তরের পাখি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৩)

৬. পায়ের নুপুর হইলো সর্প সুতানল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৫)

অতিশয়োক্তি

১. যখন নাকি ঢেঁকির থনে পা তুইলা নিলো,

মনের দুঃখে ঢেঁকি তখন পাতালে পসিলো। (কাব্যনাট্যনমগ্র : ৪৪৭)

২. তারপরে পরিলো শাড়ি নামে হাসাসি,

কাড়ির মধ্যে নাইচা বেড়ায় চন্দ্রসূর্য আসি। [...]

তারপর পরিলো শাড়ি কৃষ্ণ নীলাম্বরী,

তারাগুলি ঝিলমিল করে শাড়ির আঁচল ধরি। [...]

সেই শাড়িখান বিবির মনের মতো হইলো,

অঙ্গের বিজলি আভা শাড়িতে জড়াইলো।

শাড়ির মধ্যে লেখা আছে হাঁস জোড়া জোড়া,

শাড়ির সাগরে তারা করে ঘোরাফেরা।

সাজিয়া পরিয়া কন্যা মুখে দিলো পান,

আকাশের চন্দ্রসূর্য দেইখা লজ্জা পান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬০)

সমাসোক্তি :

১. পুরুষ আছো পুরুষ থাকো দৃষ্টি দিও না রে।

নারীর কেশ যে সর্প হইয়া দংশিবে তোমারে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪২)

২. রাঙা বউ ঢেঁকি পারায় আলতা পরা পায়,

সোহাগে কাঠের ঢেঁকি নাইচা না কুল পায়। [...]

নানীবিবি যখন আইসা ঢেঁকির উপর চড়ে,

হাসতে হাসতে ঢেঁকি তখন নোটে আছড়ে পড়ে। [...]

মেঝো বউ বারা বানে গুনগুনায়ে গায়,

কাত্‌লা দুটার পাখা মেলে ঢেঁকি উড়ে যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৪৭)

বাগধারা প্রবাদ / প্রবাদপ্রতিম বাক্য :

১. পিদিম নিভিলে আর জ্বলে না রে, মা।

সত্য যে কঠিন হয়, সত্যে নাই ক্ষমা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৬৭)

২. বাঘ ছাগলে এক ঘাটে খায় এনার দাপটেই। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫০)

৩. ইজ্জত অমূল্য মণি সাপের মাথায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৩)

পুরাণ / লোকপুরাণ :

১. কেবল বিচার নাই যুবতীতে মজে যদি মন।
রামের যে সীতা, সেই সীতারেও কইরাছিলো রাবণ হরণ ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৪)

২. চান্দের বেটা লখাইরে বেনে মারলো মোরে লাথি রে।
জাগো জাগো বেউলা রে রাণী, আঙ্খি মেইলা চাও,
বিয়ার রাইতে সিন্তার সিন্দুর মুছিয়া ফেলাও রে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৭১)

৩. কাইন্দো না কাইন্দো না তুমি নিদারুণ তাপে।
অভাগীরে ধইরা খাইছে কালীদহের সাপেরে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৫৬)

অতএব বলা যায়, বিষয়বস্তুর সাযুজ্য থাকা সত্ত্বেও, প্লট গঠনের চমৎকারিত্বে, চরিত্রের নব বিন্যাসে, শিল্পিত ভাষা-মাধুর্যে সৈয়দ হকের *চম্পাবতী* জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে*র তুলনায় স্বতন্ত্র ও নান্দনিক হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

মরা ময়ূর

সৈয়দ শামসুল হকের *মরা ময়ূর* কাব্যনাটকটি একটি দৃশ্য ও তিনটি মাত্র চরিত্রে সমাপ্ত হলেও নাট্যকার তাঁর অনন্য মেধাগুণে এর মধ্যে পঞ্চাঙ্ক নাটকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এছাড়া প্রতিটি চরিত্রের সামাজিক পরিচিতির পাশাপাশি তাদের অভ্যন্তরীণ মানসসংকটের এমন বাস্তব উপস্থাপন ঘটিয়েছেন যে, স্বল্পপরিসরের এ নাটকটির মধ্যেও একটি শিল্পসফল কাব্যনাটকের যাবতীয় গুণাবলি পরিস্ফুট হয়েছে।

এ নাটকের তিনটি চরিত্র একই সমাজকাঠামো থেকে উদ্ভূত। ধাঙড়, ধাঙড় সর্দার ও নারী চরিত্র সবাই অন্ত্যজ সমাজভুক্ত। কিন্তু সামাজিক বিনষ্টি আর অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশের অভিঘাতে তাদের জীবনেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে। নাট্যকার অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিবর্তনের এই বিষয়টি চরিত্রায়ণ কৌশলে যুক্ত করেছেন। ধাঙড় সর্দার অতীতে যেহেতু ধাঙড়ের জীবনযাপন করেছে, তাই সে প্রকাশ্যে কঠোরতার মুখোশ পরে থাকলেও ভেতরে ভেতরে ধাঙড়ের প্রতি সহানুভূতিশীল। সামাজিক শ্রেণিবাস্তবতায়, নিজের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সেও আজ সর্দারের (শাসক) ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে। অন্যদিকে নারীচরিত্রটি একসময় ছিল গ্রামের সরলাবধূ।

দারিদ্র্যের কশাঘাতে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে সে ধাঙড়ের সঙ্গে এই শহরে পা রেখেছিল। কিন্তু অচিরেই সে চিনে ফেলে নাগরিক জীবনের কুৎসিত রূপ। ফলে এই কুৎসিত ও ক্লেদপঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ধাঙড়কে ছেড়ে পালিয়ে যায় সমাজের উঁচুতলার এক গাড়িওয়ালার সঙ্গে।

মরা ময়ূর কাব্যনাটকটি বাংলাদেশের মঞ্চে প্রথম আনে নাট্যদল *চারুনীড়ম*। এটি *চারুনীড়ম* প্রযোজিত দ্বিতীয় নাটক। *চারুনীড়ম* নাট্যদল সাধারণত নিরীক্ষাধর্মী রচনা নিয়ে মঞ্চে কাজ করতে ভালোবাসে। ফলে সৈয়দ শামসুল হকের সমকাল-সমাজ, রাজনীতি নিয়ে এমন নিরীক্ষাধর্মী রচনা এ-নাট্যদলের দৃষ্টি আকর্ষণে সহজেই সক্ষম হয়েছিল। জাতীয় শিল্পকলা একাডেমীর পরীক্ষণ থিয়েটার হলে ২০১৩ সালে নাটকটি প্রথমবারের মতো মঞ্চস্থ হয়ে দর্শক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এই নাটকটি যেহেতু নাট্যকার প্রথম ইংরেজি ভাষায় রচনা করেছিলেন, তাই *চারুণীড়ম* তাদের প্রযোজিত নাটকে দুটিভাষারূপই পরিবেশন করে থাকে। নির্দেশক গাজী রাকায়েত তাঁর নান্দনিক নির্দেশনাগুণে নাটকটি অত্যন্ত সাবলীলরূপে মঞ্চে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। একঘণ্টা পনেরো মিনিট ব্যাপ্তির এ নাটকটি তিনি বিরতিহীনভাবে পরিবেশন করিয়েছেন। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় মূল নাটক – *The Dead Peacock* পরিবেশনের পর বিরতি দিয়ে একই অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটকটির বাংলা রূপান্তর মঞ্চে উপস্থাপন করেন। ফলে নাটকটির মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রচ্ছায়া ফুটে ওঠে। বস্তুত এ নাটকে নাগরিক মানসের যে পঙ্কিলতা, বিবেকহীনতা, রাজনৈতিক শঠতা দেখানো হয়েছে সেটি নির্দিষ্ট দেশ-কাল-সমাজকে অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন সংকটকে উপস্থাপন করেছে। ফলে নাটকটির ইংরেজি-রূপ আন্তর্জাতিক দর্শক মহলেও সমান দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

নাট্যদল *চারুনীড়ম* নাটকটির জন্য যে পোস্টার বানিয়েছিল, সেখানে দেখা যায় – ময়লার স্তূপকে ঘিরে একদল কাক উড়ছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে; অন্যদিকে ময়লার স্তূপকে কোনোমতে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে এসেছে একটি হাত। সেটি এমন একটি হাত, যেটি কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে বাঁচার প্রত্যাশা করছে। বস্তুত, এই পোস্টারটির মাধ্যমেই উপস্থাপিত হয়েছে নাটকের মূল সার ও সুর। সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষগুলো যে জীবনের পঙ্কিলতাকে পশ্চাতে ফেলে সুন্দরের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ আকুতি জানাচ্ছে তা প্রতীকী অর্থে এই উত্তোলিত হাতের মাধ্যমে দৃশ্যায়িত হয়েছে। *মরা ময়ূর* নাটকে ধাঙড় চরিত্রে মঞ্চে অভিনয় করেছেন নাটকটির নির্দেশক ও প্রযোজক গাজী রাকায়েত নিজেই। অন্যদিকে ধাঙড় সর্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গোলাম সারোয়ার। নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন শর্মীমালা। নাটকটির মঞ্চপরিকল্পনায় ছিলেন উজ্জ্বল ঘোষ। আলোক

পরিকল্পনায় ছিলেন সুদীপ চক্রবর্তী ও খান মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।[১] এখনও এ-নাটকটি *চারুনীড়ম* নাট্যদল মঞ্চে নিয়মিত পরিবেশন করে যাচ্ছে। ২০২০ সাল অব্দি নাটকটি সর্বমোট ২৪বার মঞ্চায়িত হয়েছে। বর্তমান মঞ্চায়নে ধাঙড় চান্দু চরিত্রে গাজী রাকায়েত অভিনয় করলেও ধাঙড় সর্দার ও নারী চরিত্রে পরিবর্তন এসছে। ধাঙড় সর্দার চরিত্রে বর্তমানে অভিনয় করছেন আশিউল ইসলাম ও নারী চরিত্রে নীলুফার ইয়াসমিন। বর্তমানের সেট ডিজাইনেও আছেন সুদীপ চক্রবর্তী আর নৃত্যনির্দেশক কাজি আনিসুল হক বরুণ।[২]

মরা ময়ূর নাটকটি স্বল্পাকৃতির হলেও নাট্যকার এরই মধ্যে উপযুক্ত মঞ্চনির্দেশনা প্রদান করেছেন। নাটকটিতে চরিত্রের উপস্থিতি ও অঙ্গভঙ্গি, মঞ্চ পরিকল্পনা সংক্রান্ত তাঁর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অভিনেতা-নির্দেশক ও প্রযোজকের জন্য হয়ে উঠেছে অভিনয়বান্ধব। যেমন নাটকের শেষের দিকে নারীচরিত্রটির হঠাৎ রূপবদলের মোহময় চিত্রায়ণ প্রসঙ্গে নাট্যকারের আলোক প্রক্ষেপণসংক্রান্ত নির্দেশনাবলি উল্লেখ করা যেতে পারে :

> নারী তার হাত দুটি দু'দিকে নাটকীয়ভাবে ছড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে – রঙিন আলো, নৃত্যপর আলো, নানা রঙের আলোর খেলায় আর নারীর গাউনের চুমকির বিচ্ছুরণে এক জাদুময় বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। নারী নৃত্যের একেকটা স্থির ভঙ্গি রচনা করে সুরে সুরে বলে যায়(কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯৪)

সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য কাব্যনাটকের মতো শব্দচয়ন, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের নান্দনিক উপস্থাপনায় আলোচ্য নাটকের ভাষা হয়ে উঠেছে অনন্য। বিশেষত, একজন ধাঙড়ের রুচি, স্বভাব এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপযুক্ত শব্দচয়নে নাটকটি হয়ে উঠেছে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য। ধাঙড় চরিত্রটি যেমন কথায় কথায় অশ্লীল শব্দ, অপভাষা ব্যবহার করেছে তেমনি সর্দার চরিত্রের মুখের সংলাপেও আছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক শব্দ, কখনো কখনো শাসকের মতো আধিপত্যবাদী শব্দ। যেমন ধাঙড়ের মুখে চাঁদের রূপ বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> আকাশে মস্ত গোলা একটা চাঁদ ছিলো,
> সে যদি আপনি দেখতেন!
> ঠিক একবারে মেয়েছেলের মাইয়ের মতো
> টসটসে – ইয়া বড়! চোখ ঠিকরে তাকিয়ে আছি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮৪)

---

[১] সূত্র : শিল্পকলায় 'বারামখানা' ও 'মরা ময়ূর' মঞ্চস্থ, বিনোদন ডেস্ক, *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা, শুক্রবার, ৫ জুন, ২০১৫

[২] সূত্র : গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : আশিউল ইসলাম, সদস্য, *চারুনীড়ম* নাট্যদল, ঢাকা

আলোচ্য নাটকের ধাঙড়সর্দার তোষামুদে, স্বার্থপর একটি চরিত্র। যতক্ষণ তার সামনে নারী চরিত্রের উপস্থিতি ছিল না ততক্ষণ সে ধাঙড়ের কথা মন দিয়ে শুনেছে; তার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছে। কিন্তু মঞ্চে যখনই নারীটি এসে হাজির হয়েছে, অমনি সে খোলস পাল্টে নারীকে তোষামোদ করতে শুরু করেছে। সে ধাঙড়কে ধমক দিয়ে তাকে চাকুরিচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে নিজেই নেমে পড়েছে রাস্তা থেকে মৃত ময়ূরটি সরানোর কাজে। ধাঙড় সর্দারের রূপ বদলের এই বিষয়টি নাট্যকার তার সংলাপে চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। সর্দার যখন ধাঙড়ের সঙ্গে কথা বলেছে তখন সে সংলাপে মিশে আছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শ্লেষ আর ধমকের সুর :

এই! এই যে চান্দু! বসে বসে পাছা ঘষছো ! [...]
শালা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি! আর তুি!
এখানে পাছা পেতে পা ছড়িয়ে আয়েস করছো!
বসে আছো কী করতে ? হাতে নুলা বাতাস লেগেছে! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮২)

আবার এই সর্দার যখন গাড়িওয়ালা নারীটির সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করেছে, তখন তার মুখের ভাষায় বিনয়-বদান্যতা ঝরে পড়েছে। নাট্যকার বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তখন তার মুখের ভাষায় যুক্ত করেছেন তোষামুদে শব্দাবলি :

আপনাকে তো বললাম, ম্যাডাম,
লোকটা পাগল। বদ্ধ উন্মাদ।
আমি ওকে এক্ষুণি বরখাস্ত করছি।
এই, এই ব্যাটা, তোর চাকরি খতম!
ম্যাডাম, আমি নিজেই মরা ময়ূরটা সরাচ্ছি।
এক্ষুণি! আপনার কষ্ট হলো।
মাফ করে দেবেন। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯২-৪৯৩)

অন্যদিকে নারী চরিত্রটির মাধ্যমো সামরিক মদদপুষ্ট পাকিস্তানপন্থি শাসকের রূপচিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে তার মুখে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরেজি, উর্দু শব্দের উপস্থাপন অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছেন নাট্যকার। নারী চরিত্রটি যখন নৃত্যরত অবস্থায় অকস্মাৎ মঞ্চে উপস্থিত হয়, তখন তার মুখের সংলাপে ইংরেজি-উর্দুভাষার শব্দ মিলেমিশে এক অদ্ভুত দ্যোতনা ও ছন্দলালিত্য সৃষ্টি করে, যেটি নৃত্যের তালের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। যেমন :

হঠ যাও সব, হঠ যাও!

তফাৎ তফাৎ হো যাও!

দেখো মেরি জান,

হামারি হাত ছে ক্যায়সে বানাউঁ

দেশ মে নয়াস্তান।

ফির নারা লাগায়া! ফির মেশিন গান!

হল্ট! মেশিনগান। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯৬)

এছাড়াও নাটকের ভাষায় ব্যবহৃত অলঙ্কার উপমা, চিত্রকল্পের কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

উপমা :

১. আকাশে মস্ত গোলা একটা চাঁদ ছিলো, [...]
ঠিক একেবারে মেয়েছেলের মাইয়ের মতো / টসটসে – ইয়া বড় ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮৪)

২. হঠাৎ – বললে বিশ্বাস যাবেন না– চাঁদটা হঠাৎ / পাশেই পুষ্করিনিতে ঝপ করে দিলো একটা ডুব ! / ঠিক আমার বৌয়ের মতো! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮৪)

৩. চোখে বিশাল সানগ্লাস, প্রজাপতির পাখার মতো ফ্রেম। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯২)

উৎপ্রেক্ষা :

১. পেট ফুলে ঢোল। গতর ফুলে উঠে মাই যেন ফুটবল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮২)

২. হঠাৎ সেই লোকটা! মাটি ফুঁড়ে বেরুলো। / সটান! ঠিক যেন গাছ একটা গজালো। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৪৮৫)

৩. তাহলে, শহর যেন পরিষ্কার ফিটফাট থাকে, / সুন্দর থাকে, তারই জন্যে তো!/ যেন বেহেশতের বাগান মনে হয় দেখে – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৮৮)

৪. বৌটা! তার গাড়িতে। সেই শাদা ইয়াব্বড় গাড়িতে। / এক ঝলকই দেখেছি। যেন একটা অচিন সুন্দর পাখি, (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৪৯০)

মরা ময়ূর কাব্যনাটকটি সৈয়দ শামসুল হকের লেখা ইংরেজি নাটকের অনুবাদ হলেও নাট্যকার শিল্পসৌন্দর্যে যথেষ্ঠ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় ক্ষুদ্র কলেবরের এ নাটকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

অপেক্ষমাণ

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস প্রসঙ্গ উপস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের শুভচেতনা জাগ্রত করে সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন একটি সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এ-নাটকের চরিত্রায়ণ কৌশল সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য কাব্যনাটকের তুলনায় স্বতন্ত্র। এখানে একটি চরিত্র বহুস্বরের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ইবসেনের নাটকের চরিত্র সৈয়দ হকের নাটকের চরিত্র বনে গেছে। আবার, সৈয়দ হকের নির্মিত চরিত্র ইবসেনের নাটকের চরিত্রে অভিনয় করেছে। চরিত্রের এমন মিথস্ক্রিয়া নাটকটিকে দিয়েছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। আবার, একটি চরিত্র একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করায় অল্পসংখ্যক কুশীলব নিয়ে নাটকটির সফল মঞ্চায়ন সম্ভবপর হয়েছে; যে-কোনো নাট্যপ্রযোজনার জটিল প্রক্রিয়ায় এটি ইতিবাচক দিক। এরপর আবার নাটকের শেষে আকস্মিকভাবে নাট্যকারদের মঞ্চে উপস্থিতি দর্শকদের মাঝে যেমন সাড়া জাগিয়েছে, তেমনি নাটকটির আঙ্গিককে করে তুলেছে অভিনব। নাটকের অভ্যন্তরে নাট্যকারের এমন উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টিতে বাংলা কাব্যনাটকের ইতিহাসে বোধ হয় আর ঘটেনি; সেদিক দিয়েও এ নাটকটির মধ্যে নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়।

সৈয়দ শামসুল হক সঙ্গত কারণেই ইবসেনের মূল রচনা থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে আলোচ্য নাটকে চরিত্র সংযোজন করেছেন। যেমন, ইবসেন রচিত *এ ডলস হাউস* নাটকের প্রধান চরিত্রসংখ্যা পাঁচ; হেলমার, তার স্ত্রী নোরা, নোরার বন্ধু মিসেস লিনদ, হেলমারের বন্ধু ডাক্তার র‍্যাঙ্ক ও নিলস ক্রগস্তাদ। এছাড়া নাটকে গৌণ কিন্তু অপরিহার্য চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে আরও কিছু চরিত্র; এরা হলো হেলমার-নোরার তিন সন্তান, তাদের ধাত্রী অ্যান, গৃহপরিচারিকা ও কুলি চরিত্র। তবে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে কেবল নোরা ও তার স্বামী হেলমারের সক্রিয় উপস্থিতি ও কথোপকথন যুক্ত করেছেন। এছাড়া পরিপ্রেক্ষিতকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যও বেশকিছু চরিত্রের পরোক্ষ উপস্থিতি রয়েছে। অন্যদিকে *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র সংখ্যা এগারো; এরা হলো নাটকের প্রধান চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান, তার স্ত্রী মিসেস স্টকম্যান, ছেলে মর্টেন ও ইয়েলিফ, ডাক্তারের স্কুল শিক্ষিকা কন্যা পেট্রা, ডাক্তারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নগরপিতা পিটার স্টকম্যান, ডাক্তারের শ্বশুর মর্টেন কিল, পত্রিকার সম্পাদক হোভস্টাড, পত্রিকার সম্পাদনা সহকারী বিলিং, পত্রিকার প্রকাশক আসলাকসেন ও ডাক্তারের প্রকৃত নিঃস্বার্থ নাবিক-বন্ধু ক্যাপ্টেন হরস্টার। এছাড়াও নাটকের প্রয়োজনীয় ক্লাইমেক্স তৈরিতে একজন মদ্যপ মাতাল এবং শহরের বেশকিছু জনচরিত্র

ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে মূলরচনার সব চরিত্র গ্রহণ করেননি। তিনি কেবল প্রধানতম চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান, খলচরিত্র মেয়র পিটার স্টকম্যান, ডাক্তারের স্ত্রী চরিত্র নিয়ে নাটকের কাহিনি সাজিয়েছেন। অন্যাদিকে, তাঁর স্বরচিত নাটক *ঈর্ষা*র মূল নাট্যকাহিনিতেও মাত্র তিনটি চরিত্রেরই শরীরী উপস্থিতি ছিল : প্রৌঢ় শিক্ষক চরিত্র, যুবক শিক্ষার্থী এবং যুবতী। চরিত্রসংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে *অপেক্ষমাণ* নাটকের ক্ষুদ্র পরিসরেও তাদের তিনজনকেই কমবেশি ক্রিয়াশীল রেখেছেন নাট্যকার। আবার আলোচ্য নাটকে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কিছু চরিত্র এনেছেন। যেমন, স্টেশন মাস্টার, কুলি, ব্রেকডান্সারের দল, কেরানি প্রভৃতি। বস্তুত, তিনটি নাট্যকাহিনিকে একই ক্যানভাসে উপস্থাপনের প্রয়োজনে সৈয়দ শামসুল হক মূল নাটকে চরিত্রের এমন সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। এতৎসত্ত্বেও মূল নাটকের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটেনি।

অপেক্ষমাণ এর নাট্যকাহিনি শুরু হয়েছে কোরাস চরিত্রের মাধ্যমে; নিশুতিরাতে রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে। কোরাসে নাট্যকার যে চরিত্রগুলি ব্যবহার করেছেন তারা উক্ত স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, কুলি ও কেরানি। এরাই বিভিন্ন সময়ে নাটকের প্রয়োজনে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। এরাই কখনো ব্রেকডান্সারের দলভুক্ত হয়ে নাটকের মূলসূত্র দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছে, কখনো *এন এনিমি অব দ্য পিপলের* জনগণের ভূমিকা পালন করেছে, আবার কখনো কখনো দৃশ্যানুযায়ী মঞ্চসজ্জার কাজে ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ কোরাসকে সৈয়দ শামসুল হক নাট্যপরিবেশনায় সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন। কোরাসের এই বহুমাত্রিক উপস্থাপনা বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে অভূতপূর্ব ঘটনা। নাট্যকার *অপেক্ষমাণ* নাটকের প্রারম্ভে যে মঞ্চনির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেখানেই কোরাসের এমন বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে দর্শকদের ধারণা দেবার প্রয়াস পেয়েছেন :

> শূন্য মঞ্চ। অন্ধকার মঞ্চের ওপর প্রথমে কয়েকটি তীব্র আলোর বৃত্ত নাচানাচি করে। তার কিছুক্ষণ পরে মঞ্চে প্রবেশ করে ব্রেকডান্সারের দল। এরা আসলে স্টেশনের মাস্টার, কুলি ও কেরাণীর দল। গায়ে সেই রকমেরই ইউনিফর্ম, কিন্তু তাদের হাতে ধরা নাটকের ট্রাজেডি ও কমেডির একটি করে মুখোশ। এরা কোরাসের ভূমিকা পালন করবে – দৃশ্যের প্রয়োজনে মঞ্চ সাজাতে আসবে। সঙ্গীতের সঙ্গে তারা ব্রেকডান্স শুরু করে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০১)

মূলত, প্রাচীন গ্রিক নাট্যকলায় নাট্যকারগণ কোরাসের ভূমিকাকে যেভাবে নাটকে প্রদর্শন করেছেন, সৈয়দ শামসুল হক তা আত্তীকৃত করে তার মধ্যে নবতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এই নাটকে কোরাসের বহুমাত্রিক

ভূমিকা নাটকটির মঞ্চপ্রদর্শনকে যেমন সহজতর করে তুলেছে, তেমনি চরিত্রাধিক্যের জটিলতা থেকে নাটকটিকে মুক্ত করেছে।

অপেক্ষমাণ শুরু হয়েছে রেলওয়ের প্লাটর্ফমে তিনটি নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে; তারা নিজেরাই প্রসঙ্গক্রমে নিজেদের বর্তমান চরিত্র বদলে ফিরে গেছে অতীতে, এবং দর্শকদের সম্মুখে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বেদাদায়ক কাহিনি অভিনয়কলার মাধ্যমে উপস্থাপন করছে। নাটকের প্রৌঢ়চরিত্র কখনো হয়ে উঠেছেন সৈয়দ শামসুল হকের *ঈর্ষা* নাটকের প্রবীণ অধ্যাপক, কখনো হয়েছেন *এ ডলস হাউস* নাটকের নোরার স্বামী হেলমার, আবার কখনো *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের খল চরিত্র নগরপিতা পিটার স্টকম্যান। নাট্যসমাপ্তিতে আবার তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রে। তবে মূল *ঈর্ষা* নাটকে যে অসূয়াকাতর প্রৌঢ় শিল্পীকে দেখা যায়, যিনি স্বীয় শিল্পচর্চা আর জৈবিক প্রয়োজনে নিজের ছাত্রীকে ব্যবহার করেছেন, আবার শিল্পকর্মের আদর্শানুসারী না হওয়ায় জনৈক প্রতিভাবান ছাত্রকে পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দিয়েছেন, সেই ক্রুদ্ধ, ঈর্ষাকাতর প্রবীণ শিল্পী *অপেক্ষমাণ* নাটকে এসে ইতিবাচক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। *ঈর্ষা* নাটকে যেখানে তিনি ছিলেন হতাশায় মজ্জমান ব্যর্থ প্রেমিক সত্তা, এবং যিনি তাঁরই প্রেমাস্পদ ছাত্রীর বিবাহিত জীবনকে তছনছ করে দেবার হুমকি দিয়ে বলেছিলেন :

> এত ঘৃণা ? অসহ্য এতই ? এতই দূরত্ব আজ ? [...]
> দু'জনের মাঝখানে একটি যুবক আজ ?
> প্রতিদ্বন্দ্বী এখন যুবক–আমারই একজন ছাত্র ? [...]
> সে তোমাকে নগ্ন করে দেখেছে কি? এরই মধ্যে শোয়া হয়ে গেছে ? [...]
> আহ্, আ, আ, কি যে ক্রোধ হচ্ছে আমার। – ক্রোধ। হাঁ, হাঁ, ক্রোধ। (*ঈর্ষা,* কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩২০)

ক্রোধে মত্ত, প্রতিশোধে উন্মুখ সেই প্রবীণ অধ্যাপকই *অপেক্ষমাণ* নাটকে এসে শান্ত, স্থিত ও প্রজ্ঞাবান চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। অন্তরের যাবতীয় পাপাচার, অশুদ্ধতা ধুয়েমুছে এ যেন তাঁর নবতর সত্তায় আত্মোদ্বোধন। তবে *ঈর্ষা* নাটকেও প্রৌঢ়ের আত্ম-অনুশোচনার ইঙ্গিত ছিল। তবে সেটি ছিল কিছুটা ধোঁয়াশাপূর্ণ। সেখানে একবার তাঁর মনে হয়েছিল, মেয়েটির সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে শরীরী সম্পর্কে যাওয়া তাঁর উচিত হয়নি, কেননা প্রতারণা ও মিথ্যাচার যাবতীয় শিল্প ও সুন্দরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর যাই হোক মিথ্যে দিয়ে, চাতুরি দিয়ে সত্য, সুন্দর ও শিল্পের স্তব সম্ভব নয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মন ও শরীর মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। *ঈর্ষা* নাটকের শেষে প্রৌঢ়ের সংলাপগুলো বিচার করলে সেটি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। প্রেমে ব্যর্থ

হয়ে ঈর্ষাকাতর প্রেমিকের মতোই তিনি সন্দেহ করেছেন মেয়েটি হয়তো যুবকের সঙ্গেই অন্য কোথাও মিলিত হচ্ছে। তাকে ফেরানোর আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে তিনি বলেছেন :

কোথায় সে? কোথায়? তুমি আছো কোথায় ? [...]
তুমি, তুমি, রক্তমাংসে যে তুমি, আমি সেই তোমাকে চাই।
আমার ক্যানভাস হোক অমর, তোমার নদীতে আমি মরতে চাই। (*ঈর্ষা*, কাব্যনাট্যসমগ্র : ৩৬৮)

অথচ *অপেক্ষমাণ* নাটকে এই কাম-ক্রোধে উন্মত্ত প্রৌঢ় চরিত্রটি বিস্ময়করভাবে বদলে গেছেন। নারীর শরীর নিয়ে শিল্পচর্চা আর তাঁর আরাধ্য নয়; বরং প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্য উপভোগ করে তাকে স্বীয় ক্যানভাসে অমর করে রাখাই এখন তার অন্বিষ্ট।

ঈর্ষা নাটকে যুবক ছাত্রের পছন্দ ছিল প্রকৃতির রূপলাবণ্য ও বাস্তবদৃশ্য নিয়ে ছবি আঁকা। প্রৌঢ় চরিত্রটি মত্ত ছিলেন ন্যুড আর বিমূর্ত চিত্রকলায়; প্রকৃতির ছবি আঁকা একটা সময় তার কাছে মনে হতো শিল্পের নয় বরং ক্যামেরার চোখ দিয়ে সৌন্দর্য-অবলোকন। কিন্তু অন্তরের ঈর্ষা আর পঙ্কিলতা ঝেড়ে ফেলে শুদ্ধতম সত্তায় উন্নীত হয়ে তিনি এখন ছুটে চলেছেন দূরের কোনো গ্রামে ; যেখানে অবারিত মাঠের প্রান্তে আকাশের কোলে টুপ করে ডুবে যায় দিনান্তের রক্তিম সূর্য; কিংবা খরায়, বন্যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন ফসলের খেতে উদীয়মান সূর্যের মনোলোভা ছবি। রেলস্টেশনে দেখা পাওয়া যুবতী নারীকে (যেন *এ ডলস হাউসের* নোরাকে) উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, এ রেল স্টেশনে বসে অপেক্ষা করা কেবল নিছকই রেলে চেপে গন্তব্যে প্রস্থানের জন্য নয়, বরং এ অপেক্ষা দিন বদলের। কালোকে ধুয়ে মুছে আলোতে পরিবর্তন করার। প্রতারণা থেকে বেরিয়ে এসে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করার। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ় চরিত্রটিই নোরা ও ডাক্তারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যকে একাকার করে ফেলেছেন। অর্থাৎ সে-ই তিনটি চরিত্রের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যকে একই ফ্রেমে বেঁধেছেন। বস্তুত প্রৌঢ় চরিত্রটিই এখানে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের প্রতিনিধি হয়ে তিনটি নাটকের সারকথা দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। নারী চরিত্রটি অর্থাৎ নোরা যখন নাটক শেষে বলে উঠেছে আমাদের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা বোধ হয় শেষ হতে যাচ্ছে, তখন পুরুষ চরিত্রটি অর্থাৎ *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্রটি বলেছে – এ অপেক্ষার কেবল ট্রেনে চড়ে যাবার জন্য নয়, এ অপেক্ষা দিন বদলের। প্রৌঢ় চরিত্রটির উচ্চারিত সংলাপে সেই বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

প্রতারণা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু শুরু করবার।

ব্যক্তির জীবনের প্রতারণা।

জনতাকে প্রতারণা।

সংসারের প্রতারণা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৪৪)

এখানে ব্যক্তির জীবনের প্রতারণা বলতে প্রৌঢ় নিজের জীবনের কথা বলেছেন। কেননা তিনি শিল্পচর্চার নামে ছাত্রীর ন্যুড এঁকে, তাকে ব্যবহার করে একদিকে যেমন তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, তেমনি শিল্পকে করেছেন অমর্যাদা। তাঁর অদূরদর্শী ও হীন তৎপরতায় তছনছ হয়ে গেছে দুজন সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীর জীবন। এই সত্য উপলব্ধি করেই তিনি এখন আত্মাকে শুদ্ধ করতে চাইছেন। অন্যদিকে, জনতাকে প্রতারণার কথা বলে তিনি ইঙ্গিত করেছেন *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের কাহিনি-অন্তর্গত নগরপিতার কথা। যিনি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য তাঁর ভাই ডাক্তার স্টকহোমকে প্রতারিত করেছেন। চরিত্রটি কোনো কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে জনতাকে ঠকাতে চাননি। শহরের পানিতে বিষক্রিয়ার কথা তিনি নির্দ্বিধায় জনগণকে অবহিত করেছেন। অথচ বিষয়টি চেপে গেলে তিনি তাঁর ভাই নগরপিতাকর্তৃক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারতেন। বরং সে সত্যে অবিচল থেকে সত্যকে প্রচারের জন্য সব হারিয়ে তিনি আজ পথে নেমে এসেছেন। যে জনতা তাঁকে ভুল বুঝে শহর ত্যাগে বাধ্য করেছে, সেই জনতার স্বার্থরক্ষায় তিনি আজ পথে পথে। আবার সংসারের প্রতারণা বলতে প্রৌঢ় *এ ডলস হাউসে*র নারী চরিত্র অর্থাৎ নোরাকে বুঝিয়েছেন। কেননা পুরুষশাষিত সমাজের প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে সেও জীবনানন্দে স্থিত হতে চেয়েছে। দিনবদলের এই জয়গানের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রৌঢ় চরিত্রের সংলাপে :

হ্যাঁ, আমি সেই প্রান্তরে যাচ্ছি –

খরায় উজাড় হয়ে যাওয়া মাঠে – সূর্য উঠছে – আঁকতে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৪৪)

অপেক্ষমাণ নাটকের প্রারম্ভে তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক আলাপের সূচনাও ঘটেছে *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রের উদ্যোগে। নইলে ইবসেন নির্মিত চরিত্র নোরা এবং ডাক্তার স্টকম্যান তারা দুজনেই ছিলেন নিজেদের চিন্তায় আত্মমগ্ন, বিভোর। আশেপাশের ব্যক্তি বা পরিবেশ নিয়ে তাদের আগ্রহ ছিল না। নোরার এই আত্মমগ্নতা নাট্যকার মঞ্চনির্দেশ অংশে একটি উপমার মাধ্যমে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি নোরাকে বলেছেন ছায়ামূর্তির মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা নারী, যার বসনপ্রান্ত হাওয়ায় উড়ছে। এমনকি প্রৌঢ়ব্যাক্তি তাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে কুশল বিনিময়ের জন্য এগিয়ে গেলেও নোরা তখনো তাকে লক্ষ করে না।

প্রৌঢ়ের সংলাপ এবং নোরার প্রতিক্রিয়ার যে মঞ্চনির্দেশনা নাট্যকার দিয়েছেন তা উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রৌঢ়ের প্রথম সংলাপ ও নারী চরিত্রের প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ :

> প্রৌঢ়। এই যে – শুনছেন ?
>
> নারী উত্তর দেয় না। যেন সে শোনেই নি।
>
> প্রৌঢ় এবার আর একটু কাছে এগিয়ে যায়।
>
> প্রৌঢ়। আপনি কি যাত্রী? ট্রেন আসবার বেশ দেরী আছে কিন্তু।
>
> নারী এবারও কোনো উত্তর করে না বা সাড়া দেয় না। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৪)

এরপর প্রৌঢ় হাল না ছেড়ে আবারো বারোটি বাক্যসংবলিত একটি দীর্ঘ সংলাপ বলে নারীটিকে বাক্যালাপে আগ্রহী করে তুলতে চায়। এ পর্যায়ে মঞ্চে প্রথম নারী চরিত্রটি অর্থাৎ নোরার প্রথম সংলাপ শুনতে পাওয়া যায়, তবে সেটিও নারীর স্বাভাবিক চপলতাসুলভ নয় ; বরং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ একটি মাত্র বাক্যের সংলাপ : 'আমি এখানেই ভাল আছি।' কিন্তু বারংবার প্রৌঢ় চরিত্রটির উত্থাপিত নানান প্রসঙ্গ এবং বাক্যালাপের আন্তরিকতা একসময় প্রৌঢ়ের সঙ্গে তাকে আলাপে অনুপ্রাণিত করে তোলে। সে প্রথমে প্রৌঢ়ের জীবনকাহিনি শ্রবণ করে। এরপর ধীরে ধীরে সে নিজের জীবনকাহিনি উন্মোচিত করে। অবশেষে তাদের এ আলাপে নিজে থেকেই যুক্ত হয় ওয়েটিং রুমে অপেক্ষারত অপর পুরুষ চরিত্র ডাক্তার স্টকম্যান। উল্লেখ্য এখানে স্পষ্টত প্রৌঢ়ের একক আগ্রহেই রেল স্টেশনে অপেক্ষারত তিনটি পৃথক চরিত্র একীভূত হয়ে তাদের জীবনের গল্পগুলো বিনিময় করে। একটু বিবেচনা করলে বোঝা যায়, প্রৌঢ় ব্যাক্তির এমন উদ্যোগী হয়ে আলাপ জমানোর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক নিজেই যখন উদ্যোগী হয়েছেন আর্ন্তজাতিক ইবসেন নাট্যোৎসবে এ চরিত্রগুলির সম্মিলনের, সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের রচিত নাটকের চরিত্র উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে সেটিই স্বাভাবিক। আর দ্বিতীয় কারণ হতে পারে – যেহেতু তিনটি চরিত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী প্রৌঢ় চরিত্রটি। তাই বয়সের অভ্যাস অনুসারে প্রৌঢ় ব্যক্তির সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ধরে নিয়েই নাট্যকার অত্যন্ত কুশলী হয়ে প্রৌঢ়ের সঙ্গেই নোরার প্রথম আলাপ জমিয়েছেন। অর্থাৎ সৈয়দ শামসুল হক স্পষ্টত *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রের তুলনায় *অপেক্ষমাণ* নাটকে আলাপি স্বভাবের এক প্রৌঢ় চরিত্র নির্মাণ করেছেন। চরিত্রটির ইতিবাচক পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত তিনি *ঈর্ষা* নাটকে রেখে এসেছিলেন, তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিয়েছেন আলোচ্য নাটকে।

অন্যদিকে তিনি *অপেক্ষমাণ* নাটকে নারী ও পুরুষ নামে যে চরিত্রদুটির চিত্রণ ঘটিয়েছেন, তা পুরোটাই ইবসেন নির্মিত চরিত্রের প্রতিরূপ। যেহেতু তিনটি নাটককে সমীকৃত করে একটি নাটক রচনা করতে হয়েছে তাঁকে, তাই নাট্যরস ধরে রাখতে এবং সংহত অবয়ব প্রদানের প্রয়োজনে তিনি ইবসেনের চরিত্রদুটিকে বিস্তৃত আকারে গ্রন্থিত করেননি। তবে চরিত্রদুটির যে আংশিক ঝলক এবং দৃঢ়তা তিনি নাটকে উপস্থাপন করেছেন তাকে ইবসেন নির্মিত ডিটেইলস চরিত্রের সারবত্তা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

নারী চরিত্রটি ইবসেনের নোরা চরিত্রের বাইরে *ঈর্ষা* নাটকের ছাত্রীর ভূমিকাতেও অভিনয় করেছে। তবে শেষাবধি ফিরে এসেছে নোরা চরিত্রেই। *এ ডলস হাউস* নাটকে নোরা চরিত্রটির একটি রূপান্তর দেখিয়েছেন নাট্যকার ইবসেন। যেমন নাটকের প্রাথমিক অঙ্কে নোরার যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তাতে তাকে আমুদে, চলচপলা, স্নেহশীল মাতা ও একনিষ্ঠ পত্নী ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। তার মিষ্টি চিনেবাদাম খাওয়া স্বামীর পছন্দ নয়। তাই সে লুকিয়ে নিজের ভীষণ পছন্দের বাদাম খায়, প্রকাশ্যে স্বামীকে নিজের পছন্দ সম্পর্কে বলতে পারে না বা বলে না। বরং স্বামীর জেরার মুখে সে মনে করে স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার কখনোই যাওয়া উচিত নয়, হোক তা যতই সঠিক আর পছন্দের। হেলমার ও নোরার এতৎসংক্রান্ত সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

হেলমার। তুমি কি আজ মিষ্টির দোকানে যাওনি ?

নোরা। না তো! একথা বলছো কেন ? [...]

নোরা। [ডানদিকে টেবিলের কাছে গিয়ে] তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়াটা আমার উচিত নয়।

হেলমার। না, নিশ্চয় না। (পুতুলের সংসার, ১ম অঙ্ক, *ইবসেন- নাট্যসম্ভার*, পৃ. ১২-১৩)

নোরার স্বামী যখন তাকে কথায় কথায় 'মেয়েছেলে' 'বেহিসেবী নারী' 'উড়নচণ্ডী' প্রভৃতি উক্তি করে তখন সে নীরবে সয়ে যায়, গায়ে মাখে না, বরং হেসে উড়িয়ে দেয়। আবার স্বামী হেলমার যখন তাকে ভালবেসে 'পক্ষীরাণী', 'ক্ষুদে কাঠবিড়ালী' প্রভৃতি প্রাণীবাচক বিশেষণ ব্যবহার করে, নোরা তখন সেগুলো সানন্দচিত্তে উপভোগ করে :

হেলমার। আমার পক্ষীরাণীর গলা নাকি ?

নোরা। হ্যাঁ, পক্ষীরাণীর। [...]

হেলমার। আমার কাঠবিড়ালী বাড়ি ফিরলো কখন ?

নোরা। এইমাত্র। (পুতুলের সংসার, ১ম অঙ্ক, *ইবসেন-নাট্যসম্ভার*, পৃ. ৯-১০)

অথচ এই নোরাই কিছু ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অবশেষে পুরোপুরি বদলে যায়। সামাজিক প্রথা আর প্রচলন ভেঙে সে হয়ে ওঠে আত্মপ্রত্যয়ী নারী। যে সংসার, সন্তান ও স্বামী ছিল তার সার্বক্ষণিক ভাবনার, দৈনন্দিন কর্মের কেন্দ্রবিন্দু, সে-সবকে পেছনে ফেলে সে নিজেকে আত্মানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। *অপেক্ষমাণ* নাটকে সৈয়দ শামসুল হক রেলস্টেশনে অপেক্ষারত যে নারীর ছবি এঁকেছেন সে মূলত এই দৃঢ়প্রত্যয়ী নোরা। সে এখন আর সংসারের পুতুল নয়, পুরুষের খেলার বস্তু নয়। বরং সমাজে নারীপুরুষের সমমর্যাদা ও অধিকারের দাবিতে সোচ্চার ও দৃঢ়কণ্ঠ। এই প্রত্যয়ের দীপ্তি তার অন্তরে ছিল বলেই সে রেলস্টেশনের অন্ধকারকে ভয় পায়নি; অচেনা পরিবেশে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেনি কিংবা ভয়বোধে আক্রান্ত হয়নি। বরং প্রৌঢ়ের আহবানের মুখে নিজের জীবনকাহিনি তাকে খুলে বলতে পেরেছে। নাটকের শেষে যখন প্রৌঢ় তাকে জানিয়েছে প্রতারণা ছেড়ে তার প্রকৃতিসম্ভোগে বেরিয়ে পড়ার কথা, তখন সেও তার গন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছে :

> নারী। আপাতত – যেখানে আমার জন্ম, সেইখানে।
> নতুন জন্ম আমি নিতে চাই। নারী নয়, ব্যক্তির জন্ম। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৪৪)

এমনকি নারী চরিত্রটি তার এই নবজাগ্রত ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ নাটকের শেষ সংলাপ অব্দি বজায় রেখেছে বা প্রমাণ করে গেছে। কেননা, *অপেক্ষমাণ* নাটকের শেষে যখন নাটকীয়ভাবে দুই দেশের দুই কালের দুজন নাট্যকারের সাক্ষাৎ ঘটে মঞ্চে, তখন প্রৌঢ় চরিত্রটি আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ওঠেন – এই মহান নাট্যকারগণই তাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু নোরা সেটি মেনে নেয় না। সে বলে – নাট্যকারগণ তাদের সৃষ্টি করেননি, বরং তারাই নাট্যকার সৃষ্টি করেছে :

> প্রৌঢ় । আসলে ওই যে দেখছেন – ওঁরাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন!
> নারী। না! ভুল বললেন। আমরাই ওঁদের সৃষ্টি করেছি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৪৫)

বস্তুত, নারীচরিত্রটির এমন দীপ্ত সংলাপের মাধ্যমে নোরার আত্মপ্রত্যয়ী রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে এখন পুরুষের ভুল শুধরে দেবার মতো সাহস সঞ্চার করতে পেরেছে। একজন নাট্যকার যেমন চরিত্রসৃষ্টি করেন, তেমনি ঘটনা কিংবা চরিত্রই যে প্রকৃতপক্ষে একজন কালজয়ী নাট্যকারের জন্ম অবশ্যম্ভাবী করে তোলে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে নোরার এই সংলাপে।

অপেক্ষমাণ নাটকের পুরুষ চরিত্রটি সৈয়দ শামসুল হক হেনরিক ইবসেনের *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছেন। ফলে এই চরিত্রের মধ্যে ইবসেন রচিত চরিত্র

পুরোটাই মিশে আছে। সৈয়দ শামসুল হক আর সেখানে কোনো বদল আনেননি। ইবসেন যেমন একজন জনদরদি, প্রচণ্ড মেধাবী ও আবেগি ডাক্তার চরিত্র নির্মাণ করেছেন, সৈয়দ হকও এই চরিত্র নির্মাণে সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তাঁর নাটকে প্রথম পর্যায়ে এ চরিত্রটিকে তিনি দেখিয়েছেন একজন ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আত্মভোলা মানুষ হিসেবে; যিনি অত্যন্ত তন্ময়চিত্তে ওয়েটিং রুমে ক্রমাগত পায়চারি করেই চলেছেন, সহযাত্রীর প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল নেই। তাঁর উপস্থিতি তখনই জানা যায়, যখন প্রৌঢ় চরিত্রটি নারী চরিত্রটিকে ওয়েটিংরুমে বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছেন :

আসুন, ওয়েটিং রুমে বসবেন।
ওখানে আরো একজন আছেন।
কষে তিনি পায়চারি করছেন সেই এসেছেন থেকে।
অদ্ভুত ভদ্রলোক। একটি কথাও এ পর্যন্ত হয়নি।
দু’ একবার চেষ্টা করেছিলাম।
চোখমুখ দেখে তেমন ভালো ঠেকলো না।
তাই বাইরে বেরিয়েছিলাম। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৫)

একপর্যায়ে নারীটি সম্পূর্ণ একা স্বামীগৃহ ছেড়ে সন্তানুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে শুনে প্রৌঢ় চরিত্রটি যখন বিস্ময় প্রকাশ করে, তখন দেখা যায়, আত্মমগ্ন পুরুষ চরিত্রটি নারীটিকে সমর্থন করছে। এ পর্যায়ে কিন্তু চরিত্রটিকে আর আত্মভোলা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ বলে মনে হয় না; বরং সমাজসচেতন একজন সদালাপী, বাস্তববাদী মানুষ হিসেবেই তিনি দর্শকের সম্মুখে হাজির হয়। তিনি দূর থেকে এঁদের কথোপকথন শুনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং নিজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর সংলাপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সৌজন্যবোধ, সুরুচি, প্রজ্ঞা ও পরিস্থিতি অনুধাবন ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা :

দুঃখিত, আমি দুঃখিত। একপাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শুনছিলাম।
আশাকরি মনে কিছু করেননি। বা, বেমওকা হাজির হয়ে পড়িনি।
শুনলাম আপনি পেইন্টার। অনেক কথা বোঝেন শোঝেন।
কিন্তু আপনার কথাটার প্রতিবাদ না করে পারলাম না।
একা মানুষেরই কোনো ভয় থাকে না।
তবে, একা হয়ে ওঠাটাই যা মুশকিল।
সবাই পারে না। সবার কাছে একা মানেই – অসহায়।

আমার কাছে নয়। আমি এটা আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২২)

তার সংলাপ শোনার পর প্রৌঢ় চরিত্রটির মনে হয়, তিনি হয়তো কবি সাহিত্যিক বা আত্মমগ্ন প্রকৃতির লোক। যে কারণে তিনি তাঁকে প্রাচ্যভাববাদ চর্চার পুরোধা ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একলা চলা' বিষয়ক বিখ্যাত গানের পঙ্ক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানতে চান –তিনি কি ভাববাদে আস্থা রেখে দুঃখের সমুদ্র পাড়ি দিতে চান! কিন্তু পুরুষ চরিত্র তখনি তাঁর ভ্রম সংশোধন করে বলেছেন : ভাববাদ নয়, বরং জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি অবশেষে একলা থাকার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি তাই স্পষ্ট করে জানান :

না, অতটা কাব্য করে বলার বা দেখার লোক আমি নই।
আমি কঠিন বাস্তবের মানুষ।
সে হিসেবেই আমি নিজেকে গড়ে তুলেছি।
বাস্তবকে আমি বিচার করে দেখি, বিশ্লেষণ করে দেখি,
তারপর আমার কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।
ওটা আমার সিদ্ধান্তের কথা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৩)

এরপর পুরুষ চরিত্রটি প্রৌঢ় এবং নারী চরিত্রটির কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নিজের জীবনের ট্রাজিক আখ্যান বর্ণনা করেন। হেনরিক ইবসেন তিনটি অঙ্কের বিস্তৃত পরিসরে যে নাট্যকাহিনি বেশকিছু চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, নাট্যকার সৈয়দ হক সেখানে পুরুষ চরিত্রের দীর্ঘ একটি সংলাপের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করেছেন। ইবসেনের মূল নাটকের যে অংশে নগরপিতা, ডাক্তার ও জনগণ মুখোমুখি হয়েছে সৈয়দ হক *অপেক্ষমাণ* নাটকে সেখান থেকেই শুরু করেছেন। এদেশের মানুষ,সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি নাট্যকাহিনি ও চরিত্র সাজিয়েছেন। ইবসেনের নাটকে ডাক্তার চরিত্রটি যেমন দেশপ্রেমিক, নির্লোভ, সত্যান্বেষী, নির্ভীক চরিত্রের, *অপেক্ষমাণ* নাটকেও চরিত্রটি সেরকম। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা ও চরিত্রের বিবর্তন বা পুনর্নির্মাণ নয়, সৈয়দ হকের উদ্দেশ্য ছিলো অতীতের বিখ্যাত নাট্যকারের বিখ্যাত চরিত্রকে সমকালের সমাজ, রাজনীতির সঙ্গে একাকার করে পরিবেশন তিনি দেখাতে চেয়েছেন শতবছর পরেও সব কালে সব দেশে, সব সমাজে হেনরিক ইবসেন কতটা প্রাসঙ্গিক।

আলোচ্য নাটকের পুরুষ চরিত্রটি ডাক্তার স্টকম্যান চরিত্রের বাইরে আরো একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রৌঢ় যখন নিজের কাহিনি অভিনয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন তখন এ চরিত্রটি যুবক ছাত্রের ভূমিকা নিয়েছে।

আবার নাটকের শেষপর্যায়ে মূল চরিত্রে প্রত্যাবর্তন করেছে। নাটকের শেষে আবারও তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায় দৃঢ়প্রত্যয়ী দিনবদলের পথিক চরিত্ররূপে। তিনি জানেন তাঁর প্রতীক্ষা কেবল ট্রেনের জন্য নয়, বরং :

অপেক্ষা পরিবর্তনের।

বদলের – সবকিছু বদলে যাবার। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৪৪)

ফলে তিনি ছুটে যেতে চেয়েছেন 'শহরে শহরে গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরতে।' কারণ তিনি জানেন সুযোগ কেউ কাউকে দেয় না, সুযোগ নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে হয়। যেমন গড়ে নিতে হয় নিজেই নিজেকে।

বস্তুত, 'ইবসেনের নাটকগুলোর উপস্থাপন, চরিত্রায়ণ সাদামাটা হলেও সব মিলিয়ে এই সাধারণই একসময় অসাধারণ হয়ে ওঠে। নাটক যে সমাজকে উপস্থাপন করে, সেটিও নতুনভাবে দর্শকদের উপলব্ধি করান তিনি। ইবসেনের আগে নাটকে রাজা-রানি, বাদশা, বেগম, সেনাপতি – অর্থাৎ বীর ও অভিজাত শ্রেণির চরিত্র চিত্রায়ণ করা হতো। কিন্তু জনজীবন উপস্থাপিত না হয়ে উপেক্ষিত থাকত। ইবসেন সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, সমাজস্থ অসংগতি ও নারীদের যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে।'[১] সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটকের চরিত্রনির্মাণ প্রসঙ্গেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। *অপেক্ষমাণ* কাব্যনাটকটিও এর ব্যাতিক্রম নয়।

হেনরিক ইবসেন তাঁর বিখ্যাত *এ ডলস হাউস* নাটকটি তিনটি অঙ্কের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যেই যুক্ত করেছেন গ্রিক পঞ্চাঙ্ক নাটকের ব্যঞ্জনাসূত্র। অন্যদিকে তাঁর *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকটিও রচিত হয়েছে তিনটি অঙ্কের কলেবরে। আবার *ঈর্ষা* নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে তিনটি চরিত্রের সাতটি বৃহৎ সংলাপের মাধ্যমে। সৈয়দ শামসুল হক অবশ্য *অপেক্ষমাণ* নাটকে প্রচলিত নাট্যফর্ম মেনে কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাজনে যাননি। বরং একটি দৃশ্যের মধ্যেই পুরো নাটকটি সমাপ্ত করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন নাটকের চরিত্রগুলো এখানে কেবল সংলাপ প্রক্ষেপণের নান্দনিকতায় স্বকীয় হয়ে উঠেছে। তিনটি বৃহৎ কলেবরের নাটককে একই দৃশ্যে মঞ্চায়নের এমন অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি) আয়োজিত ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব উপলক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে *অপেক্ষমাণ* নাটকটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয়। নাটকটি প্রযোজনা করে *নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়* ; পরিচালনা করেন নাট্যজন আতাউর রহমান ; তিনি এ

[১] মুহম্মদ ফরিদ হাসান, 'হেনরিক ইবসেন : প্রথা ভাঙার নাট্যকার', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, সাহিত্য পাতা, ৩ জুন, ২০১৬

নাটকটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র প্রৌঢ়ের ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এছাড়া এ নাটেকের নারী চরিত্রে অভিনয় করেন অপি করিম ও যুবক ডাক্তার চরিত্রে অভিনয় করেন পান্থ শাহরিয়ার। বলাবাহুল্য পরিচালকের নির্দেশনার দক্ষতায় এবং অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাটকের এমন অনন্য সংমিশ্রণের অভিনবত্ব প্রত্যক্ষ করে ঢাকার দর্শক মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। এই জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় নাটকটি ২০১০ সালে মিশর আর্ন্তজাতিক নাট্যোৎসবে উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ পায়। এ সময়ে নাটকটির সমকালীনতা নিয়ে নিদের্শক আতাউর রহমান নিম্নরূপ মন্তব্য করেন :

> নাটকটির মধ্যে বর্তমান সময়ের অনেক কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এর আবেদন অনেক বেশি। এজন্য দর্শকের কাছে সহজে পৌঁছে যায়। গতবছর ঢাকায় ইবসেন নাট্যোৎসবে এর প্রথম মঞ্চায়ন হয়। তখন মিশরের শিল্পকলার একজন কর্মকর্তা ঢাকায় নাটকটি দেখে যান। তিনিই আমাদের নাটকটি নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল এ উৎসবে আমন্ত্রণ করেছেন।[১]

অপেক্ষমাণ নাটকের মঞ্চসফলতা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন :

> আমার *রক্তকরবী* নাটকটি দেখে শম্ভু মিত্র মঞ্চে উঠে এসে তাঁর বিমোহিত হওয়ার কথা দর্শকদের সামনে জানিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, এ নাটকটিও তেমন একটি প্রযোজনা হবে।[২]

অন্যদিকে, নাটকটির অন্যতম প্রধান চরিত্র নারীর ভূমিকায় অভিনয় করা নাট্যঅভিনেত্রী অপি করিম এ নাটকটিতে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে এক আলাপচারিতায় জানান:

> নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হয়েছিল গত বছরের নভেম্বরে। সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (সিএটি) আয়োজিত আর্ন্তজাতিক ইবসেন উৎসবে। হেনরিক ইবসেনের দুটো নাটক *এ ডলস হউস* ও *অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল* এবং সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য *ঈর্ষা*র সমন্বয়ে এ নাটকটি রচনা করা হয়েছে। এ নাটকে আমি অভিনয় করেছি নোরা ও যুবতী চরিত্রে। গতবছরের নভেম্বর মাসে আমরা *রক্তকরবী* নিয়ে কায়রো উৎসবে গিয়েছিলাম। সে উৎসব থেকে ফিরেই এ নাটকটির কাজ ধরতে হয়েছিল। মাত্র ১২ থেকে ১৫ দিন সময়

---

[১] আতাউর রহমান, দ্রষ্টব্যঃ প্রতিবেদন, 'কায়রো নাট্য উৎসবে বাংলাদেশের দুই নাটক', বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ঢাকা, ৯ অক্টোবর ২০১০

[২] আতাউর রহমান, দ্রষ্টব্যঃ '*রক্তকরবী থেকে অপেক্ষমাণ*', "আনন্দ পাতা", *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১২ নভেম্বর, ২০০৯

পেয়েছিলাম আমরা। এত অল্প সময়ে একটি মঞ্চনাটক তৈরি করে প্রদর্শন করা খুবই কঠিন কাজ। তবু আমরা সেই কঠিন কাজটাকে সত্যি করেছি। এই নাটকে একই সঙ্গে দুটি ভিন্নধর্মী চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে। এটা সত্যি কঠিন কাজ। দুটি চরিত্রের পোশাক-আশাক, মানসিক অবস্থা, স্বভাব, সংলাপ সবই ভিন্ন। রাতদিন খেটে আমাকে এই নাটকের জন্য তৈরি হতে হয়েছে। তবে মূল রচনাগুলো আমার পড়া ছিল বলে কিছুটা উপকার পেয়েছি। প্রচণ্ড ভয়ে ছিলাম সংলাপ মুখস্থ করা নিয়ে। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত টানা আমাদের কাজ করতে হয়েছে।[১]

অপেক্ষমাণ নাটকের ভাষানির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকার নতুন করে সংলাপ লিখেছেন কম, বরং ইবসেন থেকে রূপান্তর করেছেন বেশি। আবার, নিজের লেখা পুরাতন নাটকের ভাষা বা সংলাপ হুবুহু তুলে ধরেছেন। ফলে এ নাটকের সংলাপে শিল্পের কারুকাজ – উপমা, অলঙ্কারের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম চোখে পড়ে। *ঈর্ষা* নাটকের যে অংশ তিনি হুবুহু তুলে ধরেছেন, সে অংশের ভাষার যে অপরূপত্ব, তা নতুন করে আলোচনা আমরা বাহুল্য মনে করছি। তবে হেনরিক ইবসেনের রচনা দুটি তিনি অনুবাদ করলেও তাকে এ-কাল ও সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তিনি সাজিয়েছেন। ফলে এ অংশগুলোতে ভাষার চমক, শব্দের নতুনত্ব, অলঙ্কার ও উপমার প্রয়োগ বেশ চোখে পড়ে। আর যেসব এলাকা তিনি নতুন করে বিন্যস্ত করেছেন সেখানেও তাঁর অনন্যতা দৃষ্টি এড়ায় না। এ নাটকে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োগ করেছেন। নাটকে সূত্রধার বা কোরাস হিসেবে ব্রেকডান্সারের দল যে গান ও নাচ পরিবেশন করেছে মঞ্চে, বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে তাও অভিনব ঘটনা। আধুনিক রক গানের ধাঁচে মঞ্চে সংগীত পরিবেশন এবং তরুণসমাজে তুমুল জনপ্রিয় ব্রেকডান্সকে মঞ্চনাটকে উপস্থাপনের সম্ভাব্যতা তিনিই প্রথম ভেবেছেন। মূলত এমন সংগীত পরিবেশনা এবং নাচের মাধ্যমে তিনি নাটকে একটি পাশ্চাত্য ধাঁচের আবহ ও শিহরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

নাট্যকার ব্রেকডান্সার চরিত্রের উপযোগী করে যে সংগীত রচনা করেছেন রক ধাঁচে, সেখানে তিনি স্বভাবতই কোনো নির্দিষ্ট সুর সংযোজন করেননি। তিনি চেয়েছেন ব্রেকডান্স যেমন তারুণ্যের উদ্দীপনায় হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হয় এখানেও তেমনটা বজায় থাক। তিনি এমন করে পঙক্তির মাত্রা নির্ণয় করেছেন, শব্দের মালা গেঁথেছেন, যাতে পেশাদার না হলেও এ গান মঞ্চে ঠিকই পরিবেশন করা যায়, এবং ধ্বনিঝংকারে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা যায়। ফলে আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাসের ঝংকারে গানগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন :

---

[১] প্রাগুক্ত

হেনরিক ইবসেন ইবসেন

হো হো ইবসেন

হেনরিক ইবসেন

হেনরিক ইবসেন ইবসেন

হো হো ইবসেন

হেনরিক ইবসেন ॥ [...]

দৃশ্য দৃশ্য

পুতুলের সংসার করে অবিমৃষ্য –

অবিমৃষ্য

আরো এক নাটকের সেই এক ব্যক্তি

ব্যক্তি ব্যক্তি

জনতার শত্রু সে চিহ্নিত হয় হোক

সত্যের পক্ষেই তার অভিব্যক্তি

বলেছেন

হো হো ইবসেন

হেনরিক ইবসেন ॥ (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০২)

এখানে স্পষ্টতই অনুমান করা যায় ধ্বনিমাধুর্যে, শব্দের সুষমবিন্যাসে সঙ্গীতের ভাষা কতটা উপযোগী এবং শিল্পমাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে। যেহেতু এটি কোরাসের পরিবেশনা, তাই মূল পঙক্তির পরে আবার সে লাইন থেকে শব্দের পুনরাবৃত্তি সুরের লালিত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। কেবল তাই নয়, সংগীতের ব্যবহারটি ঠিক নাটকে কেমন হবে, তা নিয়েও নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনাটি নিম্নরূপ :

> সঙ্গীতের সঙ্গে তারা ব্রেক ডান্স শুরু করে।
>
> সেই সঙ্গে গানের কথাগুলো শ্রুত হয়।
>
> গানের কথাগুলোতে খুব একটা সুর দেবার দরকার নেই। ১-২/১-২ মাত্রায় আবৃত্তির মতো করেও বলা যেতে পারে। মূল ব্যাপারটা হবে ব্রেক ডান্সের ড্রাম ও কী বোর্ডের সঙ্গীত নির্ভর। দলটি নেচে চলে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০১)

সৈয়দ শামসুল হক আলোচ্য নাটকে হেনরিক ইবসেনের মূল রচনা থেকে প্রায়ই হুবহু অনুবাদ করলেও তাঁর মতো জাত কবির হাতে পড়ে তা আরও প্রাঞ্জল ও নান্দনিক হয়ে উঠেছে। আবার, কাহিনির বুননের কারণে

তিনি কিছু সংলাপ কাটছাঁট করে রচনা করেছেন; সমকালীনতা বজায় রাখতে অনেককিছু বদল করেছেন। যেমন, নোরা ও তার স্বামী যখন ধর্মীয় বিধি-নিষেধ নিয়ে আলাপ করেছে, তখন তারা খ্রিষ্টধর্মাচার, যাজক, পাদ্রি, চার্চ প্রভৃতি অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছে। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক যখন সেটিকে অনুবাদ করেছেন তখন বাঙালি মুসলিম সমাজের ধর্মাচার এবং শিষ্টাচার মাথায় রেখেই তা করেছেন। যেমন *এ ডলস হাউস* নাটকে হেলমার যখন নোরাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে আটকাতে চেষ্টা করে তখন নোরা বলে:

> নোরা। ধর্ম বলতে কী বোঝায় তা আমি সত্যিই জানিনে। [...] বিয়ের সময় যাজক হ্যানসেন আমাকে যা বলেছিলেন সেটাই আমি কেবল জানি – তিনি আমাকে বলেছিলেন ধর্ম বলতে এই বোঝায় – ওই বোঝায়। এখান থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়ানোর পরে আমি দেখতে চাই যাজক হ্যানসেন ঠিক কথা বলেছিলেন কি না ; অন্তত, তিনি যা বলেছিলেন সে কথা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না।
>
> হেলমার। তোমার মতো যুবতীর মুখে এইরকম কথা শোনার কল্পনাও কেউ কখনও করেনি।
>
> (*পুতুলের সংসার*, *ইবসেন-নাট্যসম্ভার*, পৃ. ৮৫)

অন্যদিকে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *অপেক্ষমাণ* নাটকে এ কথালাপ ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে, যেখানে সুস্পষ্ট হয়েছে সাধারণ বাঙালি মুসলিম পরিবারের শিষ্টাচার, জীবনাদর্শ :

> স্বামী। এত বোঝো, আর এটুকু বোঝো না যে তোমার স্থান হচ্ছে তোমার সংসারে। হ্যাঁ, সংসারেই। [...] হাদিস কোরান, গীতা বাইবেল, মানে ধর্ম - তোমাকে শেখায়নি?
>
> স্ত্রী। শুনতে তোমার হয়তো খারাপই লাগবে – ধর্মটা যে কী, আমি ঠিক বুঝি না। [...] ধর্ম তো এই – মোল্লারা যা বলে, পাদ্রীরা যা বোঝায়, যা ব্যাখ্যা করে! এবার আমাকে নিজের মতো করে বুঝতে হবে। জীবনের পাঠ নিয়ে দেখতে হবে সত্যটা আছে কোথায়। আমাকে জানতেই হবে মোল্লারা যা বলে তার কতখানি সত্য, আর কতটা মনগড়া। বা, ওরা যা বলে তা আমার বেলায় খাটে কিনা ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৫)

আবার *এ ডলস হাউস* নাটকের হেলমার চরিত্রের(*অপেক্ষমাণে* পুরুষ চরিত্র) মুখে আরবি শব্দমিশ্রিত সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন তিনি। নোরা বা নারী যখন তাকে জানিয়েছে মোল্লানির্ধারিত ধর্মে তার আপত্তি আছে, সে নিজের ধর্ম-কর্ম নিজেই বুঝে নিতে চায় বাস্তবতার নিরিখে তখন হেলমার তথা স্বামী চরিত্রটি জানিয়েছে :

স্বামী। তওবা করো, তওবা করো। মানুষ তোমার মুখে থুতু দেবে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫১৫)

সৈয়দ শামসুল হকের কবিমানসের অনেকটা জুড়েই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর প্রায় রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের উক্তি কিংবা রচনার অংশবিশেষ জুড়ে দিয়েছেন। *ঈর্ষা* কাব্যনাটকেও প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান কিংবা কবিতার পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হতে দেখা যায়। *অপেক্ষমাণ* নাটকেও রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক ভাবে উচ্চারিত হয়েছে। *এন এনিমি অব দ্য পিপল* নাটকের ডাক্তার চরিত্রটি যখন বলেছে – একা মানুষেরই কোনো ভয় থাকে না। পিছুটানহীন মানুষই পারে নির্ভীক চিত্তে মিথ্যের মোড়কে জড়ানো সমাজের সঙ্গে অকুণ্ঠ চিত্তে লড়ে যেতে, তখন প্রৌঢ় চরিত্রটি তাকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য নাট্যচিন্তার সঙ্গে প্রাচ্যকবি রবীন্দ্রনাথের এই মেলবন্ধন নাটকটিকে করে তুলেছে অনন্যস্বাদী। প্রাসঙ্গিক এলাকা উল্লেখ করা যেতে পারে :

পুরুষ। একা মানুষেরই কোনো ভয় থাকে না।
তবে, একা হয়ে ওঠাটাই যা মুশকিল।
সবাই পারে না। সবার কাছে একা মানেই – অসহায়।
আমার কাছে নয়। আমি এটা আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি।
প্রৌঢ়। ও! আপনি তাহলে সেই গানের লোক – মুশকিলে ভরসা দিতে চান?
'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে !' (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২২)

মূল *এনিমি অব দ্য পিপলে* যখন ডাক্তার স্টকম্যান, মেয়র পিটার স্টকম্যান ও জনতা সভামঞ্চে মুখোমুখি হয়েছে, তখন জনতার বাক্যালাপ ছিল উত্তর-প্রত্যুত্তরধর্মী ; একটি সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারীরা যেমন নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে বা বক্তাকে প্রশ্ন করে ঠিক সেরকম। কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক যখন এ অংশটি অনুবাদ করেছেন তখন এদেশীয় ঝাঁজ বজায় রেখেছেন। বাংলা অঞ্চলে সাধারণ জনতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো – কোনো কিছু পছন্দ না হলে 'ভূয়া ভূয়া' বলে দূয়োধ্বনি তোলা। আবার, এদেশের মিছিলের জনপ্রিয় স্লোগানগুলোকেও নাট্যকার নাটকে উপস্থাপন করে পাশ্চাত্যের একটি নাটককে এদেশীয় সামাজিক বাস্তবতায় ঢেলে সাজিয়েছেন। যেমন :

১. জনতা। ভূয়া ! ভূয়া !
ভূয়া ভূয়া ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৫)

২. রাজধানীর গোড়াতে – আগুন জ্বালো।

জ্বালো জ্বালো – আগুন জ্বালো। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৫)

৩. চলো চলো – রাজধানী চলো।

ষড়যন্ত্রের গোড়া মারো। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৫২৫)

৪. ডাক্তারের চামড়া – তুলে নেবো আমরা।

ডাক্তারের চামড়া – তুলে নেবো আমরা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৬)

৫. জুতা মারো তালে তালে।

জুতা মারো দুই গালে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৭)

এছাড়াও *অপেক্ষমাণ* নাটকের ভাষায় ব্যবহৃত কিছু নান্দনিক অলঙ্কার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, রূপক-প্রতীক, প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারার দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

উপমা

১. এক নারী মঞ্চের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মতো। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৩)

২. রাগ ? রাগ তো পানির মতো।

আগুন পেলে টগবগ করে ফোটে,

কিছুক্ষণ পরেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৭)

৩. যারাই মিথ্যার সঙ্গে বসবাস করে, জনতাকে ভুল পথে নিয়ে যায়,

আপন স্বার্থে ব্যবহার করে –

মহামারীর বীজাণু ছড়ানো কীটের মতো তাদের মেরে ফেলা উচিত। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩৩)

উৎপ্রেক্ষা

১. খাতার ওপরে কামরুল তাঁর দ্রুত হাতে কলমের টান দিয়ে

চলেছেন –

আকঁছেন হীরামন পাখির শরীর, তার ঠোঁট, তার পালক, বিশাল আকাশ –

কামরুল এঁকে চলেছেন –

মেয়েটির বিস্ময়ভরা চোখের সমুখে যেন ঘটে যাচ্ছে

ইন্দ্রজাল ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩৮)

চিত্রকল্প

২. ভাবছি এবার থেকে প্রকৃতির ছবি আঁকবো।
যেমন ওই যে অসাধারণ ভোরের কথা বললাম,
বিস্তীর্ণ পাথারের ওপর সূর্য উঠছে।
একটু একটু করে কাঁটাবন, শস্যকাটা মাঠ,
শুকনো খড়ের স্তূপ, রুখো মাটি,
ভোরের রক্তমাখা আলোয় ফুটে উঠছে, আঁকবো। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৬)

৩. খাতার ওপরে কামরুল তাঁর দ্রুত হাতে কলমের টান দিয়ে
চলেছেন –
আকঁছেন হীরামন পাখির শরীর, তার ঠোঁট, তার পালক, বিশাল আকাশ –
কামরুল এঁকে চলেছেন –
মেয়েটির বিস্ময়ভরা চোখের সমুখে যেন ঘটে যাচ্ছে
ইন্দ্রজাল ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩৮)

রূপক / প্রতীক

১. এ তো আর আজকের দিনের হালকা পল্কা দরোজা নয়।
ওক কাঠের দরোজা, ঊনবিংশ শতাব্দীর। কঠিন ! [...]
সমাজটার মতোই ! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২০)

২. আমি অবাক হয়ে যাই কীভাবে মৃতের শাসনে জীবিতেরা আজ পড়ে আছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩২)

সমাসোক্তি

১. হ্যাঁ, রক্ত ! মিথ্যার আঘাতে সত্যের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩৩)

২. জীবনের মিথ্যা তোমাকে শিল্পের মিথ্যা করে তুলবে।
তোমার ছবি হবে প্রতারক – হবে অশুদ্ধ – দূষিত। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩৫)

বাগধারা / প্রবাদ / প্রবাদপ্রতিমবাক্য :

১. একা হয়ে যেতে হয় সত্যের সম্মুখেই
শক্তিটা আছে শুধু সত্যেই – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৩)

২. নারীর পক্ষে সিদ্ধান্ত শব্দটা অচল, বিস্ময়কর ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫০৮)

৩. সেটা হচ্ছে রাজধানীর মতলবী ফাঁদ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৫)

৪. ডাক্তারের কাজ শুধু রোগের চিকিৎসা করা নয়, ডাক্তারের প্রথম কাজ – আমার বিবেচনায় – রোগের কারণ নির্মূল করা।(কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫২৯)

৫. পিলে চমকে ওঠে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩০)

৬. সত্যের পক্ষে যারা তারা চিরকালই সংখ্যালঘু – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩১)

৭. শক্তি তাদেরই হাতে যারা সত্যমিথ্যা বিচার করতে পারে,
ভালো মন্দ স্পষ্ট করে নির্ণয় করার ক্ষমতা রাখে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩১)

৮. সত্য কাউকে মুকুট পরায় না। সত্য মানুষকে বিকশিত করে।
সত্য মানুষকে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে দেয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৩১)

হেনরিক ইবসেন ছিলেন নওরেজিয়ান সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। অবশ্য তিনি তাঁর মহৎ লেখনী ও দূরদর্শী শিল্পদৃষ্টির জন্যে দেশকালের গণ্ডি ছাপিয়ে হয়ে উঠছেন বিশ্বজনীন। তাঁর নাট্যরচনার একটি বিশেষ প্রবণতা হলো তাঁর নাটকে শিল্প এবং সমাজ যুগপৎভাবে অবস্থান করে। প্রচলিত ভিক্টোরীয় সমাজের কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও বিবিধ অসংগতি বাস্তবতার নিরিখে তাঁর নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে। এ-গুণই হেনরিক ইবসেনকে সাধারণের চোখে অসাধারণ করে তুলেছে। বস্তুত, 'তিনিই প্রথম সমালোচকের দৃষ্টিতে সমাজকে দেখে নাটকের সমাপ্তিতে বৈচিত্র্য আনেন। অর্থাৎ ইবসেনই প্রথম নাট্যকার, যিনি ইউরোপীয় নাট্য ঐতিহ্যের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে নাট্য রচনা করেন। এ জন্য তাঁকে মানুষের কথা ও সমালোচকদের তীক্ষ্ণ তীরও হজম করতে হয়েছে। [...] প্রথমে তাঁর চিন্তা ও কর্ম বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হলেও পরবর্তী সময়ে সেই চিন্তাগুলোই সমগ্র ইউরোপে ও পরে বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।'[১] বাংলাদেশেও সেই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে উদযাপিত হয়ে আসছে হেনরিক ইবসেন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব; যাকে ঘিরে এদেশের প্রথিতযশা নাট্যকারগণ হেনরিক ইবসেনের বিভিন্ন বিখ্যাত নাট্যকর্ম অনুবাদ করেছেন, এবং দেশের স্বনামধন্য নাট্যদলগুলো সেসব নাটক মঞ্চে পরিবেশনায় ব্রতী হয়েছেন। ফলে এদেশের নাট্যামোদী দর্শক ভিনদেশি এ নাট্যকারের দর্শন ও সমাজবোধের

[১] ফরিদ হাসান, প্রাগুক্ত

সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। তবে সৈয়দ শামসুল হক এ ধারায় নিসন্দেহে অনন্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নাট্যজন আতাউর রহমানের অনুরোধে ইবসেনের নাটকের রসনির্যাস গ্রহণ করে তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনাবৃত্তিকে বহুদূর প্রসারিত করেছেন এবং তিনটি নাটকের মূলসার সমীকৃত করে সৃষ্টি করতে পেরেছেন কালজয়ী মৌলিক কাব্যনাটক *অপেক্ষমাণ*। এ-নাটকে সৈয়দ হক নাট্যপ্রতিভার যে-স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছেন তার দ্বিতীয় স্বাক্ষর বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে বিরল।

উত্তরবংশ

সৈয়দ শামসুল হকের *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকে একদিকে যেমন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি সমকালীন কুটিল রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে মজ্জমান জাতির বেহাল দশাও চিত্রিত হয়েছে। নাট্যকার এখানে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একাত্তরের ঘাতক-দালাল-রাজাকারদের ঘৃণ্য অপরাধের বিচার চেয়ে প্রতিবাদ করেছেন। নেতা, লেখক ও লেখকের মেয়ে – নাটকের এই প্রধান তিনটি চরিত্রের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বিচার-প্রসঙ্গ। বলা যায়, একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও প্রতিবাদী উচ্চারণ সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক *উত্তরবংশ*। বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক অস্ত্রহাতে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ না দিলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আজীবনকাল বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করে গেছেন। বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতির পক্ষে তিনি শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলেন। এদেশের মানুষ কূপমণ্ডূক জীবনভাবনা পরিত্যাগ করে উদার, মুক্ত ও প্রগতিশীল জীবনভাবনায় স্নাত হবে – এটিই তিনি মনে প্রাণে চেয়েছেন। তিনি নিজেকে বাহান্নর সন্তান পরিচয় দিতে অধিক পছন্দ করতেন। জীবন সায়াহ্নে লন্ডনে অবস্থানকালে মুক্তদৃষ্টির লেখক-সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে একান্ত এক আলাপচারিতায় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :

> হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদাভেদ আমরা করিনি। আমরা বেড়ে উঠেছিলাম গণতান্ত্রিক একটা চেতনার মধ্য দিয়ে। আমরা তো বাহান্নর সন্তান, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সন্তান। [...] আরেকটা দিক হলো স্বাধীন বালাদেশের অভ্যুদয় আমরা দেখেছি। তাতে আমাদের অবদান কতটুকু, সেটা আমি বলতে চাই না। কিন্তু এই যে অভ্যুদয় দেখেছি, এটা আমাদের জীবনের বিশাল একটা পাওয়া। ভবিষ্যতের প্রজন্ম আমাদের ঈর্ষা করবে, আমরা এমন সব ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা এই দেশটাকে গড়ে তুলেছে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর কথা যদি বলি, তাঁর সময়ে আমরা বেঁচে ছিলাম। তাঁকে আমরা সাতই মার্চের ভাষণ দিতে দেখেছি, তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি

পেতে দেখেছি, তাঁকে আমরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় পেয়েছি। এই পুরো ব্যাপারে যে প্রত্যক্ষদর্শী, এটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হবে। এমনকি তারা বলবে, আপনারা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আপনাদের লেখার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেছেন। [...] এই দেশ আমাদের নিজের হাতের তৈরি। এই দেশ আমার পিতা-পিতামহ থেকে শুরু করে আরও আগের প্রজন্মের উত্তরাধিকার বহন করছে। তাদের নানাবিধ অবদানে সমৃদ্ধ এই দেশ।[১]

তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে উত্তরপ্রজন্মকে অতীতের সঠিক ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গটি তিনি *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকের মাধ্যমে উত্থাপন করেছেন। তিনি আশা করেছেন, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক জীবনে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়ের কারণে মানবতাবিরোধী অপরাধের যে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি, উত্তরপ্রজন্ম দায়িত্ব নিয়ে একদিন সে বিচারপ্রক্রিয়ার সম্পন্ন করবে। নাটকের প্রধান দুই চরিত্র – নেতা ও নাট্যকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাদের কন্যা, তথা উত্তরপুরুষের ওপর। লেখক-কন্যাও একদিকে যেমন তার মায়ের ওপর একাত্তরে সংঘটিত নির্যাতনের বিচারের দাবিতে সোচ্চার, অন্যদিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ। সে তাই দীপ্রস্বরে ঘোষণা করেছে :

আমরা আর সময়কে পার হয়ে যেতে দেবো না।
যে- বিচার আপনারা করতে পারেননি, আমরাই করবো।
সময় এখনো বহে যায়নি, বিচারে তাদের তুলবো। [...]
বিচার যদি না করি– ইতিহাসে আমরা
মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৭)

তবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কেবল অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হবার বেদনাবিধুর আলেখ্য নয়। মুক্তিযুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথানত না করে গৌরবদীপ্ত বিজয় রচনার ইতিহাস। এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ হক রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ, সশস্ত্র আক্রমণ ও গেরিলা যুদ্ধের বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যান তুলে ধরেছেন *উত্তরবংশ* নাটকে। তিনি চান – বর্তমান প্রজন্ম সেই পূর্বপ্রজন্মের কথা জানুক, যারা অন্যায়ের সঙ্গে কিছুতেই আপস করেনি। সেই সংগ্রামী

---

[১] 'জীবন ও বন্ধুত্ব : সৈয়দ শামসুল হক ও আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী', *থিয়েটার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

যুবাদের কথা জানুক, যারা নিজেদের স্বার্থ ভুলে দেশমাতৃকার বৃহৎস্বার্থে অসম সাহসিকতার সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নাট্যকারের মেয়ে চরিত্রটির মুখে তাই শুনতে পাই :

> সেই গণহত্যার গল্পও তুমি আমার কাছে করেছো – ক্লান্তিহীন।
>
> [...] গণহত্যার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম সেই উঠে দাঁড়ানো।
>
> [...] হানাদারদের চোখ এড়িয়ে নগরে প্রবেশ করে
>
> অর্তকিতে মুক্তিযোদ্ধাদের পালটা আক্রমণ ও আঘাত। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৪)

উত্তরবংশ নাটকে প্রধান চরিত্র তিনটি। নাট্যকার, তার কন্যা এবং জনৈক জননেতা। তবে আরেকটি প্রধান চরিত্র নাট্যকারের স্ত্রী – যিনি নেপথ্যে থেকেও নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত, নাট্যকারের স্ত্রীকে ঘিরেই এ নাটকের মূল বক্তব্য পরিণামমুখী হয়েছে। এছাড়া নাটকে কিছু পরিপ্রেক্ষিত-চরিত্র রয়েছে, যারা নাটকের প্রয়োজনে কখনো ঘাতক হানাদার, রাজাকার, কখনো নির্যাতিত জনতা, মুক্তিযোদ্ধা প্রভৃতি চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। তবে নাট্যকাহিনি অগ্রসর হয়েছে প্রধান তিনিটি চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনে। এই তিনটি চরিত্রের ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, নাট্যকার স্বয়ং নাটকের ভূমিকায় বলেছেন :

> এ কাব্যনাট্য কেবল নাট্যকার, তার মেয়ে, এবং নেতা, এই তিন চরিত্র সম্বলিত দৃশ্যগুলো নিয়েই উপস্থাপন করা সম্ভব; সে ক্ষেত্রে অপর দৃশ্যগুলো কেবল ধ্বনি সম্পাতের মাধ্যমে এনে প্রয়োজনীয় আবহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৪৯)

নাটকের প্রধান চরিত্র নাট্যকার, যার হৃদয়ের ক্ষরণ-বিগলন পাঠক-দর্শকের অন্তরকে স্পর্শ ও বিচলিত করেছে। সৃষ্টিশীল এ মানুষটি প্রতিনিয়ত অন্তর্লোকে লালন করেছে শোকের হিম ও প্রতিশোধের দাবানল। তার অন্তর স্ত্রী শোকে ভারাক্রান্ত, কিন্তু বাইরে সে নির্বিকার থাকার ক্রমাগত অভিনয় করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশপেমিক জনৈক নেতা তাকে পরামর্শ দিয়েছেন এই বলে যে – তার উচিত সত্যটা স্বীকার করে দ্রোহে, ক্ষোভে জ্বলে ওঠা। এমন কিছু রচনা করা, যা ঝিমেধরা সমাজমানসকে সমুদ্রসম উত্তাল করে দিতে পারে। আর তাতেই সম্ভব হবে একাত্তরেরর ঘাতক দালালদের বিচারকার্য। কারণ ব্যক্তির শোক আর রাষ্ট্রের সামষ্টিক শোক কখনো পৃথক নয়। নাট্যকার হারিয়েছে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে, আর বিনষ্ট রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে রাষ্ট্র হারিয়েছে তার আদর্শ, তার স্বপ্ন। বলাবাহুল্য এজন্য দায়ী এদেশেরই সুপ্তিমগ্ন জনগণ। পঁচাত্তর-উত্তর সময়ে তারাও পঁচা পাঁকে গা ভাসিয়েছে, রাজনীতি আর ধর্মব্যবসার মোহজালে বন্দি হয়ে ব্যক্তিক উন্নয়নের চিন্তায় সামষ্টিক স্বার্থ বেমালুম ভুলে গেছে। নাট্যকারের খেদোক্তি :

> যা আমরা মুখে মেজে নিচ্ছি – মনে করেছি প্রসাধন –

আসলে তা কালি – কালি! আমাদের অক্ষমতার কালি –

আমাদের ব্যর্থতার কালি – আমাদের ভ্রান্তির কালি।

আর তারই মাশুল এখন আমরা দিয়ে চলেছি। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮০)

একদা তরুণ নাট্যকার ও তার স্ত্রীর চোখে ছিল সংসার গড়ার স্বপ্ন, হৃদয়ে ছিল অকৃত্রিম প্রেম-ভালোবাসা। তাঁরা চেয়েছিলেন পাখি হয়ে উড়ে যেতে সবুজ নিসর্গ আর নিবিড় প্রান্তরে, মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়াতে চেয়েছেন স্বদেশের মুক্ত আকাশে। কিন্তু পাকিস্তানি হায়েনার দল অর্তকিতে হানা দিয়ে তাদের স্বপ্নের পৃথিবী তছনছ করে দিয়ে গেছে। অট্টহাস্যে গুলি করেছে তাদের কোমল বুকে; লেখকের তরুণী স্ত্রীকে শেকলবন্দি করে নিয়ে গেছে নির্যাতন ক্যাম্পে। ঘটনার আকস্মিকতায় রক্তাক্ত হয়েছে যুবক নাট্যকারের হৃদয় :

পিপাসায় নদীর কিনারে আমি উবু হয়ে সেই যে নেমেছি –

শিকারীর অট্টহাসে হাত থেকে পড়ে গেছে পানি।

বিস্ফারিত চোখে আজও চেয়ে আছি আমি –

রক্তে ভিজে গেছে করতল! (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৫৪)

যুদ্ধশেষে নাট্যকার তাঁর স্ত্রীকে পরম মমতায় নিজগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক সংসার আর হয়ে ওঠেনি। কেননা দীর্ঘকাল ক্যাম্পে নির্যাতন সয়ে সয়ে স্ত্রীর মধ্যে একধরনের বিকার জন্ম নিয়েছে। নিজের হাতেগড়া সংসারকে তার মনে হয়েছে শত্রুবেষ্টিত বাংকার; নিজের স্বামীকে মনে হয়েছে হানাদার বাহিনীর বর্বর সেপাই, দেশদ্রোহী রাজাকার, ধর্ষক আলবদর। ফলে কিছুতেই আর সে স্বাভাবিক হতে পারছিল না। এরপরও নাট্যকারের প্রেমময় যত্নে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিলেন; সংসারের স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর কোল জুড়ে এসেছিল কন্যা সন্তান। কিন্তু এরপর পঁচাত্তর-উত্তর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, রাষ্ট্রক্ষমতায় আবারো মৌলবাদের উত্থান দেখে তিনি ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর ধারণা হয় – একদিন রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁর সঙ্গে যে ঘৃণ্য আচরণ করেছে, ভবিষ্যতে তাঁর সন্তানও এদেশে সেই ঘৃণ্য আচরণের শিকার হবে। ফলে তিনি আত্মহননের পথ বেছে নেন।

নাট্যকার এ পর্যায়ে অনুধাবন করেন যে, পাকিস্তানি হানাদারদের নির্মম অত্যাচার সয়েও তাঁর স্ত্রী যে টিকে গিয়েছিলেন, নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার অবিচার আর নিজস্বামীর পলায়নবাদী মানসিকতা তাঁকে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে। অথচ নাট্যকার যদি উপযুক্ত প্রতিবাদ করতে পারতেন তখন, তাঁর স্ত্রী হয়তো বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পেতেন। নাট্যকারের মেরুদণ্ডহীন নপুংসক মনোবৃত্তি,

অনাকাঙ্ক্ষিত নির্লিপ্ততা ও আপসকামিতা তাঁর স্ত্রীকে আশাহত করেছে। ফলে আত্মহত্যা করে এই ভ্রষ্টতা, এই বিচারহীনতা, এই আদর্শহীনতা থেকে বহুদূরে সরে যেতে চেয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের সংলাপ উল্লেখ্য :

লজ্জা আর লজ্জার শেকল – পায়ে পায়ে বেজেছে আমার।
পরিবারের সত্যকে রেখেছি গোপন, আমি করেছি গোপন।
সব স্পষ্ট দেখছি এখন – আমার এ পরস্পরবিরোধী ভূমিকা।
আর ভেতরে বাহিরে এই আমারই তো দুই ভিন্ন রূপ দেখে –
ক্ষোভে ক্রোধে বিপন্ন বিধ্বস্ত নারী – স্ত্রী আমার আত্মঘাতী হয়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০২)

নাট্যকারের মনে এই ঘটনা এতটাই তীব্রভাবে আঘাত করে যে, তিনি আজীবন বিপত্নীক থেকে যান । এমনকি নিজ কন্যার কাছ থেকেও তিনি তার মায়ের আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ গোপন করে গেছেন। পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক একজন নির্যাতিত নারী সংসারে ফিরেও যে রাষ্ট্রের অন্যায় ও অন্যায্য নীতির কারণে আবার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন – এটি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাট্যকারের কাছে অগ্রহণযোগ্য, লজ্জিত বিষয়। কেননা তারা নিজেরাই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে নাট্যকারের মধ্যে সবসময় আত্মগ্লানিবোধ কাজ করেছে। তাই তিনি আশা করেছেন – যে অন্যায়ের বিচার তাঁরা করে যেতে পারেননি, একদিন তাঁর কন্যা তথা জাতির উত্তরবংশ তার উপযুক্ত বিচার করবে।

নাটকের আরেকটি প্রধান চরিত্র – নাট্যকারের বন্ধু – নেতা। এই রাজনৈতিক নেতা গতানুগতিক, তোষামুদে, অসৎ নন। তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশুদ্ধ মানুষ। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী রাজনীতির কারণে তাকে সবসময় বোমা হামলার আশঙ্কা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। এমনকি তাঁকে সর্বত্র অনুসরণ করে যায় সরকারের পোষা গুপ্তচর। নেতা যে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃস্থানীয় দল আওয়ামী লীগের সদস্য তাও নানান প্রসঙ্গে নাটকে ইঙ্গিতায়িত হয়েছে। এখানে নাট্যকার চরিত্রটিও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সমর্থক। বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক নিজেও ছিলেন এ দলের একজন বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। ফলে নাট্যকার ও নেতা চরিত্রের নানান সংলাপে ব্যক্তি সৈয়দ শামসুল হকের কণ্ঠস্বরই সুস্পষ্ট হয়েছে। নেতা চরিত্রের একটি সংলাপে নেতা ও নাট্যকার উভয়েই যে নৌকা প্রতীকের সমর্থক, তার প্রমাণ মেলে। যেমন নাট্যকারকে উদ্দেশ্য করে নেতা বলেছেন :

লক্ষ করেছো কিনা, মিল আমাদের একটা জায়গায় –
দরিদ্র মাঝি ছিলো তোমার প্রথম কবিতার বিষয়
আর মাঝির সেই নৌকোটিকে আমি দেখে উঠলাম
মুক্তির সমুদ্রে পৌঁছে যাবার এক প্রতীক। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮৭

নেতা চরিত্রটি একজন সর্বহারা মুক্তিযোদ্ধা। দেশমাতৃকাকে হানাদার ঘাতকের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তার বিনিময়ে তাঁকে হারাতে হয়েছে সবকিছু : নিকটজনের মৃত্যু হয়েছে, বিধবা বোন হয়েছে ধর্ষিত। নাট্যকার সৈয়দ হক এখানে নেতার বোনের ধর্ষিত হবার যে নির্মম চিত্র বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সুইপার প্রত্যক্ষদর্শী রাবেয়া খাতুনের বর্ণনার সাদৃশ্য রয়েছে।[১] মুক্তিযুদ্ধে বিপুলসংখ্যক মানুষের আত্মদান, অগুনতি নারীলক্ষ্মীর সম্ভ্রম হারানোর প্রতিকার কিছুতেই আর সম্ভব নয়। তবু যারা এই ঘৃণ্য ও অমানবিক নৃশংসতার সঙ্গে জড়িত, তাদের আশু বিচার যে প্রয়োজন, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখেই সৈয়দ হক রচনা করেছেন *উত্তরবংশ* নাটক।

নাট্যকারের মেয়ে চরিত্রটি একবিংশ শতাব্দীর ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া, শিক্ষিত, স্বাবলম্বী, দায়িত্বসচেতন তরুণপ্রজন্মের প্রতিনিধি। মেয়েটি শৈশব থেকেই মাতৃস্নেহবঞ্চিত, পিতাকে সে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। নাটকের শুরুতে আমরা একজন মমতাময়ী, দায়িত্বশীল কন্যাকে পেয়েছি; কিন্তু যে মুহূর্তে মেয়েটি মায়ের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছে, তখনি আমাদের সম্মুখে এক প্রতিবাদী রাজনীতিসচেতন চরিত্রেরই যেন আবির্ভাব ঘটেছে, যে তার নাট্যকার-পিতার নির্লিপ্ততা, নেতার পলায়নবাদিতার বিরুদ্ধে তিক্ত কথা বলতেও দ্বিধা করেনি। বস্তুত, উত্তরবংশ মনে করছে পূর্বজ শিল্পী-বোদ্ধারা যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের কলমের মাধ্যমে। তারা কেবল যুদ্ধের বিরহগাথা, অত্যাচারের কাহিনি রচনা করে গেছে বিলাপের মতো করে। কিন্তু জাতির বুকে এই দুর্দশা কেন নেমে এসেছে, বা এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা কারা, তাদের পরিচয় সঠিকভাবে তুলে ধরে উত্তরপ্রজন্মকে সতর্ক করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। আর একারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ঘাতকেরা ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছে অনায়াসেই। নাট্যকারের মেয়ে চরিত্রটি তার বাবার প্রতি যে ক্ষোভ উগরে

---

[১] দ্রষ্টব্য : রাবেয়া খাতুন, জবানবন্দী, *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, সম্পাদনা : শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১–১৫২

দিয়েছে, তা যেন এদেশের নিস্পৃহ লেখক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তরুণ প্রজন্মের অভিযোগ। মেয়ের বক্তব্য উল্লেখ্য :

> তুমি দাবানলের সেই দিনরাত্রির কথা বলেছো,
> তোমার কলমে তুমি সেই দোজখের বর্ণনা করে গেছো। [...]
> কিন্তু কেন মানুষকে হত্যা করা হচ্ছিলো,
> তুমি তার কথা বলোনি।
> মানুষ কেন ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো, তা মনে করিয়ে দাওনি তুমি।
> মানুষ কেন স্বাধীনতা চেয়েছিলো, তুমি তার কথা বলো নি। [...]
> ধর্মের নামে ভাই ডেকে ভুলিয়ে যারা দেশটিকে করেছিলো শোষণ,
> বিকট সেই প্রতারণার কথা তুমি নাটকে আনোনি।
> তুমি শুধু তোমার প্রতিভার কলমে, শব্দের পর শব্দরোল তুলে
> ক্রন্দন রচনা করেছো, যেন নতুন এক কারবালার নতুন মর্সিয়া – [...]
> ফোরাতের তীরে নিহত ইমামের স্মরণে যেমন –
> তুমিও তেমনি চেয়েছো – মানুষের রক্তটাকেই মনে রাখুক!
> কিন্তু কেন রক্তপাত ঘটেছিলো তার পূর্বাপর কারণটাকে,
> কিম্বা এখনো যে আবার আমাদের রক্ত ঝরতে পারে ওদেরই হাতে –
> তুমি আমাদের সতর্ক করোনি। বিশ্লেষণ করে তুমি কিছুই বলোনি। (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৫৯৬)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক নাটকের মেয়ে চরিত্রটির মাধ্যমে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের সম্মুখে একাত্তরের সত্য ইতিহাস জানাতে চেয়েছেন, যাতে তারা পাকিস্তানি ঘাতকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের অত্যাচারের বাস্তবকাহিনি জেনে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে। যে বিচার, যে দায়িত্ব অতীতে অগ্রজরা পালন করতে পারেনি প্রতিকূল সামাজিক-রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক কারণে, সে-কাজ সমাধা করতে উত্তরপ্রজন্ম অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। মেয়ে তাই পিতাকে প্রতিবাদী সত্তায় আত্মপ্রকাশের আহবান জানিয়ে বলেছে :

> সুনীতির মঞ্চে তুলে ধিক্কার জানানো আর নয় –
> ধর্ষক ঘাতক যত একাত্তর সালের প্রত্যেকে,
> যুদ্ধ অপরাধী যত মুক্তিযুদ্ধকালে, প্রত্যেকে
> আজ যারা মিশে আছে জনপদে, খোঁজো –

[...] বিচারে ওঠাও তাদের, দণ্ড দাও, দণ্ড দাও, দাও। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০২)

মেয়েটি আত্মপ্রতিজ্ঞায় উদ্দীপিত হয়ে আরও বলেছে :

আমার মা, আমার বোন, আমার ভাই, আমার পূর্বপুরুষেরা,
আমি উত্তরবংশের মেয়ে, আমরাই করবো বিচার।
বাবা, আমি তোমার উত্তরপ্রজন্ম – তোমরা যেখানে ব্যর্থ,
আমরা সেখানে হতে চাই সফল। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৫)

২০১২ সালের ১৩ আগস্ট গোলাম সারোয়ারের নির্দেশনা ও *কণ্ঠশীলনের* প্রযোজনায় *উত্তরবংশ* নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। তবে মাত্র ৮টি প্রযোজনার পর এটির মঞ্চায়ন থেমে যায়।[১] গোলাম সারোয়ার এ নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশের সব মানুষ আরেক যুদ্ধ করে চলেছে বাংলাদেশের ভেতরে যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবি নিয়ে। কালের পরিক্রমায় এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে এগিয়ে আসে নতুন প্রজন্ম। এমনই একটি বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার তাঁর *উত্তরবংশে*।[২]

নিরীক্ষাপ্রবণ নাট্যকার সৈয়দ হক তাঁর *উত্তবংশ* কাব্যনাটকের প্লট নির্মাণেও যথেষ্ঠ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। প্রচলিত গ্রিক নাট্যফর্মের পঞ্চাঙ্ক সূত্র অনুসরণ না করে কেবল বারোটি দৃশ্যে তিনি নাটকের গল্প সাজিয়েছেন। এরমধ্যে কিছু কিছু দৃশ্য আবার সংলাপহীন; শুধু মঞ্চনির্দেশে চরিত্রের অঙ্গভঙ্গি ও অভিক্ষেপের মাধ্যমে দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটকের ১ম থেকে ৪র্থ দৃশ্য এরকম ছোট ছোট ঘটনাপুঞ্জে সাজানো হয়েছে। সরাসরি চরিত্রের মুখের সংলাপের মাধ্যমে কাহিনির সূচনা হয়েছে ৫ম দৃশ্য থেকে। নাটকটি যেহেতু অতীত ও বর্তমান সময়ের সমন্বয়ে রচিত, সেহেতু নাট্যকার প্রায়শ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন। অতীতের এই ঘটনাবলি সৈয়দ হক উপস্থাপন করেছেন ফ্লাশব্যাকরীতির আশ্রয় নিয়ে। যেমন : নাট্যকারের স্ত্রীর আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বা রহস্য কী, এটিই বস্তুত আলোচ্য নাটকে প্রথম থেকে একটি কৌতূহল সৃষ্টি করে দর্শক-পাঠক মনে। এ পর্যায়ে তাই ফ্লাশব্যাক রীতিতে নাট্যকার-চরিত্রের স্মৃতিতে প্রফিলিত হয়েছে পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে

---

[১] সূত্র : অনন্ত হিরা, 'গত ২০ বছরে আমাদের থিয়েটার : ঢাকার থিয়েটারের পালাবদল-পালা', *theatrewala.net*, চলতি সংখ্যা (৩৪), ঢাকা

[২] 'কণ্ঠশীলনের নতুন নাটক *উত্তরবংশ*' *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, বিনোদন পাতা, সংস্কৃতি সংবাদ, ১৫ আগস্ট, ২০১২

নাট্যকারের স্ত্রীর নিগ্রহের করুণ চিত্র। এ দৃশ্যে সৈয়দ শামসুল হক যেভাবে নাট্যকারের স্ত্রীর নির্যাতনের ছবি এঁকেছেন, তা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নিগৃহীত সমগ্র নারী সমাজের চিত্র বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এর পূর্বে দর্শক আভাসে ইঙ্গিতে নাট্যকারের স্ত্রীর প্রতি পাকিস্তানি নরপশুদের নির্যাতন প্রসঙ্গে অবগত হয়ে থাকলেও এ দৃশ্যে এসে পুরোপুরি জেনে যায় এবং নিশ্চিত হয় যে, নাট্যকারের স্ত্রী হানাদারদের হাতে ধর্ষিত ও নির্যাতিত হয়েছিল। কিন্তু নাট্যকারের মেয়ে তার মায়ের আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ কখন জানবে, বা আদৌ জানবে কিনা, অথবা জানলেও তার প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটিই তখন দর্শকের উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল। ৬ষ্ঠ দৃশ্যে কেবল মঞ্চনির্দেশের মাধ্যমে সংলাপহীন যে নারকীয় নির্যাতন দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উপস্থাপন করা যেতে পারে :

> আলো জ্বলে ওঠে। সামরিক বেশে বিপরীত মানুষেরা শূন্য মঞ্চস্থানে আসে। এবার তাদের সঙ্গে সাধারণ বেশে স্থানীয়দের দেখা যায়। প্রত্যেকে তারা একেকটি মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে। মেয়েরা হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে। ছোটাছুটি করে। নারকীয় উল্লাসে বিপরীত মানুষেরা তাদের ধাওয়া করে। [...] আবহধ্বনি সঙ্গীতে–বাঁশীর তীক্ষ্ণ স্বর ও দুন্দভির মতো ভারী ঢোলক-শব্দ। মেয়েরা সংজ্ঞা হারায়। এক যুবতী – আসলে নাট্যকারের স্ত্রী – তার ওপর আলো গুটিয়ে আসে। একটু পরে ধীরে সে মাথা তোলে। তার এলোমেলো দীর্ঘ চুল মুখ বুক ঘিরে পড়েছে। মুখ ক্ষতবিক্ষত। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৫)

নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য দৃশ্যটি পুরোটাই নির্মাণ করেছেন মঞ্চনির্দেশের মাধ্যমে। অর্থাৎ পুরো দৃশ্যটি নাটকের মূল চরিত্রগুলোর সংলাপবিহীন একটি বাস্তবচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে। নাট্যকার এই দৃশ্যটির মাধ্যমে বস্তুত ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধীদের অপরাধ কতটা ভয়াবহ ছিল সে সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে চেয়েছেন। নাট্যকার এই দৃশ্যটি নির্মাণে শিল্পীর কল্পনার তুলনায় ইতিহাসবেত্তার মতো বাস্তবানুগ হতে চেয়েছেন – পাঠক-দর্শককে ১৯৭১ সালের নারী নির্যাতনের ভয়াল ছবিটি মূলানুগ করে দেখাবার প্রয়োজনে। কেননা তিনি এখানে নারী নির্যাতন, ধর্ষণের যে পাশবিক চিত্রটি সৃষ্টি করেছেন সেই বর্ণনার সঙ্গে ১৯৭১ সালে নারী নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। অর্থাৎ নাটকের প্লট গঠন, মঞ্চপরিকল্পনা, পাত্র-পাত্রী নিবার্চনে সৈয়দ শামসুল হকের সনিষ্ঠ যত্ন ও প্রজ্ঞা সহজেই নজর কাড়ে।

উত্তরবংশ নাটকে মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) *কবর* (রচনা : ১৯৫৩) নাটকের প্রভাব লক্ষণীয়। সৈয়দ হকের রচনায় মুনীর চৌধুরীর লেখনীর প্রভাব নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> আমার মনে হয়, একমাত্র অগ্রজদের মধ্যে আমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং মুনীর চৌধুরী, এ দু'জনকে গ্রহণ করেছি।[১]

মুনীর চৌধুরীর *কবর* নাটকে যেমন লাশ কবর থেকে উঠে আসার দৃশ্য রয়েছে তেমনি *উত্তরবংশ* নাটকের শেষের দিকের একটি দৃশ্যে চকখড়ির মতো সাদামুখ অসংখ্য মৃত নারী-পুরুষ মঞ্চে উঠে আসে বিচারের দাবিতে। এরা মূলত একাত্তরে নির্যাতিত নারী-পুরুষের আত্মা। তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে ঘুরে ঘুরে বিচারের দাবি জানিয়ে উচ্চারণ করতে থাকে :

> আমরা আর কবরে থাকবো না।
> আমরা আর কান্নার রোলে বাতাস ভারী করবো না।
> আমরা উঠে এসেছি বধ্যভূমি থেকে –
> আমরা উঠে এসেছি অমাবস্যা সরিয়ে – [...]
> আর কতকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে –
> একটি বিচারের জন্যে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৫)

'আমরা আর কবরে থাকবো না' – সংলাপটি *কবর* নাটকের লাশদের সংলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুনীর চৌধুরীর *কবর* ছিল ৫২-র ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত প্রতিবাদী নাটক, আর *উত্তরবংশ* ১৯৭১-এ মানবতাবিরোধী অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত প্রতিবাদী নাটক।

উত্তরবংশ নাটকটির কলেবর তুলনামূলকভাবে সৈয়দ হকের অন্যান্য নাটক থেকে বৃহৎ। এ নাটকটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচিত হলেও সংলাপগুলো নিছকই স্লোগানধর্মী হয়ে ওঠেনি। বরং একজন অসামান্য কবির হাতে সংলাপের ভাষায় কাব্যের লালিত্য, মাধুর্য অনন্য হয়ে উঠেছে। বস্তুত, 'সৈয়দ শামসুল হকের রচনা থেকে আমরা নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি, বাংলাভাষার শক্তি কত প্রবল ও ঐশ্বর্যবান! আমাদের এই বাংলাভাষাকে সৈয়দ হক নতুন নতুন রূপ দিয়েছেন। কতভাবেই না তিনি ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষাকে! কখনো নিপাট-নিটোল সাজানো-গোছানো রূপ দিয়েছেন, কখনো দিয়েছেন আঞ্চলিক

[১] সাক্ষাৎকার, 'কালের খেয়া', *দৈনিক সমকাল*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ভাষার তীব্রতার পরিচয়, কখনো দিয়েছেন কাচের মতো ধারালো আকাট মুখের ভাষার প্রায়োগিক রূপ। [...] বাংলা ভাষার একজন প্রবল প্রতিভাবান লেখক হিসেবে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বাংলা ও বাঙালির শক্তির উৎস।'[১]

সৈয়দ হকের অন্যান্য কাব্যনাটকে আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ রচিত হলেও এ নাটকে তিনি চরিত্রের শ্রেণি-অবস্থান বিবেচনায় রেখে প্রমিত বাংলা ভাষার সংলাপ ব্যবহার করেছেন। নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্রই উচ্চশিক্ষিত, শহুরে, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। ফলত, তাদের মুখের ভাষায় আঞ্চলিকতার ছাপ সংলাপের গাঁথুনিকে দুর্বল করে দিতে পারতো। এছাড়াও একজন সফল কবি হিসেবে নাট্যকার উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের সমন্বয়ে সংলাপকে শিল্পিত করে তুলেছেন। ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এ লুকোনো অবস্থায় গণহত্যা ও হত্যা-ধর্ষণ–লুণ্ঠনদৃশ্য অবলোকন করেছিলেন তা তুলনা করেছেন সাগরে ডুবন্ত জাহাজের পেরিস্কোপের সঙ্গে :

> জানালার নিচে মাথা তুলে
> ডুবোজাহাজের পেরিস্কোপের মতো আমার চোখ তুলে
> আমি দেখেছি – আমি দেখেছি – [...]
> পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম, পাশবিকতম, সবচেয়ে ভয়াবহ
> সেই হত্যা, সেই গণহত্যা। সেই ধর্ষণ। সেই মৃত্যু। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৩)

আবার মুক্তিযুদ্ধকালে অসহায় তরুণ যোদ্ধাকে তিনি তুলনা করেছেন ভেজাবারুদের সঙ্গে। ভেজাবারুদ যেমন আপাত অক্ষম, কিন্তু অন্তরে লালন করে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ, তেমনি একাত্তরের বিপন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিরুপায় যুবক লালন করছে প্রতিবাদ, দ্রোহের আগুন। এ সময় ও সমাজকে নাট্যকার তুলনা করেছেন জাহান্নামের আগুনের সঙ্গে :

> লাগাতার কারফিউ। বাইরে গোলাগুলি। একাত্তর। [...]
> ভেজাবারুদের মতো যুবক প্রতিধ্বনি করে ওঠে – 'খবর!'
> [...] দোজখের তাপে তপ্ত। ধারালো ছুরির মতো রোদ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৫৬)

এরকম আরও কিছু শিল্পিত, তাৎপর্যপূর্ণ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অলঙ্কারের উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

---

[১] জাকির তালুকদার, 'সৈয়দ শামসুল হকের কথাসাহিত্য : শক্তিকেন্দ্রের সন্ধানে', *পরানের গহীন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

উপমা :

১. মানুষের বুকে যে কথাগুলো পাথরের মতো হয়ে আছে,
তাকে গলিয়ে ঝর্নার উদ্দাম ধারা সৃষ্টি করতে হবে আজ। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৫)

২. প্রতিমুহূর্তে যাকে বিজয়ে ধরে রাখতে হয় –
নইলে গোলাপী তুলোর মিঠাইয়ের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮০)

৩. কবিতার ধ্বনির মতো অনুভব করছো বলেই
এমন উচ্চারণের রোল তুমি শব্দের ভেতরে ধরেছো। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮৯)

৪. অতীতকে এত বেশি মনে রাখলে অতীত পেছন থেকে
শেকলের মতো টানে পেছনেই – এতে রাষ্ট্রের চলন থামে, ... (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৯৩)

৫. মানুষের হৃৎপিণ্ড তপ্ত খোলায় খৈয়ের মতো ফোটে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৯৮)

উৎপ্রেক্ষা :

১. মেয়েদের টেনে টেনে বের করেছিল ঘর থেকে,
দাঁত – দাঁত ওদের – হিংস্র তীক্ষ্ণ কামুক,
যেন পৃথিবীর সমস্ত মাতৃদুধ ওরা শোষণ করে নিতে
বিকটের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে জনপদে নেমেছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৩)

২. তুমি শুধু তোমার প্রতিভার কলমে, শব্দের পর শব্দরোল তুলে
ক্রন্দন রচনা করেছো, যেন নতুন এক কারবালার নতুন মর্সিয়া –
যেন মিছিলের পর মিছিলে গীত হবে সেই শোকগাথা। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৯৫-৫৯৬)

৩. রক্তাক্ত আঁধার ঠেলে রক্ত মেখে সূর্য ওঠে রোজ। মিলিটারি ট্রাক –
তার ধ্বড়ধ্বড় শব্দটা যেন করাত – চিরে ফেলে জগত। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৯৮)

৪. নিঃশব্দে সমস্ত কিছুর পতন আর থমথমে অনিশ্চয়তা যেন
মিস্তিরির হাতে শিরিষের মোটা কাগজ – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬০)

সমাসোক্তি :

১. বাতাস আজও মায়ের বোনের কান্নার অবিশ্রান্ত রোল হয়ে ফেরে, ... (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৭)

২. আপনার আদর্শ আজ ধর্ষিত – চেতনার জানু বেয়ে রক্ত ঝরছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৬)

৩. নালপড়া বুটের শব্দ গজাল ঠুকে চলে মানুষের হৃৎপিণ্ডে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৭৮)

৪. খসে খসে পড়ছে রাষ্ট্রের মাংস, নগ্ন হয়ে পড়ছে নাভিমূল,
আর শত্রুরা তাদের তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮০)

৫. কখনো কখনো, কী জানো, সময় কেমন চেপে ঠেসে আসে।
অতীত অস্থির হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ আর্ত হয়ে পালায়।
সময় কি সময়ের গতিতেই আছে ? নাকি – অতীত ফিরে এসে অট্টহাসি করছে – (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৬৬)

চিত্রকল্প :

১. পৃথিবী নীল হয়ে গেছে হিমে –
ঘরের বাঁশ বেড়া হিম, পায়ের নিচে উঠোন হিম,
আকাশ হিম, বাতাস হিম, নদীর পানি বরফের মতো হিম –
কিন্তু ওই উনোনের চাপা দেয়া কড়াইয়ের ওলটানো পিঠ –
বিশাল কাছিমের মতো উবু হয়ে ? ওটাও কি হিম ?
একদিন খুব ভোরে উঠেছি, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছি –
কড়াইটার পিঠে হাত দিতেই ছ্যাঁত করে উঠলো হাত –
তাতানো কড়াইয়ের পিঠ, ফোসকা পড়ে গেলো হাতে।
ভাবিনি যে আগুনটা মরে যায়নি দীর্ঘ সারা রাতেও –
আছে হিমের ভেতরে মাথামুড়ি দিয়ে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮৯)

২. জীবন যে অনুভব করে
সে যেন পাষাণ ভেঙে বরফ গলিয়ে
প্রবল তিস্তার মতো হিমালয় থেকে নেমে আসে সমতলে –
কলকল খলখল উল্লাসের করতালি বাজিয়ে বাজিয়ে
ফসলের জন্যে পলি ফেলতে ফেলতে
যমুনায় গিয়ে ঝাঁপ দেয়,
যমুনাকে জাগিয়ে তোলে সে,
মাতিয়ে ভরিয়ে তুলে মরা যমুনাকে
আবার জীবন দেয়, নতুন জীবন।
যমুনা যৌবন পায়।

তখন যমুনা তাকে জংঘার ভেতরে নিয়ে
সারা দেশে পলি ফেলে যেতে যেতে
দু'পাড়ে ধানের বান ফসলের সচ্ছলতা ফলাতে ফলাতে
পদ্মাকে ডাক দিয়ে বলে –
আয়, শরীরের ভেতর আয়,
মেঘনার দিকে তার তরঙ্গের মুদ্রা তুলে বলে –
তোর কালো স্রোতের ভেতরে
ব্রহ্মপুত্র আয় নিবি আয় –
মৎসবতী হব আজ, সময় হয়েছে। (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৮৯)

পুরাণ :

১. ভুলে গিয়েছিলে শত্রু হচ্ছে রক্তবীজের ঝাড়,
একটি ফোঁটাও যতদিন থাকে – নতুন শত্রু জন্ম হতেই থাকে। (কাব্যনাট্যসমগ্র:৫৮০) [

ভারতীয় পুরাণ মতে, দানবরাজ রম্ভের রূপান্তরিত রূপ হল রক্তবীজ। ইনি দৈত্যরাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি ছিলেন। দেবির সঙ্গে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধকালে রক্তবীজ ও দেবির সহচরীদের ঘোর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে এর শর-বিদ্ধ দেহ হতে যত বিন্দু রক্ত ভূমিতে পড়ত, তা থেকে রক্তবীজের মতো ভয়ঙ্কর বলবীর্য মহাসুর উদ্ভূত হত। এই জন্য ইন্দ্র নিজের বজ্র দিয়ে একে নিপাত করতে গেলে শত শত রক্তবীজের আবির্ভাব হয়েছিল। শেষে দেবী মহাশক্তি দেবতাদের বিপথে দেখে নিজের অঙ্গীভূতা কালীকে বললেন, সমস্ত রক্ত-বীজস্বরূপ দৈত্যকে ভক্ষণ কর এবং রসনাবিস্তার করে সমস্ত শোণিত পান কর। তা'হলে রক্তবীজ নিঃশোণিত হয়ে আমার হস্তে নিহত হবে। দেবী মহাশক্তি চামুণ্ডা ও কালীর সাহায্যে রক্তবীজের নিপাত করেন।[১] আলোচ্য নাটকে সৈয়দ শামসুল হক একাত্তরের বিপুল পরাজয়ের পরও পাকিস্তানপন্থী রাজাকার-দালাল সম্প্রদায়ের ধীরে ধীরে এ দেশের রাজনীতিতে স্থায়ী হওয়া প্রসঙ্গে আলোচ্য পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। রক্তবীজের যেমন আমূল বিনাশ প্রয়োজন, নইলে উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকে, তেমনিভাবে রাজাকার-মানবতাবিরোধীদের আমূল বিনাশ প্রয়োজন, যেন তারা আর শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি না করতে পারে।

---

[১] দ্রষ্টব্য: পৌরাণিক অভিধান, সম্পাদনা : সুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আষাঢ়, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫৯)

২. এদের বিরুদ্ধেই তো একাত্তরে উঠে দাঁড়িয়েছিলো মানুষ – / এখন সেই ওরাই আবার ছদ্মবেশে ছিদ্র কেটে ঢুকেছে –/ লখিন্দরের বাসরে সাপ! ছিদ্র কেটেছে কি সদর পথেই এসেছে– / রাষ্ট্রছিনতাইকারীরাই ডেকে এনেছে তাদের– (কাব্যনাট্যসমগ্র : ৫৯৩)

বেহুলা লখিন্দরের গল্প বাঙালির লোকজ পুরাণের অংশ। বেহুলা *মনসামঙ্গলের* প্রধান নারী চরিত্র, এবং তাঁর স্বামী হলো চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দর। আলোচ্য কাব্যনাট্যে স্বাধীন বাংলাদেশকে লখিন্দরের নিশ্ছিদ্র বাসরঘরের সঙ্গে তুলনা করে পাকিস্তানপন্থি মানবতাবিরোধীদের সর্পের সঙ্গে প্রতিতুলনা করা হয়েছে; যারা জনগণের অসতর্কতায় ঢুকে পড়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে।]

৩. পরনের শাদা শাড়িটি স্বাভাবিকের চেয়ে বহুগুণ দীর্ঘ, আঁচলটি লাল রক্ত মাখা। মঞ্চ সে পরিক্রম করতে থাকে, আচঁল তার লুটিয়ে থাকে, টানে টানে খুলে যেতে থাকে – যেন অন্তহীন। (মঞ্চনির্দেশ, কাব্যনাট্যসমগ্র : ৬০৪)

এখানে অবশ্য নাট্যকার পুরাণ থেকে সরাসরি কোনো চরিত্র বা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। তবে দীর্ঘ আঁচল এবং টানে টানে শাড়ি খুলে যেতে থাকা চিত্রসংবলিত যে মঞ্চনির্দেশ তিনি প্রদান করেছেন, তাতে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি মহাভারত-পুরাণে উল্লেখিত চরিত্র দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সঙ্গে ১৯৭১ সালে পাকহানাদার বাহিনীর হাতে এদেশের মা-বোনের ধর্ষিত হবার ঘটনা তুলনা করেছেন।]

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা করেছেন। বস্তুত তিনি চেয়েছিলেন এ নাটকটি রচনা ও মঞ্চায়নের মাধ্যমে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের প্রকৃত ইতিহাস পৌঁছে দেবেন। এর ফলে একাত্তরের ঘাতক-দালাল-রাজাকারদের বিচার-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। তবে বিষয়মুখ্য এ রচনাটির শিল্পসৌন্দর্যের দিকেও তিনি সমান লক্ষ রেখেছেন। প্লট গঠন, চরিত্রায়ণ, ভাষাগত মাধুর্য– সবদিকেই তিনি সমান নজর রেখেছেন। ফলে রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও *উত্তরবংশ* কাব্যনাটকটি একটি যথার্থ কাব্যনাটক হয়ে উঠতে পেরেছে।

উপসংহার

কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের মিলিত সমবায়ে নির্মিত হয় একটি সফল কাব্যনাটক; যেখানে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট পরিণামের তুলনায় চরিত্রের অন্তর্দহন, ব্যক্তিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন মুখ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কাব্যনাটকে বর্হিবাস্তবতার তুলনায় অন্তর্বাস্তবতার উপস্থাপনই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আধুনিক কাব্যনাটকের যাত্রা শুরু হয় পাশ্চাত্য কবি টি এস এলিয়টের হাত ধরে। তিনি মৌলিক কাব্যনাটক যেমন রচনা করেছেন, তেমনি কাব্যনাটক বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ রচনা করে এ ধারাটিকে সাহিত্যাঙ্গনে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। বাংলাসাহিত্যে অনেকেই কাব্যনাটক রচনা করেছেন; যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যনাট্যকার হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু ও সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ। বাংলাদেশের সাহিত্যে কাব্যনাটক রচনায় সৈয়দ শামসুল হকের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। একাধারে জনপ্রিয় ও শিল্পসফল কাব্যনাটক রচনায় তিনি তুলনারহিত শিল্পী। সৈয়দ শামসুল হক পেশাগত কারণে ইংল্যান্ডে থাকার সময় প্রচুর মঞ্চ নাটক প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় তিনি গ্রিক ও শেকস্‌পিয়রিয়ান নাটকে ব্যবহৃত কবিতার লালিত্যপূর্ণ শক্তি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন । বিশেষত, টি এস এলিয়ট, হেনরিক ইবসেন রচিত কাব্যনাট্যের ধরন সৈয়দ হককে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। আবার এদেশীয় লোকসমাজ, লোকসংস্কৃতি, লোকগাঁথা, *মৈমনসিংহ গীতিকা* এমনকি মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্যের মাটিগন্ধী মাধুর্যে সৈয়দ শামসুল হক ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ফলত, পাশ্চাত্য নাট্যফর্ম ও প্রাচ্যের বিষয় – এ দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে তিনি কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ে* প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইতিহাসকে। তবে মুক্তিযুদ্ধ এ নাটকের প্রেক্ষাপট হিসেবে উপস্থাপিত হলেও, নাট্যকার এখানে ইতিহাসের ঘটনাবলির ধারাবিবরণী উপস্থাপন করেননি। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে এ নাটকের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন – যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শ্রেণি রাজনীতির স্বরূপ, সর্বোপরি সাধারণ জনগণের ওপর ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাব। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঘটনার বিবরণী নয়, ঘটনার কার্যকারণ ও তৎসূত্রে চরিত্রের মনোকথন উন্মোচনই এখানে নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় এ নাটকটি রচনা করে তিনি বাংলাসাহিত্যে নাট্যভাষার এক নতুন ধারার সূচনা করেছেন। *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকটি

বাস্তব ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এক বীরযোদ্ধাকে নিয়ে রচিত হয়েছে। এখানে বাংলার বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের সাধারণ কৃষকজীবনের চাওয়া-পাওয়া, ক্ষোভ, দ্রোহ ও বঞ্চনার কথকতা যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি ভাগ্যান্বেষণে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুদূর বিলেত থেকে আগত ব্রিটিশ কর্মচারীদের শোষণ-শাসনের স্বরূপ, ব্যক্তিগত হতাশা ও জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখার গল্প উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। সৈয়দ শামসুল হকের রচনাগুণে ও ভাষানির্মাণ দক্ষতায় *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকের প্রায় অধিকাংশ সংলাপ আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। যখনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জনগণ জেগে ওঠে, তখনই তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নূরলদীনের – 'জাগো বাহে, কোনঠে সবায়' সংলাপ।

এখানে এখন নাটকটি সৈয়দ শামসুল হকের একটি নিরীক্ষামূলক সামাজিক কাব্যনাটক। যুদ্ধোত্তর কালপরিসরে বিপর্যস্ত সমাজ, বিনষ্ট রাজনীতি, সর্বোপরি মানুষের মজ্জমান চেতনার স্বরূপ চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। নাটকের প্লট নির্মাণ, চরিত্রায়ণ কৌশল কিংবা মঞ্চ-উপস্থাপনকৌশল সবকিছুতেই নাট্যকারের অভিনব ভাবনা নজর কাড়ে। ভাষাবিন্যাসেও তিনি তাঁর অন্যন্য রচনাশৈলীর মতো কুশলী ও সার্থক।

ষোড়শ শতাব্দীর কিংবদন্তিতূল্য ব্রিটিশ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বিখ্যাত ট্রাজিক নাটক *জুলিয়াস সিজার* অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *গণনায়ক* কাব্যনাটকটি রচনা করেন। এ নাটকটি রচনার পেছনে নাট্যকারের প্রগাঢ় দেশপ্রেম, দেশের ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজ সম্পর্কে প্রবল সচেতনতাবোধ কাজ করেছে। বস্তুত, *গণনায়ক* নাটকটিতে রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। খুব কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা দ্বারা একজন রাষ্ট্রপতি কীভাবে খুন হতে পারে, বাস্তবতার আলোকে তার বর্ণনা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এখানে। এ নাটকে বঙ্গবন্ধুর ছায়া প্রবলতর। বস্তুত, পঁচাত্তর-উত্তর সময়ে যখন সমগ্রজাতি এক অদ্ভুত নিশ্চুপতায় ডুবে ছিল, সমগ্র দেশে যেখানে জাতির জনকের নাম মুখে নেয়াই নিষিদ্ধ ছিল; তখন সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বিভিন্ন লেখায় বিশেষত, এ-কাব্যনাট্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এককভাবে সৈয়দ হকই সম্ভবত শেকস্‌পিয়রের অধিকসংখ্যক নাটকের অনুবাদ করেছেন, কিংবা শেকস্‌পিয়র রচনাবলি থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে তা এদেশের পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সমীকৃত করে বিনির্মাণ করেছেন। কাব্যনাটক *ঈর্ষা* এমনই একটি রচনা। এর মৌলবিষয় মানবিক ঈর্ষা। শেকসপিয়রের *ওথেলো* নাটক থেকে ঘটনাংশ আহরণ করলেও তাকে একান্ত নিজের মতো করে আলোচ্য

নাটকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। তিনটি মাত্র চরিত্রের সাতটি মাত্র সংলাপে তিনি মানবজীবনে জৈবিক ঈর্ষার বিষময় ফল চিত্রিত করেছেন। এ নাটকের ভাষা কবিত্বের মাধুর্যে অনন্য; নাট্যকাঠামোও অভিনব।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক *নারীগণ*। তবে পলাশির করুণ ইতিহাস এ- নাটকের প্রেক্ষাপট হলেও পূর্বজ নাট্যকারদের অনুসরণে তিনি সিরাজদ্দৌলা-বিষয়ক দেশাত্মবোধক ও ভাবাবেগসম্পন্ন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেননি। বরং তিনি এখানে রাজমহলের উচ্চবংশীয় নারীদের মনোকথনের পাশাপাশি উপস্থাপন করেছেন উপেক্ষিত সেইসব দাসীদের অনুক্ত কথা, যারা দাসপ্রথার নির্মম শিকার হয়ে পিতা-মাতা, গৃহ হারিয়ে অন্তঃপুরবাসিনীর জীবনযাপনে বাধ্য হয়, এবং রাজপরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। এ-নাটকে বারবিলাসিনীদের জীবনগাথাও অত্যন্ত দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার। তিনি কুতবচরিত্রের সংলাপে *নারীগণ* নাটক লেখার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে বলেছেন : স্মৃতির প্রচ্ছদপটে আঁকা শুধু রাজাদেরই মুখ! / নারীর কথা কে লেখে ? কার মনে থাকে ? (কাব্যনাট্যসমগ্র: ৩৮০)

কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত জনপ্রিয় লোকনাটক *বেদের মেয়ে* অনুসরণে সৈয়দ হক তাঁর *চম্পাবতী* কাব্যনাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার মনে করেছিলেন জসীম উদ্‌দীন বাংলাসাহিত্যে প্রায় অনালোচিত বেদেসমাজকে পাঠক-দর্শকের সম্মুখে বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরার বাসনায় রচনার নাট্যগুণ ক্ষুণ্ন করে ফেলেছেন। ফলে তিনি মূলরচনার সুর অক্ষুণ্ন রেখে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন-পরিশোধন করে সেটি নতুন রূপ সাজিয়েছেন। এক্ষেত্রে সৈয়দ হক জসীম উদ্‌দীনের মতো গতানুগতিক নাট্যধারা অনুসরণ না করে ১০টি দৃশ্যের মাধ্যমে আদ্যন্ত সমগ্র নাটকটি নির্মাণ করেছেন। ফলে নাটকটি লোকনাট্যের শিথিলতা পরিত্যাগ করে আধুনিক কাব্যনাটক হয়ে উঠতে পেরেছে।

অপেক্ষমাণ নাটকটি সৈয়দ শামসুল হক ইবসেন-নাট্যোৎসবে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশক আতাউর রহমানের বিশেষ পরিকল্পনা ও পরামর্শে রচনা করেছিলেন। এটি মূলত তিনটি নাটকের মিথস্ক্রিয়া। এখানে সৈয়দ শামসুল হক ও নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেন যুগলভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন । সৈয়দ শামসুল হক হেনরিক ইবসেনের এমন দুটি কালোত্তীর্ণ নাটককে বেছে নিয়েছেন, যেখানে নাটকগুলোর প্রধান চরিত্ররা সত্যের প্রয়োজনে সমাজের বিরুদ্ধে লড়েছে। সমাজের বিপক্ষে কথা বলায় স্বভাবতই তারা একা হয়ে গেছে, তবু সত্যের পথ থেকে বিচলিত হয়নি। অন্যদিকে, তিনি তাঁর *ঈর্ষা* নাটকের প্রৌঢ় চরিত্রকেও এ-নাটকের সঙ্গে যুক্ত

করে করেছেন – যিনি শেষপর্যন্ত সত্যের আয়নায় দাঁড়িয়ে জীবনের প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

মরা ময়ূর নাট্যকারের একটি রূপকধর্মী রচনা। এ-নাটকে 'আজানে'র প্রয়োগ ও এতদ্বিষয়ক সংলাপকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মৌলবাদী গোষ্ঠী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এতৎসত্ত্বেও নাটকটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটি সমকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ একটি অসাধারণ নাট্যকর্ম। অন্যদিকে যুদ্ধপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবি নিয়ে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *উত্তরবংশ* নাটক রচনা করেছেন। একটি বিশেষ রাজনৈতিক সরকারের আমলে, মুক্তবুদ্ধির ওপর মৌলবাদীগোষ্ঠীর রক্তাক্ত হামলার প্রসঙ্গটিও এখানে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল একাত্তরের ঘাতক-দালালদের প্রকৃত ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা, যেন তারা প্রকৃত সত্য অবগত হয়ে দেশ থেকে ঘাতক, রাজাকার, মৌলবাদী শক্তির বিনাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্যনাটকটি রচিত হলেও সৈয়দ শামসুল হকের সৃষ্টিশীল প্রতিভাগুণে এটি একটি সার্থক কাব্যনাটক হয়ে উঠতে পেরেছে।

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হক কাব্যনাট্যসৃজনে নিজস্ব কল্পনা ও পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন কাজে লাগিয়েছেন, ঠিক তেমনি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পঠন-পাঠনসূত্রে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমীকৃত করে তাঁর সৃষ্টিকে উত্তীর্ণ করেছেন অনন্য স্থানে। তিনি বরাবরই নিরীক্ষাপ্রিয় নাট্যকার। নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন তিনি অনন্য রুচিশীলতা দেখিয়েছেন, তেমনি কাব্যনাট্যের ফর্ম নিয়ে নিরীক্ষাপ্রিয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। বস্তুত, সৈয়দ হকের সাহিত্যধারায় তাঁর নাট্যসাহিত্য অতি-উজ্জ্বল অংশ অধিকার করে আছে। সমগ্র বাংলা কাব্যনাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ

সৈয়দ শামসুল হক : *কাব্যনাট্যসমগ্র*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

: *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (রচনাকাল : ১৯৭৫)

: *গণনায়ক* (রচনাকাল : ১৯৭৬)

: *এখানে এখন* (রচনাকাল : ১৯৮১)

: *নূরলদীনের সারাজীবন* (রচনাকাল : ১৯৮২)

: *ঈর্ষা* (রচনাকাল : ১৯৯০)

: *নারীগণ* (রচনাকাল : ২০০৬)

: *চম্পাবতী* (রচনাকাল : ২০০৮)

: *উত্তরবংশ* (রচনাকাল : ২০০৮)

: *অপেক্ষমান* (রচনাকাল : ২০০৯)

: *মরা ময়ূর* (অনূদিত, ২০১২)

সহায়কগ্রন্থ (বাংলা)

অজয় রায়, *আদি বাঙালি : নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৭

অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

অতুল সুর, ড., *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৪

অনুপম হাসান, *বাংলাদেশের কাব্যনাটক : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০

অলোক রায় (সম্পা.), *সাহিত্যকোষ : নাটক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৩

অলোক সরকার, *অগ্রজ কবিরা ও কাব্যনাটক*, কবিপত্র, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *মীর কাসিম*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫

আতাউর রহমান, *নাট্য প্রবন্ধ বিচিত্রা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, *ত্রিমাত্রিক*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৬

আনিসুজ্জামান, *বিপুলা পৃথিবী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

আবুল বারকাত, *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৫

আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৯

আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'আটতলার ওপরে', *নাট্যসমগ্র*, সেবা পাবলিসার্স, ঢাকা, ২০০৯

আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *শিল্পীর রূপান্তর*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ইহুদীর মেয়ে', *শ্রেষ্ঠ নাটক*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

আলী আনোয়ার, *আধুনিক ইউরোপীয় নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

আহমদ ছফা, *সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*, প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

আহমেদ ফিরোজ (সম্পা.), *ফিরে দেখা ১৫ আগস্ট*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯

উত্তম দাশ, *বাংলা কাব্যনাট্য*, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯৮৯

এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬

এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১০

ওবায়দুল কাদের, *পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু*, মূল লেখক : রবার্ট পেইন, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

কণিকা সাহা, *আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য : উদ্ভব ও বিকাশ*, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪

কবির চৌধুরী, *এ্যাবসার্ড নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

খান সারওয়ার মুরশিদ (সম্পা.), *সমকালীন বাংলা সাহিত্য*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯

খায়রুল আলম সবুজ (অনুবাদ), *এন এনিমি অব দ্য পিপল*, বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৮

গোপাল হালদার, *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ২০১৩

জসীমউদ্‌দীন, *বেদের মেয়ে*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

জীবনানন্দ দাশ, কবিতাসমগ্র, টুম্পা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

তপন পালিত, *মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন (১৯৭১-২০১৩)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬

তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) : *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা* , পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪

দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক কাব্য পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২

দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব- বিচার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮

নাজমুন নাহার লাইজু, *বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০২০

নিলুফার বানু (সম্পা.), *প্রসঙ্গ নাট্য এবং*, যৌথ প্রকাশনা : *থিয়েটার* ও বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০৪

নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২

নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব*, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৩

নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পা.) *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস : ১৯৪৭-১৯৭১* , আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পা.), *ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, ঢাকা, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

পিয়াস মজিদ (সম্পা.), *বিন্দু : নির্বাচিত সৈয়দ শামসুল হক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৮

প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৮

ফররুখ আহমদ, *নৌফেল ও হাতেম* , আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৯

বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬

বদিউর রহমান, *রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন পাঠের ভূমিকা*, নতুনধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯১

বিশ্বজিৎ ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, *কাব্যনাট্যসমগ্র* (সম্পা.), অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

বেগম আকতার কামাল, *রবীন্দ্রনাথ : যেথায় যত আলো*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

বেগম আকতার কামাল, *বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, *অন্নদামঙ্গল* (প্রথম খণ্ড), তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫

মফিজ চৌধুরী, ড., *উইলিয়াম শেকস্পীয়রের জুলিয়াস সীজার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৩

মমতাজউদদীন আহমদ, *আমার নাট্যভাবনা*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০০

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, ড., *পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

মাহবুব সাদিক, *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য : একালের জীবনভাষ্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

মুনতাসীর মামুন, *বন্দুকের ছায়ায় গণ*তন্ত্র, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩

মোস্তফা তারিকুল আহসান : *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও সুনীল কান্তি দে, (সম্পা.), *মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার ও গণজাগরণ মঞ্চ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা ,২০১৪

মো : জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা (১৯৪৩-১৯৯০)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭,

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, *রংপুর জেলার ইতিহাস* (প্রথম পর্ব), রংপুর, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ২০১৫

রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪

রামেন্দু মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

রামেন্দু মজুমদার, *বিষয় : নাটক*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

রামেন্দু মজুমদার, *নাটক : তত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৩

রাহমান চৌধুরী, *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, বাংলাএকাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, *বিষ বিরিক্ষের বীজ*, অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, *উপদ্রুত উপকূল*, বুকস্ ফেয়ার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬

শান্তনু কায়সার, *কাব্যনাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

শান্তনু কায়সার, *বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬

শাহরিয়ার ইকবাল, *নীল বিদ্রোহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি* (সম্পা.), একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৯

শাহরিয়ার কবির, *সভ্যতার মানচিত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা ২০১১

শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পা.), *মৈমনসিংহ গীতিকা*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১

শ্রী নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

শুদ্ধসত্ব বসু, *বাংলা সাহিত্যের নানারূপ*, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ

সুশীল চৌধুরী, *পলাশির অজানা কাহিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯

শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৭

শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

সরদার ফজলুল করিম (সম্পা.), *আমাদের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬১

সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক- বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭

সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২১০৪

সাজেদুল আউয়াল, বাংলা নাটকে নারী-পুরুষ ও সমাজ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫

সাবিরা মনির, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭

সিদ্দিকুর রহমান, *স্মৃতি সত্তার আলোকে টি. এস.এলিয়ট*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

সুধীরচন্দ্র সরকার (সম্পা.), পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৮

সুনীলকুমার ঘোষ (সম্পা.), *ইবসেন নাট্যসম্ভার : চতুর্থ খণ্ড*, প্রকাশক : গৌরাঙ্গচন্দ্র সান্যাল,কলকাতা, ১৯৮৩

সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১২

সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৮

সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

সৈকত আসগর (সম্পা.), *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৯

সৈয়দ শামসুল হক, *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯১

সৈয়দ শামসুল হক, *প্রণীত জীবন*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

সৈয়দ শামসুল হক, *কালধর্ম*, *উপন্যাস সমগ্র*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২,

হায়াৎ মামুদ ও পিয়াস মজিদ (সম্পা.), *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ : ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো..*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা ২০১৭

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন, *লিভিং হিস্ট্রি*, অনুবাদ : জাকারিয়া স্বপন, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

হোসনে আরা জলী, *নাট্য বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজি)

Helen Gardner, *The Art of T.S.Eliot*, Faber and Faber Limited, London, 1949
J.H. Broomfield, *Elite conflict in a plural society : Twentieth Century Bengal,* University of California press, 1968
Nurul Islam Khan (edt.), *Bangladesh District Gazetteer's Rangpur*, Dhaka, Bangladesh Government press, 1977
Raymond Williams, *Drama from Ibsen to Eliot,* Chatto and Windus, London, 1952
R.C. Majumder (edt.), *History of Bengal*, Vol.1, The University of Dhaka press, (3rd edn.) 1978
T.S.Eliot, *Selected Essays*, Faber and Faber Limited, London, Reprint: March 1963
T.S.Eliot, *Poetry and drama,* Faber and Faber, London, Reprint: 1957
T.S.Eliot, *On poetry and poets,* Faber and Faber, London, Reprint : 1961
Sir William Wilson Hunter , *Hunter's Statistical Accounts of Bengal,* Vol.7, Trubner & Co., London 1877

সহায়ক প্রবন্ধ

অপু শহীদ, 'গত বিশ বছরে আমাদের থিয়েটার : কিছু আলো অন্ধকার', থিয়েটার বিষয়ক ছোটকাগজ *ক্ষ্যাপা*, ঢাকা, সংখ্যা ৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (সূত্র : www.theatrewala.net)
অলোক বসু, 'জাতীয়তাবাদী চেতনায় উৎসারিত সৈয়দ হকের দু'টি নাটক', *থিয়েটার : সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা*, (সম্পা : রামেন্দু মজুমদার) , ৪৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা : এপ্রিল ২০১৭, ঢাকা
আতাউর রহমান, '*রক্তকরবী* থেকে *অপেক্ষমাণ*', আনন্দ পাতা, *দৈনিক প্রথম আলো*, সম্পাদক : মতিউর রহমান, ঢাকা, ১২ নভেম্বর, ২০০৯
আতাউর রহমান, 'সাহিত্য-সৃজনে অনন্য পুরুষ সৈয়দ শামসুল হক', '*কালিকলম*' অনলাইন সংস্করণ, ১৮ মে, ২০১৫
আতাউর রহমান, 'শিল্পের সংসারের এক মহাবীর', *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১১
আতাউর রহমান, 'সাম্প্রতিক নাটকে প্রতিবাদী চেতনা' *থিয়েটার*, ঢাকা, ১৮ তম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
আতাউর রহমান, 'হ্যামলেট প্রসঙ্গে আলাপচারিতা', পাক্ষিক *অন্যদিন*, ঢাকা, বর্ষ ২১, সংখ্যা ১৪, সেপ্টেম্বর ২০১৬
আব্দুল গাফফার চৌধুরী, 'অনন্য সৈয়দ হক', *সংবাদ সাময়িকী*, *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ.১৮
আবু সাঈদ তুলু, 'মঞ্চনাটক : *নারীগণ*', *কালি ও কলম (অনলাইন সংস্করণ*), ঢাকা, ২২, নভেম্বর, ২০১২
আহমেদ মাওলা, 'কথাকেবিদ সৈয়দ শাসুল হক', *কালি ও কলম*,ঢাকা, ১ ডিসেম্বর, ২০১৬
গোলাম সারওয়ার, 'কালের খেয়া', সংখ্যা নম্বর : ৫০৯, *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, শুক্রবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২১৬
চিন্তামন তুষার, 'সৈয়দ হকের *চম্পাবতী*', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, অনলাইন সংস্করণ, ২৪ অক্টোবর ২০১৩
জাফরুল্লাহ চৌধুরী, *কারাগারে বঙ্গবন্ধুর চিকিৎসা*, ই.বনিকবার্তা, সম্পাদকীয়, ১০ জানুয়ারি, ২০২০

ফজলুল হক সৈকত, *দৈনিক যায়যায় দিন* (অনলাইন সংস্করণ), ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯

ফরিদ আহমেদ, 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়', blog.*mukto-mona.com,* ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, ঢাকা

মফিদুল হক, 'সৈয়দ শামসুল হকের নাট্যত্রয়ী : তৃতীয় মাত্রার সন্ধানে', *থিয়েটার*, প্রাগুক্ত

মফিদুল হক, 'থিয়েটারের স্মরণীয় প্রযোজনা *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*', *সাপ্তাহিক চিত্রালী*, ঢাকা, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭৭

মফিদুল হক, 'ঈর্ষা : নাগরিকের ঈর্ষণীয় প্রযোজনা', *দৈনিক সংবাদ*, সম্পাদক : আহমদুল কবীর, ১০ মার্চ ১৯৯২

মান্নান হীরা, 'প্রতিরোধের ঐতিহ্য ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমাদের পথনাটক', জাতীয় নাট্যাৎসব- ৯১ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্যুভেনির, সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, ঢাকা, ১৯৯১

মাসিদ রণ, '*নারীগণ* : প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কাহিনী', *দৈনিক কালেরকণ্ঠ*, ৩ জুলাই ২০১৫

মুহম্মদ ফরিদ হাসান, 'হেনরিক ইবসেন : প্রথা ভাঙার নাট্যকার', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৩ জুন, ২০১৬

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন , 'আব্দুল মান্নান সৈয়দের নাট্যসাহিত্য', *কালি ও কলম* (অনলাইন সংস্করণ), ২৩ এপ্রিল, ২০১৮

মো. নজরুল ইসলাম, 'জাপানি নাটক : নো', দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৩ আগস্ট, ২০১৯, সাহিত্যপাতা

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ : 'বাংলা কাব্যনাটকের ধারায় ফররুখ আহমদের *নৌফেল ও হাতেম*', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১৪ জুন, ২০০২

বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*, সম্পাদনা : রামেন্দু মজুমদার, প্রাগুক্ত

বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য : মুক্তিযুদ্ধের বর্ণমালা', *প্রসঙ্গ নাট্য এবং*, সম্পাদনা : নিলুফার বানু, প্রাগুক্ত

বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের নাটক : বিষয় ও আঙ্গিক', *একুশের প্রবন্ধ ৯৮*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

রামেন্দু মজুমদার, 'বাংলাদেশের মঞ্চনাটক', *শৈলী*, সম্পাদনা : ইকবাল আহমেদ, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৫

রামেন্দু মজুমদার, 'থিয়েটারের কথা-সদস্যবৃন্দ'(সম্পা.), *থিয়েটার*, , ৮ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৮০

রেজা ঘটক, ব্লগ: 'পালাকার এর ভারত জয়!!!', ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ (দ্রষ্টব্য : *somewhereinblog.net)*

রেহান ফজল, 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা : যার নির্মম হত্যার পর ভারতে ইংরেজদের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়', *বিবিসি হিন্দি (অনলাইন সংস্করণ)*, দিল্লি, ৩ জুলাই ২০২০

স.ম. শামসুল আলম, 'কাব্যনাট্যের কারিগর সৈয়দ শামসুল হক', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৭

সেলিনা হোসেন, 'সব্যসাচীর বিদায়', সংবাদ সাময়িকী, *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সৈয়দ শামসুল হক (সাক্ষাৎকার), *বিশ্বদর্পণ*, ঢাকা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৯

সৈয়দ শামসুল হক, 'অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার : রাঢ় বাঙলার মুগ্ধ চিত্রকর', *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা*, মাসিক বলাকা, সম্পাদক : শরীফা বুলবুল, ঢাকা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩৭, নভেম্বর ২০১৬

সৈয়দ শামসুল হক *আমাদের কবিতা বিশ্বমানসম্পন্ন*, সংবাদ সাময়িকী, *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

সৈয়দ শামসুল হক, 'সৈয়দ শামসুল হকের মুখোমুখি', ব্রাত্য রাইসু, 'খোলা জানালা', *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ*, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৯৭

সৈয়দ শামসুল হক, 'জীবন ও বন্ধুত্ব', *থিয়েটার*, সম্পাদনা : রামেন্দু মজুমদার, ঢাকা, ৪৬ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা,) এপ্রিল ২০১৭

শফি আহমেদ, 'উজান সময়ের আবর্তে সৈয়দ হকের কতিপয় নারী', পাক্ষিক *অন্যদিন*, ঢাকা, বর্ষ ২১, সংখ্যা ২১, ১-১৫ জানুয়ারি ২০১৭

প্রতিবেদন :

'লেটস টক উইথ শেখ হাসিনা', প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, *দ্যা ডেইলি স্টার*, সম্পাদক : মাহফুজ আনাম, ঢাকা , ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১

'ছারছিনার পীর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, সম্পাদক : মতিউর রহমান, প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ, প্রচ্ছদ/ বাংলাদেশ/ অপরাধ, ২৭ মার্চ, ২০১৭

'মাটির নবাব নূরলউদ্দীন', অন্যআলো : ফিচার, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১

'*প্রথম আলোর* সম্পাদক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রতিক্রিয়া', কলাম, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২১ জানুয়ারি, ২০২০, অনলাইন সংস্করণ

'কণ্ঠশীলনের নতুন নাটক *উত্তরবংশ' দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, বিনোদন পাতা, সংস্কৃতি সংবাদ, ১৫ আগস্ট, ২০১২

'একবছর পর মঞ্চে প্রাঙ্গণেমোর এর *ঈর্ষা*,' গ্লিটজ প্রতিবেদক, বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম (অনলাইন) ৩ জানুয়ারি ২০১৯

'শিল্পকলায় সৈয়দ হকের *নারীগণ*', গ্লিটজ প্রতিবেদক, *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ৯ জুলাই ২০১৭

নৃত্যনাট্য *চম্পাবতী*র প্রদর্শনী, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, বিনোদন পাতা, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৪

'চট্টগ্রামের মঞ্চে *শব্দ নাট্যচর্চা কেন্দ্রের চম্পাবতী*, *নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম*, অনলাইন সংস্করণ, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৯

'শিল্পকলায় *বারামখানা* ও *মরা ময়ূর* মঞ্চস্থ, বিনোদন ডেস্ক, *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা, শুক্রবার, ৫ জুন, ২০১৫

'কায়রো নাট্য উৎসবে বাংলাদেশের দুই নাটক', *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ঢাকা, ৯ অক্টোবর ২০১০

'European literary seene, A report Saturday Saturday Review', *Washington*, March 20, 1965

THE ASHIAN AGE, Editor: Seema Mustafa, Dhaka, 18 october, 2016, Entertainment Desk.

ইউটিউব লিংক

প্রাঙ্গণেমোর পরিবেশিত নাটক *ঈর্ষা*, Prangonemor Theater' official youtube channel.